

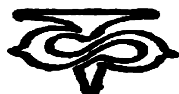
ভারতের সাধক

ভারতের সাধক

৩য় খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২



প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭

প্রকাশক
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

আচার্য শঙ্কর

যতিবেশধারী নবদৃপ্ত বালক একাকী পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। মুণ্ডিত মস্তক, নগ্নপদ, পরিধানে শুধু কৌপীন আর বহির্বাস। হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু। পথচারীরা একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে এই দিব্যকান্তি, সৌম্যদর্শন বালক সন্ন্যাসীর দিকে। সে যেন এক পরম বিস্ময়। বয়স আট বৎসরের বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই ঘরের মায়া ছাড়িয়া কোন্ অজানার উদ্দেশে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে ?

দাক্ষিণাত্যের সুদূর কালাড়ি গ্রাম হইতে শুরু হয় বালকের এই পদযাত্রা। তারপর দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে, দীর্ঘ পথ প্রান্তর হইয়াছে অতিক্রান্ত। এবার পবিত্র নর্মদার কূলে পৌঁছিয়া তাহার আনন্দের অবধি রহিল না।

স্নান তর্পণ, পূজা-বন্দনা শেষ হইয়া যায়, তারপর নদীর গতিপথ ধরিয়া আবার চলে পরিব্রাজন। নর্মদার তীরে তীরে কোন্ পরশমণি সে খুঁজিয়া ফিরে, কে জানে !

কবে কোন্ এক শুভ মুহূর্তে মহাযোগী গোবিন্দপাদের নামটি তাহার কানে আসিয়া পশে, হৃদয়ে তখনি গাঁথা হইয়া যায়। তারপর অভ্যাগত সাধুসন্তদের কাছে, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের কাছে এই মহাত্মার কাহিনী সে কম শোনে নাই। অপরিমেয় তত্ত্বজ্ঞান ও যোগবিভূতির অধিকারী এই গোবিন্দপাদ স্বামী। সারা দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ঋদ্ধি-সিদ্ধির খ্যাতি প্রচারিত। জনশ্রুতি শোনা যায়, ঋষিবর পতঞ্জলি নাকি এই মহাত্মার সিদ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। নিভৃত গিরিকন্দরে লোকলোচনের অন্তরালে দীর্ঘকাল ইনি রহিয়াছেন সমাধিস্থ।

বালকের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। কোথায় বিরাজ করেন এই বহুজনবাঞ্ছিত মহাযোগী ? কোথায় তাঁহার রহস্যঘন সেই সুগোপন ধ্যানগুহা ! ব্যাকুল হৃদয়ে সন্ধান সে এযাবৎ কম করে নাই। পথে প্রান্তরে অরণ্যে পর্বতে কত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত মঠ, মন্দির ও সাধকদের দ্বারে ফিরিয়াছে তাহার প্রশ্ন নিয়া।

ভাগ্য সেদিন বড় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। নর্মদার তীরে দৈবক্রমে এক অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বালকের দেখা। কৃপাভরে তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি মহা ভাগ্যবান, তাই এ বয়সেই জেগেছে সত্যকার মুমুক্ষা। কিছুটা দূরেই ওঙ্কারনাথ। সেদিকে তুমি এগিয়ে যাও। আশীর্বাদ জানাই, লাভ করো তোমার প্রার্থিত পরমধন !"

নর্মদার স্রোতধারা খণ্ডিত করিয়া দণ্ডায়মান ওঙ্কারনাথ পাহাড়। পুরাণ সাহিত্যে ইহাকে বলা হইয়াছে বৈদুর্যমণি পর্বত। এক সময়ে ভক্তবীর মান্ধাতার রাজধানী ছিল এই স্থানে। ওঙ্কারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিবলিঙ্গ এই পবিত্র পাহাড়ের কোলে যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজিত। আজও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে অগণিত তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হয়, ভক্তিভরে অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী কানে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। আকুল আগ্রহে বালক তাই তাড়াতাড়ি ওঙ্কারনাথ পর্বতে আরোহণ করিতে থাকে। পাতি পাতি করিয়া সকল স্থানই খোঁজা হইয়া গেল। কিন্তু কই ? মহাত্মার কোনো সন্ধানই যে নাই ? এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়িল জঙ্গলাবৃত এক অপ্রশস্ত গুহামুখ।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালক থমকিয়া দাঁড়ায়। সুড়ঙ্গটি ক্রমে এক প্রশস্ত গিরি-কন্দরে আসিয়া মিশিয়াছে। সম্মুখে তাহার দেখা যায় এক বিস্ময়কর দৃশ্য। জটাজুট-সমন্বিত কয়েকজন প্রবীণ যোগী এখানে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন, আর স্বল্পালোকিত গুহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে অলৌকিক গাম্ভীর্য।

সন্ন্যাসী বালক তাহার হৃদয়াবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। অনতিদূরে নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন এক প্রাচীন তাপস, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বালক উচ্চকণ্ঠে নিবেদন করে, "প্রভু, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। মহাযোগী গোবিন্দপাদ স্বামীর করুণাপ্রার্থী আমি। বহুদূর থেকে শুধু এই কামনা নিয়েই এসেছি। তাঁর সন্ধান বলে দিয়ে এ আর্ত বালকের প্রাণ রক্ষা করুন।"

বাহ্য-বিস্মৃত সাধকের কানে এ স্বর সহজে পৌঁছাবার নয়। গুহাগাত্রে বার বার উহা ধ্বনিত হইতে থাকে। খানিক বাদে মৌনী মহাত্মাকে নয়ন উন্মীলন করতে দেখা যায়।

নতজানু বালক সন্ন্যাসী বার বার আকুতি নিবেদন করিতেছে, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা।

তাহার এ কাতর প্রার্থনা ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে টলাইয়া দিল। কৃপাভরে হস্ত উত্তোলন করিয়া দিলেন বরাভয়।

ধুনির আগুন নিভিয়া গিয়াছে—প্রদীপ জ্বালাইবার উপায় নাই। দুই খণ্ড প্রস্তর ঘষিয়া নিয়া বৃদ্ধ তাপস আলোক প্রজ্বলিত করিলেন। তারপর দীপটি হাতে তুলিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "বৎস, এসো, আমার অনুসরণ করো।"

গিরিকক্ষের এক প্রান্তে আসিয়া তাপস থামিয়া গেলেন। অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইলেন একটি গর্ভগুহা। একটি নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উহার প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া আছে। স্নেহমধুর কণ্ঠে কহিলেন, ঐ গুহার ভেতরেই মহাযোগী গোবিন্দপাদ রয়েছেন সমাধিস্থ। ওঙ্কারনাথ পাহাড় আর নর্মদাতীর উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে এঁর তপঃপ্রভায়। যাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলেছে সে-ই শুধু তা দেখতে পায়। দীর্ঘকাল ধরে এখানে আমরা পড়ে রয়েছি এঁরই কৃপার আশায়। কিন্তু মহাযোগী কবে সমাধি হতে ব্যুত্থিত হবেন, তা কেউ জানে না। তোমার যা কিছু বলবার আছে তা এখানে দাঁড়িয়েই জানাও।"

"কিন্তু প্রভু, আমি যে যোগীরাজকে দর্শন করার কামনা নিয়েই দূর দুর্গম পথ বেয়ে এখানে এসেছি। শুধু তাই নয়, তাঁর আশ্রয় না পাওয়া অবধি যে আমার শান্তি নেই।"

"বৎস, বুঝতে পারছি—তুমি মহা ভাগ্যবান্। তাই জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার এই বয়সেই তোমাতে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। তুমি শক্তিধরও বটে। বেশ তো, এই প্রস্তর-দ্বার উন্মোচন করে মহাযোগীকে তোমার প্রার্থনা জানাও।"

বালক সন্ন্যাসীর অন্তরতলেও পৌঁছিয়াছে মহাত্মা গোবিন্দপাদের কৃপা ইঙ্গিত। সে বুঝিয়া নিয়াছে—পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষই তাহার অধ্যাত্ম-জীবনের আলোক-দিশারী, তাহার ইহ-পরকালের পরমাশ্রয়।

অমিততেজা এই বালক। হৃদয়ে তাহার নিরন্তর জ্বলিতেছে বিশ্বাসের দীপশিখা। নির্ভয়ে গুহার দ্বারে সে হস্তার্পণ করিল।

গুহাবাসী অপর সাধকদের ধ্যান ইতিমধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে। সম্মুখে আসিয়া বালকের সঙ্গে তাঁহারাও হাত মিলাইলেন। প্রস্তরদ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল।

প্রদীপের আলোকে অমনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল মহাযোগীর মহিমময় মূর্তি। নয়ন দুইটি ধ্যান নিমীলিত, তপঃসিদ্ধ দেহে বিচ্ছুরিত অলৌকিক জ্যোতির আভা। সারা দেহে জীবনের কোনো লক্ষণ নাই, অথচ অবলীলায় মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া মহাত্মা সমাসীন রহিয়াছেন আত্মজ্ঞানের উত্তুঙ্গ চূড়ায়।

হাতের প্রদীপ ভূতলে নামাইয়া রাখিয়া বালক যুক্তকরে স্তবগাথা গাহিতে শুরু করিয়া দিল। সমবেত সাধকগণ নীরবে, সবিস্ময়ে তাহারি কাণ্ড দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন —অদ্ভুতকর্মা এই বালক! নিশ্চয় দৈববলে সে বলীয়ান্, নতুবা সমাধিস্থ গোবিন্দপাদের সম্মুখে কে এমন সাহসে দাঁড়াইবে, তাঁহাকে আহ্বান জানাইবে? যোগীগুরু তবে কি নিজেই এই চিহ্নিত সাধককে আজ এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন?

গোবিন্দপাদ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। ঝরিয়া পড়িল দিব্য কৃপার অমৃতধারা। মুমুক্ষু বালক যোগীবরের আশীর্বাদ ও আশ্রয় লাভে ধন্য হইল।

সেদিনকার এই ভাগ্যবান্ নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণতনয়ই ভারতের বহুবিশ্রুত মহাপুরুষ—শঙ্করাচার্য। 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' বলিয়া মহাজ্ঞানী আচার্য উত্তরকালে যে শ্লোক রচনা করিয়া যান, কৌপীনধারী অষ্টমবর্ষীয় বালকরূপেই সে সৌভাগ্যকে নিজ জীবনে তিনি আহ্বান করিয়া আনেন।

ওঙ্কারনাথের গিরিগুহায় এমনিভাবে সেদিন শঙ্করের অধ্যাত্মজীবনের দৃশ্যপটখানি উত্তোলিত হয়। এসময়ে তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর। চার বৎসরের মধ্যে অসামান্য যোগসিদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান হয় তাঁহার করায়ত্ত। তারপর গুরু গোবিন্দপাদের আদেশে হিমালয়ের নিভৃত ধাম বদরিকাশ্রমে বেদান্তভাষ্য প্রভৃতি রচনায় রত হন। গুরুর আদিষ্ট এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেদিন তিনি এক ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর মাত্র।

এই নবীন আচার্যের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হন সমকালীন বহু শক্তিধর পণ্ডিত ও সাধক। তাঁহার এইসব অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্যদের সঙ্গে নিয়া শঙ্কর ভারত বিজয়ে বাহির হইয়া পড়েন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা—বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘোষিত হয় লোকোত্তর পুরুষ ও যুগাচার্য শঙ্করের জয় জয়কার। একটি মানুষের জীবনের মনীষা, কর্মকুশলতা ও অধ্যাত্মশক্তির এমন সমন্বয় বিরল, সারা বিশ্বের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

শুধু দিগ্বিজয় করিয়াই শঙ্কর এসময়ে ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অধ্যাত্মজীবনে এক নূতন স্রোত তিনি সঞ্চারিত করেন, নূতনতর মনন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া করেন অদ্বৈত-বেদান্তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। জ্ঞানগঙ্গার যে প্রবাহকে ভারতভূমিতে তিনি আহ্বান করিয়া আনেন, অজস্র ধারায় সমগ্র বিশ্বমানবের জীবনে তাহা হয় বিস্তারিত।

এই বিরাট বিস্ময়কর কাজ আচার্য সম্পন্ন করেন মাত্র বত্রিশ বৎসরের স্বল্পপরিসর জীবনে। এক অদ্ভুত নাটকীয় দ্রুততার মধ্য দিয়া ঘটিতে দেখা যায় শঙ্করজীবনের মহাকাশ। নাটকীয় ভঙ্গীতেই হয় বিচিত্র পট-পরিবর্তন। আবার তেমনি নাটকীয় চমৎকারিতার মধ্য দিয়াই নামিয়া আসে লীলা-অবসানের যবনিকা।

শঙ্কর ছিলেন যুগাচার্য—প্রেরিত মানুষ। তাই দেখি নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে এই বিরাট পুরুষের মহাজীবনই হইয়া উঠে ঐশী লীলার এক অপূর্ব রঙ্গমঞ্চ। এদেশের সন্ন্যাসী ও সাধকদের দৃষ্টিসমক্ষে মহাজ্ঞানী এই আচার্য প্রতিভাত হইতে থাকেন দেবাদিদেব শঙ্করের অবতাররূপে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরল দেশের লাবণ্যশ্রীর তুলনা নাই। ঘন সবুজ তরুলতা আর শ্যামস্নিগ্ধ মৃত্তিকা দেখিয়া মনে হয়, সাগরগর্ভ হইতে সেদিনমাত্র বুঝি ইহা উঠিয়া আসিয়াছে। পুরাণে আছে, জামদগ্ন্য পরশুরাম যোগবলে এক সময়ে এই ভূমিখণ্ডকে সমুদ্রতল হইতে উত্তোলন করিয়া আনেন।

কালাডি কেরলের এক ক্ষুদ্র গ্রাম। নিষ্ঠাবান্ নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ আচার্য শিবগুরুর বাস এই গ্রামে। শাস্ত্রচর্চা ও জপধ্যানেই তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়। পত্নী বিশিষ্টা দেবীও বড় ধর্মপরায়ণা। গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে চন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দির, উভয়ে পরম ভক্তিভরে এই জাগ্রত শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন।

আচার্য ও তাঁহার পত্নীর অন্তরে দুঃখ—বহুকাল চলিয়া গিয়াছে কিন্তু পুত্রমুখ দর্শনের সৌভাগ্য আজো হয় নাই।

শিবগুরু সেদিন মন্দিরে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। সহসা কানে প্রবেশ করিল মহেশ্বরের দৈববাণী—'বৎস, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর দান করছি—শিবকল্প মহাজ্ঞানী এক পুত্র তুমি লাভ করবে, আর দিগ্‌বিদিকে ঘোষিত হবে তার জয়বার্তা।'

গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই শিবগুরু সোৎসাহে পত্নীকে এই দৈববাণীর কথা কহিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না।

৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথির মধ্যাহ্নে শিবগুরুর গৃহে সেদিন হঠাৎ আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল। ভূমিষ্ঠ হইল এক অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র। নবজাতকের নাম দেওয়া হইল শঙ্কর।

শৈশব হইতেই বালক বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আর অসামান্য শ্রুতিধর। একবার যাহা কিছু শ্রবণ করে চিরতরে স্মৃতিপটে তাহা গাঁথা হইয়া যায়। মাত্র তিন বৎসর বয়সে মালয়ালাম সাহিত্যের যে কোনো গ্রন্থ সে পাঠ করিতে পারে, পঠিত অজস্র বিষয়বস্তু অনায়াসে আবৃত্তি করিতে সে সক্ষম। এই অলৌকিক মেধা ও প্রতিভা দর্শনে গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। এই কচি বয়স হইতেই শিবগুরু সোৎসাহে শিশুকে পড়াইতে শুরু করেন। পুত্রকে সর্বশাস্ত্রবিদ্ করিয়া তুলিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের বড় অভিলাষ।

প্রতিভাধর পুত্রের পরিণতি দেখার সৌভাগ্য পিতার আর হয় নাই, অল্পকাল মধ্যেই তিনি মরজগৎ ত্যাগ করিয়া যান। বিশিষ্টা দেবীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। তাই তো! কি করিয়া তিনি সংসার চালাইবেন? বালক শঙ্করের দায়িত্বই বা কিভাবে পালন করিবেন?

অবশেষে নয়নজল মুছিয়া সাহসে বুক বাঁধিতেই হইল। পতির ইচ্ছা ছিল, মেধাবী পুত্রকে শাস্ত্র অধ্যয়নের সমস্ত সুযোগ দিবেন, বংশের মুখ সে উজ্জ্বল করিবে। সে ইচ্ছা তো অপূর্ণ রাখা চলিবে না। শঙ্কর পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করা মাত্র বিশিষ্টা দেবী তাহার উপনয়ন দিলেন, অতঃপর শাস্ত্রপাঠের জন্য তাহাকে গুরুগৃহে পাঠানো হইল।

বালক মেধাবী, সৌম্য ও সুদর্শন। অধ্যাপকের স্নেহ লাভ করিতে তাই দেরি হয় নাই। টোলের এককোণে বসিয়া সে পড়ে, গোড়ার দিকের প্রাথমিক পাঠ আয়ত্ত করিতে থাকে। আর অদূরে বসিয়া গুরু উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের অধ্যাপনা করেন, শাস্ত্রের নানা দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে হয়।

পাঁচ বৎসরের বালক হইলে কি হয়, শিক্ষকের অধ্যাপনার সময় শঙ্কর সেদিন হঠাৎ

নিজস্ব এক মতামত প্রকাশ করিয়া বসে। একি অদ্ভুত ব্যাপার! শ্রুতিধর বালক এক-কোণে বসিয়া কখন যে উচ্চতর শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সে খবর কেউ রাখে না। অধ্যাপকের চোখ তখনি খুলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন ঈশ্বরদত্ত মহাপ্রতিভা নিয়া এ বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ তাহার মধ্যে রহিয়াছে নিহিত।

এবার হইতে শঙ্করের জন্য নির্দিষ্ট হইল উচ্চতর পাঠক্রম। দুই বৎসর অক্লান্ত অধ্যয়নের ফলে চতুষ্পাঠীর সমস্ত পাঠই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। বেদ বেদান্ত, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসরের বেশী হইবে না।

কৃতী পুত্র ভক্তিভরে মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বিশিষ্টা দেবীর সেদিন বড় আনন্দ। পুত্র তাঁহার এ বয়সেই সর্ব শাস্ত্রবিদ্ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাবত্তা ও লোকোত্তর প্রতিভার জন্য এই অঞ্চলের সর্বত্র তাঁহার খ্যাতি তখন প্রচারিত।

পুলকাশ্রুতে মায়ের দুই চোখ ছলছল হইয়া উঠে, কহেন, "বাবা, সত্যিই আজ পুত্র-গর্বে আমার সারা অন্তর ভরে উঠেছে। তোর পিতার মুখ তুই উজ্জ্বল করেছিস। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ তোর ভেতর দিয়ে সফল হয়ে উঠেছে।"

শঙ্কর নিবেদন করেন, "মা, আমি ঠিক করেছি, এখন হতে ঘরে বসেই অধ্যাপনা করব, আর করব তোমার চরণ সেবায় দিনাতিপাত। আশীর্বাদ করো, একাজে যেন সফল হই।"

পুত্রকে কোলে নিয়া জননী বার বার আশিস্ জানান।

অবিলম্বে শঙ্কর চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসিলেন। বালক অধ্যাপকের এ শিক্ষা-কেন্দ্র লোকের কাছে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। ওই নূতন কর্মজীবনের পথে বাধাও কম উপস্থিত হইল না। স্থানীয় পণ্ডিতেরা শঙ্করকে কোনো মতেই আমল দিতে চাহেন না। অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ বালক, সে আবার শাস্ত্রের কি পড়াইবে?

কিন্তু বালক যে অলৌকিক শক্তিধর, তাহা না মানিয়া উপায় নাই। এই নবীন অধ্যাপকের কাছে বড় বড় শ্রুতি-স্মৃতিবিদ্ পণ্ডিতকে সেদিন মস্তক অবনত করিতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞানের এক বিরাট জন্মগত অধিকার নিয়া তাঁহার আবির্ভাব! যেমন অমানুষী তাঁহার স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও তর্ক-প্রতিভা, তেমনি অলৌকিক শক্তি শাস্ত্রের মর্মোদ্-ঘাটনে!

যুগাচার্যের ভূমিকা গ্রহণের জন্য শঙ্কর আসিয়াছেন, আর আসিয়াছেন বালক-জীবনের এক বিরাট ব্যতিক্রমরূপে। প্রভাতের বাল-সূর্য এ তো নয়, এ যে মধ্যাহ্ন-গগনের খরকরবর্ষী মার্তণ্ড!

বালক শঙ্করের কাছে প্রবীণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকেরা অল্পকাল মধ্যে পরাজয় স্বীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র সমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জননীর প্রতি শঙ্করের শ্রদ্ধার অন্ত নাই। রোজকার পূজা অর্চনা ও অধ্যাপনার পর দীর্ঘ সময় তাঁহার সেবায় অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধা মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই এ সময়ে তাঁহার সমস্ত জীবনটি যেন আবর্তিত হইতে থাকে। এই মাতৃভক্তির উদ্দীপনায় শঙ্কর সেদিন এক অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করিয়া বসেন।

বিশিষ্টা দেবী কুলদেবতা শ্রীকেশবের পূজা দিতে বাহির হইয়াছেন। গ্রাম হইতে কিছুটা দূরেই পবিত্র আলোয়াই নদী, সেখানে স্নান সমাপন করিয়া তবে পূজা মন্দিরে ঢুকিবেন। বার্ধক্যে শরীর আজকাল বড় অপটু হইয়া পড়িয়াছে। তাই পূজা উপচার নিয়া মন্দিরের দিকে আগাইয়া চলিলেন।

বেলা গড়াইয়া গেল। জননী সেই যে ভোরবেলায় কখন বাহির হইয়াছেন, এখনও তো ঘরে ফিরিতেছেন না! শংকর বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে গিয়া দেখিলেন, রাস্তার ধারে তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন, বৃদ্ধ বয়সে এ পথশ্রম সহ্য হয় নাই। চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কোনোমতে তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

মাতা ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন—পথশ্রমে মৃতকল্প। শংকর আর নয়নাশ্রু রোধ করিতে পারিতেছেন না।

শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ মাতৃভক্ত বালকের অন্তর মথিত করিয়া সেদিন প্রার্থনাবাণী উদ্গীত হইল, "ভগবান্, জননী আমার বৃদ্ধা হয়েছেন—তার এ পথশ্রম, এ দুঃসহ যন্ত্রণা আর যেন আমায় দেখতে না হয়। কৃপা ক'রে তুমি আলোয়াইর স্রোতধারা কিছুটা এগিয়ে দাও। ঐহিক জীবনের কোনো প্রার্থনাই আমার নেই প্রভু, শুধু আমার বৃদ্ধা মায়ের স্নানের ঘাটটি আরো একটু কাছে নিয়ে এস।"

সত্যসন্ধ, নিষ্কলুষ ব্রহ্মচারী বালকের সেদিনকার এ প্রার্থনা ভগবান্ অপূর্ণ রাখেন নাই। অচিরেই তটদেশ ভাঙিতে ভাঙিতে আলোয়াই নদী শংকরের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনমানসের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে বালক অধ্যাপকের আর একটি বিশিষ্ট রূপ। অলৌকিক প্রতিভাধর শংকর যে অলৌকিক শক্তিও ধারণ করেন, এ সংবাদ সেদিন প্রচারিত হইয়া পড়ে।

শংকরের প্রতিভা ও শক্তির নানা কাহিনী ক্রমে কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানে যায়। বালকের অমানুষী বিদ্যাবত্তার কাহিনী আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্তনের কথা দিকে দিকে রটিয়া গিয়াছে। রাজা তাই বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। তাছাড়া নিজে তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্বোৎসাহী। তাঁহারই রাজ্যে শংকরের মতো লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়াছে—এ প্রতিভার প্রকৃত মর্যাদা না দিলে চলিবে কেন? রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন।

শংকরকে কিন্তু রাজধানীতে নেওয়া গেল না। তেজোদৃপ্ত বালক অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "মন্ত্রীবর, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, রাজসভার প্রতি কোনো আকর্ষণই আমার নেই। তাছাড়া, আমি তো শাস্ত্রব্যবসায়ী নই, শাস্ত্রজ্ঞান বিতরণ করে যাওয়াই হচ্ছে আমার একমাত্র কাজ। কৃপা ক'রে রাজরাজড়ার সান্নিধ্যে যেতে আমায় প্রলোভিত করবেন না!"

মন্ত্রী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

শঙ্করের কথা শুনিয়া কেরলরাজের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আরও বাড়িয়া যায়। এ অদ্ভুত বালককে দর্শনের জন্য, তাঁহার সহিত তত্ত্বালোচনার জন্য, রাজা নিজেই একদিন কালাড়ি গ্রামে উপস্থিত হন।

সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর রাজার বিস্ময় চরমে উঠিল। দেখিলেন, এ বালক

সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম, অলৌকিক ঐশী শক্তির অধিকারী না হইলে এ কখনো সম্ভব হয় না। অজস্র সাধুবাদের পর তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন, সম্মুখে রাখিলেন অজস্র স্বর্ণমুদ্রার উপঢৌকন।

নিরাসক্ত বালক একটি মুদ্রাও স্পর্শ করিলেন না, রাজার অমাত্যদের দ্বারাই এগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন।

রাজা চন্দ্রশেখর তাঁহার জীবনে কোনোদিনই এই অনন্যসাধারণ বালককে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সেবার শঙ্করের গৃহে কয়েকটি বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। বালক অধ্যাপকের অলৌকিক প্রতিভা ও জ্ঞানের প্রসিদ্ধি তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, এবার তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার ফলে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

কৌতূহলী হইয়া আগন্তুকেরা বিশিষ্টা দেবীকে পুত্রের জন্মকুণ্ডলী আনিতে বলিলেন। জন্মপত্রিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ বালক যে উত্তর-কালের যুগাচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন, অধ্যাত্ম-জগতের নেতারূপে থাকিবেন চির-কীর্তিত!

জননী ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু, আমার পুত্রের আয়ু কত বৎসর তা আপনারা দেখেছেন কি? সে দীর্ঘায়ু হবে তো? দয়া ক'রে একবারটি আমায় বলুন।"

তাই তো! পণ্ডিতেরা এমন বিমর্ষ হইলেন কেন? ললাট কুঞ্চিত করিয়া বহুক্ষণ তাঁহারা গণনা করিলেন। আবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তারপর সকলে নীরব।

বিশিষ্টা দেবী ছাড়িবার পাত্রী নন, বার বার তিনি মিনতি করিতে লাগিলেন। এড়াইতে না পারিয়া পণ্ডিতেরা বলিতে বাধ্য হইলেন, "মা, কি আর বলবো। তোমার বালক নিতান্ত স্বল্পায়ু। ষোল আর বত্রিশ বৎসরে এর জীবন সংশয় যোগ দেখতে পাচ্ছি।"

বিধবার নয়নের মণি—শঙ্কর। তাহাকে হারাইতে হইবে? গণনার ফল শোনামাত্র জননী কাতর স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। একমাত্র পুত্র শঙ্কর যে তাহার জীবনসর্বস্ব, 'শিব-রাত্তিরের সল্‌তে'—অন্ধকারময় জীবনে এই বালকই যে ক্ষীণ দীপশিখা। বক্ষপুটে, অঞ্চলের আড়ালে, রাখিয়া এতকাল এ সন্তানকে তিনি আগ্‌লাইয়া চলিয়াছেন।

স্বল্পায়ুর কথা শুনিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের দল চলিয়া গেলেন, কিন্তু বালক শঙ্করের চেতনার মর্মমূলে সেদিন একথা হানিয়া গেল এক প্রচণ্ড আঘাত। ভবিতব্যতার ইঙ্গিত যে ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। কান পাতিয়া শঙ্কর শুনিলেন তাঁহার জীব-জীবনের দ্বারে মহাকালের অস্ফুট পদধ্বনি।

জন্মজন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে, মুমুক্ষার আকুতি নাড়া দিতেছে সর্বসত্তায়।

জননী শঙ্করের মনের কথা খুলিয়া বলেন,—সন্ন্যাস নিয়া সদ্‌গুরুর সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িতে চান। আত্মজ্ঞান তাঁহাকে অর্জন করিতে হইবে, করিতে হইবে ব্রহ্মলাভ। নহিলে কোথায় এ মানবজীবনের সার্থকতা? বিধির বিধানে স্বল্পায়ু হইয়া তিনি জন্মিয়াছেন, আর তো তাঁহার সময় নষ্ট করা চলে না।

জননী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। অসহায় বৈধব্য জীবনের একমাত্র আশা

ভরসা এই শঙ্কর। এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে হারাইয়া কি করিয়া বাঁচিবেন? কিশোর কমনীয় দেহে কি করিয়াই বা সে সন্ন্যাস-জীবনের কৃচ্ছ্র পালন করিবে? অবুঝ সন্তানের এ কি হৃদয় বিদারক কথা! জননী হাহাকার করিয়া উঠেন।

সংসার ত্যাগে শঙ্কর দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু জননীর অনুমতি ছাড়া যে গৃহত্যাগ করা চলে না। এবার সেই চেষ্টাতেই তিনি রহিলেন। সেদিনকার এক আকস্মিক বিপদের মধ্য দিয়া জীবন বিধাতা আনিয়া দিলেন পরম সুযোগ।

মায়ের সহিত শঙ্কর সেদিন নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছেন। আলোয়াই নদী মোটেই গভীর নয়, কিন্তু কোথা হইতে সেদিন সেখানে এক কুমীর আসিয়া উপস্থিত। অতর্কিতে উহা শঙ্করকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

আত্মরক্ষার জন্য জলের মধ্যে তিনি ছুটাছুটি করিতেছেন, আর কুমীর করিতেছে পশ্চাদ্ধাবন—সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বিশিষ্টা দেবী ও ঘাটের অন্যান্য নরনারী সকলে আর্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি এক ক্ষুদ্র চড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন কিন্তু হিংস্র কুমীর কোনো-মতেই তাঁহাকে ছাড়িবে না, আবার তাড়া করিয়া আসিতেছে। আর নিস্তার নাই, শেষ সময় বুঝি আসন্ন। দূর হইতে জননীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা গো, আমি মরতে চলেছি। কিন্তু দুঃখ রইল যে, আমার সন্ন্যাস নেওয়া আর হল না, মুক্তিও ঘটল না জীবনে। তুমি শিগ্‌গীর অনুমতি দাও, আমি অন্ত্যসন্ন্যাস নিই, ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি।"

জননী তখন দুই চোখে অন্ধকার দেখিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তাই হোক, তাই হোক। তোকে সন্ন্যাস নিতে আমি অনুমতি দিচ্ছি।" কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নদীতটে লুটাইয়া পড়িল তাঁহার মূর্ছিত দেহ।

নদী তীরে এতক্ষণ সোরগোল কম হয় নাই। সকলের আর্ত চীৎকার শুনিয়া কয়েকটি জেলে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসে। সাহসে ভর করিয়া, বর্শা নিয়া তাহারা কুমীরটিকে আক্রমণ করে। কুমীর নিহত হয়, আর আহত শঙ্কর দৈব কৃপায় বাঁচিয়া যান।

অন্ত্যসন্ন্যাসের কথাটি কিন্তু সত্যসন্ধ বালকের মনে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ঈশ্বরদত্ত সুযোগ যেমন আসিয়াছে, তেমনি মিলিয়াছে মায়ের অনুমতি। আনুষ্ঠানিকভাবে না হোক এখন তিনি যে মনেপ্রাণে সত্য সত্যই সন্ন্যাসী।

জননীকে সেই দিন দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন,—সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ, তিনি গৃহের বাহিরে বৃক্ষমূলেই রাত্রি যাপন করিবেন। তাছাড়া এই বৃক্ষমূলে থাকাও তাঁহার চলিবে না। কাল প্রত্যূষেই চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করিবেন।

শিরে করাঘাত হানিয়া বিশিষ্টা দেবী কাঁদিতে থাকেন—"ওরে, সত্যিই কি আমি তোকে সেদিন সন্ন্যাস নিতে বলেছি? সে যে শুধু মুখেরই কথা। অন্তরের কথা তো নয়। কোনো মা কি এমন কথা কখনো ছেলেকে বলতে পারে? তাছাড়া তোর মত শিশু কঠোর সন্ন্যাস জীবন যাপন কি ক'রে করবে, বলতো?

শঙ্কর বুঝান—"মা, তুমি জননী হয়ে, সত্যকার মঙ্গলার্থিনী হয়ে কেন আমায় সংকল্প-চ্যুত করবে? মিথ্যাচারী ক'রে কেন আমায় নরকের মুখে ঠেলে দেবে? আচ্ছা, কুমীরের আক্রমণ থেকে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে, আমায় কে বাঁচালো, তা একবার ভেবে দেখ দেখি! ভগবান্ ছাড়া এমন শক্তিমান্, এমন কৃপাময় আর কে আছেন? সেই ভগবানের হাতেই তুমি তোমার পুত্রকে আজ সঁপে দাও, মা।"

এ কি অদ্ভুত সংসার-বিতৃষ্ণা এই শিশুর? পুত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া জননী বুঝিলেন কোনোমতেই আর তাহাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। শঙ্কর তাহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিলেন, জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রবাক্যও কম শুনাইলেন না। জননী নীরব হইলেন বটে, কিন্তু মন তাঁহার প্রবোধ মানিল না। অসহায়া বৃদ্ধার বুকের পাঁজর যেন ভাঙিয়া যাইতেছে। বুক-জোড়া ধন শঙ্করকে ছাড়িয়া নিজের অস্তিত্বের কথা যে তিনি ভাবিতেই পারেন না।

সখেদে কহিলেন, "ওরে, তুই চলে গেলে এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় দু'মুঠো অন্ন কে দেবে? মুক্তিই বা পাবো কি ক'রে?—তা একবার ভেবে দেখ দেখি? শেষ নিশ্বাস ছাড়বার সময় পুত্রের হাতের মুখাগ্নিটুকুও যে পাবো না।"

মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া শঙ্কর সর্বাগ্রে পুত্রের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন। জ্ঞাতিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আমার যে ক'খণ্ড জমি রয়েছে তা আমি আপনাদের দান ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু আপনারা আমায় কথা দিন, এর পরিবর্তে জননীর ভরণ-পোষণের ভার আপনারা গ্রহণ করবেন।" সকলে সোৎসাহে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শঙ্করের হৃদয় হইতে এক গুরুভার নামিয়া গেল।

বালকের হৃদয়ে অমিত আশা, চোখে মুখে আত্মপ্রত্যয়ের আলো। জননীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "মাগো, তোমার প্রসাদে সাধনা আমার জয়যুক্ত হবেই। আর তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, সন্ন্যাস নিই আর যেখানেই থাক, তোমার অন্তিমকালে নিশ্চয় আমি তোমার কাছে উপস্থিত হবো। ইষ্টদর্শন ক'রে পরমানন্দে তুমি অমরধামে যেতে পারবে। তোমার পারলৌকিক কাজে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি হবে না।"

মুমুক্ষু বালক যুক্তকরে স্তবগাথা গাহিতেছেন। আবাহনে তাঁহার উদ্বোধিত হইয়া উঠিল কল্যাণময়ী মাতৃশক্তি। বিশিষ্টা দেবীর মনে পড়িল শঙ্করের জন্মের আগেকার কথা। স্বামী শিবগুরুর প্রাপ্ত দৈবাদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী তিনি আজো বিস্মৃত হন নাই। সাশ্রুনয়নে তাই উচ্চারণ করিলেন আশীর্বাণী।

পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত কিছু উপচার জননী পরদিন নিজেই শান্তমনে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কালাডির নরনারী আশ্চর্য হইয়া গেল।

শঙ্কর সর্বশাস্ত্রে নিপুণ। নৈষ্ঠিকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম সম্পন্ন করিলেন। তারপর মুণ্ডিতমস্তক বালকসন্ন্যাসী যাত্রা করিলেন নর্মদার দিকে।

পরিব্রাজনের পথে সেদিন তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে কদম্ববন নামক অরণ্যে পৌঁছিয়াছেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করা হইয়াছে। মধ্যাহ্নের সূর্যতাপ হইয়াছে দুঃসহ। শ্রান্ত হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষমূলে বসিলেন। এমন সময়ে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদল ব্যাঙের ছানা নদী জল হইতে লাফাইয়া তীরস্থ একটি প্রস্তরের উপর উঠিয়া বসিল। রৌদ্র বড় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, বেশীক্ষণ তিষ্ঠিবার উপায় নাই। আবার তাহারা জলগর্ভে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময়ে বিস্ময়কর এক কাণ্ড ঘটিতে দেখা গেল। একটি বৃহদাকার সাপ ফণা বিস্তার করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পরমাত্মীয়ের মতো সস্নেহে এই ব্যাঙের ছানাগুলিকে একট ছায়া দান করিতে লাগিল।

ব্যাঙ দেখিলেই সাপ লুব্ধ হইয়া উঠে, সোৎসাহে উহা ভক্ষণ করে। কিন্তু খাদ্য খাদকের সম্বন্ধের একি অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম! শঙ্করের বুঝিতে দেরি হইল না যে, তপঃপ্রভাব এ স্থানকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য হিংস্র সাপের স্বভাবের এই পরিবর্তন,

ধ্যাণ্ডের প্রতি এই অদ্ভুত বাৎসল্যভাব। তিনি খুঁজিতে বাহির হইলেন, কে সেই মহা-তাপস, যাঁহার তপঃশক্তি এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাইতে সক্ষম ?

অদূরে কন্দর্যাগিরি গাত্রে দেখা যাইতেছে এক প্রাচীন সাধকের কুটীর। উহা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। এক বৃদ্ধ তাপস এখানে থাকিয়া সাধনভজন করেন। শংকর তাঁহার নিকট শুনিলেন, এই স্থানেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন-কালের মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম। এই অঞ্চলের সর্প কেন তাহার সহজাত খলতা বিসর্জন দিয়াছে, এবার তাহা বুঝা গেল।

বহু সাধকের তপস্যাপূত এই বন নিভৃত সাধনার পক্ষে বড় উপযোগী। এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা শংকরের মনে উদিত হয়। এই ইচ্ছার বীজই উত্তর-কালে আত্মপ্রকাশ করে খ্যাতনামা শৃঙ্গেরী মঠরূপে।

পাহাড় হইতে নামিয়া আবার তাহার যাত্রা শুরু হয়।

দুইমাস অবিরাম চলার শেষে শংকর প্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী নগর অতিক্রম করেন। তারপর উপনীত হন ওংকারনাথের দ্বীপ-শৈলে। এখানকার পর্বত গুহাতেই ঘটে তাহার সৌভাগ্যোদয়, লাভ করেন মহাযোগী গোবিন্দপাদের আশ্রয়। এই অধ্যাত্ম-স্পর্শমণিই কেরলের বালক সন্ন্যাসীকে রূপান্তরিত করে, যুগাচার্যের ভূমিকায় তাঁহাকে করে প্রতিষ্ঠিত।

সমাধিব্যুত্থিত যোগী গোবিন্দপাদ যে কয়টি সাধককে সেদিন আশ্রয় দেন, শংকর তাঁহাদের অগ্রগণ্য। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্য নিয়া এ বালক আবির্ভূত। বৈরাগ্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধননিষ্ঠার দিক দিয়াও তাঁহার জুড়ি নাই। মহাপ্রাজ্ঞ গুরুর কৃপারাশি ধারণ করার শক্তি নিয়াই সে যে উপস্থিত হইয়াছে।

গুরুর চরণতলে বসিয়া নবীন সাধক একাদিক্রমে তিন বৎসর কঠোর সাধনা সম্পন্ন করিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসামান্য যোগসিদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া গেল। গুরুর রোপিত সাধনবীজ পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিল অপরূপ মহিমায়। সতীর্থ সাধকেরা সকলেই বুঝিলেন, শংকরের এ অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তির পিছনে রহিয়াছে ঐশী লীলানাট্যের এক গূঢ় সূচনা।

গুরু গোবিন্দপাদকে উপলক্ষ করিয়া এসময়ে শংকরের যোগবিভূতির এক চমকপ্রদ লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

তখন ঘোর বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, বর্ষণের বিরাম নাই। নর্মদা ক্রমে স্ফীতকায়া হইয়া উঠে, তারপর দুই কূল ভাসাইয়া হঠাৎ ধারণ করে প্রলয়ংকরী রূপ। ওংকারনাথ শৈলের গাত্রে বার বার প্রতিহত হইয়া বিপুল জলরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মহাযোগী গোবিন্দপাদ কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার নিজস্ব গুহায় সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন।

শিষ্যেরা শংকিত হইয়া উঠিলেন, বন্যার বেগ বাড়িতেছে, গুরুদেবের জীবন বিপন্ন না হয়। প্লাবনের জল গুহাদ্বারেই সেদিন আসিয়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। যত বড় বিপদই হোক না কেন, যোগীরাজের সমাধি তো ভঙ্গ করা যাইবে না। অথচ এ-জলস্রোতই বা কে রোধ করিবে ?

শক্তিধর শংকর দৃঢ়পদে আগাইয়া আসিলেন। কহিলেন, "আপনারা কেন শুধু শুধু

উদ্বিগ্ন হচ্ছেন? আমাদের গুরু মহারাজ মহাব্রহ্মজ্ঞ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাঁর অনিষ্ট করতে পারে না। আর সমাধিমগ্ন অবস্থায় তো অনিষ্টের প্রশ্নই উঠে না। আপনভোলা মহাযোগীর সাথে সহযোগিতা না ক'রে প্রকৃতির যে কোনো উপায় নেই। তাছাড়া, তাঁর আশীর্বাদে এ বন্যার গতিরোধ আমি করতে সক্ষম।"

একটি মাটির ঘড়া আনিয়া শংকর তাহা কাত করিয়া রাখিয়া দিলেন। এদিকে জলোচ্ছ্বাস কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু একি বিস্ময়কর কাণ্ড জলরাশি স্ফীত হইয়া গুহার দ্বারে-আসামাত্র ঐ মৃৎকুম্ভের ভিতরে ঢুকিতেছে আর নিমেষে হইতেছে অদৃশ্য। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলে শংকরের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

সমাধিভঙ্গের পর যোগীবর সেদিনকার ঘটনা সব শুনিলেন। প্রসন্নকণ্ঠে শংকরকে বলিলেন, "বৎস, আমার আশীর্বাদে তুমি হয়েছ আপ্তকাম, ব্রহ্মবিদ্যা তুমি লাভ করেছ। সর্বশাস্ত্রের তত্ত্ব তোমার ভেতর যেমন স্ফুরিত হয়েছে, তেমনি সর্বজ্ঞান ও যোগবিভূতিও হয়েছে করতলগত। তোমার আর কিছু প্রার্থনা থাকে ত বল।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শংকর যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় আমার সকল অভাবই তো দূর হয়েছে। আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় নেই। আপনি কৃপা ক'রে অনুমতি দিলে এবার সমাধিস্থ হয়ে এ দেহ বর্জন করতে চাই, ব্রহ্মসাগরে বিলীন হতে চাই।"

গোবিন্দপাদ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। উত্তর দিলেন, "বৎস, দেহ বিসর্জনের সময় এখনো আসে নি। ঐশ নির্দেশে, যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যে তুমি এসেছো, সে কাজ তো তোমার এখনো শেষ হয়নি। অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান নতুন করে তোমায় প্রচার করতে হবে। নিতে হবে লুপ্ত তীর্থগুলো উদ্ধারের ভার। সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানা পাপ ও অনাচার ঢুকেছে, এর সংস্কার সাধন করতে হবে, পুনর্গঠন করতে হবে এদেশের অধ্যাত্মজীবনকে। সারা জনসমাজ আজ হয়ে পড়েছে ঈশ্বরবিমুখ। তাকে টেনে আনতে হবে পরম কল্যাণের দিকে।"

"আদেশ করুন, কি আমায় এবার করতে হবে।"

"তোমার আধারে অদ্বৈতজ্ঞানের আলো জ্বলে উঠবে, তা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, এই প্রতীক্ষাই আমি করছিলাম। আমার কাজ আজ শেষ হয়েছে। তাই এ দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। এবার তুমি কাশীধামের দিকে এগিয়ে যাও, প্রভু বিশ্বেশ্বরের আদেশ নিয়ে নির্দিষ্ট কর্মব্রত উদ্‌যাপন করো।"

শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়া গোবিন্দপাদ নিমজ্জিত হন সমাধি সাগরে। এই সমাধি হইতে আর তিনি উত্থিত হন নাই।

মহাযোগীর প্রাণবায়ু উৎক্রমণ করে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে। ভারতের অধ্যাত্ম-গগনের এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয় অন্তর্হিত।

গুরুদেবের আদেশমতো শংকর কাশীতে পৌঁছিলেন। সারা ভারতে ধর্মজীবনের মধ্যমণি এই মহাতীর্থ। দণ্ডী সন্ন্যাসী, শাস্ত্রবিদ্ ও পরিব্রাজকদের এখানে নিরন্তর আনা-গোনা। শাস্ত্রালাপ, মন্ত্রোচ্চারণ ও স্তবগুঞ্জনে এ নগরীর পথঘাট সদাই থাকে মুখরিত। যত কিছু নূতন ধর্মমত প্রচারিত হয়, যত কিছু নূতন শাস্ত্রব্যাখ্যা রচিত হয় তাহার উৎস এই বারাণসী।

শংকর এখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন।

মণিকর্ণিক ঘাটের নিকটে পরিকরবৃন্দসহ তিনি আসন পাতিয়া বসিলেন। তেজঃপুঞ্জকলেবর কে এই কিশোর সন্ন্যাসী? লোকের যেন কৌতূহলের আর অন্ত নাই। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈতবাদ কাশীর জনজীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিয়া দিল।

সেদিন আচার্যকে ঘিরিয়া প্রবীণ দণ্ডী সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদেরা বসিয়া আছেন, আর অতুল বিক্রমে তিনি প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। শাস্ত্রবিচারের রণভূমিতে তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। আবার মুমুক্ষু সাধনার্থী নরনারীর সম্মুখে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন পরিব্রাজকরূপে—শুধু দর্শনে ও উপদেশেই লোকের সংসার বন্ধন চিরতরে শিথিল হইয়া যায়।

অদ্ভুত এই কিশোর আচার্য। লোকোত্তর জ্ঞান ও যোগবিভূতির ঐশ্বর্যে সারা বারাণসীকে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন।

এ সময়ে চোলদেশীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে করেন আত্মসমর্পণ। শাস্ত্রবিদ্যায় এ চোল ব্রাহ্মণের ছিল অসাধারণ পারদর্শিতা। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে প্রথম জীবনে জ্ঞানসাধনায় তিনি ব্রতী হন, তারপর বৈরাগ্যের হাতছানি একদিন তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া আনে। এতদিন পরে মহাসাধক শঙ্করের মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন তাঁহার পরম আশ্রয়। এই নবাগত যুবকই আচার্যের সর্বপ্রথম দীক্ষিত শিষ্য, সনন্দন। ইনিই অসামান্য যোগবিভূতি-খ্যাত আচার্য পদ্মপাদ।

নির্বিশেষ পরব্রহ্মতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা ছিলেন স্বামী গোবিন্দপাদ। শঙ্কর তাঁহারই মানসপুত্র। গুরুর মহাবাণী প্রচার করিবেন, মানবজাতির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিবেন আত্মজ্ঞানের পরম তত্ত্ব—এই ইচ্ছাই শঙ্করের মনে এতদিন বাসা বাঁধিয়াছিল। এবার আদেশ মিলিয়াছে, যোগীগুরু তাঁহার ভিতরে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পথে তাঁহার এ কাজ শুরু করিবেন? পরমগুরু আচার্য গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের এক উৎসস্বরূপ তাঁহার রচনার ব্যাখ্যা দিয়াই কাজ শুরু করা মন্দ কি? শঙ্কর তাই মাণ্ডুক্যকারিকা প্রথমে রচনা করিলেন। কর্মব্রত শুরু করিলেন গুরুর গুরুকে মর্যাদা দিয়া।

একদল গবেষকের ধারণা—আচার্য গৌড়পাদ ছিলেন গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ। শঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য আচার্য সুরেশ্বরও (মণ্ডন মিশ্র) এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের ধারা ভারতবর্ষে সেদিন বড় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এ ধারাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলার জন্য শঙ্কর ব্রতী হইলেন। উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়া শুরু হইল তাঁহার নবতর সিদ্ধান্ত স্থাপন ও তত্ত্বের ব্যাখ্যান।

উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, এই জগৎ একেবারে মিথ্যা, স্বপ্নের মতোই অলীক। জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

অদ্বৈতবাদের এই ব্যাখ্যাকে চরম পর্যায়ে টানিয়া নিয়া আরো কহিলেন,—নির্গুণ নির্বিশেষ এই ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই, আর এই নির্বিশেষ ব্রহ্মই হইতেছে একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। মুমুক্ষু মানুষকে এই তত্ত্বই জানিতে হইবে, জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে।

তরুণ আচার্যের অতিমানুষিক জ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া দলে দলে লোক

তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে আসে। পণ্ডিত ও মূর্খ, সাধু ও বিষয়ী সবাই উপস্থিত হয় তাঁহার ধর্মসভায়। কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদের এই চরম ব্যাখ্যা বুঝিবার মতো প্রস্তুতি কয়জনের? কে ইহার প্রকৃত অধিকারী, কাহার মধ্যে এ তত্ত্বের স্ফুরণ হইবে, একথা শঙ্কর উদ্দীপনার তোড়ে বিস্মৃত হইয়াছেন। কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা সেদিন তাই তাঁহাকে সতর্ক করিতে আসেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্কর স্নান করিতে যাইতেছেন। খানিকটা অগ্রসর হইতে দেখিলেন, এক সদ্যবিধবা তরুণী তাহার মৃত পতির শব কোলে করিয়া কাঁদিতেছে। রাস্তাটি বড় অপরিষ্কার, ইহার মুখ অবরোধ করিয়া সে বসিয়া আছে। শব সংকারের জন্য যে টাকাকড়ির দরকার, তাহার যোগাড় নাই। তাই মাঝে মাঝে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে।

পথ বন্ধ, আগাইবার উপায় কই? শঙ্কর কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "মাগো, শবটিকে এমন আড়াআড়ি রেখো না, সোজা ক'রে রাখো। তা হলে আমরা পথ চলতে পারি।"

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? শোকাকুলা নারী কাঁদিয়াই চলিয়াছে নড়িবার নামটি নাই। শিষ্য পরিবৃত শঙ্কর বড় বিপদে পড়িয়াছেন। কি করিয়া গঙ্গায় যাইবেন? বার বার তাই মিনতি জানান।

নারী হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "সন্ন্যাসী, সরে যাওয়ার অনুরোধ যা কিছু করতে হয় তা বরং এই শবের কাছেই করো। অভিরুচি হলে হয়ত সে এক পাশে সরে যেতে পারে।"

এ কি অদ্ভুত কথা! তবে কি পতিশোকে এ নারীর মাথা খারাপ হইয়াছে?

করুণায় বিগলিত শঙ্কর বলিলেন, "মা, তাও কি কখনো হয়? শব কি ক'রে স্থান পরিবর্তন করবে?"

বিধবা নারী এবার দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, "আচার্য, শক্তিশূন্য ব্রহ্ম হচ্ছেন জগৎ-কর্তা—এ সিদ্ধান্ত আপনি সর্বত্র স্থাপন ক'রে চলেছেন। আচ্ছা, তাই যদি সত্য হয় তবে এই নিষ্প্রাণ শক্তিহীন শব কেন নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না?"

কথা কয়টি বলার পরেই দেখা গেল, শবসহ রমণী মুহূর্তমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একি অলৌকিক কাণ্ড! কোন্ নিগূঢ় তত্ত্বকে শঙ্করের সম্মুখে সে উদ্‌ঘাটিত করিতে চায়?

ধ্যানস্থ হইয়া আচার্য বুঝিতে পারিলেন, এ লীলার নায়িকা স্বয়ং অন্নপূর্ণা। বুঝাইয়া দিয়া গেলেন, সাধারণ অধিকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ উপযোগী। শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের কল্পনাই সহজে সে করিতে পারে। আর নির্বিশেষ পরব্রহ্মতত্ত্ব শুধু সেই মুষ্টিমেয় সাধকদেরই জন্য, যাঁহাদের আছে উচ্চতর জ্ঞানসাধনা।

আর এক দিনের কথা। শঙ্কর গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন, পিছনে ভক্ত ও শিষ্যের দল। তাকাইয়া দেখেন, সম্মুখে দাঁড়ানো এক ভীমকায় চণ্ডাল, সঙ্গে কয়েকটা বিকট-দর্শন কুকুর।

একে অন্ত্যজ চণ্ডাল, তাহাতে আবার পূতিগন্ধময় শ্মশানের নোংরা ঘাঁটিয়া বেড়ায়। সন্তর্পণে লোকটির স্পর্শ এড়াইয়া শঙ্কর কিছুটা দূরে দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "ওরে, ওধারে একটু সরে দাঁড়া, বাবা।"

চণ্ডাল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল। তারপর অনর্গল ধারায় তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে লাগিল জ্ঞানগর্ভ, চমকপ্রদ শ্লোকরাজি।

শঙ্কর বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গিয়াছেন।

যে শ্লোক তিনি শুনিলেন, তাহার মর্ম এই—"আচার্য, আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? আমার আত্মাকে না দেহকে? আত্মা সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল—সে সরে যাবে কোথায়? আর, কেনই বা যাবে? তার পক্ষে পবিত্রতা কি, আর অপবিত্রতাই বা কি? গঙ্গাবক্ষে চন্দ্র হয় প্রতিফলিত, সুরাপাত্রেও দেখা যায় তারই প্রতিবিম্ব কিন্তু এ দু'য়ের পার্থক্য কোথায়, তা আমায় বলতে পারেন? আর আপনি যদি আত্মাকে সরে যেতে না ব'লে এ দেহকেই অনুরোধ ক'রে থাকেন, সে কি ক'রে তা পালন করবে? সে তো জড়। সন্ন্যাসী আচার্যরূপে, আত্মজ্ঞানের খ্যাতনামা উপদেষ্টারূপে আপনি দেখছি লোককে কেবলই করছেন প্রবঞ্চনা।"

এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! কে এই ছদ্মবেশী চণ্ডাল? মুহূর্তমধ্যে আচার্য শঙ্করের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে দেবাদিদেব মহেশ্বরের চিন্ময় মূর্তি। নিজেও নিজেকে করেন উপলব্ধি। সত্যই তো, গুরুর আদেশে যুগাচার্যের মহান্‌ ভূমিকায় তিনি আজ অবতীর্ণ! মহাজ্ঞানী গুরুর তিনি মানসপুত্র। সংস্কারের কিছুমাত্র আবিলতা তাঁহার রাখিলে চলিবে কেন? চণ্ডালের ছদ্মবেশে তাই তো বিশ্বেশ্বর স্বয়ং এখানে নামিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষু উন্মীলন।

রজতগিরিসন্নিভ, প্রজ্ঞানঘন মূর্তি তাঁহার সম্মুখে। বড় অপরূপ, বড় মহিমাময় দেবাদিদেবের এই আবির্ভাব। শঙ্কর নির্নিমেষে সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রসন্নমধুর কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর কহিলেন, "বৎস, সর্বসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে, এবার হতে তুমি প্রকৃত অদ্বৈতবাদের ধারক বাহক হও। তোমার কাজে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এবার জগৎ-কল্যাণের জন্যে তুমি এই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রচারে অগ্রসর হও। তার আগে উপনিষদ্‌ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করো, বৈদিক জ্ঞানের অবরুদ্ধ ধারাকে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দাও। জ্ঞানসাধনায় নতুন ক'রে সঞ্চারিত করো প্রাণশক্তি।"

বিশ্বেশ্বরের আদেশ মিলিয়াছে, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আর দেরি হইল না। শঙ্কর স্থির করিলেন, হিমাচলের কোলে, ব্যাসদেবের তপস্যাপূত ভূমিতে আসন পাতিয়া বসিবেন, আদিষ্ট গ্রন্থরচনা সেখানে সমাপ্ত হইবে। সঙ্গে চলিল সনন্দন এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য। কিছুদিনের মধ্যে সকলে হৃষীকেশে পৌঁছিলেন।

পৌরাণিক কালের পরম পবিত্র যজ্ঞভূমি এই হৃষীকেশ। যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ চিরকাল এখানে পূজা পাইয়া আসিতেছে। বহুপূর্বে একদল চীনা দস্যু এস্থান আক্রমণ করে, পাণ্ডারা তখন ভীত হইয়া বিগ্রহটি তাড়াতাড়ি গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়া রাখে। দীর্ঘদিন ইহার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এবার সেই হারানো পবিত্র বিগ্রহের সন্ধান শঙ্কর শুরু করিলেন।

এই দেবমূর্তি যেখানে আছে সেখানকার চিত্র একদিন ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে। সবাইকে ডাকিয়া তখনি জলগর্ভ হইতে এটিকে উদ্ধার করা হয়।

বদ্রিধামের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। সীমান্ত হইতে দস্যুরা মাঝে মাঝে আক্রমণ

চালাইত, লুঠপাট করিয়া অদৃশ্য হইত। বিগ্রহের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা তাই কঠিন হইয়া উঠে। অবশেষে উহা নিকটস্থ এক জলকুণ্ডে ডুবাইয়া রাখা হয়। শঙ্কর দেখিয়া লুব্ধ হইলেন—পূর্বের সে বহুখ্যাত নয়নাভিরাম মূর্তি আর নাই, সেস্থলে এক শালগ্রাম শিলার অর্চনা চলিতেছে।

সবাইকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "নারায়ণের সেই প্রাচীন মূর্তি আমি উদ্ধার করবো বলে সঙ্কল্প করেছি। আপনারা তাড়াতাড়ি বিগ্রহের অভিষেক ও প্রতিষ্ঠার আয়োজন করুন।"

পাণ্ডা ও স্থানীয় লোকেরা ভীত হইয়া বলাবলি করিতে থাকে : এই কুণ্ডের তলদেশে যে দুরন্ত পার্বত্য নদী অলকানন্দার যোগ রহিয়াছে। এখানে ডুব দিতে গিয়ে অনেকে প্রাণ হারায়। তবুও আচার্য কেন বৃথা এই বিপদের মুখে পা বাড়াইতে চান? কিন্তু কিছুতেই শঙ্করকে নিরস্ত করা গেল না।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ধীর পদে কুণ্ডের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্তিটি নিয়া যখন উপরে উঠিয়া আসিলেন, সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। চারিদিক কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল—বদরী বিশাল লালা কি জয়!

ইহার পর আচার্য সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হন ব্যাসতীর্থে। অলকানন্দা ও কেশবগঙ্গার সঙ্গমস্থানের ঊর্ধ্বে, হিমবন্তের কোলে, ব্যাসদেবের প্রাচীন আশ্রমগুহা। দিব্য ভাবের স্পন্দনে এখানকার আকাশ-বাতাস পূর্ণ, চারিদিকে অপূর্ব ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ। এই নিভৃত গিরগুহাটি আচার্যের বড় পছন্দ হইল।

চার বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই গিরিকন্দরে রচিত হইল ষোলখানা শাস্ত্র-গ্রন্থের মহাভাষ্য। অলৌকিক প্রতিভার দীপ্তিতে নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ে আজও এগুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

শঙ্করের রচিত ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষদ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতির ভাষ্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম ও সনৎসুজাতীয় গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা সর্বত্র বিস্ময়ের চমক লাগাইয়া দেয়। অদ্বৈত-বাদের নবতর উল্লাসে ভারতের সাধককুল ও পণ্ডিতসমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে।

আরব্ধ কর্মকে সফল করিয়া তোলার সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়া যায়। আচার্যের অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া জ্যোতির্ধামের রাজা মুগ্ধ হন, তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজশিষ্যের সহায়তায় নব রচিত গ্রন্থগুলির অনুলিপি সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নয় লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও অদ্বৈতবাদের প্রচারের মধ্য দিয়া উত্তরাপথের বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বেদাচার আবার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। জিজ্ঞাসু সাধক, সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদদের দল ব্যাসগুহার আশ্রমে ভিড় করিতে থাকেন।

আচার্য জানেন, তিনি স্বল্পায়ু হইয়া জন্মিয়াছেন এবং এই অল্পপরিসর জীবনে তাঁহাকে এক বিরাট ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। একলা একাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য সর্বাগ্রে চাই একদল শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী শিষ্য। তাই শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তিসঞ্চারের কার্যে তিনি ব্রতী হইলেন। কয়েকজনকে অচিরে যোগসিদ্ধি ও শাস্ত্র জ্ঞান আয়ত্ত করিতে দেখা গেল।

শিষ্যদের মধ্যে সনন্দন শঙ্করের বড় প্রিয়, যোগসামর্থ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের অনেক কিছু

সযত্নে তাঁহাকে তিনি দান করিয়াছেন। এই গুরুকৃপার জন্যে কেহ কেহ সনন্দনকে বেশ একটু ঈর্ষাও করেন।

এই প্রিয় শিষ্যের গুরুভক্তির প্রকৃত স্বরূপ শঙ্কর একদিন সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

অলকানন্দার তীরে আচার্য শিষ্যদল পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সকলেই উপস্থিত, সনন্দন শুধু সেখানে নাই। কি একটা ঔষধ সংগ্রহের জন্য ওপারে গিয়াছেন।

পার্বত্য নদীটি অপরিসর, কিন্তু বড় খরস্রোতা, ফেনিল আবর্ত তুলিয়া তীব্রবেগে সোঁসোঁ শব্দে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহারো পক্ষে সাঁতরাইয়া এ নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। কয়েক মাইল দূরে গাছের গুঁড়ি ও লতাগুল্ম দিয়া একটি সেতু বাঁধা হইয়াছে—গঙ্গার ধারা সেখানে খুব সঙ্কীর্ণ। এই সেতুর উপর দিয়া সনন্দন কিছুক্ষণ আগে অপর তীরে পৌঁছিয়াছেন।

শিষ্যদের কাছে শঙ্কর এ সময়ে নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটি কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সকলকে তিনি আহ্বান জানাইলেন। বড় জটিল প্রশ্ন—কাহারো মুখে কথা সরিতেছে না।

আচার্যের চোখে মুখে স্মিত হাসির ঝলক। কহিলেন, "দেখছি, তোমরা কেউ এর মীমাংসা করতে পারলে না? এ বড় পরিতাপের কথা। কিন্তু সনন্দনকে যে দেখছিনে। সে কোথায়? তাকে একবার ডাকো, দেখি সে এর উত্তর দিতে পারে কি না?"

জনৈক শিষ্য জানাইলেন, "গুরুদেব, সনন্দন ওপারের অরণ্য অঞ্চলে কি এক কাজে গিয়াছেন। ঐ দেখুন, তিনি কাজ শেষ ক'রে নদীতীরের দিকেই আসছেন। আপনি নিজে তাঁকে তাড়াতাড়ি আমাদের সভায় আসতে বলুন।"

নদীর অপর তীরে শঙ্কর নয়ন ফিরাইলেন। ঐ তো, সনন্দন ওপারে পাকদণ্ডির বনপথ দিয়া এদিকে আসিতেছেন।

আচার্য ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "সনন্দন, তোমার জন্য সবাই আমরা প্রতীক্ষা করছি। এখনি চলে এস, একটুও বিলম্ব ক'রো না।"

একথা কানে পৌঁছামাত্র সনন্দন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রাণপ্রিয় আচার্যের আহ্বান। এক মুহূর্তও যে দেরি করা চলে না। যে সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়াছেন, তাহা খুব কাছে নয়। সে পথে ফিরিতে হইলে সময় লাগিবে। তাই গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তখনি সরাসরি নদীতে নামিয়া পড়ে সনন্দন।

উন্মত্তের মতো অলকানন্দা ছুটিয়া চলিয়াছে। এ স্রোতে যে কোনো মানুষই তৃণের মতো ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু এসব কোনো বিপদের কথাই সনন্দনের মনে স্থান পাইল না।

এপারে সকলে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া আছেন। তুহিনশীতল, পার্বত্য নদীর খরস্রোতে আজ কোন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কে জানে!

অচিরে দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। শিষ্যের দল বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া গেলেন। গুরুগতপ্রাণ সনন্দন পরমানন্দে অগ্রসর হইতেছেন—অলকানন্দার জলধারায় এক একবার পা রাখিতেছেন, আর পায়ের তলায় ফুটিয়া উঠিতেছে এক একটি করিয়া জলপদ্ম। দেহভার রক্ষার এ কি অপূর্ব অলৌকিক ব্যবস্থা। শক্তিধর গুরুগতপ্রাণ শিষ্য অবলীলায় এপারে আসিয়া পৌঁছিলেন, গুরুর চরণে করিলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

শঙ্করের নয়নে এবার ফুটিয়া উঠিয়াছে শিষ্যগৌরবের অপূর্ব দীপ্তি। আননে প্রসন্ন-মধুর হাসির আভা। দাক্ষিণ্যভরা হাতটি তুলিয়া সনন্দনকে আশীর্বাদ করিলেন। সস্নেহে কহিলেন, "বৎস সনন্দন, তোমার গুরুভক্তি, যোগৈশ্বর্য আর জ্ঞান সকলের শিক্ষণীয় হোক। পদ্মের উপর পদ স্থাপন ক'রে তুমি অলকানন্দা অতিক্রম করেছো তাই আজ থেকে তুমি আখ্যাত হবে পদ্মপাদ নামে।"

অতঃপর সনন্দনের মুখে আচার্যের তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া সকলে আরো খুশী হইয়া উঠেন।

ভাষ্যাদি রচনার মধ্য দিয়া অদ্বৈতজ্ঞানের জোর প্রচার চলিতেছে, রচিত হইয়াছে জ্ঞান সাধনার নূতনতর ভিত্তি। শিষ্যেরা অনেকেই হইয়াছেন সিদ্ধ, সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম। শঙ্কর এবার ধীরে ধীরে ব্যাস গুহার নিভৃতি হইতে বাহির হইয়া পড়েন।

উত্তরাখণ্ডের দূর দুর্গম তীর্থগুলি দর্শনের পর সদলবলে তিনি উত্তরকাশীতে উপনীত হন। এখানে পেঁাছিবার পর হইতেই তাঁহার মধ্যে দেখা যায় এক অপূর্ব ভাবান্তর। অধ্যাপনা ও তত্ত্বোপদেশ দানে আর পূর্বের সে উৎসাহ উদ্দীপনা নাই। সদাই তিনি থাকেন অন্তর্মুখীন, আত্মসমাহিত।

জীবনের পাতা উল্টান আচার্য। অন্তরে চিন্তা খেলিয়া যায়—গুরু গোবিন্দপাদের ইচ্ছানুসারী কাজ তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। পালন করিয়াছেন প্রভু বিশ্বেশ্বরের আদেশ। ভারতের অধ্যাত্মক্ষেত্রে বেদান্তবাদের জ্ঞানগঙ্গাও আজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অভীষ্ট তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। এবার সমাধিযোগে উত্তরকাশীর পুণ্যভূমিতে এই দেহের খোলস ভাঙিয়া ফেলিলে ক্ষতি কি ?

পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তাইতো! আচার্যের বয়স এবার ষোল বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা শুনিয়াছেন, ইহার বেশী আয়ু তাঁহার নাই। তবে কি সত্য সত্যই তিনি দেহরক্ষা করিতে চাহিতেছেন ? আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে, এ সময়ে উত্তরকাশীতে শঙ্কর একদিন অলৌকিকভাবে ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। পুরাণের বর্ণিত রূপ ধারণ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ বিশালবপু মহামুনি জটাজুট-সমন্বিত হইয়া আবির্ভূত হন। স্তবে তুষ্ট হইয়া আচার্য শঙ্করকে বরদান করেন, "বৎস, ঈশ্বরের আদিষ্টকর্ম তুমি সম্পন্ন করেছো। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার রচিত অদ্বৈতবাদের ভাষ্যসমূহ জগতে চির-অক্ষয় হয়ে থাক্।"

শঙ্কর করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে তাহলে আমায় অনুমতি দিন, এবার আমি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হই—এ দেহের বন্ধন চিরতরে ত্যাগ করি।"

"না বৎস, ঐশ বিধান অন্যরূপ। তোমায় আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে. বিশেষ কর্তব্যকর্ম রয়েছে। এ কথাটা জানাবার জন্যেই আমি নিজে এখানে এসেছি। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যার ভেতর তুমি শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করেছ, সত্যি। কিন্তু এখনো তা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের তোমার স্বমতে আনতে হবে। এ কঠিন কাজটা যে এখনো বাকি। তোমার সিদ্ধান্ত এই মহারথীরা গ্রহণ না করলে দেশের সাধারণ লোক তা মানতে চাইবে কেন ? ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষরূপে তুমি আবির্ভূত হয়েছ,

এবার নির্দিষ্ট কাজকে সম্পূর্ণ ক'রে তোল। আরো যোল বৎসর তুমি এ কাজের জন্য বেঁচে থাকবে।”

যুগাচার্যের জীবন-নাট্যে এমনি করিয়া আবার এক নূতনতর অঙ্ক সেদিন সংযোজিত হইল।

এবার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের বিজয়ে শঙ্কর বাহির হইয়া পড়েন। উত্তরাখণ্ড হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা হইতে পরশুরাম ক্ষেত্র, সর্বত্র উড্ডীন করেন অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা। সারা ভারত এই শক্তিধর মহাপুরুষের যশঃপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আচার্য শঙ্কর কিন্তু অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নন—এ তত্ত্ব, এ আদর্শ পূর্ব হইতেই এ দেশে ছিল। তিনি করিয়াছেন ইহার পুনরুজ্জীবন। তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও প্রচার, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সংগঠন প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি ভারতের মানসলোকে আনিয়া দেয় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। যোগবিভূতির সহিত মনীষা ও কর্মকুশলতার বিস্ময়কর সম্মিলন দেখা যায় আচার্যের জীবনে। শুধু এ দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ইহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শঙ্কর কহিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। নির্গুণ নিরুপাধিক ও জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু, ও পরমতত্ত্ব, আর এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমস্ত কিছু হইতেছে মায়ার লীলাবৈচিত্র্য—অনিত্য। এ সত্য পূর্ববর্তী অদ্বৈতবাদী আচার্যেরাও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ইহাতে আনিয়া দিলেন নূতন প্রাণস্পন্দন। নূতন তরঙ্গের বেগ ইহাতে তিনি সঞ্চারিত করিয়া তুলিলেন। শত শত বৎসরের পর আজিও তাহার প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে।

ভারতের অধ্যাত্মজীবনে বৈদিক কর্মকাণ্ডের তখন বড় প্রাধান্য। যাগযজ্ঞ ও বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান নিয়াই সেদিনকার মানুষ মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ এ মানসিকতার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া বসিল। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ মতবাদকে তিনি টানিয়া নিলেন চূড়ান্ত স্তরে।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব দুই-ই বেদে রহিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর জোর দিয়া কহিলেন, জীবের মুক্তি সাধিত হইবে না, যতক্ষণ সে নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে, মায়িক জগতের সহিত সম্বন্ধহীন পরমাত্মাকে, উপলব্ধি না করিবে। আরো ঘোষণা করিলেন, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন—শুধু মায়ার আবরণ দ্বারাই এ দুয়ের পার্থক্য সূচিত হয়। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে এই মায়ার অন্ধকার দূরে যায়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব স্ফুরিত হয়—উদিত হয় 'তত্ত্বমসি' এই মহাজ্ঞান।

শ্রুতির সগুণ ব্রহ্ম শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মায়াবাদ এই সগুণ ব্রহ্মকেও বলিয়াছে মিথ্যা, অনিত্য। শক্তি ও গুণাদির অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন সগুণ ব্রহ্মে। তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সগুণ ব্রহ্ম মায়িক, অনিত্য। যুক্তিনিষ্ঠার দিক দিয়া শঙ্কর তাই শুধু মানিয়াছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। আর এ পরমতত্ত্বই তিনি সারা বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আচার্যের অদ্বৈতবাদ তখনকার দিনে শুধু দার্শনিক বিতণ্ডাতেই পরিণত হয় নাই, তাঁহার প্রদর্শিত বেদান্ত-বিচার ও সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়া বহু শিষ্য আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ

হন। ইহাদের প্রভাবে ভারতে দিকে দিকে জ্ঞানপন্থী সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রকাশ ঘটিতে থাকে। শুধু অসামান্য শাস্ত্রবিদ্‌রূপেই নয়, এক মহাশক্তিধর আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষরূপে শঙ্কর কীর্তিত হন—নিখিল ভারতের অধ্যাত্মনেতার আসন তিনি অধিকার করেন। মুমুক্ষু সন্ন্যাসী ও প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্‌ সকলেই এই তরুণ আচার্যের কাছে আশ্রয় নিতে আসে।

নূতন সাধক ও সাধারণ মানুষের বেলায় কিন্তু আচার্য ব্রহ্ম-আরাধনার নানা পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়া গিয়াছেন,—মায়া বলিয়া এসব উড়াইয়া দেন নাই। তাই তো এই মায়াবাদী অদ্বৈত-বিজ্ঞানীর ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনি অন্নপূর্ণা প্রশস্তি, শিবাষ্টক ও গঙ্গা-যমুনা স্তুতির শ্লোকরাশি। ত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য তিনি রাখিয়াছেন জ্ঞানোপাসনা, আর সাধারণ ভক্তের জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন পূজা-অর্চনা ও ভজনের। নিষ্কল নিরুপাধিক ব্রহ্মবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতার লেখনীতে ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে—ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। এ এক পরম বিস্ময়।

সারা ভারতে স্থাপন করিতে হইবে বেদান্তের ধর্ম, উড্ডীন করিতে হইবে অদ্বৈতবাদের পতাকা। আর দেরি করা চলে না। শঙ্কর তাই তাড়াতাড়ি উত্তরাখণ্ড হইতে নামিয়া আসিলেন।

চারিদিকে তখন কুমারিল ভট্টের জয় জয়কার। মীমাংসাদর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য এই চোলদেশীয় পণ্ডিত। যাগযজ্ঞসমন্বিত বৈদিক কর্মকাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বিখ্যাত নেতাগণ তাঁহার বিরাট প্রতিভার সম্মুখে একের পর এক মস্তক অবনত করিতেছেন।

প্রয়াগধামে গিয়া শঙ্কর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন। সম্ভাষণের পর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "মহাত্মন্, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো বলেই এখানে আমি এসেছি। বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য আমি সারা ভারত ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আপনার মতো দিগ্বিজয়ী শাস্ত্রবিদের স্বীকৃতি না পেলে তো আমার কাজ অগ্রসর হবে না। আমি জানি, আপনি বেদের কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সমর্থক। কিন্তু আজ আমি আপনাকে আমার মতবাদই গ্রহণ করাতে চাই। পরাস্ত হবার পর আপনি আমার ভাষ্যের একটি বার্তিক রচনা ক'রে দিন। আপনার মতো মহাপণ্ডিতকে দিয়ে এটা করাতে পারলে তবেই অদ্বৈত-বাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।"

রোষে কুমারিল ভট্টের নয়ন দুইটি ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্করের আপাদ-মস্তক নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কে এই ষোড়শ বর্ষীয় তরুণ সন্ন্যাসী? কোথায় পাইল সে এমন দুঃসাহস? এ কি তাঁহার ঔদ্ধত্য, না দৈবী প্রতিভার শক্তি?

ভট্টপাদের শিষ্যেরা মহা উত্তেজিত হইয়াছেন, শঙ্কর ও তাঁহার অনুগামীদের সকলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্করের পরিচয় অচিরে সেখানে প্রকাশ হইয়া পড়িল। কুমারিল কহিলেন, "আচার্য, আমি জানি, আপনি গোবিন্দপাদ স্বামীর শিষ্য, আপনার অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তির কথাও আমি শুনেছি। উত্তরাখণ্ড থেকে যে ভাষ্যাদি আপনি রচনা করিয়াছেন, তার খ্যাতিও দেশে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে।"

নিজের রচিত প্রধান ভাষ্য কয়টি দেখাইয়া দিয়া শঙ্কর কহিলেন—"ভট্টপাদ! আমার এ গ্রন্থগুলো পড়ে আপনাকে আজ আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। তা নইলে তো চলবে না।"

"কিন্তু আচার্য, আপনি বড় অসময়ে এসে পড়েছেন। আমি যে সঙ্কল্প করেছি, তুষানলে এ দেহ এবার ত্যাগ করবো।"

"সে কি কথা ? আপনার মতো মহাপণ্ডিত কেন আত্মহত্যা করতে যাবেন ?"

"তবে সংক্ষেপে শুনুন। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করবার জন্য এক সময়ে আমি নালন্দা বিহারে যাই। সেখানে আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করি। আমার এই বৌদ্ধ আচার্য অবশেষে একদিন আমার কাছেই বিচারে পরাভূত হন। তারপর ক্ষোভে দুঃখে তুষানলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আজ আমার জীবন সায়াহ্নে সেই গুরু-বধের প্রায়শ্চিত্ত করবো বলে স্থির করেছি। সামনে ঐ তুষের ঢিবি দেখতে পাচ্ছেন, এখনি আমি তাতে আরোহণ করবো, আগুন জ্বেলে দেবো আত্মাহুতি।"

"কিন্তু মহাত্মন্, আমার প্রার্থিত বিচার এড়িয়ে গেলে যে আপনার অপযশ ঘোষিত হবে।"

"না আচার্য, সে জন্য চিন্তা নেই—বিচারের ব্যবস্থা আমি ক'রেই যাচ্ছি। বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি আজীবন চেষ্টা ক'রে এসেছি। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অবৈদিকদের উচ্ছেদ করতেই আমার বেশীর ভাগ সময় ব্যয়িত হয়েছে, অবসর আমি মোটেই পাইনি। আসলে পূর্ণাঙ্গ বেদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমার কাম্য। এদিক দিয়ে আপনার ও আমার মতবাদ ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসবে এই আশাই আমি করি। আপনি এবার আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে যান। শিষ্য হলেও সে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। প্রতিভা ও বিচারনৈপুণ্য তার অতুলনীয়। মণ্ডন আপনার কাছে পরাস্ত হলে, ধরে নেবেন —আমারই পরাজয় ঘটেছে !"

বৈদিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কুমারিল অতঃপর ধীরপদে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

দক্ষিণের মাহিষ্মতী নগরে পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের বাস। নর্মদা ও মাহিষ্মতী নদীর সঙ্গমের কাছে তাঁহার প্রাসাদোপম ভবন বিরাজিত। বেদবিদ্যার অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ও ধর্মগুরুরূপে তাঁহার প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের সীমা নাই।

শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, প্রাচীরঘেরা বৃহৎ যজ্ঞস্থলটি ধূমে সমাচ্ছন্ন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ও শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মণ্ডন, নিবিষ্ট মনে হোম করিতেছেন। দ্বারপালেরা কিছুতেই শংকরকে ঢুকিতে দিবে না, বার বার অনুনয় বিনয় করিয়াও কোনো ফল হইল না। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কথিত আছে, শংকর এ সময়ে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হন—যোগবলে শূন্যপথে উঠিয়া অবলীলায় তিনি প্রাচীর অতিক্রম করেন।

মণ্ডন মিশ্র প্রতাপশালী যাজ্ঞিক। বহু ধনী ব্যক্তি ও রাজরাজড়া তাঁহার শিষ্য—ইঁহারা-ও কেহ কখনো তাঁহার অনুমতি ছাড়া যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করেন না। কিন্তু কে এই দুর্বিনীত তরুণ সন্ন্যাসী ? এত সাহস তাঁহার কি করিয়া হয়। মণ্ডন মিশ্র সরোষে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসেন।

শংকর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্যবর, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। আমি মহাযোগী গোবিন্দপাদ স্বামীর শিষ্য শংকরাচার্য। আপনাকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করতেই আমি আজ এখানে এসেছি। সেদিন আপনার গুরু ভট্টপাদ কুমারিলকে পরাস্ত করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার সুযোগ পাইনি। মরদেহ ত্যাগ করার আগে তিনি

বলে গিয়েছেন—আপনার পরাজয় নাকি তাঁরই পরাজয় বলে গণ্য হবে। আমি চাই বেদের কর্মকাণ্ড ছেড়ে আপনি আমার প্রচারিত জ্ঞান সাধনা ও অদ্বৈতবেদান্ত গ্রহণ করুন।"

বিস্মিত ক্রুদ্ধ মণ্ডন একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন আর ভাবিতেছেন, অর্বাচীন সন্ন্যাসী জানে না কাহার সহিত সে কথা বলিতেছে।

কিন্তু মণ্ডন মিশ্রের ভুল ভাঙিতে বেশী দেরি হয় নাই। কিছুটা আলাপ করিয়াই বুঝিলেন, এই তরুণ সামান্য ব্যক্তি নয়, অলৌকিক শক্তিতে সে শক্তিমান্। তাছাড়া, ঐ আহ্বান শোনার পর তর্কযুদ্ধে না নামিয়া উপায় নাই।

মণ্ডন কহিলেন, "যতিবর, আপনার বিচার দ্বন্দ্বের এ আহ্বান আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু আগে থাকতে ঠিক করা হোক, যিনি পরাস্ত হবেন তাঁকে কি দণ্ড নিতে হবে।"

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শংকর উত্তর দিলেন—"আচার্য, শর্ত রইলো—তাঁকে গ্রহণ করতে হবে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্যত্ব। আপনি যদি হেরে যান আমাকে গুরুত্বে বরণ করবেন, গার্হস্থ্য ছেড়ে নেবেন সন্ন্যাস। আর আমি পরাভূত হলে নেবো আপনার শিষ্যত্ব, এই দণ্ডকমণ্ডলু চিরতরে ত্যাগ করবো।"

"উত্তম কথা। কিন্তু এ বিচারসভায় মধ্যস্থ কে হবেন ?"

"আচার্য, বহুস্থানে আপনার সহধর্মিণী উভয়ভারতী দেবীর খ্যাতির কথা আমি শুনে এসেছি। এ বিচারসভার নেত্রী হয়ে তিনিই করুন জয়-পরাজয় নির্ধারণ।"

"এ প্রস্তাব আবার ভেবে দেখুন। উভয়ভারতী একে নারী, তার ওপর আমারই গৃহিণী। তাঁর কাছে সুবিচার পাবেন বলে কি আপনার বিশ্বাস আছে ?"

"হ্যাঁ। আমি জেনেছি, আপনার স্ত্রী শুধু অসামান্য মনীষা ও শাস্ত্রজ্ঞানেরই অধিকারিণী নন, সত্যনিষ্ঠার দিক দিয়েও তাঁর তুলনা বিরল। আমার ইচ্ছে, তিনিই আমাদের মধ্যস্থ হোন।"

মণ্ডন এ প্রস্তাব মানিয়া নেন। তারপর মাহিষ্মতী নগরের পণ্ডিতসমাজের সম্মুখে উভয়ের এই বিচার বিতর্ক চলে প্রায় আঠার দিন ব্যাপিয়া। বিচারের শেষে উভয়ভারতী আচার্য শংকরের জয় ঘোষণা করেন। পরাক্রান্ত বেদবিদ্ মণ্ডন মিশ্রের এ পরাজয়ে চারিদিকে আলোড়ন পড়িয়া যায়।

শংকরের আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে জয়গৌরবের আনন্দ। বৈদিক কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ আচার্য আজ তাঁহার কাছে পরাস্ত। ইহার ফলে অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রধান বাধাটি অপসারিত হইয়া গেল। মণ্ডনকে এবার নিতে হইবে তাঁহার শিষ্যত্ব। সন্ন্যাসদীক্ষা দিবার জন্য শংকর উদ্যোগী হইলেন।

বাধা দিয়া উভয়ভারতী কহিলেন, "যতিবর, একটু থামুন। এখনি কিন্তু আমার স্বামীকে আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে পারেন না। স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী আমি। কই আমাকে তো এখন অবধি আপনি তর্কযুদ্ধে হারাতে পারেন নি। ভেবে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে আপনার জয় হয়েছে অর্ধসমাপ্ত। তবে আসুন, এবার আমি আপনাকে আহ্বান করছি শাস্ত্র-বিচারে।"

বড় অদ্ভুত এই দ্বন্দ্ব-আহ্বান। যৌক্তিকতা ইহার কিছু থাক বা না থাক শংকর

এ দ্বন্দ্ব এড়াইয়া যাইতে রাজী নন। উভয়ভারতীকে পরাস্ত করিয়া শুধু মণ্ডন-গৃহেই নয় সারা দক্ষিণদেশে যে তাঁহাকে বেদান্তের জয়পতাকা উড়াইতে হইবে।

সহাস্যে শংকর কহিলেন—"আচার্যপত্নী, এ আহ্বান গ্রহণ করলাম আমি। কিন্তু কোন শাস্ত্র নিয়ে বিচার হবে, আপনিই তা ঠিক করুন।"

"যতিবর, আমাদের এ তর্কযুদ্ধ হবে কামশাস্ত্র নিয়ে।"

শংকর চমকিয়া উঠিলেন। এ আবার কি কথা? বিশাল শাস্ত্রবারিধির তুলনায় এ যে কূপোদক! তাছাড়া আজীবন তিনি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস ব্রত নিয়া আছেন, শেষটায় কি কামশাস্ত্রের বিচারে তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে? তাঁহার পক্ষে এ যে বড় কঠিন ব্যাপার। প্রমাদ গণিলেন তিনি।

সানুনয়ে কহিলেন, "দেবী, আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া ক'রে এ বিষয়বস্তু ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে আপনি তর্ক করুন।"

"আচার্য, সর্বশাস্ত্রবিদ্ ও মহাজ্ঞানী বলে আপনার খ্যাতি রটেছে। তবে আমার উত্থাপিত কামশাস্ত্রের প্রশ্ন আপনার জ্ঞানের বাইরে থাকবে কেন? তাছাড়া আপনি ব্রহ্মবিদ্। বলুন তো, এ আলোচনা করতে আপনার মনে শংকাই বা ওঠে কেন? আরও একটা কথা আমার স্বামী তার শর্ত অনুযায়ী আপনার কাছে সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছেন, তার আগে আমি পরীক্ষা করতে চাই আপনার জ্ঞানের পরিধি কতটা, আর আপনার যোগ-সামর্থ্যই বা কতটুকু।"

শঙ্করকে এ নারী-প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান গ্রহণ করিতেই হইল। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য তিনি একমাসের সময় নিলেন।

মাহিষ্মতী নগরের উপকণ্ঠে, এক অরণ্যে আচার্য শঙ্কর সেদিন শিষ্যগণসহ বসিয়া আছেন। আসন্ন বিচারের কথা ভাবিয়া তিনি বড় চিন্তাকুল। কামশাস্ত্রের শুধু তাত্ত্বিক দিক জানিলেই তো জয়ী হইতে পারিবেন না—এ শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটি সম্বন্ধে যে তিনি অজ্ঞ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও জ্ঞান ছাড়া এ প্রতিভাশালিনী নারীর সম্মুখে কতক্ষণ আর টিকিতে পারিবেন? নিজে তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী। কাজেই তাঁহার পক্ষে প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র পথ পরকায়ায় প্রবেশ। অপর কাহারো দেহের মাধ্যমে এ তত্ত্বের ব্যবহারিক দিকটি আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে সুযোগই বা কোথায়?

ভাগ্যক্রমে অচিরে এক যোগাযোগ দেখা গেল। সংবাদ মিলিল, অদূরে বনের ভিতর এক শব সংকারের আয়োজন চলিতেছে। মৃতদেহটি অমরুক নামক এক তরুণ রাজার।

আচার্য অমনি স্থির করিলেন, এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। গহন বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে দীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী। উহার এক দুর্গম গুহায় উপনীত হইয়া শিষ্যদের কহিলেন, "দ্যাখো, মণ্ডনপত্নীর বিদ্যাদর্প আমায় চূর্ণ করতেই হবে। নইলে বেদান্ত প্রচারের ব্রত আমাদের থেকে যাবে অসমাপ্ত। এখনি যোগবলে আমি ঐ মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করছি। একমাস শেষ হবার আগেই আমার নিজ দেহে ফিরে আসবো। তোমরা এ ক'দিন আমার পরিত্যক্ত দেহকে সতর্কভাবে পাহারা দেবে। সাবধান! এ গুপ্ত স্থানের সন্ধান কেউ যেন না পায়, কেউ যেন এ দেহ স্পর্শ না করে।"

এদিকে রাজদেহের সংকারের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ ও ঘৃত

আনিয়া জড়ো করা হইয়াছে। অমাত্য ও পুরোহিতেরা আনুষ্ঠানিক কর্মে ব্যস্ত। হঠাৎ শবাধারটি নড়িয়া উঠিল। তারপর দেখা গেল মৃত রাজা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অমরুকের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যের বোঝা ঠেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

দেব কৃপায় রাজা বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, আত্মীয়স্বজন ও অনুচরদের তাই আনন্দের সীমা নাই। বাদ্যভাণ্ডসহ সাড়ম্বরে তাঁহাকে প্রাসাদে ফিরাইয়া নেওয়া হইল।

শুধু বাঁচিয়া উঠাই নয়, রাজা যেন এক নূতন মানুষরূপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আগেকার সেই রাজসিক মনোবৃত্তি আর নাই। ভোগসুখ আর বিলাস-ব্যসনের সম্মুখে কেন যেন আজকাল বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। রাজকার্যে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু সে কূটকৌশলী রাজাকে তো আর পাওয়া যাইতেছে না।

রাজমহিষীর সন্দেহ জাগিল, রাজার মৃতদেহে যোগবিভূতিসম্পন্ন কোনো মহাপুরুষ প্রবেশ করেন নাই তো? মন্ত্রীর মনেও অনুরূপ চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছে।

রাণী ও মন্ত্রী উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন। সূক্ষ্ম লোকচারী যোগী বা সন্ন্যাসী যিনিই এ দেহে বিহার করুন না কেন, আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। যে কোনো উপায়ে রাজাকে জীবিত রাখিতেই হইবে।

মন্ত্রীবর প্রবীণ, কূটবুদ্ধি। তাঁহার বিশ্বাস পরকায়ায় প্রবেশে সমর্থ যোগীর নিজস্ব দেহ নিশ্চয়ই নিকটস্থ কোনো নিভৃত অঞ্চলে সংরক্ষিত আছে। খুঁজিয়া বাহির করিয়া সর্বাগ্রে সেটি বিনষ্ট করা প্রয়োজন। তবেই রাজদেহবাসী সূক্ষ্মদেহী সাধক আর তাঁহার এই বর্তমান আধার ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।

কঠোর আদেশ প্রচার করা হইল, কোনো যোগী বা সন্ন্যাসীর শব দেখিলে তখনি তাহা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

রাজানুচরেরা সকল স্থান পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিতেছে। শঙ্করের শিষ্যেরা বড় ভীত হইলেন। কোনোমতে একবার যদি তাহারা গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়, তবে আর রক্ষা নাই।

প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ ঠিক করলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, সময় থাকিতে আচার্যকে সতর্ক করা দরকার। ভিক্ষার্থীরূপে কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ অমরুকের কাছে উপস্থিত হলেন।

রাজদেহচারী শঙ্করকে নিবেদন করা হইল, "প্রভু, রাজার লোকেরা সর্বত্র ঘোরাঘুরি করছে। আপনার পরিত্যক্ত দেহ একবার দেখতে পেলে ছাড়বে না, জোর ক'রে দাহ ক'রে ফেলবে। আর দেরি না ক'রে আপনি স্ব-দেহে ফিরে আসুন।"

মৃত ভোগীর দেহে বাসের প্রয়োজন শঙ্করের ফুরাইয়াছে। ইহারই মধ্যে কামশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব ও তথ্য তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। চুপি চুপি শিষ্যদের আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই। তোমরা তাড়াতাড়ি গিরিগুহায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আজই এ দেহ আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

এদিকে কিন্তু যে বিপদের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিল। একদল রাজ সৈন্য বনের মধ্যে সন্ন্যাসীদের আস্তা দেখিয়া সন্দিহান হইয়া পড়ে।

তল্লাসী চালানোর জন্য রাজ-সৈনিকেরা পর্বত গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আচার্যের শিষ্যেরাও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত আছেন, কোনোমতেই গুরুর দেহ তাঁহারা স্পর্শ করিতে দিবেন না।

ঘোর বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অচেতন দেহটি নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

তারপর নিদ্রোত্থিতের মতো শঙ্কর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রাজসৈন্যরা তো হতবাক্। কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।

শঙ্করের নিজদেহে ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে, সেদিন ঠিক সেই সময়ে রাজা অমরুকের ঘটে প্রাণবিয়োগ।

শঙ্করের এই অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতির কথা দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাহিষ্মতী নগর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আচার্যের কথা নিয়া মুখর হইয়া উঠে।

দৃপ্তভঙ্গীতে শঙ্কর এবার মণ্ডন মিশ্রের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ভারতীর সহিত তর্কযুদ্ধের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

মণ্ডন-পত্নী বড় ভয় পাইয়া গেলেন। আচার্য কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবার আর তাঁহাকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অলৌকিক শক্তিধর তরুণ এই সন্ন্যাসীর স্বরূপও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রেরিত আচার্য ও যুগ-মানবরূপে তাঁহার আবির্ভাব! তাই সর্বত্রই রহিয়াছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়ভারতী যুক্তকরে পরাজয় স্বীকার করিলেন। কথিত আছে, ইহার অল্পকাল পরেই এই মহীয়সী মহিলা যোগবলে মরদেহ ত্যাগ করেন।

শঙ্করকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মণ্ডন তাঁহার নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার নামকরণ হয় সুরেশ্বরাচার্য। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকরূপে উত্তরকালে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মণ্ডন মিশ্রের পরাজয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। সারা দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত-সমাজে শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব অচিরে বিস্তারিত হয়। বেদের কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে জ্ঞানমার্গীয় শাস্ত্র ও সাধনার ধারা নূতন করিয়া উৎসারিত হয়।

নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য শঙ্কর এ সময়ে নাসিক ও পন্ঢারপুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। তারপর দিগ্বিজয়ী আচার্যরূপে উপনীত হন শ্রীশৈলে। পুণ্যতোয়া কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে, এখানকার শৈলচূড়ায়, এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মল্লিকার্জুন নামে পৌরাণিক কাল হইতে রহিয়াছে ইঁহার প্রসিদ্ধি। এই শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বহু শাক্ত, শৈব ও কাপালিক সাধক এখানে তপস্যারত রহিয়াছেন। শক্তিধর আচার্য শঙ্করের সম্মুখে তাঁহাদের অনেকেই সেদিন মস্তক অবনত করিলেন।

উগ্রভৈরব নামে এক প্রবীণ কাপালিক এখানে সাধনা করেন। এ অঞ্চলে শিষ্য ও অনুচরের সংখ্যা তাঁহার কম নয়। শঙ্করের বেদান্তবাদের তিনি ঘোর বিরোধী, তাছাড়া

দিগ্বিজয়ী তরুণ আচার্যের প্রভাব তাঁহার কাছে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। ক্রকচ নামক উগ্রভৈরবের অনুরাগী এক রাজা নিকটেই অবস্থান করেন। উভয়ে মিলিয়া চক্রান্ত করিলেন শঙ্করকে হত্যা করিয়া মনের জ্বালা মিটাইবেন, এই সঙ্গে অদ্বৈতবাদেরও হইবে মূলোৎপাটন।

নিভৃত শৈলশিখরে বসিয়া শঙ্কর সেদিন সবেমাত্র তাঁহার সায়ং কৃত্যাদি শেষ করিয়াছেন। এমন সময়ে ক্রকচের প্রেরিত একদল আততায়ী হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে, বন্দী করিয়া দূরস্থিত এক পর্বতগুহায় তাঁহাকে টানিয়া নেয়।

অমাবস্যার দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কাপালিকের অনুচরদের মশালের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলক। একদল প্রেতের মতো তাহারা আচার্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। নিকটেই গুহার ভিতরে বিরাজিত মহাভৈরব বিগ্রহ। এই পীঠস্থানে আচার্যকে বলি দিয়া আজ সকলে প্রতিহিংসার বাসনা পুরাইবে।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে নিস্পন্দভাবে শঙ্কর বসিয়া আছেন। বীতরাগভয়ক্রোধ মহাপুরুষের কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

এদিকে শঙ্করের শিষ্যেরা সবাই বড় চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল কিন্তু আচার্যের দেখা নাই কেন? নিভৃতে কোথাও কি ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন? এই নূতন জায়গায় কোনো বিপদে পড়িয়াছেন কিনা তাহাই বা কে বলিবে?

কুটিরের এক প্রান্তে শিষ্য পদ্মপাদ বহুক্ষণ যাবৎ ধ্যানস্থ ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল এক বিস্ময়কর দিব্য আবেশ। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়া তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন। আচার্য শিষ্য ও অনুগামীরা ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের অনেকটা পথ চলিয়া আসার পর সকলে উপনীত হইলেন ভৈরবগুহায়। ইতিমধ্যে আচার্যকে হত্যা করার সমস্ত আয়োজন আততায়ীরা করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রুদ্ধ শিষ্যেরা প্রচণ্ড বিক্রমে তাহাদের আক্রমণ করিল।

হঠাৎ দশদিক সচকিত করিয়া ধ্বনিত হইল ভাবাবিষ্ট পদ্মপাদের হুঙ্কার। প্রচণ্ড বিক্রমে নিমেষ মধ্যে কাপালিকদের উপর তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শঙ্করকে বধ করার জন্য রাখা হইয়াছে সিন্দূর চর্চিত এক বৃহৎ খড়্গ। বিদ্যুৎবেগে এই খড়্গটি তুলিয়া নিয়া পদ্মপাদ কাপালিক গুরুর গলায় বসাইয়া দিলেন। দুর্বুদ্ধি উগ্রভৈরব ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িলেন, আর তাঁহার অনুচরেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

পদ্মপাদের সেদিনকার এ ভাবোন্মত্ততা বড় বিস্ময়কর। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। শোনা গেল, সাধন-জীবনের গোড়ার দিকে একবার তিনি নৃসিংহদেবের আরাধনায় রত হন। অচিরে সিদ্ধিলাভও ঘটে এবং সে সময়ে তিনি বরলাভ করেন—যে কোনো সত্যকার সঙ্কটে নৃসিংহদেব তাঁহার পরিত্রাতারূপে হইবেন আবির্ভূত। গুরুদেবের বিপদের দিনে আজ তাই তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছে নৃসিংহদেবের সেই আবেশ!

শিষ্য ও পার্ষদগণসহ শঙ্কর এবারে গোকর্ণে আসিলেন। বিখ্যাত শৈব পণ্ডিত

নীলকণ্ঠের বাস এই স্থানে। এই পণ্ডিতকে বেদান্তমতে আনার পর মৌনাম্বিকা নামক শক্তিপীঠে আচার্য উপনীত হন।

এ সময়ে কোনো অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে রটিয়া যাইত। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

দেবী দর্শন শেষ করার পর শঙ্কর মন্দির ত্যাগ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন অদূরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার স্ত্রী আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। সম্মুখে শায়িত রহিয়াছে সদ্যমৃত এক বালক। এটি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র—সর্বস্বধন। শোকে দুঃখে স্বামী-স্ত্রী একেবারে পাগলের মতো হইয়াছেন।

শঙ্করের অলৌকিক শক্তির কাহিনী ইহাদেরও কানে পৌঁছিয়াছে। তিনি আজ মন্দির দর্শনে আসিবেন, উভয়ে তাই মৃত পুত্রটি কোলে নিয়া এখানে আসিয়াছেন। আচার্যের চরণে লুটাইয়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী মর্মভেদী কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষের হৃদয় বিগলিত হইল, ফুটিয়া উঠিল করুণাঘন রূপ। দেবীর নির্মাল্যটি তখনো তাঁহার হাতে জড়ানো ছিল, মৃত বালকের শিরে সস্নেহে স্থাপন করিলেন।

মুহূর্তমধ্যে দেখা গেল এক অলৌকিক দৃশ্য। বালকের নয়ন ও ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, দেহ ধীরে ধীরে নড়িয়া উঠিতেছে। মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইতে দেখিয়া জনতা সোল্লাসে আচার্যের জয়ধ্বনি শুরু করিয়া দিল। শঙ্কর দ্রুতপদে তখনি সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

বিরাট ঐশ কর্মের গুরুভার রহিয়াছে আচার্যের শিরে। সম্মুখে দীর্ঘায়ত বন্ধুর পথ। কিন্তু স্বল্পায়ু তিনি—হাতে সময় নিতান্ত কম। তাই এ সময় প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে মনীষা ও বিদ্যাবত্তার সহিত প্রকটিত করিতে হইয়াছে যোগবিভূতির ঐশ্বর্য। যখন যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই স্বল্পকাল মধ্যে বিশিষ্ট সাধক ও আচার্যদের আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন—লৌকিক ও অলৌকিক উভয় শক্তিবলে করিয়াছেন তাঁহাদের আত্মসাৎ।

আচার্যের বেদান্তমতের বিরাট প্রতিষ্ঠা সেদিন কিন্তু বিজয়ীর রথচক্রের পেষণেই গড়িয়া উঠে নাই। পরিক্রমার পথে পথে নব নব প্রতিভার আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহাদের টানিয়া আনিয়াছেন নিজের ছত্রচ্ছায়ায়। এই শিষ্যদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন বেদান্তের এক একটি দিক্‌পাল। সৃজনীপ্রতিভা ও সংগঠনের অপরূপ সমন্বয় তাঁহার সমগ্র অধ্যাত্মকর্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবলীর জনসাধারণের মধ্যে সেদিন আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়া সেখানে উপস্থিত। স্থানীয় প্রাচীন সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞেরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

পণ্ডিত প্রভাকর এ অঞ্চলের এক প্রতাপান্বিত আচার্য। খ্যাতি, সমৃদ্ধি উভয়ই তাঁহার যথেষ্ট, কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। একমাত্র পুত্রটি জড়ভাবাপন্ন। বুদ্ধি ও মননশীলতার চিহ্ন তো নাই-ই, কোনো সময়ে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্তি হইতেও শোনা যায় না। এ যেন মানুষ নয়—মাংসপিণ্ডবিশেষ। এ ছেলের দুঃখে পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর জীবন হইতে হাসি ও আনন্দ চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে।

শঙ্করের মহিমা ও যোগৈশ্বর্যের কথা প্রভাকর শুনিয়াছেন। ভাবিলেন, পুত্রের

নিরাময়ের জন্য এই মহাপুরুষের কাছেই একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক না। ছেলেকে আচার্যের পদতলে রাখিয়া সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন—"প্রভু, একবার চেয়ে দেখুন, এ দুর্ভাগার কি অবর্ণনীয় দুর্দশা। একে নিয়ে আমরা জীবন্মৃত হয়ে কাল কাটাচ্ছি। আপনি একবার কৃপা করুন। শুনেছি, আপনার চরণাশ্রয় পেয়ে মৃত প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তবে আমার ছেলের কি বাকস্ফূর্তিটুকুও হবে না?"

বালক একেবারে জড়পিণ্ডের মতো—নির্বাক, অচঞ্চল। শঙ্করের চরণতলে বসিয়া উদাস নয়নে সে তাকাইয়া আছে, আর পণ্ডিত প্রভাকর কাতরস্বরে বার বার মিনতি জানাইতেছেন।

বৃদ্ধের আকুতি আচার্যের অন্তর স্পর্শ করিল। করুণামাখা কণ্ঠে বালককে প্রশ্ন করিলেন, "বৎস, আমায় বল দেখি—তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? আবার কোথায়ই বা চলে যাবে? এ জগতে তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তুই বা কি আছে?"

জড়পিণ্ডের আজ একি অলৌকিক পরিবর্তন! চকিতে তাহার মধ্যে দেখা দিল চৈতন্যের বিদ্যুৎ ঝলক। নয়ন দুইটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল, বাক্‌হীন মুহূর্তমধ্যে হইয়া উঠিল বাঙ্‌ময়। অপূর্ব দৈব শক্তিতে সে আজ উদ্দীপিত। কণ্ঠ হইতে অনর্গল ধারায় নির্গত হইতেছে সংস্কৃত শ্লোকরাজি—যেমন তাহার উচ্চারণভঙ্গী তেমনই ভাবের গভীরতা ও ভাষার ব্যঞ্জনা।

বালকের পিতা প্রভাকর ও উপস্থিত দর্শনার্থীরা এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য প্রভৃতি শঙ্করের দিক্‌পাল শিষ্যদের বিস্ময়ও এদিন চরমে উঠিল। এ স্তোত্ররাশি যে অপরূপ, অনুপম। আত্মস্বরূপ-বোধের এমন বর্ণনা পূর্বে তাঁহারা আর শোনেন নাই।

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে শঙ্কর শিষ্যদের কহিলেন, "তোমরা সবাই শুনে রাখো, এ হচ্ছে 'হস্তামলক স্তোত্র'। এর নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে পারলে সাধকের কাছে আত্মজ্ঞান হয়ে ওঠে সহজবোধ্য—করধৃত আমলকী ফলের মতো তা আয়ত্তে এসে পড়ে। তোমরা সবাই এ চৈতন্যময় স্তোত্র রোজ অভ্যাস করবে।"

অকর্মণ্য, জড়ভরত পুত্রের এ-কি অপ্রত্যাশিত রূপান্তর! পণ্ডিত প্রভাকর ভাবাবেগে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, দুই চোখ দিয়া অবিরাম ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে শঙ্কর কহিলেন, "পণ্ডিত, আপনার এ পুত্র সামান্য নয়—অসামান্য। জড়পিণ্ড মোটেই নয়—এ যে চৈতন্যের পুঞ্জ। এঁর ভেতরকার আত্মজ্ঞানের আলোক আজ হঠাৎ স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ইনি হচ্ছেন এক অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ। আরো শুনুন, সংসারে আবদ্ধ থাকবার মানুষও ইনি নন। আপনার কোনো প্রয়োজনেও কখনো আসবেন না। একে আমার হাতেই সঁপে দিতে হবে। আজ থেকে আমিই এঁর ভার গ্রহণ করলাম।"

পণ্ডিত প্রভাকরের নয়নে আবার দেখা দিল অশ্রুধারা। এবার পুলকের অশ্রু নয়—দুঃখের। পুত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া আবার তাহাকে হারাইলেন, তাই এ ক্রন্দন!

শঙ্করের আবিষ্কৃত এই পরমজ্ঞানী, বালক শিষ্য এখন হইতে তাঁহার নিকটেই রহিয়া

গেলেন। সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর ইহার নূতন নামকরণ হয়, হস্তামলকাচার্য। পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরাচার্যের মতোই শঙ্করমণ্ডলীতে ইঁহার মর্যাদা ছিল অসামান্য।

ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য সে-বার শৃঙ্গেরীতে আসিয়াছেন। এ অঞ্চলটি পৌরাণিক ঋষি বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যায় পবিত্র। এক সময়ে শঙ্করের ইচ্ছা ছিল, এখানে একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিবেন। এখানকার মনোরম পরিবেশ দেখিয়া অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা এবার তাই উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। কর্ণাটকের রাজা সুধন্বা ইতিমধ্যে আচার্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই রাজ্য ও তাঁহার শিষ্যদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইল সুপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরী মঠ। আচার্য এখানে মহাসমারোহে সারদাদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই মঠে শঙ্কর বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাঁহার বহু গ্রন্থ এখানে রচিত হয়। শাস্ত্রালোচনায় ও সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে আচার্য এক একদিন উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, অমূল্য তত্ত্বরাজি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইতে থাকিত। সুপণ্ডিত শিষ্যেরা তখনই সেগুলি সযত্নে লিখিয়া রাখিতেন।

শৃঙ্গেরীতে থাকা কালে শিষ্যদের কাছে উপস্থিত হয় গুরুসান্নিধ্যের সুবর্ণ সুযোগ। আচার্যের অন্তরঙ্গতা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সকলেই এ সময়ে প্রভাবিত হইতে থাকেন। গুরুকৃপার অমৃতসিঞ্চন সাধক শিষ্যদের মধ্যে আনিয়া দেয় অপূর্ব রূপান্তর।

পর্যটন, তর্কযুদ্ধ ও সংগঠন কর্মের নানা ভিড়ের মধ্যে শঙ্করের জীবনে বিশ্রামের অবকাশ খুব কমই মিলিয়াছে। কিন্তু এত কিছু ব্যস্ততার মধ্যেও ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অন্তর্লোকের কোনো খুঁটিনাটি সংবাদই তাঁহার কাছে কখনো অজানা থাকে নাই। সতর্ক অতন্দ্র দৃষ্টি নিয়া আশ্রিতদের সাধনা ও সিদ্ধির ধারাকে সদাই তিনি করিতেন নিয়ন্ত্রিত। তাহাদের অহংবোধের সূক্ষ্মতম তরঙ্গটি সর্বোজ্ঞ আচার্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

উচ্চকোটির শিষ্যদের শিক্ষার জন্য, তাঁহাদের প্রসন্ন আত্মাভিমান দূর করার জন্য, আচার্য শৃঙ্গেরীতে বসিয়া সেদিন এক অলৌকিক যোগবিভূতি প্রদর্শন করিলেন।

গিরি নামক এক নিরক্ষর শিষ্যকে তিনি বড় ভালবাসেন। সেবা, ভক্তি ও সাধন-নিষ্ঠার দিক দিয়া গিরির তুলনা সত্যই বিরল। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান তাহার কিছুই নাই, আর এই দৈন্য ও ত্রুটি নিয়া কখনো মাথা ঘামাইতেও তাহাকে দেখা যায় না।

শিষ্য ও ভক্তদের নিকট শঙ্কর অনেক সময় উৎসাহভরে নানা দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, সকলে মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার ভাষণ শুনিতে থাকে। কিন্তু গিরি এসব বিষয়ে একেবারে নিস্পৃহ। কোনো ঔৎসুক্য, কোনো প্রশ্নই তাহার নাই। বিচার-বিতর্কের অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া গুরুসেবা ও গুরুকৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। সে উপলব্ধি করিয়াছে—গুরুসেবাই সকল বিদ্যা ও সকল সিদ্ধির মূলে।

আচার্যের শাস্ত্রব্যাখ্যার কালে নিরক্ষর গিরির প্রতিদিনকার কাজ—এককোণে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকা। শাস্ত্রের একবর্ণ সে বোঝে না, বুঝিতেও চাহে না। কিন্তু গুরুর অমৃত ভাষণ রোজ কানে না শুনিলে তাহার দিন চলে না।

সেদিন এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইবে। শিষ্যগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে

বসিয়া আছেন। কিন্তু কই, গুরুদেব তো গ্রন্থের ডোর উন্মোচন করিতেছেন না। কাহার জন্য তিনি অপেক্ষমান ? সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন, নানা কথা ভাবিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে পদ্মপাদ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমরা সবাই উপস্থিত। কৃপা ক'রে এবার তবে ব্যাখ্যা শুরু করুন।"

শঙ্কর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "দেখছি, তোমরা সবাই রয়েছো, কিন্তু গিরি কই, বলতো ? তাকে তো দেখছিনে ?"

সেবকশিষ্য গিরির খোঁজে কয়েকজন বাহির হইলেন। শোনা গেল নিকটেই নদী স্রোতে সে গুরুদেবের বহির্বাস ও কমণ্ডলু প্রক্ষালন করিতে গিয়াছে। আসিতে একটু দেরি হইবে।

আচার্য কিন্তু নিশ্চলভাবেই বসিয়া আছেন, পুঁথি খুলিবার কোনো লক্ষণই নাই।

পদ্মপাদ আর কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "প্রভু, গিরি তো একেবারে নিরক্ষর, আজকের এই দুরূহ শাস্ত্র ব্যাখ্যার মর্ম কি সে বুঝতে পারবে।"

প্রকৃত উত্তরটি আচার্য এড়াইয়া গেলেন। মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিলেন, "তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করাই তো উচিত। সে যে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রতিদিন আমাদের আলোচনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।"

নির্দিষ্ট কাজকর্ম সমাপনের পর গিরি গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গিরি, রোজই তো শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা তুমি শুনে যাচ্ছো। আজ তুমিই বরং আমাদের কিছু শ্লোক শুনিয়ে দাও। আমার তো মনে হয়, তুমি নিজেই বেশ রচনা করতে পারবে।"

একি অবিশ্বাস্য কথা ! অক্ষর পরিচয়টুকুও যাহার নাই, সংস্কৃত শ্লোক সে কি করিয়া রচনা করিবে ? গুরুদেব একি কহিতেছেন ?

মুহূর্তমধ্যে গিরির নয়ন দুইটি ভাবাবেশে নিমীলিত হইয়া যায়। আচার্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে সে আবৃত্তি করিতে থাকে অপূর্ব শ্লোকরাশি। অনর্গলধারায় বহিয়া চলে তোটকছন্দে গাঁথা সদ্যরচিত গুরুমাহাত্ম্যের বর্ণনা। ভক্তপ্রাণের আকুতি হইয়া উঠে প্রাণবন্ত, বাক্‌বিভূতির ঐশ্বর্যে অনুপম !

এ শ্লোক শুনিয়া সমবেত শিষ্যদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বশক্তিমান্ গুরুর কৃপায় গিরি লাভ করিয়াছে সর্ব বিদ্যা, সফল হইয়াছে তাহার সর্ব অভীষ্ট। নবস্ফুরিত বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির প্রভায় মূর্খের মনোলোক আজ উদ্ভাসিত।

এই অলৌকিক লীলার মাধ্যমে আচার্য সেদিন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে গুরুভক্তির মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। প্রথিতযশা শিষ্যদের সূক্ষ্ম বিদ্যাভিমানের মূলে পড়িল এক প্রচণ্ড আঘাত।

সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর শঙ্করের এই সেবক-শিষ্য গিরির নাম হয় তোটকাচার্য। অল্পকাল মধ্যে এক মহাজ্ঞানী সাধকরূপে সমগ্র ভারতের বৈদান্তিকসমাজে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

শৃঙ্গেরীতে বসিয়া শঙ্কর সেদিন অধ্যাপনায় রত রহিয়াছেন। হঠাৎ চমকিয়া

উঠিলেন। একি বিচিত্র অনুভূতি ? জিহ্বায় তাঁহার বার বার মাতৃস্তন্যের স্বাদ লাগিতেছে কেন ?

ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন এ তাঁহার জননীর আহ্বানের ফল। অন্তিম শয্যায় তিনি শায়িতা। সন্ন্যাসী পুত্রকে আর একবার না দেখিয়া শান্তিতে মরিতে পারিতেছেন না।

মনে পড়িয়া গেল পুরাতন কথা। গৃহত্যাগের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে জননীর চরণতলে গিয়া তিনি উপবেশন করিবেন। যেখানেই থাকুন না কেন, সময়মতো কালাড়ির কুটিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে তাঁহার ভুল হইবে না।

কিন্তু সময় যে আর মোটেই নাই। অবিলম্বে না পৌঁছিতে পারিলে জননীর সহিত শেষবারের মত দেখা হয়তো আর হইবে না। কথিত আছে, যোগবলে এই সময়ে তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন, অগোণে উপস্থিত হন মাতার সন্নিধানে।

দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের ব্যবধানে মাতা পুত্রের এ মিলন। আনন্দে আত্মহারা জননীর গণ্ড বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিতে থাকে। শেষ বিদায়ের পালা তাঁহার আসিয়া গিয়াছে। তবুও ভাল, এ সময়ে পুত্রের চাঁদমুখ শেষবারের মত দেখিয়া নিলেন।

অন্তিম সময়ে, মাতার শিয়রে বসিয়া পুত্র ভগবৎ-মহিমা গাহিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মবাদী আচার্যের কণ্ঠে শোনা গেল সগুণ ব্রহ্মের অপরূপ স্তুতিগান। জননীও ভাব-গম্ভীর সুরে সুর মিলাইয়া ক্ষীণস্বরে নিবেদন করিলেন তাঁহার শেষ প্রার্থনা। তারপর চিরতরে তাঁহার নয়ন দুইটি মুদিয়া আসিল।

জ্ঞাতিরা ছিলেন শঙ্করের জ্ঞানমার্গীয় সাধনার বিরোধী। ইতিপূর্বেই আচার্যকে তাঁহারা সমাজচ্যুত করিয়াছেন। একদল কুচক্রী এবার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। শুরু হইল নির্যাতন ও লাঞ্ছনা। মৃত জননীর ঔর্ধ্ব দৈহিক কাজে একটি লোকেরও সাহায্য পাওয়া গেল না।

সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসীর জীবনে সেদিন রূপায়িত হইয়া উঠে মাতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা। মাতার দেহের সৎকার শঙ্কর একাকী স্বহস্তে সমাপ্ত করেন। পারলৌকিক সব কিছু কাজই অনুষ্ঠিত হয়। কালাড়িতে থাকিতে জননীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন সেদিন তাহা এমনি করিয়া তিনি পালন করেন।

এবার শেষবারের মতো শঙ্কর তাঁহার বেদান্তধর্মের প্রচার পরিক্রমায় বাহির হন— অলৌকিক প্রতিভা ও যোগসিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ এই তরুণ আচার্য। অনুগামী শিষ্যদেরও ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞানৈশ্বর্যের সীমা নাই। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের শক্তিতে তাঁহারা এক একটি দিক্‌পাল। এই সুসংগঠিত মণ্ডলী নিয়া আচার্য যখনি যেখানে উপস্থিত হন, উচ্চকোটির সাধক ও পণ্ডিতের দল তাঁহার মতবাদ মানিয়া নেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শির অবনত করেন।

বৌদ্ধবাদের ধারা ভারতভূমিতে এসময়ে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তবাদ ইহার উপর এক চরম আঘাত হানিয়া বসিল। বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রচারের রন্ধ্রপথে সমাজে এ সময়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নানা বাহ্যানুষ্ঠান ও অনাচার। চারিদিকে কুসংস্কার পুঞ্জীভূত। অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত জ্ঞানের স্নিগ্ধ নির্মল ধারা এ সময়ে সমাজের অনেক কিছু ক্লেদ, পঙ্কিলতা ধুইয়া মুছিয়া দিল।

জ্ঞানসাধনার বাণীর মধ্য দিয়া আচার্য একদিকে স্থাপন করিলেন আত্মতত্ত্বের বিচার, অপরদিকে জনজীবনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শুচিতার নূতনতর আদর্শ। এদেশের ধর্ম ও সমাজে দেখা দিল পুনরুজ্জীবন। তীর্থাঞ্চলে, নগরে ও পল্লীতে নূতন প্রাণস্পন্দন জাগিয়া উঠিল। সার্বভৌম ধর্মনায়করূপে, যুগাচার্যরূপে এই তরুণ বৈদান্তিক হইয়া উঠিলেন সারা ভারতের বরেণ্য।

বদরিধাম হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা—অধ্যাত্ম সাধনার সকল কেন্দ্রেই শঙ্করকে সেদিন প্রেরিত-পুরুষরূপে মানিয়া নিয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ দ্বারা হইয়াছে প্রভাবিত।

লোকোত্তর মনীষা ও যোগশক্তির সহিত শঙ্করের মহাজীবনে মিলিত হয় অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা ও কর্মকুশলতা। ফলে তাঁহার প্রভাব শুধু একদল সার্থকনামা বৈদান্তিক সন্ন্যাসীই তৈরি করে নাই—সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠন, মঠ স্থাপন ও সন্ন্যাসীদের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়াও অধ্যাত্ম ভারতকে উন্নততর করিয়া তোলে।

ভারতের চার প্রান্তে চারটি বিশিষ্ট ধামে আচার্য তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হয়—দ্বারকার সারদামঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামের যোশীমঠ এবং রামেশ্বরের শৃঙ্গেরী মঠ। স্বনামধন্য শিষ্যগণ—সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য হস্তামলক যথাক্রমে এগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করিয়া শঙ্কর অপরূপ সংগঠনপ্রতিভার পরিচয় দেন। গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের এই সব মঠের অধীনে রাখিয়া আচার্য তাহাদিগকে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এ তাঁহার এক বড় কীর্তি। তাঁহার এ সংস্কার ব্যবস্থা একদিকে যেমন সন্ন্যাস-আশ্রমের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি ভারতের পুরাতন সমাজ-জীবনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে পরম কল্যাণময় আদর্শ।

কয়েক বৎসরের পরিক্রমা ও অনলস কর্মসাধনার পর আচার্য সেবার উত্তরাখণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। গুরুদেবের আদিষ্ট কর্ম তিনি সমাপ্ত করিয়াছেন। ঐশকর্মের ব্রতও প্রায় উদ্‌যাপিত। বেদান্তের ত্যাগবৈরাগ্যময় ভাবধারা দিকে দিকে বহিয়া চলিয়াছে, সর্বত্র সগৌরবে উড়িতেছে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পতাকা।

ধ্যানগম্ভীর হিমাদ্রির কোলে এবার তাঁহার চির বিশ্রামের পালা। প্রতীক্ষিত মহালগ্নটি অতঃপর একদিন আসিয়া পড়ে। দেবাদিদেব মহেশ্বরের উদ্দেশে সুললিত এক স্তবগাথা তিনি রচনা করেন। শেষ আরাধনা ও অর্ঘ্য নিবেদনের পর মগ্ন হন মহা-সমাধিতে।

সম্মুখে আকাশের সীমাহীন বিস্তার। রজতশুভ্র হিমগিরির চূড়ায় চূড়ায় তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে অপরূপের দিব্যরূপ, মহামৌনের অপরূপ মহিমায় আকাশ বাতাস মন্থর। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ নীরবে আচার্যকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। শঙ্কায় অন্তর কাঁপিতেছে, কাহারও আজ বুঝিতে বাকী নাই—আচার্যের এ সমাধি আর ভাঙিবার নয়! আসন্ন চিরবিদায়ের কথাটি যে আভাসে ইঙ্গিতে কিছু দিন আগে হইতে তিনি জানাইয়া আসিতেছেন।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক সমাধির মধ্য দিয়া আত্মপূজার শেষ আরতিটুকু সাঙ্গ করিলেন, তারপর ঘটিল নরলীলার চির-অবসান।

ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিতে বার বার এ সময়ে জাগিয়া উঠিতেছিল আচার্যের রচিত আত্ম-দর্শনের মহাবাণী—

কিং করোমি ক্বঃ গচ্ছামি।
কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্বং
মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥

—মহাপ্রলয়ে জলোচ্ছ্বাস যেমন সারা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনিভাবেই তো আত্মা দিয়ে সবকিছু রয়েছে আবরিত, আত্মাতেই রয়েছে নিমজ্জিত। তাহ'লে কি আর আমার আছে করবার ? কোথায় আমি যাবো ? কোন বস্তু করবো গ্রহণ ? কি-ই বা করবো আজ বর্জন ?

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ যেন একেবারে নূতন মানুষ। বিদ্যার সে অভিমান, কূটতর্কের সে বিলাস, আজ আর নাই। কৃষ্ণ বিরহে সদাই থাকেন মুহ্যমান। আর্তি আর দৈন্য দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না। উদ্ধত বিদ্যাদর্পী পণ্ডিতের একি অদ্ভুত রূপান্তর! নদীয়ার যে কেউ এ পরমভাবগত রূপ একবার দর্শন করে, বিস্মিত হইয়া যায়।

এ রূপান্তরের কাহিনী বড় বিচিত্র, বড় অলৌকিক। গয়ায় গিয়া প্রথমেই পণ্ডিত ভক্তিভরে তাঁহার পিতৃকার্য সমাপন করেন। কাছেই ভারতবিশ্রুত বিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দির। পুণ্যার্থীরা সবাই এ পবিত্র স্থান দর্শন করিতে আসে। নিমাইও আসিলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়াই, কি জানি কেন, অপূর্ব ভাবাবেশে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

পুষ্পদাম, ধূপ-ধুনা ও অগুরু চন্দনের গন্ধে মন্দিরগর্ভ আমোদিত। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা দলে দলে আসিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছে। তরুণ নিমাই এক দিব্য ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন। সারা দেহ তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে—ভক্তিরসের আবেশে হইয়াছেন আত্মহারা। আয়ত নয়ন দুইটি ছাপাইয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। কানে পশিতেছে ব্রাহ্মণদের স্তবগান—'এই সেই পরম প্রভুর চরণ, মহালক্ষ্মী যাহার করেন সেবা, দেবাদিদেব শঙ্কর যাহা হৃদয়ে রাখিয়া হন ধন্য। যোগীজনের চিরবাঞ্ছিত পরম ধন এই চরণকমল হইতেই সদা নিঃসৃত মুক্তিদায়িনী গঙ্গা।'

ভক্তির আবেশে উদ্বেল, ক্রন্দনরত, নিমাইর দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। দীর্ঘায়ত সুন্দর সুঠাম তনু কে এই তরুণ? দুই চোখ ছাপাইয়া কেনই বা তাঁহার এ হৃদয়বিদারী কান্না? এ ভুবনমোহন রূপ একবার দেখিলে নয়ন ফিরাইবার উপায় নাই! এমন মানুষকে কাঁদিতে দেখিলে না কাঁদিয়া কে থাকিতে পারে? সর্বচিত্তহারী কে এই করুণ-সুন্দর পুরুষ?

মন্দির কক্ষের কোণে পরমভাগবত ঈশ্বরপুরী করজোড়ে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসাধক এক সন্ন্যাসী। প্রেমভক্তি ধর্মের উৎস, মহাত্মা মাধবেন্দ্র পুরীর ইনি অন্তরঙ্গ শিষ্য। তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া ইনিও এ সময়ে হঠাৎ গয়াধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ঈশ্বরপুরী এতক্ষণ পাদপদ্ম বেদীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। এবার নিমাইর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। প্রেমভক্তিরসের এ কি অপূর্ব বিহ্বলতা? এ দৃশ্য দেখা মাত্রই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে খেলিয়া গেল আনন্দের তরঙ্গ। এ তরুণ যে তাঁহার অতিপরিচিত।

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর বেশ যাতায়াত আছে। তরুণ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানেই তাঁহার আলাপ। শুধু অসাধারণ তীক্ষ্ণধী নয়, অমানুষী প্রতিভারও সে অধিকারী। এই অল্প বয়সেই নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে নিমাই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাঁহার সে বিদ্যা ও প্রতিভা ছাপাইয়া আজ কোন্ অলৌকিক

ভক্তিরস উৎসারিত হইতে চাহিতেছে? ভিড় ঠেলিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বড় অপ্রত্যাশিত এ সময়ে এ বৈষ্ণব মহাপুরুষের দর্শন। নিমাই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দৈন্যভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আজ যে আমার মহাভাগ্য। গয়ায় এসে বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তের দর্শন। ঈশ্বর কৃপায় এমন যোগাযোগ যখন ঘটেছে, আর আপনাকে ছাড়ছিনে, কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্র প্রদান করুন, চরণে আশ্রয় দিন। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। এবার সংসারসাগর থেকে আমায় উদ্ধার করুন, কৃতার্থ করুন বিষ্ণু-পাদপদ্মের মধু পান করিয়ে।"

ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "নিমাই, নবদ্বীপে থাকতে তোমার অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য আমি দেখেছি। এবার দেখছি অমানুষী ভক্তিরস উদ্‌গত হচ্ছে তোমার ভেতর থেকে। কৃপাময় কৃষ্ণ নিশ্চয় তোমার অভীষ্ট পূরণ করবেন।"

কয়েকদিনের মধ্যেই নামমন্ত্রে শক্তিসঞ্চার করিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্তিবীজ সেদিন রোপিত হইল সর্বোত্তম আধারে। এ বীজের পুষ্পিত ও ফলিত রূপ—প্রেম-ভক্তিধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্য তিথির সন্ধ্যা। নবদ্বীপের আকাশে আর সুরধুনীর বুকে জোছনার জোয়ার উথলিয়া উঠিয়াছে। নদীতীর বড় নয়নাভিরাম। ঘাটে ঘাটে অগণিত মানুষের আনাগোনা। চাঁদনা রাতে নগরের পণ্ডিত ও পড়ুয়ারা দলে দলে এখানে আসিয়া জোটে। তর্ক-বিতর্কে, হাসি-হুল্লোড়ে আকাশ বাতাস সরগরম করিয়া তোলে। আজ আবার রহিয়াছে চন্দ্রগ্রহণের যোগ, ভিড়ের তাই অন্ত নাই। কোলাহল আর হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরপুর।

এমনি সময়ে মায়াপুর পল্লীতে শ্রীহট্টিয়া পাড়ায় শোনা গেল নারীকণ্ঠের ঘন ঘন হুলুধ্বনি আর শঙ্খরব।

পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এইমাত্র একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মিশ্রপত্নী শচীদেবীর আর প্রতিবেশিনীদের আনন্দের অবধি নাই। নীলাম্বর চক্রবর্তী শচীদেবীর পিতা। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, জ্যোতির্বিদ্যায়ও তাঁহার খ্যাতি কম নয়। দৌহিত্রের জন্ম সংবাদ পাইয়া তিনি পাঁজিপুঁথি নিয়া আসিয়া উপস্থিত। গণনা করিয়া কহিলেন, "এ জাতকের কোষ্ঠী যে দেখছি অপূর্ব? শুধু অসামান্য মনীষা ও বিদ্যার অধিকারীই হবে না—ধর্মজগতের এক মস্ত নেতাও যে হবে। বহুলোক পূজো করবে দেবতা জ্ঞানে।"

আনন্দ্যসুন্দর মিশ্রগৃহের এই শিশু। আজিকার পূর্ণিমার চাঁদের তরণী বাহিয়া সে আবির্ভূত, এই পূর্ণিমারই স্বর্ণকান্তি যেন তাহার সারা অঙ্গে উপচিয়া পড়িতেছে।

উত্তরকালে এই শিশুরই অভ্যুদয় ঘটে নদীয়ার গোরাচাঁদরূপে। সুরধুনীর দুই তীর প্রেমভক্তির সুধাস্নিগ্ধ কিরণে তিনি প্লাবিত করিয়া দেন। আবার নীলাচলের সাগরতীরে দেখি, তাঁহারই আর এক অনির্বচনীয় রূপ। সেখানে তিনি চৈতন্য চন্দ্র—প্রেমভক্তির পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। বিশ্বভক্তজনের হৃদয়সাগর উদ্বেলিত করিয়া পূর্ণ-চন্দ্রেরই মতো সেখানে তিনি বিরাজমান।

মধুর রূপ, মধুর প্রেম, আর মধুর করুণার এ এক আনন্দঘন মহাপ্রকাশ। ঐশী কৃপা

আর যুগ যুগ সঞ্চিত মানব-তপস্যার ফল সেদিন এই প্রকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠে। মানব ইতিহাসে ইহার তুলনা আজিও মিলে নাই।

জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যাচর্চার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া আর তিনি দেশে ফিরেন নাই। স্বীয় অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানেই তিনি রহিয়া গিয়াছেন। সংসারে তেমন প্রাচুর্য না থাকিলেও অসচ্ছলতা কিছু নাই। মোটামুটিভাবে দিন বেশ চলিয়া যায়।

মিশ্রের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। পর পর কয়েকটি পুত্রকন্যার মৃত্যুর পর এবার এই পুত্রের জন্ম। জননী তাই এ শিশুর নাম রাখিলেন নিমাই। কোষ্ঠীর নাম বিশ্বম্ভর।

নিমাই শুধু নিজ গৃহেরই আনন্দধন নয়, পাড়া-পড়শীদেরও সে নয়নমণি। ভুবন-ভোলানো তাহার দিব্য রূপের ছটা। একবার দেখিলে দুই চোখ ফিরাইয়া নেওয়া কঠিন। আনন্দ-চঞ্চল এ শিশুর হাসিতে গৃহ-অঙ্গন মুখর হইয়া উঠে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনপ্রাণ সে কাড়িয়া নেয়।

হাতেখড়ির পর দেখা গেল, বালকের মেধা ও প্রতিভা দুই-ই বড় বিস্ময়কর। বিদ্যালয়ের পাঠ একের পর এক অবলীলায় সে আয়ত্ত করে। পুত্রগৌরবে জনক-জননীর মন খুশীতে ভরিয়া উঠে।

নিমাইর বয়স তখন প্রায় সাত বৎসর। মিশ্রের গৃহে এই সময়ে হঠাৎ এক মহাবিপদ ঘটিয়া যায়। প্রথম পুত্র বিশ্বরূপের বয়স ষোল বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু এই বয়সেই দেখা যায় তাঁহার বিষয়-বিরক্তি। অবশেষে একদিন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মিশ্রদম্পতি শোকে দুঃখে হন মুহ্যমান।

সন্ন্যাস নিবার পর বিশ্বরূপের নাম হয় শঙ্করারণ্য পুরী। এ জীবনে আর তিনি কখনো ঘরে ফিরিয়া আসেন নাই।

মিশ্র পরিবারের উপর দুঃখ দুর্দৈবের আঘাত এখানেই থামে নাই। নিমাইর বয়স তখন দশ এগারো বৎসরের বেশী নয়, এসময়ে সামান্য কয়েকদিন রোগে ভুগিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বালক পুত্রটিকে নিয়া জননী শচীদেবীর বিপদের অন্ত রহিল না।

মায়ের একমাত্র আশা ভরসাস্থল, এই নিমাই। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে সে পড়িতেছে। অতুলনীয় তাহার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি। কিন্তু তাহাকে নিয়া ঝঞ্ঝাটেরও অন্ত নাই। কি পাঠশালায়, কি পথে ঘাটে বা গঙ্গার ঘাটে নিমাইর দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির। দুষ্টামি করিয়া কাহারো পূজার ফুল সে কাড়িয়া নেয়, কাহারো গায়ে হঠাৎ জল ছিটাইয়া দিয়া কোথায় লুকাইয়া পড়ে। চঞ্চল বালকের বিরুদ্ধে প্রায়ই থাকে নানা অভিযোগ, এসব শুনিতে শুনিতে জননীর কান ঝালাপালা হয়। প্রতিবেশীদের কোনো-মতে বুঝাইয়া তিনি শান্ত রাখেন।

চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিমাইর বয়স এখন মাত্র আঠার বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব দীপ্তি দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠে। বাল-চঞ্চলতা আর নাই। এখন তিনি হইয়া উঠিয়াছেন কূট-তার্কিক, বিদ্যাদর্পী,—অসাধারণ তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা। নানা দুরূহ তত্ত্ব যেমন অবলীলায় আয়ত্ত করেন, উহা নিয়া সঙ্গী পড়ুয়াদের সঙ্গে তর্কজালের বিস্তারও কম করেন না।

নিমাইর সব চাইতে বড় বিলাস—ফাঁকির নানা কূট প্রশ্ন তুলিয়া লোককে বিব্রত করা, তাদের অপদস্থ করিয়া রঙ্গ দেখা। নবদ্বীপের নবীন প্রবীণ সকল পড়ুয়াই তাঁহার ভয়ে ভীত, তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে পারিলে যেন সবাই বাঁচে।

নিমাইর টোলের পড়াশুনা সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার নিজেই সোৎসাহে অধ্যাপনা শুরু করিলেন। মুকুন্দসঞ্জয় নবদ্বীপ শহরের একজন বর্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটিতে নবীন শিক্ষক নিজস্ব টোল খুলিয়া বসিলেন। অতঃপর নিমাই পণ্ডিতের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইতে থাকে। টোল জমিয়া উঠিতে তাই বেশী দেরি হইল না।

পুত্র এবার অধ্যাপক। সংসারে আর্থিক সাচ্ছল্যও বেশ কিছুটা হইয়াছে। তাহার জন্য এক মনোনীত পাত্রী খুঁজিতে শচীদেবী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বল্লভ আচার্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার মনে ধরিল। বধূরূপে তাহাকেই ঘরে তুলিলেন।

নবীন অধ্যাপক হইলে কি হয়, ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যাবত্তা নিমাইর অসাধারণ। তাছাড়া অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশও তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পণ্ডিতেরা এজন্য তাঁহাকে বড় একটা ঘাটাইতে চাহেন না। বরং কিছুটা এড়াইয়াই চলেন। এ সময়কার একটি ঘটনায় তাঁহার লোকোত্তর স্বরূপটি নবদ্বীপের লোকের কাছে হঠাৎ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আচার্য কেশব কাশ্মীরের এক প্রথিতযশা পণ্ডিত। ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র-গুলিতে সাড়ম্বরে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, আর তর্কযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করেন। নবদ্বীপে আসিয়াই পণ্ডিত হাঁকডাক শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা ও বিচারশক্তির খ্যাতি শুনিয়া পণ্ডিতসমাজে বেশ কিছুটা ভীতির সঞ্চার হইল। সহসা কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন না।

নিমাই সেদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেছেন। চারিদিকে তাঁহার ছাত্রের দল উপবিষ্ট। দিগ্বিজয়ী কাশ্মীরী পণ্ডিত পালকিতে চড়িয়া নিকটেই কোথায় যাইতেছেন। প্রতিভাদীপ্ত এই নবীন অধ্যাপকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ঘাটে আসিয়া নিজ হইতেই আলাপ-পরিচয় শুরু করিলেন।

ভারতখ্যাত মহারথী পণ্ডিত তাঁহার সম্মুখে। উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া নিমাই নম্র নতি জানাইলেন।

নানা কথাবার্তা চলিতেছে। হঠাৎ নিমাই তাঁহাকে কহিলেন, "পণ্ডিতবর, আমাদের সামনেই প্রবাহিতা রয়েছেন মুক্তিদায়িনী ভাগীরথী। শুনেছি আপনার কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। কৃপা ক'রে একটি নূতন গঙ্গাস্তব রচনা ক'রে আমাদের শুনিয়ে দিন। পাপ তাপ মোচন হোক।"

নিমাইর মুখের কথা না ফুরাইতেই পণ্ডিত কেশব অবলীলায় ঝড়ের বেগে এক সদ্য-রচিত স্তব আবৃত্ত করিয়া চলিলেন। রচনাটি সুদীর্ঘ এবং রসমধুর। অপূর্ব প্রতিভার ছাপ তাহার ছত্রে ছত্রে। চারিদিকে শ্রোতাগণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া আছে। স্তবপাঠ শেষ হইয়া গেলে কেশব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নবীন অধ্যাপকের দিকে চাহিলেন।

এবার নিমাই সবিনয়ে শুরু করিলেন শ্লোকের সমালোচনা। শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধি

অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ, একটির পর একটি অসাধারণ প্রতিভা ও চাতুর্যবলে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিলে কি হয়, নিমাই মুহূর্তমধ্যে তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি এই তরুণ অধ্যাপকের। কাহার সাধ্য ইঁহার সহিত আঁটিয়া উঠে? মহাপণ্ডিত কেশবের ভারতজয়ী প্রতিভা কোথায় যেন আজ লুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বড় মুষড়িয়া পড়িলেন।

পণ্ডিতের দুরবস্থা বুঝিয়া নিতে নিমাইর দেরি হইল না। আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"পণ্ডিতবর, আজ আর বিতর্কে কাজ নেই। অনেক হয়েছে, আপনিও শ্রান্ত হয়েছেন। বরং আগামীকাল আমরা আবার মিলিত হবো।"

পরের দিন ভোর না হইতেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একাকী নিমাইর কাছে আসিয়া উপস্থিত। নিতান্ত দীনভাব। সে দর্পিত-দেহী, উদ্ধত মূর্তি আর নাই। কহিলেন, পূর্ব রাত্রে স্বপ্নযোগে নিমাইর অলৌকিক স্বরূপ নাকি তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, আর তাঁহার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে, তাঁহার কাছে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা নাই। পরদিনই তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিগ্বিজয়ীর এই রহস্যময় অন্তর্ধানের ফলে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়।

কিছুদিন পরে নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। সুপণ্ডিত ও প্রতিভাবান্ পণ্ডিত বলিয়া সে অঞ্চলে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা পান এবং প্রচুর অর্থও উপার্জন করিয়া আনেন।

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ইতিমধ্যে গৃহে এক শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। নব পরিণীতা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনের ফলে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন হইতে অধ্যাপনার উপর নিমাই জোর দেন। প্রতিষ্ঠাও দিন দিন বাড়িতে থাকে। দূর দূরান্ত হইতে তাঁহার টোলে ছাত্রেরা আসিয়া জড় হয়। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরে তিনি বেশ গণ্যমান্য হইয়া পড়েন।

শচীদেবীর অন্তরে কিন্তু সুখ নাই। এমন প্রাচুর্যভরা ঘর সংসার কিন্তু একটি গৃহিণী সেখানে না থাকিলে চলিবে কেন? নিমাইর আবার বিবাহ না দিলে তিনি শান্তি পাইতেছেন না।

সুপাত্রী শীঘ্র জুটিল। নবদ্বীপে সনাতন পণ্ডিতের বেশ সুনাম রহিয়াছে, মান সম্মান ও বিষয়-সম্পত্তিও তাঁহার কম নয়। রাজপণ্ডিত নামেই এ অঞ্চলে তিনি পরিচিত। তাঁহার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীর বড় পছন্দ হইল। ভাবিয়া খুশী হইলেন পরম রূপ-লাবণ্যবতী এই কিশোরীকে নিমাইর পাশে চমৎকার মানাইবে।

মহা আড়ম্বরের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। জননী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

মিশ্র-পণ্ডিতের ঘর সংসার এবার বড় মধুময়, বড় মনোহর। নানা দুঃখ-দুর্দৈবের পরে সুখনীড়টি সদাই আনন্দের হিল্লোলে দুলিতেছে। বৃদ্ধা জননী গৃহদেবতা রঘুনাথ-বিগ্রহের সামনে বসিয়া শান্তমনে মালা জপেন, গঙ্গাস্নান করিয়া তুলসীতলায় রোজ পুত্রের কল্যাণে প্রণাম নিবেদন করেন, আর পরাণপুত্তলি নিমাইর সংসারের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে তৃপ্তির হাসি হাসেন।

আর কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া? তাঁহার জীবনে আজ উথলিয়া উঠিয়াছে স্বর্গের অমৃত-

যায়। এমন স্বামী-সৌভাগ্য এই নবদ্বীপে আর কাহার আছে ? পরমরমণীয় রূপ নিমাইর, অসামান্য তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য। এমন স্বামীর সোহাগিনী তিনি।

যুবক নিমাইর জীবনেও আসিয়াছে প্রতিষ্ঠা আর সুখৈশ্বর্যের জোয়ার। অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও প্রতিভায় তিনি অধিকারী। মহানন্দে পাণ্ডিত্যের দর্প ও বিলাস নিয়াই অধ্যাপক ও পড়ুয়াসমাজে তাঁহার দিন কাটে। কেহ তাঁহাকে বলে—উদ্ধত, কেহ বলে—লোকোত্তর শক্তির অধিকারী মহাভাগ্যবান্ পুরুষ।

গৃহজীবনেই বা নিমাই পণ্ডিতের মতো এমন ভাগ্যবান্ কয়জন ? এমন কল্যাণময়ী জননীর স্নেহচ্ছায়া কে কোথায় পায় ? আর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া ? দেহে তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্যের ঐশ্বর্য, অন্তরে সদা টলমল করিতেছে স্বামীপ্রেমের মধুর রস।

অধ্যাপক জীবনের সাফল্য ; আর গৃহী জীবনের মাধুর্যে নিমাইর মতো আর কাহার জীবন এমন ভরপুর ?

আনন্দ-মদির এই জীবন কিন্তু কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ একদিন বিপর্যস্ত হইয়া যায়। আর এ বিপর্যয় আসে নিমাইর অলৌকিক ভাবমত্তার মধ্য দিয়া—দমকা হাওয়ার মতো।

গয়াধামে পৌঁছিবার পরই জীবনের পুরাতন নির্মোক কখন যেন কি করিয়া খসিয়া পড়িল। বাহির হইয়া আসিল নূতন রূপে, নূতন ভাবময়তার মধ্য দিয়া, এক নূতন মানুষ। কৃষ্ণ-অনুরাগের অঞ্জন কে যেন তাঁহার দুই চোখে পরাইয়া দিয়াছে। সংসারের সমস্ত কিছু রঙ-রসও আজ তাই বদলাইয়া গিয়াছে।

মিশ্রগৃহের সুখনীড়ে পূর্বের সে নিমাই আর ফিরিয়া আসে নাই। সে তেজোদৃপ্ত অধ্যাপক আজ কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সেই মাতৃভক্ত পুত্র—প্রেম-গদ্গদ সেই স্বামী আর নাই। নিমাই ফিরিয়াছেন কৃষ্ণবিরহবিধুর, মহাপ্রেমিক এক সাধকরূপে।

ভক্তি-প্রেমের এ সাধনা সেদিন তাঁহাকে ভক্ত মানবের হৃদয়েশ্বর করিয়া তুলে। অধ্যাপক বৃত্তি ও বিদ্যাবৈভব ত্যাগ করিয়া তিনি হন প্রেমের কাঙাল। সর্বজীবের বিরহবেদনা, দৈন্য ও আর্তি তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাঁহার বুকে। শচীমায়ের দুলাল রূপান্তরিত হন অগণিত মানবহৃদয়ের আনন্দধন রূপে। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণকান্ত হইয়া উঠেন লক্ষ জীবের প্রাণেশ্বর—প্রেমের ঠাকুর।

গয়াধামে নিমাইর সম্মুখে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সেদিন নিত্যানন্দ আকস্মিকভাবেই আবির্ভূত হন। ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করিয়া আবার তেমনি আকস্মিকভাবে এই পরমভাগবত সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইয়া যান। আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই।

যে নাম-মন্ত্রটি সেদিন এই ভক্তিসিদ্ধ মহাবৈষ্ণব নিমাইর কানে ঢালিয়া দেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। বিদ্যা অভিমানের কঠিন আবরণটি মুহূর্তে টুটিয়া যায়। কৃষ্ণ মিলনের পিয়াসে, বিরহের দুঃসহ দহনজ্বালায় তিনি হন অধীর উদ্বেল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হন, আর নয়নের জলে বয়ান ভিজিয়া যায়। সর্ব অঙ্গে ফুটিয়া উঠে অশ্রুকম্প-পুলক চিহ্নিত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেদিনকার আশীর্বাদ ছিল অমোঘ। ইহার ফল ফলিতে দেরি হয় নাই। যুগযুগান্তের ধ্যানের বিগ্রহ, প্রাণের ইষ্টকে নিমাই তাঁহার কৃপায় দর্শন করেন। 'নব কিশোর নটবর মুরলীর মনোহর' রূপে প্রাণপ্রভু কৃষ্ণ হন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত।

এ ভুবনভোলানো রূপ, এ রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য তরঙ্গায়িত হয় তাঁহার সর্বসত্তায়। এ তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসিয়া চলেন!

এ রূপ, এ মাধুর্য তাঁহাকে পাগল করিয়া দেয়, আবার হঠাৎ আত্মগোপন করে? কোথায়, কি করিয়া, প্রেমময়ের দর্শন মিলিবে? বিরহে নিমাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। অধীর হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন, 'কৃষ্ণরে, বাপরে! আমার প্রাণমন চুরি ক'রে নিয়ে কোথায় তুমি লুকিয়ে রইলে! প্রাণের ঈশ্বর! এসো এসো কৃপা ক'রে তেমনিভাবে আবার আমায় দেখা দাও।'

সঙ্গীরা সকলে মিলিয়া বার বার প্রবোধ দিতে থাকেন। কিন্তু কে তাহাতে কান দেয়? কৃষ্ণবিরহের আগুন দাউদাউ করিয়া সর্বসত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কে তাহা নিভাইবে?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিমাই বলেন, "ভাইরে, তোমরা সবাই ফিরে চলে যাও। আমি আর নবদ্বীপে যাবো না। আমার প্রাণ-সর্বস্ব কৃষ্ণকে কোথায় পাবো, তাই বলে দাও। আমার হৃদয়-বৃন্দাবন ছেড়ে তিনি কি মথুরায় চলে গিয়েছেন? তাহলে আজ মথুরার পথেই আমি পা বাড়াবো। তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, এ দুঃসহ জ্বালা কেউ বুঝবে না।"

বহু সান্ত্বনা, বহু অনুনয়-বিনয়ের পর কোনোমতে তাঁহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনা হইল।

সর্বত্র রটিয়া গেল, পাণ্ডিত্যগৌরবে উদ্ধত সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই। গয়াধামে গিয়া তাঁহার এক অপূর্ব রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। নিমাই আজ বৈষ্ণবীয় দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ—এক পরম ভাগবত। প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের বিরহে সদাই তিনি মুহ্যমান। আর্তি দেখিয়া নয়ন জল রোধ করা যায় না।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের মধ্যে মহা উৎসাহের সঞ্চার হইল। অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী এই নিমাই পণ্ডিত। এবার ভক্তি-ধর্মে তাঁহার মতি হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অসামান্য ভক্তি ও প্রেমাবেশ দেখা যাইতেছে তাঁহার মধ্যে। ভক্তসমাজের কাছে এ বড় আনন্দের কথা, বড় আশার কথা।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁহার গয়াধামের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে উৎসুক হইয়াছেন। নিজের মনের দুঃখ বর্ণনার জন্য, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য নিমাইও কম ব্যস্ত নন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সকলে একদিন তাই মিলিত হইলেন।

কিন্তু কথা বলিবার মতো মনের অবস্থা নিমাইর কই? তাছাড়া পরিচিত ভক্তিমান্ বন্ধুদের দর্শনমাত্রেই তিনি উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন, কৃষ্ণবিরহের শোক উথলিয়া উঠিল।

ভাগবত হইতে শ্লোকরাশি উচ্চারণ করিয়া অধীরভাবে কেবলই তিনি কাঁদিতে থাকেন। ক্রমে তীব্র প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কনককান্তি দেহটি কখনো ধুলায় আছড়িয়া পড়িতেছে—কখনো বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি হইতেছেন মূর্ছিত।

"আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই?" বলিয়া নিমাই হঠাৎ একবার প্রচণ্ড বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহের স্তম্ভটিকে সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন, মড়্‌মড়্‌ শব্দে উহা ভাঙিয়া পড়িল। তারপর শুরু হইল, 'হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহার মর্মভেদী বিলাপ। এ বিলাপ ও প্রেমবিকারের চিহ্নসমূহ দেখিয়া বন্ধুরা তো হতবাক্।

সকলে ভাবিতেছেন, এ যে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে এ যে পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু! উচ্চকোটির সাধক ছাড়া এ প্রেম লাভের সৌভাগ্য তো কাহারো হয় না। ভাগবতে যে সব অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, সুদীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধ ভক্তদেহে যাহা প্রকটিত হয়, নিমাই পণ্ডিতের দেহে হঠাৎ সে-সব লক্ষণ কি করিয়া দেখা দিল? এ যে সত্যই এক অভাবনীয় কাণ্ড।

মুরারি, সদাশিব, দামোদর প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণ নিমাইর মুখে তাঁহার পরিবর্তনের কথা, অপ্রত্যাশিত অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে আসিয়াছেন। সকল কথা শুনিয়া ও এই অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, গয়াধামে নিমাইর ইষ্ট দর্শন হইয়াছে। পূর্ব জীবনের সঞ্চিত পুণ্যপ্রবাহ ঐশ নির্দেশে হঠাৎ সেদিন তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে—আর তাহা নামিয়াছে বন্যার বেগে। এ বেগ দুর্দমনীয় অফুরন্ত।

বিস্ময়ে ও আনন্দে সকলে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের কোন্ নিগূঢ় ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে কে জানে? শক্তিধর নিমাই কি তবে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ? ভারতে ভক্তিধর্ম আজ স্তিমিতপ্রায়। তাহারই পুনরুজ্জীবনের বার্তা নিয়া কি আজ সে আবির্ভূত।

নিমাই কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভাই গদাধর, তোমরা ধন্য, আগে থেকে কৃষ্ণভজন ক'রে আসছো। আমার এ জীবন কেটে গেল বৃথা কাজে। যদিও বা ভাগ্য-বলে গয়ায় গিয়ে কৃষ্ণের দেখা পেলাম, তাও আবার ফেল্‌লাম হারিয়ে। তোমরা আমায় বলে দাও, কোথায় গেলে আমার প্রাণপ্রভুকে পাবো।"

কৃষ্ণবিরহবিধুর নিমাই বাণবিদ্ধ পাখির মতো ছটফট্ করিতেছেন। সঙ্গীরা সবাই তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান। এ অমানুষী ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত।

নানাভাবে প্রবোধ দিবার পর নিমাই কিছুটা শান্ত হইলেন, তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

টোলের অধ্যাপনা দুই তিন মাস যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। নিমাই এবার তাই ছাত্রদের পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু আগের সে উৎসাহ উদ্দীপনা কোথায়? তেজোদৃপ্ত অধ্যাপক আজ হইয়াছেন এক দীনাতিদীন ভক্ত। কৃষ্ণদর্শনের ব্যাকুলতায় তিনি অধীর।

পাঠ গ্রহণের জন্য ছাত্রদের দল সাগ্রহে তাঁকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কিন্তু পড়াইবে কে? ব্যাকরণগ্রন্থ খোলা অবস্থায় একপাশে পড়িয়া থাকে। নিমাই ভাবাবেশে মুহ্যমান হয়। অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। মুখে কেবলই উচ্চারণ করিতে থাকেন ভাগবতের শ্লোক আর কৃষ্ণকথা। আয়ত নয়ন দুইটি বহিয়া দরদরধারে কৃষ্ণবিরহের অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে।

বহুক্ষণ পর আবার কখনো তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে। শিষ্যদের বলিতে থাকেন, "ভাইসব, পড়ানোর কাজ এখন থেকে আর আমায় দিয়ে হবে না। গ্রন্থ খুলে বসলে পাঠ বা ব্যাখ্যার দিকে মন যায় না। যাবেই বা কি ক'রে? নয়ন মেলতে না মেলতেই দেখি কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু, হাতে তাঁর মোহন বাঁশী, মাথায় শিখিপুচ্ছ চূড়া, গলায় বনমালা। মধুর হাসিতে তাঁর চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। সুস্মিত হাসি হেসে সে মুরলী বাজায়, আর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। তখন আমাতে আর আমি থাকিনে। তোমরা এবার আমায় বিদায় দাও। প্রাণভরে আমি আশীর্বাদ করছি, তোমাদের সবার কৃষ্ণভক্তি হোক্।"

অতঃপর প্রিয় ছাত্রদের নিয়া নিমাই পরম আনন্দে নামকীর্তন শুরু করিয়া দেন। করতালি দিয়া সকলকে গাওয়ান—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

সারা অন্তর ভাবাবেশে উদ্বেল! সুগৌর সুঠাম দেহটি ভূতলে পড়িয়া লুটাইতে থাকে। নয়নের নীরে বসন ভিজিয়া যায়। বাহ্যজ্ঞান মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসিলে কি হয়, অচিরেই আবার দেখা দেয় দিব্যোন্মাদের দশা। পুঁথিতে ডোর দিয়া ছাত্ররা দিনের পর দিন ঘরে ফিরিয়া যায়। পণ্ডিতের অধ্যাপনার পাট তাই উঠিয়া গেল।

কৃষ্ণপ্রেমে নিমাই অধীর—উন্মত্ত। শচীদেবী ইহার কিছুই বুঝেন না। ভাবিয়া অস্থির হন, কবে তাহার এ অপ্রকৃতিস্থ ভাব কাটিবে? মায়ের মনঃকষ্ট ও দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।

পতিগতপ্রাণা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াও ভাবিয়া কূল পান না। অজানা আশঙ্কায় বুক কেবলই দুরদুর করিয়া উঠে। স্বামীর এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন! গয়ায় যাইবার আগে তো এমনটি ছিলেন না। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া এ যে একেবারে উন্মাদের অবস্থা।

শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত মিশ্র পরিবারের বড় ঘনিষ্ঠতা। এই প্রবীণ বৈষ্ণবকে শচীদেবী খুব শ্রদ্ধা করেন। নিমাইর অদ্ভুত ভাবান্তর ও ভক্তি উচ্ছ্বাসের কথা শ্রীবাসকে জানানো হইয়াছে। একদিন তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

কাছে বসিয়া, সমস্ত কিছু দেখিয়া শুনিয়া, শ্রীবাসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অভূতপূর্ব কৃষ্ণপ্রেম নিমাইর মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে! উচ্চকোটি ভক্তসাধকদের মধ্যেও যে এ বস্তু দুর্লভ। জন্মান্তরের পুণ্য ছাড়া এ মহারূপান্তর তো সম্ভব নয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে শচীদেবী শ্রীবাসকে কহেন, "পণ্ডিত, স্বামী আর বড় ছেলের অভাবে নিমাইকে নিয়েই কোনোমতে বেঁচেছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্টে একি হলো? শেষকালে সে কি পাগল হয়ে যাবে?"

শ্রীবাস হাসিয়া উত্তর দেন, "না গো—না এমন পাগল হওয়া তো সৌভাগ্যের কথা। এ সৌভাগ্যের এককণা পেলেও যে আমি বেঁচে যেতাম। তুমি বৃথা ভেবে মরছো। এ বায়ুরোগ নয়—মহাভক্তির আবেশ দেখা দিয়েছে তোমার নিমাইর দেহে।"

নিমাইর গৃহে এবার নাম-কীর্তন শুরু হইয়া গেল। নবদ্বীপে ক্ষুদ্র একটি বৈষ্ণব-গোষ্ঠী রহিয়াছে বটে, কিন্তু জনসমাজে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন কিছু নাই। নিমাই পণ্ডিতের মতো তেজস্বী ও প্রতিভাধর পুরুষ আজ কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইয়াছে, ভক্তসমাজের কাছে এ বড় শুভ সংবাদ। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি নিমাইর গৃহে আসিয়া জড়ো হইতে থাকেন। খোল, করতাল, মন্দিরা বাদ্যসহ তুমুল নৃত্য কীর্তন শুরু হইয়া যায়।

অল্পকাল মধ্যে শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনের এ আসর স্থানান্তরিত হয়। বিশিষ্ট বৈষ্ণব-গণ একে একে উহাতে যোগ দিতে থাকেন।

তখনকার দিনে বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নেতৃস্থানীয়। জ্ঞান ও ভক্তিরসের অপূর্ব মিশ্রণ এই প্রবীণ আচার্যের সাধনজীবনে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র পুরীর ইনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য। গীতা ও ভাগবতের ভক্তিরসাত্মক ব্যাখ্যায় অদ্বৈতের তুল্য তখন আর কাহাকেও দেখা যায় না। সমসাময়িক কালের বহু ভক্ত এই বৈষ্ণব মহা-

পুরুষের আশ্রয় ও সাহায্য পাইয়া কৃতকৃতার্থ। ভক্তপ্রবর যবন হরিদাসও ছিলেন ইঁহাদের অন্যতম।

আদি নিবাস শ্রীহট্টে হলেও অদ্বৈত স্থায়িভাবে তখন শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। নবদ্বীপেও তাঁহার একটি বাড়ি রহিয়াছে, এখানে তিনি মাঝে মাঝে অবস্থান করেন। বন্ধুবর গদাধরকে সঙ্গে নিয়া নিমাই একদিন অদ্বৈতের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

আচার্য তখন তুলসীমঞ্চের সম্মুখে বসিয়া পূজাপাঠ সারিতেছেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র প্রেমতরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিল। দিব্য ভাবাবেশে নিমাই সংবিৎহারা হইয়া ভূতলে পড়িলেন। সর্বদেহে ফুটিয়া উঠিল সাত্ত্বিক বিকারের নানা দুর্লভ চিহ্ন।

এ দৃশ্য দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ অমানুষী প্রেম কি কখনো মানুষে সম্ভব? ভাগবতে যে প্রেম-বিকারের বর্ণনা আছে, তাহাই যে এই দেবদুর্লভকান্তি তরুণের সারা দেহে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন, আচার্য ভগবৎ-চরণে তাঁহার আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তুলসীচন্দন নিবেদন করিয়া কত কাঁদিয়াছেন, "প্রভু, তোমার সৃষ্ট পৃথিবীতে আজ ভক্তি নেই, প্রেম নেই। জীবনের স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়াছে কলুষ আর ক্লেদ। তুমি এসো, তোমার কৃপার ধারায় সব শুচি স্নিগ্ধ ক'রে তোল। জীবের উদ্ধার সাধন করো।" আজ কি তাঁহার সেই প্রার্থনারই উত্তর আসিয়া গিয়াছে?

এ কোন্ ভাগবতী-তনু তাঁহার নয়নসমক্ষে আবির্ভূত? অমরার লাবণ্য ছানিয়া রচিত এই তনু, আয়ত নয়নযুগলে অবিরাম বহিতেছে প্রেম-যমুনার ধারা। আর্তি ও ক্রন্দনে কঠিন পাষাণও বিগলিত হয়—পাষাণ-হৃদয় তো কোন্ ছার!

অদ্বৈত আচার্যের অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে আজ বার বার ডাকিয়া কহিতেছে, "ওগো, এই যে তোমার বহুপ্রার্থিত প্রেমঘন বিগ্রহ। নিখিল মানবের আর্তি বুকে নিয়া কৃষ্ণবিরহের কান্না দুই চোখে পুরিয়া আজ ইঁহার আবির্ভাব!"

বৃদ্ধ আচার্য আনন্দাবেশে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। নিমাইর মধ্যে কোন্ অলৌকিক বস্তু তিনি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার সংবিৎহীন দেহের সম্মুখে বসিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তিনি পূজা করিলেন।

অদ্বৈতের সেদিনকার এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজে নিমাইর এক অপূর্ব মর্যাদা আনিয়া দিল। প্রেম-ভক্তিধর্মের নেতারূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন।

এবার তিনি হইলেন ভক্তজনের হৃদয়প্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ, আর প্রেমিক সাধকের—গৌরসুন্দর!

শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরাঙ্গের অপূর্ব অন্তরঙ্গ প্রেমলীলা, আর কীর্তনবিলাস এবার হইতে শুরু হইল।

কখনো দেখা যায় তাঁহাকে এক মহাভক্তরূপে। অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাছে হৃদয় উঘারিয়া তিনি মনোবেদনা জানাইতেছেন—বুকফাটা আর্তনাদ শুনিয়া সকলে কাঁদিতে শুরু করিয়াছে। আবার কখনো বা অপরূপ দিব্য চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ—অলৌকিক ভাবৈশ্বর্য ও ভগবত্তার প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। চুম্বক যেমন লৌহকণাসমূহ অবলীলায় আকর্ষণ করে, তেমনি গৌরাঙ্গ একের পর এক তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে টানিয়া আনিতেছেন। এখন তিনি আর শুধু প্রেমভক্তিরসের উচ্ছল সাধকমাত্র নহেন—

এখন তিনি শত শত ভক্ত-হৃদয়ের অধীশ্বর, বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নিয়ামক। এখন তিনি 'প্রভু'।

নবদ্বীপের এই প্রেমলীলা ও কীর্তন-বিলাসে কিন্তু এক বৎসরের বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু এ অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রেমধর্মের বিরাট এক সংগঠন তিনি নিপুণভাবে গড়িয়া তুলিলেন। এই সঙ্গে আনিলেন মধুর ভজন, রাগানুগা সাধন আর নামকীর্তনের অপূর্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

চিহ্নিত ভক্তদল একে একে নিমাইর চরণতলে উপস্থিত হইতেছেন। কেউ কেউ পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত সহজ সখ্য ও প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার নূতনও অনেকে আসিয়া জুটিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহারা নিমাইকে প্রভু বলিয়া ডাকিলেন, আকুল আগ্রহে তাঁহার ভক্তিগঙ্গার প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গৌরাঙ্গের ভুবনমোহন মূর্তি আর ভুবনমঙ্গল নামকীর্তনের আকর্ষণ বড় প্রবল, বড় অমোঘ। সবার অলক্ষ্যে অন্তরঙ্গ ভক্তদল শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া জুটিতেছেন। মহাপ্রেমিক মহাশক্তিধর প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে এক বিরাট ভাগবতগোষ্ঠী—সূচনা করিতেছে এক নবযুগের অভ্যুদয়।

কোথায় গৌরাঙ্গের এ বিস্ময়কর শক্তির উৎস? যোগৈশ্বর্য তিনি প্রকটিত করেন না। শাস্ত্ররচনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যানও তাঁহাকে করিতে দেখা যায় না। তবে মানুষ কোন্ আকর্ষণে দলে দলে ছুটিয়া আসে? নিমাইর শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাঁহার সর্বহৃদয় আকর্ষণকারী, সর্বহৃদয় দ্রবকারী প্রেমের মধ্যে। এ প্রেম অলৌকিক ও সর্বাতিশায়ী, এ প্রেম মহাভাবময়ী।

দেবদুর্লভ নিমাইর অঙ্গের লাবণি, ভুবনভোলানো, হৃদয়গলানো তাঁহার রূপ। এ রূপ দেখাইয়া মানুষকে তিনি আকর্ষণ করেন। দলে দলে তাহারা ছুটিয়া আসে। ছুটিয়া আসিয়া প্রেমময় প্রভুর প্রেমের ফাঁদে পড়ে। তাঁহার কৃষ্ণবিরহের কথা শুনিয়া হৃদয় নিঙড়ানো কাঁদন শুনিয়া তাহারা কাঁদে। তারপর চিরতরে তাঁহার চরণতলে দেহমন-প্রাণ বিকাইয়া দেয়। 'প্রভু' হইয়া উঠেন তাঁহাদের ধ্যানের বস্তু, প্রেমের পুত্তলি, তাঁহাদের জীবনসর্বস্ব।

কৃষ্ণপ্রেমরসে গৌরাঙ্গ থাকেন সদা ভাসমান। আর্তি, ক্রন্দন ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া দিবারাত্রি তাঁহার কোথা দিয়া যেন কাটিয়া যায়। কখনো থাকেন মূর্ছিত, কখনো বা অর্ধ বাহ্যাবস্থায়। কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয়, এ ভাবোন্মত্ততার ভিতর একদিনের তরেও আপন লীলাসঙ্গী নির্বাচনের বেলায় একটুও তাঁহার ভুল হয় নাই। এ কাজে সর্বদা দেখা গিয়াছে তাঁহার বিস্ময়কর দক্ষতা, আর প্রয়োজনমতো সর্বত্র স্ফুরিত হইয়াছে তাঁহার অলৌকিক শক্তি।

অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় প্রভৃতি একে একে পূর্বেই আসিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস প্রভৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নিতেও প্রভুর দেরি হয় নাই। এবার তিনি প্রতীক্ষমান রহিয়াছেন তাঁহার প্রধানতম পার্ষদ ও প্রতিনিধি নিত্যানন্দের জন্য।

শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন সমাপন করিয়া প্রভু সেদিন ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সবাই শোন। এই উচ্চকোটির মহাপুরুষ

সদ্য পদার্পণ করেছেন নবদ্বীপে। নিজ ইচ্ছায় তিনি আত্মগোপন ক'রে আছেন। তোমরা ভাল করে তাঁর সন্ধান করো। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রাণ আমার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

ভক্তগণ মহাবিপদে পড়িলেন। নবাগত মহাপুরুষটি এত লোকের ভিতর কোথায় আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন কে জানে? জনবহুল নবদ্বীপে তাঁহার সন্ধান পাওয়া সহজ কথা নয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

প্রভু এবার নিজেই পার্ষদদের নিঃ। শহরের পথে বাহির হইলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সোজা নন্দন আচার্যের গৃহে গিয়া তিনি উপস্থিত। সবাই সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্রকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত সেখানে উপবিষ্ট। প্রভু ভক্তগণসহ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উভয়ে উভয়ের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। কাহারো মুখে একটিও কথা নাই। গৌরাঙ্গ মনে মনে ঠিক করিলেন, অবধূতের হৃদয়ের অর্গলটি কৌশলে তিনি খুলিয়া দিবেন, আর সবাইকে দেখাইবেন এক অপূর্ব রঙ্গ। তাই শ্রীবাসকে তিনি ভাগবত হইতে পড়িতে কহিলেন একটি ভক্তি-রসাত্মক শ্লোক।

শ্লোকটি পড়া হইবামাত্র দেখা গেল এক চমকপ্রদ দৃশ্য! দুর্বার প্রেমতরঙ্গে অবধূত কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়াছেন। দুই নয়নে অবিরল ঝরিতেছে পুলকাশ্রু ধারা। সর্বদেহে সাত্ত্বিক বিকারের অপূর্ব চিহ্ন। তারপর গৌরসুন্দর তাঁহার দেহে হস্তটি স্পর্শ করামাত্র তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

অতঃপর ভক্তদের কাছে এ মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীর পরিচয় আর গোপন রহিল না। তাঁহারা জানিলেন, ইনিই প্রভুর বহুপ্রতীক্ষিত মহাপুরুষ—নিত্যানন্দ অবধূত।

সকলে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন, প্রভুর দর্শন স্পর্শনের মধ্যে এ কি দিব্য শক্তির ইন্দ্রজাল?

সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের প্রেমবন্ধনে চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন। সর্বত্যাগী নিরাসক্ত অবধূত সেদিন হইতে হইলেন প্রভুর প্রেম-ভক্তি-ধনের ভাণ্ডারী। নূতনতর কর্মযুগে তাঁহাকে নামিতে হইল। এখন তিনি হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ।

দূর-দূরান্ত হইতে একের পর এক ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। ভক্তিধর্মের জগতে ইহারা যেন এক একটি দিক্‌পাল। কিন্তু কোন সূত্রে কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে ইহারা আসেন তাহা কে বলিবে? তাছাড়া এই ভক্তদের চিনিবার সামর্থ্যই বা রাখে কয়জন?

প্রভুর কাছে কিন্তু তাঁহার এই চিহ্নিত পার্ষদদের আগমন রহস্য মোটেই অজানা নয়। ইঁহাদের আগমনের জন্যই যে তিনি হৃদয়ভরা উৎকণ্ঠা নিয়া প্রতীক্ষমাণ রহিয়াছেন। নির্দিষ্ট লগ্নটি উপস্থিত হইলেই আর তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারেন না।

'পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক,' বলিয়া গৌরসুন্দর সেদিন কাঁদিয়া আকুল। বার বার বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতেছেন, "বাপ্ পুণ্ডরীকে, তোমার বিহনে বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে, তবুও তোমার দেখা নেই! কি নিষ্ঠুর তুমি বলতো! এসো বাপ, শিগ্‌গীর এসে আমার তাপিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াও।

ভক্তদের কেহই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না। কে এই পুণ্ডরীক? এ কোন্ মহাভাগ্যবান্ ভক্ত যাঁহার বিরহে প্রভু এমন করিয়া কাঁদিতেছেন? নামটি কেহ শুনিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না।

প্রভুকে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক মহাভক্ত। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক। চালচলনেরও বেশ রাজসিকতা রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষয়-বিরক্ত এক মহাবৈষ্ণব। অনেকেই সহসা এ প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম নন।

প্রভু কিন্তু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলই বলিয়া চলিয়াছেন, "ওগো তোমরা সবাই বাপ্ পুণ্ডরীককে এখনি আমার কাছে এনে দাও, আমার প্রাণ শীতল করো।"

শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ ভীত হইয়া কেবলি একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতেছে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে কবে আসিয়াছেন, কোথায় আছেন কেহ জানেন না। সকলে ভাবিয়া পাইতেছেন না, কি করিয়া প্রভুকে শান্ত করা যাইবে।

যোগাযোগ অচিরেই ঘটিয়া গেল। ভক্ত মুকুন্দ সেদিন প্রভুর সভায় আসেন নাই। তিনি চাটগাঁয়ের লোক, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়াছেন। মুকুন্দ ভাবিলেন, এ অতি উত্তম সুযোগ এ মহাবৈষ্ণবকে তিনি প্রভুর কাছে উপস্থিত করিবেন।

মুকুন্দের সহিত গদাধরের বড়ই অন্তরঙ্গ। সেদিন পথিমধ্যে তিনিও সঙ্গ নিলেন। কথাপ্রসঙ্গে এ মহাপুরুষের নানা মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।—ভক্তি-সাধনার ইনি মূর্ত বিগ্রহ, গঙ্গায় পাদস্পর্শ ঘটিবার ভয়ে গঙ্গাস্নানও নাকি কখনো করেন না। এই মহাপুরুষটির দর্শন লাভের জন্য গদাধর উৎকণ্ঠিত।

বিদ্যানিধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিন্তু বড় হতাশ হইতে হইল। যে বেশে, যে ভঙ্গীতে তিনি বসিয়া আছেন তাহাতে প্রকৃত ভক্ত বা বৈরাগ্যবান্ সাধক বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

চেহারাটি দেখিতে রাজপুত্রের মতো। সুদৃশ্য এক পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। মাথার উপর কারুকার্যময় চন্দ্রাতপ। পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ। সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসে ঘরটি ভরপুর। রূপার পানের বাটা হইতে মাঝে মাঝে দুই এক খিলি পান মুখে পুরিতেছেন আর গল্প করিতেছেন, কয়েকটি ভৃত্য ময়ূর পুচ্ছের পাখা নিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে ব্যস্ত।

গদাধর চিরদিনই বড় বিষয়বিমুখ ও বৈরাগ নিষ্ঠ। ভাবিতেছেন, এ আবার কাহাকে তিনি দেখিতে আসিলেন? এ যে এক মহাবিলাসী ব্যক্তি। বৈষ্ণব মহাপুরুষ দেখিতে আসিয়া তাঁহার খুব শিক্ষা হইয়াছে, এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতে পারিলে বাঁচা যায়।

মুকুন্দ কিন্তু এতক্ষণ বন্ধুবর গদাধরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। ভাবিলেন আর নয়, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রকৃত স্বরূপটি ভক্তপ্রবর গদাধরকে এবার দেখাইতে হইবে। কথাপ্রসঙ্গে ভাগবত হইতে তিনি কৃষ্ণের মহিমাব্যঞ্জক একটি মধুর শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

মুহূর্তমধ্যে গৃহমধ্যে যেন এক মহাবিপ্লব ঘটিয়া গেল! পুণ্ডরীকের দেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল অপূর্ব সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। পালঙ্ক হইতে ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া তিনি মূর্ছিত হইলেন। পদাঘাতে মূল্যবান তৈজসপত্র, তাম্বুলাধার প্রভৃতি চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। পরিধানের জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন, কেশপাশ আলুথালু। সেই বিলাসী মানুষটিকে আর চিনিবার উপায় নাই।

বাহ্যজ্ঞান লাভের পর পুণ্ডরীক করুণ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন, "পরাণ প্রভু আমার, কবে আমার উদ্ধার করবে? আমার প্রাণ যে কাঠের মতো কঠিন, ভক্তির লেশমাত্র নেই তাতে। তোমার কৃপা আমি কবে পাবো তাই আমায় বলে দাও।"

প্রেমোন্মাদের এ করুণ দৃশ্য দেখিয়া গদাধর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। মনে বড় অনুশোচনা হইল, এই আত্মগোপনকারী মহাপুরুষকে এতক্ষণ অবজ্ঞা করিয়া তিনি মোটেই ভাল করেন নাই। বৈষ্ণবাপরাধের কথা ভাবিয়া বেশ কিছুটা ভয়ও পাইলেন। ঠিক করিলেন, ইঁহার নিকট হইতেই তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, তাহাতে যদিবা অপরাধের কিছুটা খণ্ডন হয়।

সেই রাত্রিতেই শ্রীবাস-অঙ্গনে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৌরসুন্দরকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রভুর সকাশে সাশ্রুনয়নে গলবস্ত্র হইয়া তিনি আসিয়াছেন। পরিধানে এবার তাঁহার দীনহীনের মলিন বেশ। চরণতলে পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, সবাইকে যেমন উদ্ধার করছো তেমনি আমাকেও করো উদ্ধার। আর আমায় তুমি এমন ক'রে দূরে সরিয়ে রেখো না, বঞ্চনা ক'রো না।

প্রেমাপ্লুত প্রভুও অঝোর ধারে কাঁদিতেছেন, আর বার বার কহিতেছেন, "পুণ্ডরীক বাপ আমার। এবার তোমায় পেয়ে হৃদয় শান্ত হলো, আমি যে পুনর্জীবন পেলাম।"

এ প্রেমলীলা দেখিয়া ভক্তদের আনন্দের অবধি রহিল না।

প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভু কহিলেন, "কৃষ্ণের আজ আমার ওপর বড় কৃপা। পুণ্ডরীক বাপকে আমার কাছে এনে দিয়ে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করলেন। তোমরা সবাই কিন্তু জেনে রেখো, আজ হতে এঁর পদবী বিদ্যানিধি নয়—প্রেমনিধি। প্রেমভক্তির নিগূঢ় সাধন বিলাবার জন্যই কৃষ্ণ এঁকে গড়েছেন।"

প্রভুর প্রিয় পার্ষদ গদাধর কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীবাস অঙ্গনে রোজই চলিতেছে প্রেমনাট্যের নব নব দৃশ্যের উদ্ঘাটন। দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর নানা লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে। সর্ব ভাবের ভাবুক তিনি, সর্ব রসে তিনি রসময়। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস তাঁহার এসময়কার অবস্থাটির বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন ॥
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥
ক্ষণে হয় সানুভাব দম্ভ করি বৈসে।
মুঁই সেই মুঁই সেই ইহা বলি হাসে ॥

প্রায়ই তিনি থাকেন ভক্তি আর প্রেমের রসে বিভোর। ভক্তের দৈন্য ও আর্তির যেন তিনি মূর্ত বিগ্রহ। আবার এক এক দিন তাঁহার মধ্যে দেখা যায় বিস্ময়কর ঈশ্বরীয় আবেশ। দৃপ্ত তেজে, প্রমত্ত ভঙ্গীতে শ্রীবাসগৃহের বিষ্ণুখট্টায় অবলীলায় বসিয়া পড়েন। ভগবত্তার ভাবটি এ সময়ে প্রকট হইয়া উঠে, বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রভুর অলৌকিক ও ঐশ্বর্যময়

রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে রহিয়াছেন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, হরিদাস ইত্যাদি।

প্রভু প্রায়ই আবেশগ্রস্ত হন, ভগবত্তা-ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, আবার বাহ্যজ্ঞান পাইলেই শুরু হয় তাঁহার দাস্যভাব ক্রন্দন।

একদিন কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সেদিন আর শুধু আবেশ নয়, সজ্ঞানে স্বচ্ছন্দে শ্রীবাস পণ্ডিতের পূজিত বিষ্ণুবিগ্রহের খট্টায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। সম্মুখে ভক্তদের কীর্তন ও নর্তন চলিতেছে, আর তিনি মহিমোজ্জ্বল মূর্তিতে উপবিষ্ট হইয়া প্রসন্নমধুর হাসি হাসিতেছেন। ভগবান্ জ্ঞানে ভক্তগণ সেদিন তাঁহার অভিষেক স্নান সম্পন্ন করাইলেন, পূজা করিয়া ধন্য হইলেন।

দিব্য ঐশ্বর্যের প্রকাশ সেদিন গৌরসুন্দরের মধ্যে ঘটিয়াছে, তিনি একেবারে কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। স্বেচ্ছামতো কত করুণা, কত বিভূতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সেদিন স্বর্গীয় আনন্দের বন্যা উৎসারিত। বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন, প্রভুর এ অলৌকিক ভাবটি সাত প্রহর ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল।

এই ঐশ্বরীয় আবেশের মধ্যে গৌরাঙ্গ সাড়ম্বরে সভা জমাইয়া বসিয়া আছেন। চারি-দিকে কৃতবিদ্য ও সার্থকনামা ভক্তগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান। হঠাৎ তিনি 'শ্রীধর শ্রীধর' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের এক অতি দরিদ্র অধিবাসী, খোলা-বেচা এই শ্রীধর। সে নাকি প্রভুর পূর্বেকার পরিচিত। কিন্তু তাহাকে এমন করিয়া আজ এত ডাকাডাকি কেন ?

করুণাভরে প্রভু কহিতে লাগিলেন, "শিগ্‌গীর আমার পরমভক্ত শ্রীধরকে তোমরা খুঁজে বার করো, এখানে ডেকে আনো। বড় দরিদ্র সে। কলার খোলা বেচে কোনো রকমে জীবন ধারণ করে—আর সদাই করে প্রাণপ্রভুর স্মরণ-মনন ; বাজারের এক নগণ্য খোলা-বিক্রয়কারী বলে লোকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিন্তু সে যে ভক্তশিরোমণি তা কেউ জানে না। যাও আমার শ্রীধরকে এখনি তোমরা নিয়ে এসো।"

ভক্তগোষ্ঠীতে সোরগোল পড়িয়া গেল। মহাভাগ্যবান্ এই শ্রীধর ! কিন্তু জনাকীর্ণ নবদ্বীপের কোথায় সে বাস করে তা কে জানে ? বহু খোঁজাখুঁজির পর তাহাকে আবিষ্কার করা গেল। ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া প্রভুর সম্মুখে হাজির করিলেন।

শ্রীধর তো বিস্ময়ে হতবাক্। সম্মুখে তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর অধীশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ—আগেকার দিনে যাঁহাকে তিনি জানিতেন নিমাই পণ্ডিত রূপে। আজ সর্বদেহে তাঁহার দিব্য লাবণ্যের ছটা, নয়নে স্বর্গের জ্যোতি বিচ্ছুরিত—শত শত পূতচরিত বৈষ্ণবের তিনি সর্বস্বধন, পরম প্রভু। সেদিনকার অধ্যাপক নিমাই আজ শুধু মহাসাধকই হন নাই, ভগবান্‌রূপে এত লোকে আজ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

ভক্তগণ কহিতেছেন, "শ্রীধর, প্রভুর তুমি এমন প্রিয়, এমন মহা-অধিকারী পুরুষ তুমি, তা কে জানতো ? এসো, এসো তোমার স্পর্শ লাভে আমাদের কিছুটা পুণ্য সঞ্চয় করতে দাও।"

কনকদণ্ডসম বাহু দুইটি প্রসারিয়া প্রভু সোৎসাহে ছুটিয়া গেলেন। প্রগাঢ় স্নেহে আলিঙ্গন দান করিয়া কহিলেন, "শ্রীধর, তুমি কি আমায় ভুলে গিয়েছো ? তোমার

কাছ থেকে কত বস্তু কেড়ে নিয়ে এসেছি। কত প্রণয়-কলহ তোমার সঙ্গে করেছি। আজকের এ আনন্দের হাটে তুমিও এসে যোগ দাও।"

ভক্ত শ্রীধরের মনে কত কথার স্মৃতি ভিড় করিয়া আসে। নবীন অধ্যাপক নিমাই বাজারে আসিয়াই তাহার উপর চড়াও হইতেন। কত কোন্দল, কত রঙ্গই না তাহাদের চলিত। নিমাই তাঁহার নিকট হইতে কিনিতেন দু'চার পয়সার থোড়, কলা, খোলা। কিন্তু ইহা নিয়া ঝগড়া আর বাগ্‌বিতণ্ডার যেন অন্ত নাই। শ্রীধর বড় দরিদ্র, কোনো-মতে কায়ক্লেশে তাহার দিনাতিপাত চলে। কিন্তু তরুণ পণ্ডিত তাহাকে সহজে ছাড়িবেন না। বিক্রয়ের জিনিসপত্র নিয়া তিনি হুড়াহুড়ি করেন, চড়া দর হাঁকিতেছে বলিয়া তাহাকে গালাগালি দেন। শ্রীধর চরম অনটনের মধ্যে বাস করে বটে, কিন্তু সত্যে চিরদিনই তাহার বড় আঁট। যে দ্রব্যের যা উচিত মূল্য তাহাই সে চায়। কিন্তু তাহা শুনে কে? নিমাই পণ্ডিত মিছামিছি কেবলই ঝগড়া বাধাইয়া বলিতে থাকেন, "তুমি অল্পদামের জিনিসের জন্য বেশী দাম চাচ্ছো, মিথ্যা ভাষণে তোমার জুড়ি নবদ্বীপে আর নেই।"

নিমাই বাজারে আসিলেই এমনি রোজ শ্রীধরকে উত্ত্যক্ত করেন। তাহার জিনিসপত্র কাড়িয়া নিয়া অর্ধেক মূল্য ছুঁড়িয়া দেন। কিন্তু কি অলৌকিক আকর্ষণ এই নবীন অধ্যাপকের। এ দুরন্তপনা এ অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁহাকে একটা কটু কথা বলা চলে না। দৈনন্দিন কলহের শেষে শ্রীধর এই চঞ্চল স্বভাব পণ্ডিতের কথাই আবার ভাবিতে বসে। হাস্যোজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানি শ্রীধরের স্মৃতিপটে বার বার উঁকি মারিয়া যায়।

সেই নিমাইর মধ্যে শ্রীধর আজ দেখিতেছেন এক অদ্ভুত রূপান্তর। দিব্য ঐশ্বর্যের এ কি অপরূপ প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, সর্বজনের জীবনপ্রভু হইয়া, এত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কৃপাময় প্রভু তাহাকে একটুও বিস্মৃত হন নাই। আপনি যাচিয়া তাহাকে প্রেম দিতেছেন।

ভাববিমুগ্ধ শ্রীধর জোড়হস্তে গৌরসুন্দরের দিকে তাকাইয়া আছে। আনন্দাশ্রু ধারায় তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত।

ভগবত্তা ভাবে প্রভু আজ উদ্দীপিত। এই মহাভক্তকে তাঁহার যেন অদেয় কিছুই নাই। প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টিখানি শ্রীধরের সর্বদেহে বুলাইয়া নিয়া কহিলেন, "শ্রীধর, তুমি আমার পরমভক্ত, পরমপ্রিয়। আজ তোমায় আমি বর দেবো। কি তোমার অভিলাষ, খুলে বল। রাজ্য চাও? রাজ্য পাবে। অষ্টসিদ্ধি চাও? আমি বলছি তাও অচিরে হবে তোমার করতলগত।"

ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীধর কহিল, "প্রভু, এবার কিন্তু আর আমায় ভাঁড়াতে পারছো না। তুমি যে পরমবস্তু তা আমার জানতে বাকী নেই। ঋদ্ধি সিদ্ধির কথা তুলে আজ আমায় বিভ্রান্ত ক'রো না।"

কিন্তু প্রভু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবেন না। বার বারই অনুরোধ করিতেছেন, "শ্রীধর, একটা কিছু বর আজ আমার কাছে তোমায় মেগে নিতেই হবে।"

সহজ প্রেমের সহজ সরণী বাহিয়া ভক্ত শ্রীধর তাহার পরমপ্রভুর চরণতলে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিধি দয়া করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন তাহার বাঞ্ছানিধি। আর

কোন্ বন্ধু তাহার চাহিবার আছে ? কিন্তু প্রভু আর তাঁহার পার্ষদদের পীড়াপীড়ি ক্রমেই বাড়িতেছে। অগত্যা শ্রীধরকে বর মাগিতেই হইল।

আঁখি দুইটি তাহার অশ্রু ছলছল। যুক্তকরে গৌরাঙ্গের ভগবদ্ভাবে বিভাবিত, জ্যোতির্মণ্ডিত আননের দিকে চাহিয়া শুধু সে নিবেদন করিল—

সে ব্রাহ্মণ কাড়িলেক মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউ তার চরণ যুগল॥

সিদ্ধি নয়, ঐশ্বর্য নয়—শুদ্ধাভক্তি, প্রভুর চরণে রতি, ইহাই দীনভক্ত শ্রীধরের একমাত্র কাম্য। প্রভুর ঐশ্বর্যময় রূপ দর্শনের অভিলাষীও সে নয়। যে লীলাচপল রূপটি নিয়া তিনি দীন শ্রীধরকে বার বার দেখা দিয়াছেন, কোন্দল ও হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়া তাহার মন কাড়িয়া লইয়াছেন, আজ সেই সহজ সুন্দর রূপটির স্মৃতিই ভক্ত শ্রীধর চিরতরে তাহার বুকে আঁকিয়া রাখিতে চায়।

ভক্তজনদের মধ্যে খোলাবেচা শ্রীধরের উদ্দেশে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল।

গৌরাঙ্গ স্থির করিলেন, তাহার প্রেমভক্তির ধর্মকে এবার তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে দিবেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে এ পরম বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এখন হইতে সব মানবের কল্যাণে ইহা বিস্তারিত হইবে।

এ প্রচারকার্যে নিজে না নামিয়া প্রভু ভার দিলেন তাঁহার দুই শ্রেষ্ঠ পার্ষদ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের উপর। ইঁহাদের চেয়ে যোগ্যতর প্রতিনিধি আর কে হইতে পারে ? উভয়েই গৌরগত প্রাণ, উভয়েই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাছাড়া—একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান।

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া প্রভু আজ্ঞা দিলেন, "আজ থেকে নবদ্বীপের সর্বত্র তোমরা কৃষ্ণনাম প্রচার করো। লোকের দোরে দোরে গিয়ে তাদের পায়ে ধরে, কৃষ্ণনাম ভিক্ষা চাও। রোজ ফিরে এসে আমায় জানাবে তোমাদের কাজের ফলাফল।"

নিত্যানন্দ ও হরিদাস পরমানন্দে নগরের পথে পথে নামকীর্তন করিয়া ফিরেন। সাধিয়া, কাঁদিয়া সর্বলোকের পায়ে পড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করান।

এ কাজ বড় সহজ নয়। কেহ শ্লেষ ব্যঙ্গোক্তি করে, কেহ বা কটুকথা বলিয়া বিদায় দেয়। আবার একদল জানায় আন্তরিক অভ্যর্থনা। ভক্তি ও প্রেমের এ সহজ পথ, এ রসের পথ তো কেহ কখনো দেখাইতে আসে নাই। অধ্যাত্মপথের এমন মাধুর্য, এমন আনন্দের কথা তো জানা ছিল না। কৃষ্ণকথা, গৌরাঙ্গকথা শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়া যায়। হরিনামের ভিখারী, দৈন্য ও আর্তি'র বিগ্রহ নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দেখিয়া কি জানি কেন, নয়নে তাহাদের অশ্রু ঝরিতে থাকে।

প্রভুর পার্ষদদ্বয় একদিন বড় সঙ্কটে পড়িলেন! দুইজনে সোল্লাসে নামগান করিতে করিতে চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, অদূরে যমদূতের মতো দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। শুনিলেন, ইঁহারা দুইটি সহোদর ভাই—জগন্নাথ ও মাধব। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, পাপানুষ্ঠানের দিক দিয়া ইহাদের জুড়ি নবদ্বীপে নাই। লুণ্ঠন ও নরহত্যায় দুজনে

দিক্‌হস্ত, হরিনাম কৃষ্ণনাম শুনিলেই ছুটিয়া মারিতে আসে। মদের নেশায় চুর হইয়া দুই ভাই সেদিন পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে।

নিতাই মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, এ দুই পাষণ্ড প্রধানকে হরিনাম নেওয়াতেই হইবে। এবার সম্মুখে গিয়া উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম গাহিবামাত্র মারমুখী হইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল।

নিত্যানন্দ যেমন কৌতুকী, তেমনি লীলা চঞ্চল। একটা কিছু ঝঞ্ঝাট কোনো ছলে বাধাইতে পারিলেই তাঁর পরম আনন্দ। মনে ভাবিলেন, এবার পালা জমাইতে হইবে। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া প্রাণপণে তিনি ছুটিতে লাগিলেন। তারপর উভয়ে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একেবারে গৌরসুন্দরের নিকট গিয়া উপস্থিত।

নিতাই সরোষে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, তোমার যত সব উল্টো ব্যাপার। ভক্ত ও সাধুদের কৃষ্ণনাম নেওয়াও, এতে আর তোমার কি এমন কৃতিত্ব? তারা তো নাম নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। হাঁ, জগাই মাধাইয়ের মতো দুর্বৃত্তদের নাম নেওয়াতে পারো—তবে বুঝি তোমার বাহাদুরী! এবার তাই করো, প্রভু!"

গৌরাঙ্গ মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, এ পাষণ্ডদের উপর তোমার যখন করুণা হয়েছে, কৃষ্ণ এদের নিশ্চয় উদ্ধার করবেন।"

কয়েকদিন পরের কথা। নামকীর্তনরত নিতাই ও হরিদাস রাত্রিকালে একদিন জগাই মাধাইর সম্মুখে গিয়া পড়িলেন। মদ্যপ দুই ভ্রাতা আরক্তিম নয়নে তখন রাস্তায় ঘোরাফেরা করিতেছে। কৃষ্ণনাম কানে যাওয়া মাত্র উত্তেজিত হইয়া ধাইয়া আসিল। হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "ওরে, কার এমন মরবার ইচ্ছে জেগেছে যে, ঘটা করে নামকীর্তন আমাদের শোনাতে আসে? তোরা কে?"

নিত্যানন্দ আজ একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটাইতে চাহেন। তাড়াতাড়ি পাষণ্ডদের কাছে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ভাই, আমি কৃষ্ণনাম তোমাদের শোনাতে এসেছি, আমি এক অবধূত।"

আর যায় কোথায়। পাপিষ্ঠ মাধাইর মাথায় যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। রাস্তার একপাশ হইতে একটি ভাঙা কলসী তুলিয়া নিয়া সবেগে সে উহা নিতাইর মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল।

এ এক মহা চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। নিতাইর আহত মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। সেদিকে কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। রক্তাক্ত স্থানটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কেবলই তিনি সুস্মিত হাসি হাসিতেছেন। পাষণ্ডী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের কৃপার ধারা আজ তিনি অবতরণ করাইতে চান, তাই তো একটা সঙ্কট পাকাইয়া তুলিতে তাঁহার এত আগ্রহ।

চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়। প্রভু গৌরাঙ্গের কাছেও ইতিমধ্যে সংবাদ গিয়াছে—দুর্বৃত্তেরা নিত্যানন্দকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, তাঁহার মস্তক হইতে ঝরিতেছে রক্তধারা।

মাধাইর ক্রোধ কিন্তু তখনো প্রশমিত হয় নাই। রোষকষায়িত নেত্রে সে লক্ষ্য করিতেছিল, নিতাই তাহার নিক্ষিপ্ত কলসী-কানার আঘাত খাইয়াও দাঁড়াইয়া আছে। উত্তেজিত অবস্থায় আবার সে তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল।

এতটা বাড়াবাড়ি জগাইর কিন্তু পছন্দ নয়। নিরস্ত্র ও শান্তস্বভাব নিতাইকে মারিয়া

গৌরব তাহাদের এমন কি বাড়িল ? মাধাইকে বাধা দিয়া সে কহিল, "ওরে, কেন বৃথা এ বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন করে মারছিস্। এতে সত্যকার কি লাভ হবে বল্‌তো।"

দুই ভ্রাতায় একথা লইয়া বচসা চলিতেছে, এমন সময় গৌরাঙ্গ সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

নিত্যানন্দের আহত শির হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছে। এ দুঃসহ দৃশ্য দেখিয়াই ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। হুঙ্কার দিয়া কহিলেন নিত্যানন্দের শোণিতপাত যাহারা করিয়াছে, সে পাষণ্ডীদের শাস্তি না দিয়া তিনি আজ ছাড়িবেন না।

নিত্যানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর করুণা-লীলা সর্বসমক্ষে তিনি প্রকটিত করিতে চান, তাহা বুঝি বানচাল হইয়া যায়। পাতকী উদ্ধারের মহিমময় দৃশ্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যই যে এত কাণ্ড তিনি ঘটাইয়া তুলিয়াছেন।

তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "প্রভু, তুমি শান্ত হও। এরা যে মহাপাপী। তোমার কৃপা-প্রসাদ যে সবার আগে এদেরই প্রয়োজন! তাছাড়া, তুমি তো জান না, ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় মাধাই আমাকে হয়তো একেবারেই মেরে ফেলতো, কিন্তু জগাই তাকে বাধা দিয়েছে। তাই তো আমার প্রাণ রক্ষা হলো। আমার সব কষ্ট দূর হবে যদি এ দুজনকে তুমি আজ আমায় ভিক্ষা দাও।"

প্রভু গৌরসুন্দর তৎক্ষণে করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাই তো! জগাই তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নিত্যানন্দের প্রাণ বাঁচাইয়াছে। তবে তো সে তাঁহার পরম উপকারী বান্ধব, পরম আপনার জন। সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "ভাই জগাই, নিত্যানন্দকে রক্ষা ক'রে তুমি আজ আমায় কিনে নিয়েছো। আশীর্বাদ করছি, পরমকরুণ কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন। আজ থেকে তোমার প্রেম-ভক্তি লাভ হোক।"

প্রভু বাহু প্রসারিয়া প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন।

কি অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হয় প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শনে তাহা কে বলিবে ? জগাই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

পাষণ্ড জগাইর এ সৌভাগ্যোদয় দেখিয়া ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। নাম-কীর্তনে ও গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে তাঁহারা সারা অঞ্চল কাঁপাইয়া তুলিলেন।

মাধাইর নিষ্করুণ প্রাণও এবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। একি অদ্ভুত পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত! এ যুগে এ বস্তু যে বড় দুর্লভ। নয়নে তাঁহার স্বর্গের মোহময় অঞ্জন। আননে মধুস্রাবী কৃষ্ণনাম! আর বুক ভরিয়া পাতা রহিয়াছে ভালবাসার ইন্দ্রজাল! কি বিস্ময়কর তাঁহার স্পর্শের প্রভাব! এ স্পর্শে জগাইর মতো এমন দুর্দান্ত, এমন পাপাত্মাও প্রেমে বিবশ হইয়া এলাইয়া পড়ে, চৈতন্য হারায়। আরও বিস্ময়কর নিমাইর কর্মসঙ্গী এই এই মহাপ্রেমিক অবধূত! এমন প্রাণঘাতী প্রহারের পরও অপার করুণা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এরা মানুষ না দেবতা ?

অনুতাপদগ্ধ মাধাইর হৃদয় এবার গলিতে শুরু করিয়াছে। অশ্রুর বন্যায় তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত। কাতর কণ্ঠে বার বার মিনতি জানাইয়া প্রভুর পায়ে সে আত্মসমর্পণ করিল। সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া তিনিও তাহাকে তখনি কোল দিলেন।

এবার জগাই মাধাই দুই ভাইকে আশ্বাস দিয়া গৌরাঙ্গ কহিলেন, "ভাই, আজ থেকে

তোমাদের সব পাপের বোঝা আমার ওপর দাও, আনন্দে কৃষ্ণনাম করো। সব অভীষ্ট তোমাদের লাভ হোক।"

প্রভুর কৃপাপ্রসাদ পাইবার পর দুই দুর্বৃত্ত জগাই ও মাধাই হইয়া উঠেন পরমভাগবত। সমস্ত বিত্তবিষয় ত্যাগ করিয়া এবার তাঁহারা কন্থাকরঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণব। নিরন্তর জপ-ধ্যান আর বৈষ্ণবসেবায় তাঁহাদের দিন কাটিতে থাকে। নবদ্বীপের অধিবাসীরা এ রূপান্তর দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

এখন হইতে প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা যায় এ প্রাণস্পর্শী দৃশ্য। জগাই, মাধাই দুই ভ্রাতা দীনহীনভাবে প্রতি স্নানার্থীর চরণে প্রণিপাত করেন। করজোড়ে অশ্রু-সজল চক্ষে মিনতি জানান, "জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ যদি আপনার কাছে হয়ে থাকে, কৃপা ক'রে আমাদের মার্জনা করুন।"

গঙ্গাস্নানে আগত নরনারীর সেবার জন্য ভক্তপ্রবর মাধাই কোদাল দ্বারা স্বহস্তে একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন, এই ঘাট আজিও মাধাইর ঘাট নামে পরিচিত আছে।

জগাই, মাধাইর এ পরিবর্তনের ফল সেদিনকার নবদ্বীপে সুদূরপ্রসারী হয়। গৌরাঙ্গের নবপ্রবর্তিত প্রেমভক্তির ধর্ম এবার ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে।

ভক্ত-সাধকদের সংখ্যা এখন হইতে ক্রমে আরও বাড়িয়া চলে। চারিদিকে কেবলই শোনা যায় হরিনামের জয়ধ্বনি। সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে খোল-করতালসহ নামকীর্তনের অনুষ্ঠান।

কাজী বার্-বাহক তখন নবদ্বীপের শাসক। তেমন হিন্দুবিদ্বেষী নন বটে, কিন্তু নূতন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর এতটা মাতামাতি, হৈ-হুল্লোড় তিনি বেশ সুচক্ষে দেখিতেছেন না। সঙ্ঘবদ্ধ কীর্তন সম্বন্ধে কিছুটা ভয়ও হয়তো পাইয়া থাকিবেন। একদিন এই কাজীর অনুচরেরা একদল ভক্তের খোল-করতাল ভাঙিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আদেশ জারী হইল, এখন হইতে নবদ্বীপে সমবেতভাবে ও উচ্চস্বরে কীর্তন করা চলিবে না।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। শেষকালে কি কাজীর অত্যাচারে ধর্ম ও ধন-প্রাণ-মন সবই যাইবে? সকলে আসিয়া গৌরাঙ্গকে কহিলেন, "প্রভু, কাজীর লোকেরা শহরে টহল দিয়া ফিরিতেছে আর কীর্তন ভাঙিয়া দিতেছে। আমরা কি করবো তা বলুন। তবে কি নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবো?"

প্রভু ক্রোধে রুদ্রমূর্তি হইলেন। নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি সর্বত্র প্রচার ক'রে দাও, নবদ্বীপের পথে আজ সন্ধ্যায় নগরকীর্তন হবে। হরিনামে কে বাধা দেয়, তা আমি দেখবো।"

ভক্তদের উৎসাহ আনন্দ আর ধরে না। প্রভুর আদেশ যখন মিলিয়াছে, তখন শাসন-কর্তা কাজীকে আর কে ডরায়?

সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয় এবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। হরিনামের মর্যাদা রক্ষায় আজ সকলে বদ্ধপরিকর। প্রভুর প্রেরণার ইন্দ্রজাল আর নিত্যানন্দের সংগঠন-প্রতিভার স্পর্শে অবিলম্বে গড়িয়া উঠিল এক বিরাট ভক্তবাহিনী।

সন্ধ্যার পূর্বেই কীর্তনকারীরা প্রস্তুত। দেখা গেল, শুধু গৌরাঙ্গের অনুগামীরাই নয়, সারা নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতাই এই বিরাট আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ যেন দৈবীশক্তি চালিত এক বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সূচনা। কে ইহা রোধ করিবে?

খোল করতাল, ঝাঁঝ কাঁসর আর নিশান নিয়া দলে দলে লোক শ্রীবাস

চারিদিকে জুটিতেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটি জ্বলন্ত প্রদীপ বা মশাল। পরিধানে মনোরম পরিচ্ছদ। চন্দন আর ফুলের মালায় সকলেরই অঙ্গ সুশোভিত।

পুরনারীদের হৃদয়েও সেদিন এই ভাব-তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে। ঘরে ঘরে তাই দেখা যাইতেছে কদলীবৃক্ষ, মঙ্গল-কলস আর দীপমালা।

শাসনকর্তার নির্দেশ অমান্য হইতেছে, কিন্তু আইনভঙ্গকারীদের মনে নাই কোনো উষ্মা, হাতে নাই কোনো অস্ত্র। আজিকার এ উৎসাহ-উদ্দীপনার, এ সর্বপ্লাবী শক্তির উৎস রহিয়াছে নামপ্রেমে আর প্রভুর মাধুর্য-মূর্তি'র অমোঘ আকর্ষণে।

গৌরাঙ্গ তাঁহার বিদ্রোহের ধ্বজাটি তুলিলেন বড় অভিনবরূপে। এ তো সংঘাত বা সংঘর্ষ নয়—এ যে তাঁহার অতিমানবীয় প্রেমনাট্যের এক দৃশ্যোদ্ঘাটন। এমনিতেই রূপ তাঁহার নয়নাভিরাম—ভুবনমোহন। তদুপরি আজ সাজিলেন নাটুয়ার ভঙ্গীতে, রঙ্গীয়ার বেশে। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাসের অনুপম তুলিকায় প্রভুর সেদিনকার সর্বজনমোহন রূপের আলেখ্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

জ্যোতির্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা ॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগবিন্দু সনে।
বাহু তুলি 'হরি হরি' বোলে শ্রীবদনে ॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব অঙ্গ তিতি পদ্মনয়নের জলে ॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনক কদম্ব ॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূভঙ্গে পতন ॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে শুক্ল-যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥

কে বলিবে গৌরাঙ্গ সেদিন এক বৃহৎ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাদশাহের প্রতিনিধি কাজীকে তিনি দমন করিতে যাইতেছেন। এ যেন তাঁহার এক পরম রমণীয় প্রেমাভিসার!

প্রভুর অহিংস অভিযান শুরু হইল, ভক্তদের সঙ্গে তিনি অগ্রসর হইলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি এক একটি কীর্তনমণ্ডলীতে নৃত্যগীত করিতে করিতে চলিয়াছেন। আর প্রভু চলিয়াছেন সকলের মধ্যস্থলে। দিব্য ভাবাবেশে তিনি প্রমত্ত।

কীর্তনকারী এই বিপুল জনতা কাজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। এ এক বিস্ময়কর জনসংঘট্ট। শুধু নবদ্বীপের ইতিহাসে কেন, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এরূপ রাজবিরোধী অহিংস অভিযানের কথা সে যুগে শোনা যায় নাই। এমন জনসমুদ্র অভাবনীয়। কাজী তাই ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন।

আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল। প্রভুর দেবদুর্লভ কান্তি, মোহন-নাগর বেশ, আর ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু নয়ন দুইটি দেখিয়া কাজী অভিভূত। ভয়ে, বিস্ময়ে

এবং অজানা আকর্ষণে তাঁহার বুক তোলপাড় করিতেছে। ভাবিতেছেন, একি মর্তের জীব না স্বর্গের দূত? এ কাহার সঙ্গে তিনি বিরোধ করিতে গিয়াছেন!

শান্ত কণ্ঠে অনুযোগের সুরে গৌরাঙ্গ কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমার বাড়িতে ছুটে এলাম, আর তুমি রহিলে দূরে লুকিয়ে এ কেমন কথা? এ তো শিষ্টাচারসম্মত নয়।"

প্রভুর কথা কয়টিতে যেন অমৃতঢালা, কি জাদু যেন ইহাতে জড়ানো রহিয়াছে। কাজী একেবারে গলিয়া গেলেন।

উত্তরে কহিলেন, "তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছো, সঙ্গে নিয়ে এসেছো বিরাট এক জনতা। তাই তো ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম। এবার শান্ত হয়েছো, তাই এসে পড়লাম। তাছাড়া তুমি তো জান না, তুমি আমার আপন জন। তোমার দাদামশায় নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সুবাদে আমার চাচা, তুমি যে তাই আমার ভাগ্‌নে হও। ভাগ্‌নে হিসাবে তোমার ক্রোধ ও আব্‌দার আমায় কিছুটা সইতেই হবে। যাক' যা হবার হয়ে গেছে—এবার তুমি বল, কি চাও।"

অপূর্ব অলৌকিক শক্তি এই মহাভাবময় প্রেমিক পুরুষের। সামান্য দুই চারিটি শান্ত মধুর কথা—কিন্তু ইহা দিয়াই কাজীকে তিনি চিরতরে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

এবার গৌরসুন্দর চাহিলেন তাঁহার ভিক্ষা। বলিলেন, "আমায় একটি দান তুমি কৃপা ক'রে দাও। আদেশ প্রচার করো নবদ্বীপে কেউ যেন কখনো কীর্তন বন্ধ না করে।"

কাজী মন্ত্রমুগ্ধবৎ কহিলেন, "আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার বংশের কেউ তোমার প্রবর্তিত কীর্তন বন্ধ করবে না।"

চারিদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল। প্রেমের বলে কাজীকে বশীভূত করিয়া সানন্দে প্রভু স্বগণসহ ঘরে ফিরিলেন।

হিন্দুর অবাধ ধর্মাচরণের অধিকার গৌরাঙ্গ মুসলমান শাসনকর্তাকে দিয়া স্বীকার করাইলেন। আর এ কাজ তিনি করাইলেন আপন অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাবে। তাই সেদিন শুধু নবদ্বীপেই নয়, সারা গৌড়দেশে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা দেখা দিল, তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন জীব-উদ্ধারকারী মহামানবরূপে।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির এ লীলা বড় অভিনব, বড় জীবন্ত। তাঁহার দৃষ্টিতে ঝরিতেছে স্বর্গের সুধাস্নিগ্ধ আলো—স্পর্শে ঘটিতেছে দিব্য রূপান্তর। একবার যে তাঁর সান্নিধ্যে আসে, সে-ই আত্মসমর্পণ ক'রে একেবারে হয় নূতন মানুষ।

সমকালীন পদকর্তা বসুদেব ঘোষ তাই প্রভুর এ সময়কার অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাহিয়া হৈল সোনা॥

প্রতিদিনকার মতো সেদিনও শ্রীবাস অঙ্গনে নামকীর্তন হইতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রভু ভাবাবিষ্ট। পরমানন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীবাসের একটি শিশুপুত্র কিছুদিন যাবৎ বড় অসুস্থ। হঠাৎ অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শ্রীবাস দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন, শিশুটি এইমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, পুত্রশোকে

এ মহাবৈষ্ণবকে অধীর হইতে দেখা গেল না। তিনি বরং ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন প্রভুর জন্য—তাঁহার কোনো অসুবিধা না হয়।

বাড়ির মেয়েদের কাঁদিতে নিষেধ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দ্যাখো, প্রভুর কণ্ঠের নাম গান শুনতে শুনতে পুত্র দেহত্যাগ করেছে, এ তার মহাভাগ্য সে উর্ধ্বলোকে গিয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি এখন কাঁদাকাটি করো, প্রভুর কীর্তন-আনন্দ ভঙ্গ করো, তবে কিন্তু আমি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবো। সবাই এখন একেবারে চুপচাপ থাকো। কাঁদতে হয়, পরে কাঁদবে।"

কীর্তন-অঙ্গনের অনেকেই এ সংবাদ জানিল না। শ্রীবাস আবার আসিয়া সেখানে যোগ দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কিন্তু প্রভুর প্রেমাবেশ টুটিয়া গেল। ভক্তদের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "আজ আমার মন হঠাৎ এমন উচাটন হয়েছে কেন? কীর্তনের আনন্দে মন বসতে চাইছে না। এমন রসভঙ্গের কারণ কি? নিশ্চয় শ্রীবাসের ঘরে কোনো অমঙ্গল ঘটেছে। তোমরা সব খুলে বলো।"

এবার কিন্তু প্রভুকে আর এড়ানো গেল না। তাঁহাকে বলা হইল, পণ্ডিতের গৃহে পুত্রশোকে সকলে বিহ্বল। শুধু প্রভুর কীর্তনানন্দ ভঙ্গ হবে বলে এ দুঃসংবাদ শ্রীবাস তাঁকে জানতে দেন নি।"

প্রভুর নয়ন দুইটি তৎক্ষণে সজল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "কৃষ্ণ আমার পরম কৃপালু। তাই শ্রীবাসের মত দুর্লভ আত্মজন আমায় জুটিয়ে দিয়েছেন! আমার জন্য এরা সব করতে পারে। ভাবছি এদের ছেড়ে আমি কি করে থাকবো?"

অতঃপর ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভু মৃত শিশুর নিকটে গেলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবী ও বাড়ির অন্যান্য সকলে শোকার্ত হইয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। কৃপাময় প্রভুর অন্তর গলিয়া গেল, পুরনারীদের সান্ত্বনা দিবার জন্য এক অলৌকিক লীলা সর্বসমক্ষে সেদিন তিনি প্রকটিত করিলেন।

মৃত দেহটিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, "তোমার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা শোকার্ত। একবার তাদের বলে যাও, তুমি কেন তাঁদের ছেড়ে যাচ্ছো, কোথায়ই বা যাচ্ছো?"

উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, মৃত শিশুটির দেহে ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরিয়া আসিতেছে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে উত্তর দিল, "প্রভু, যতদিন নির্বন্ধ ছিল, এদেহে বিরাজ করেছি, শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্ররূপে অনেক কিছু ভোগ করেছি। এবার প্রাক্তন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জায়গায় আমি চললাম। কারুর সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমার আর তোমার পার্ষদদের চরণে রইলো আমার প্রণাম; আমি এবার তাহলে বিদায় নিচ্ছি।"

শিশু আবার নিঃসাড় দেহে শয্যায় পড়িয়া রহিল, প্রাণের কোনো চিহ্ন আর তাহার মধ্যে দেখা গেল না।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কোনো পার্থক্যই নাই, এ তত্ত্বটি বুঝাইতে গিয়া প্রভুকে এই অলৌকিক লীলাটি প্রকটিত করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে শ্রীবাস-গৃহের নরনারীর শোকোচ্ছ্বাস সেদিন অনেকটা প্রশমিত হয়।

পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী মালিনী দেবীকে প্রভু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরের বিধানে

এক পুত্র তোমাদের চলে গেলো। কিন্তু আজ থেকে আমি আর নিত্যানন্দ এ দু'জন তোমাদের পুত্র হলাম, তোমরা শোক-তাপ ভুলে যেতে চেষ্টা করো।"

ভক্তগণসহ প্রভু নিজে দাঁড়াইয়া মৃত শিশুর সংকার করিলেন।

গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এক বৎসরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। ইহারই মধ্যে গৌরাঙ্গ এক বিরাট বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রভাব প্রতিপত্তি এখন ইহাদের যথেষ্ট। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে আজ শোনা যায় নামকীর্তনের আনন্দধ্বনি। গৌরসুন্দর হইয়া উঠিয়াছেন এই বৈষ্ণব ভক্তদের সর্বস্বধন, তাঁহাদের জীবন-মরণের প্রভু।

নবদ্বীপের এই প্রেমলীলায়, এই কীর্তন-বিলাসে গৌরাঙ্গের কিন্তু আর তেমন মন বসিতেছে না। প্রেমধর্মের যে প্রবাহ তিনি অর্গলমুক্ত করিয়াছেন, দিকে দিকে আজ তাহা প্রবাহিত হইতে চায়—সব মানবের অন্তর-সত্তার সহিত তাহা একাকার হইতে চায়। তাই শুধু শ্রীবাস-অঙ্গনের অন্তরঙ্গ লীলায় মাতিয়া থাকিলে চলিবে কেন? নবদ্বীপের সীমিত ক্ষেত্রটিতে তাঁহার এ দুর্লভ প্রেমধন বিলাইয়াই বা প্রভুর তৃপ্তি হইবে কেন।

অন্তরাত্মায় এবার আহ্বান আসিয়া গিয়াছে। বিশ্বমানবের কল্যাণে তাঁহাকে এ প্রেমভক্তির প্রবাহকে সঞ্চালিত করিতে হইবে। সকল মানুষের দুঃখ, বিরহ ও আর্তি তিনি বুক পাতিয়া নিবেন, সারা বিশ্বকে তিনি আহ্বান জানাইবেন। কিন্তু গৃহ না ছাড়িলে, নবদ্বীপ না ছাড়িলে, তাঁহার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কি করিয়া ঝাঁপ দিবেন?

আরও একটা বড় কথা আছে। গৌরাঙ্গ নিজে সংসারী। মাতার স্নেহ, কিশোরী ভার্যার প্রেম আর ভক্ত শিষ্যদের শরণাগতির বন্ধন তাঁহার চারিদিকে। এ বন্ধন টুটিয়া না বাহির হইলে লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন? সংসার ত্যাগ না করিলে সংসারের জীব যে তাঁহাকে তাহাদেরই মত এক মায়াবদ্ধ জীব বলিয়া ধরিয়া নিবে। তাই প্রভু স্থির করিলেন, অবিলম্বে সন্ন্যাস নিবেন। কাটোয়ার সন্ন্যাসী কেশব ভারতীকে বরণ করিবেন দীক্ষাগুরুরূপে।

নিজের সঙ্কল্পের কথাটি নিত্যানন্দ ও অপর কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে তিনি জানাইলেন। আর জানাইলেন শচীদেবীকে। এ নিদারুণ সংবাদে সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

মিনতি, ক্রন্দন ও অশ্রুজল—কোনো কিছুই সেদিন গৌরাঙ্গকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। কুসুমের মতো কোমল আবার বজ্রের মতো কঠোর তাঁহার প্রাণ। প্রয়োজন বুঝিয়া এবার বজ্রের কঠোরতাই তিনি গ্রহণ করিলেন।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ। গভীর নিশীথে গৌরসুন্দর একদিন চিরতরে গৃহত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল বৃদ্ধা জননীর করুণ বিলাপ, তরুণী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস আর ভক্তবৃন্দের আকুতি ও ক্রন্দন। কাটোয়ার পথ লক্ষ্য করিয়া প্রভু ছুটিয়া চলিলেন।

কেশব ভারতীর কুটিরে পৌঁছিবার পর একে একে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদদের জড়ো হইতে দেখা গেল।

মস্তক মুণ্ডনের পর কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। প্রভুর বয়স তখন চব্বিশ বৎসর।

সন্ন্যাসের পর প্রভু দ্রুতপদে কাটোয়া ত্যাগ করিলেন। নবদ্বীপে আর ফিরিবেন না—এবার তাঁহার লক্ষ্য নীলাচলের দিকে। নীলমাধবের বাঁশরী-সঙ্কেত আজ তাঁহার অন্তরের অন্তঃপুরে পশিয়াছে। বিরহিণী রাধার মতো পাগলপারা হইয়া তো তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন আর নয়—এবার তাঁহার লীলা-রঙ্গমঞ্চ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের মহাধাম! আত্মপ্রকাশের পরম লগ্নটি আসিয়া গিয়াছে, আর তো তাঁহার দেরি করিবার যো নাই!

পথিমধ্যে দশদিনের জন্য প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে অবস্থান করেন। সংবাদ পাইবামাত্র জননী ও ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। নৃত্য কীর্তন ও মহোৎসবের পর্ব সমাপ্ত হইলে শেষবারের মতো প্রভু জননী ও ভক্তদের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। দ্রুত চলিতে থাকেন উড়িষ্যার পথে।

ভাববিহ্বল অবস্থায় তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারিজন ভক্ত কতক্ষণে তাঁহার নয়নমণি নীলমাধবকে দর্শন করিবেন. এই চিন্তায়ই তিনি বিভোর।

দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া প্রভু পুরীধামের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছেন। দূর হইতে শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়াটি দেখা গেল, আর অমনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় সেদিকে তিনি ধাবিত হইলেন। তাঁহার গতির সহিত তাল রাখিবে কে? সঙ্গীরা সবাই তখন অনেকটা পিছনে পড়িয়া আছেন।

শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রভু মহাভাবে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে তাঁহার বহু ঈপ্সিত ধ্যানের ধন বিরাজিত। তিনি দেখিতেছেন—এতো দারুময় প্রতীক-মূর্তি নয়, এ যে গোলকপতি মদনমোহনের চিন্ময়, পরম রসোজ্জ্বল রূপ। নিখিলের সকল মাধুর্য সৌন্দর্য ছানিয়া যে এ বিগ্রহ গড়া হইয়াছে।

অরূপ এখানে রূপায়িত, সচ্চিদানন্দ এখানে বিগ্রহীভূত! পরম প্রভুর এখানে চির-প্রকাশ—চিরবিহার! এ দুর্লভ দিব্যদর্শনের পর কে স্থির থাকিতে পারে?

প্রেমোন্মত্ত প্রভু ঘন ঘন হুঙ্কারে মন্দির কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। অল্পকাল পরেই আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। হঠাৎ দুই বাহু প্রসারিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন।

পাণ্ডা ও পরিহারীদের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল। একি দুঃসাহস এই তরুণ সন্ন্যাসীর—পবিত্র মহাবিগ্রহকে সে স্পর্শ করিতে আসে! ছুটিয়া আসিয়া সকলে এক-যোগে তাঁহাকে বাধা দিল। প্রভু একেবারে সম্বিৎহারা হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া মন্দিরের সেবকদের উত্তেজনা ও কলরব সেদিন যেন আর থামিতে চায় না।

রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এসময়ে শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তরুণ সন্ন্যাসীর এই কাণ্ড ও পরিহারীদের দৌড়ঝাঁপ তিনি এতক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। তাড়াতাড়ি এবার ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইলেন।

পুরীতে তখন বাসুদেব সার্বভৌমের প্রবল প্রতাপ। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র সযত্নে তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে আনিয়া পুরীতে স্থাপন করিয়াছেন। গুরুর মতো তাঁহাকে তিনি মান্য করেন। সমগ্র ভারতের নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিকসমাজে সার্বভৌমের তখন অসাধারণ মর্যাদা। দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছাত্র, আচার্য ও দণ্ডী সন্ন্যাসীরা দলে দলে তাঁহার টোলে শাস্ত্র পাঠ করিতে আসে। উড়িষ্যার ধর্মসংক্রান্ত যে কোনো বিতর্কের মীমাংসায় তাঁহার সিদ্ধান্তই

প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয়। রাজা এবং জনসাধারণ সকলেরই কাছে তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা।

বাসুদেব সার্বভৌমকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভিড় সরাইয়া দিয়া পণ্ডিত তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন চমকিয়া উঠিলেন তিনি। এমন নয়নাভিরাম মূর্তি তো সহসা চোখে পড়ে না। তাছাড়া একি অদ্ভুত প্রেম বিহ্বলতা।

পণ্ডিতের মন গলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ কয়েকটি বাহকের সাহায্যে সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন।

কিছুকাল পরই শ্রীচৈতন্যের ভক্ত সঙ্গীরা তাহাদের পিছে পিছে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিতবর শুনিয়া খুশী হইলেন, সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার নবদ্বীপের লোক। প্রেমভক্তির আবেশে সদাই তিনি থাকেন বিহ্বল। বাসুদেব সার্বভৌম আরও লক্ষ্য করিলেন, সঙ্গীর ভক্তেরা ইঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন দেবতাজ্ঞানে।

তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিভাদীপ্ত আনন, অপূর্ব প্রেমাবেশ—এসব দেখিয়া তাঁহার প্রতি সার্বভৌম বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সস্নেহে কহিলেন, "দ্যাখো, বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী আমার কাছে অদ্বৈত-বেদান্ত পড়তে আসে। প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাজই হচ্ছে বেদান্ততত্ত্ব আয়ত্ত করা—এটা যেন কখনো তুমি ভুলে যেও না। এখন থেকে তুমি রোজ আমার কাছে বসে বেদবেদান্তের ব্যাখ্যা শুনবে। কেমন ? দেখবে তাতে তোমার উপকারই হবে।"

শ্রীচৈতন্য সবিনয়ে কহিলেন, "আচার্যবর, আপনি পণ্ডিত শিরোমণি মহাজ্ঞানী। আমি আপনার কাছে বালকমাত্র। যাতে আমার কল্যাণ হয় তাই করুন। আপনার হাতেই নিজেকে স'পে দিলাম।"

বেদান্ত পাঠ শুরু হইয়া গেল। বাসুদেব সার্বভৌম রোজ নানা দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন আর নিকটে বসিয়া প্রভু নিবিষ্ট মনে শুনিতে থাকেন। প্রায় সাত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু একবারও তিনি মুখ খুলিতেছেন না। একটি প্রশ্নও আজ অবধি জিজ্ঞাসা করেন নাই, একমনে শুধু শুনিয়াই যাইতেছেন। বাসুদেব পণ্ডিতের মনে সন্দেহ জাগিল, তবে কি এই তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার ব্যাখ্যার অর্থ কিছু ধরিতে পারিতেছেন না ?

পণ্ডিত কহিলেন, "প্রতিদিন আমি এত কিছু জটিল শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি, কিন্তু কই, তোমার দিক থেকে তো কোনো সাড়াশব্দ শুনছিনে। আমার ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল হচ্ছে তো ? সব বুঝতে পারছো কিনা আমার জানা দরকার।"

প্রভু সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আচার্যবর আপনি বলে দিয়েছেন, অদ্বৈততত্ত্ব শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর কর্তব্য। আপনার কথা শিরোধার্য ক'রে তাই এ সব শুনে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রকৃত বক্তব্য আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

সার্বভৌম রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা ! যদি না বুঝতে পেরে থাকো, তবে আমার প্রশ্ন ক'রে সঠিক অর্থ জেনে নাও নি কেন ? এরূপ চুপচাপ থাকার মানে আমি ভেবে পাচ্ছিনে, এ তোমার অন্যায় হয়েছে।"

প্রশান্ত কণ্ঠে, চৈতন্য অবলীলায় বলিয়া বসিলেন, "আচার্য, সত্যি কথা বলতে কি শাস্ত্রের সূত্রের অর্থ বেশ সহজ। অতিস্বাভাবিকভাবে তা আমার উপলব্ধিতে এসে যায়।

কিন্তু মায়াবাদী আচার্য শঙ্করের অনুসরণে আপনি যে ভাষ্য করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে বিপরীত অর্থ। মনে হয়, মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে আপনি কাল্পনিক ব্যাখ্যা ক'রে যাচ্ছেন। ভগবান্ ব্যাসের সূত্র স্বপ্রকাশ। কিন্তু সে সূত্রকে আচ্ছাদন ক'রে আপনি করেছেন আপনার নিজস্ব ভাষ্য।"

ক্রোধে অভিমানে পণ্ডিত ফাটিয়া পড়িবার মতো হইলেন। প্রচণ্ড দুঃসাহস এ যুবক সন্ন্যাসীর! কে না জানে—বাসুদেব সার্বভৌম ভারতবরেণ্য মহাপণ্ডিত। আর তাঁহারই ব্যাখ্যায় এ অর্বাচীন ভুল ধরিতে আসে! শুধু তাহাই নয়, শঙ্কর-ভাষ্য ও তাঁহার নিজস্ব ব্যাখ্যাকে কাল্পনিক বলিয়া সে উড়াইয়া দিতে চায়!

উষ্মা ও উত্তেজনা চাপিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "বেশ, তাহ'লে সূত্রের প্রকৃত অর্থ এবার তোমার মুখেই শুনি।"

প্রভু শুরু করিলেন তাঁহার ভাষণ। মুহূর্তে কোথা হইতে দিব্য শক্তি তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। অপরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রেমধর্মের প্রাধান্য তিনি স্থাপন করিলেন। তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন—শ্রীভগবান্ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আর তাঁহার প্রতি প্রেমেই জীবের পরম পুরুষার্থ।

অলৌকিক প্রতিভায় মুখমণ্ডল তাঁহার প্রদীপ্ত। মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ চৈতন্যময়। ব্যঞ্জনে, ভাবের গাঢ়তায় ও বাচনভঙ্গীতে এ কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দৈবী শক্তিতে শক্তিমান্ এমন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন সার্বভৌম কখনো হন নাই। ভক্তি, শক্তি ও জ্ঞানের একি বিস্ময়কর মিলন চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এ সন্ন্যাসীর মধ্যে! কোনো সিদ্ধান্তই যে তাঁহার খণ্ডন করা যাইতেছে না।

মহাপণ্ডিত বাসুদেব বড় দুর্বল হইয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই আর ভাবিয়া পাইতেছেন না। ন্যায় ও বেদান্তের যুগরশ্মি তিনি ধারণ করেন, এ দেশের পণ্ডিতসমাজের পুরোভাগে তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁহার মতো শক্তিধর পুরুষকে আজ এই তরুণ আজ তৃণখণ্ডের মতো কোথায় ভাসাইয়া নিতেছে?

ভয়ে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় সার্বভৌম চৈতন্যের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন—একি মানুষ না নরদেহে আবির্ভূত কোনো দেবতা? পণ্ডিতের সকল অহঙ্কার, সকল আত্মপ্রত্যয় যেন এই মহাবলী প্রেমিক সন্ন্যাসী আজ নিঃশেষে শুষিয়া নিয়াছেন। বেদশাস্ত্রে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী, বেদ-বেদান্তে অনভিজ্ঞ এই যুবকের কাছে তিনি হইয়া গিয়াছেন ক্ষুদ্র শিশুটির মতো অসহায়। নূতন ভাষ্য, নূতন মূল্যমান আজ ইঁহারই কাছে তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে।

সূত্র সমূহের প্রেমভক্তিমূলক ব্যাখ্যা শেষ হইয়াছে। প্রভু এবার ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্যবর, ভগবদ্-ভক্তিই মানুষের পরম সাধন, তাই আত্মজ্ঞানী মহামুক্ত মুনিরাও এর জন্য থাকেন লালায়িত। শ্রীমদ্‌ভাগবত এই মহাসত্যই ঘোষণা ক'রে বলেছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

পণ্ডিত সবিনয়ে কহিলেন, "যতিবর, বড় অপরূপ এই শ্লোক! এর নিহিতার্থ আজ আপনার মুখ থেকে শুনতে বড় ইচ্ছে হয়েছে। দয়া ক'রে আমায় বলুন।"

সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যাভিমান নির্জিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে তাহা যায় নাই।

প্রভুও তাঁহাকে সহজে ছাড়িবেন না। তাই চাতুরী করিয়া কহিলেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আপনি বয়সে প্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনিই আগে এর ব্যাখ্যা করুন। পরে আমি করবো।"

পণ্ডিতের প্রাণে এতক্ষণে কিছুটা বল আসিল। মনে ভাবিলেন, পাণ্ডিত্যবলে এই শ্লোকের বহুতর নূতন ব্যাখ্যা তিনি শুনাইয়া দিবেন। যদিবা এভাবে কিছুটা মান রক্ষা করা যায়। ভাষা, ভাব ও তত্ত্বের খুঁটিনাটি ধরিয়া নয়টি বিভিন্ন ব্যাখ্যা তিনি বর্ণনা করিলেন। ভাবিলেন, এ শ্লোকের আর নূতন কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

কিন্তু একি বিপদ! চৈতন্য তাঁহার এ আশায়ও বজ্র হানিলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "আচার্যবর আরও কয়েকটি অর্থ এ শ্লোকের করা যায়। তা হ'লে কৃপা ক'রে শুনুন।"

প্রভু ব্যাখ্যা শুরু করিলেন। পণ্ডিত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন আর হতবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন—অতিমানুষিক প্রতিভা ছাড়া একাজ কেহ করিতে পারে না। এ যে অভাবনীয়!

অবলীলায় প্রভু আঠারো রকমের নূতন ব্যাখ্যা শুনাইয়া দিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিদ্যার দর্প যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! এতক্ষণ যাবৎ প্রভু পণ্ডিতের দীপাধার হইতে একটু একটু করিয়া তেল শোষণ করিতেছেন। উগ্র শিখা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। এবার শেষ ফুৎকারটি দিয়া তাহা নিভাইয়া দিলেন।

আত্মাভিমানের আগুন নিভিয়া গিয়াছে। এবার মহাপণ্ডিত সার্বভৌমের নয়নে উদ্গত হইল ভক্তি-প্রেমের অশ্রুধারা। হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণে নবীন সন্ন্যাসীর দিব্যরূপটি ফুটিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঐশ্বরীয় ভক্তি, ঐশ্বরীয় জ্ঞান আর ঐশ্বরীয় শক্তি তাঁহাতে প্রমূর্ত!

মুহূর্তমধ্যে কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভুর চরণতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর চিরতরে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। শ্রীচৈতন্যকে স্বীকার করিয়া নিলেন জীবন-মরণের প্রভুরূপে।

এভাবে সেদিন বাসুদেব সার্বভৌমকে প্রভু আত্মসাৎ করিয়া নেন। এ আত্মসাৎ শুধু প্রভু আর ভক্তের ব্যাপারই নয়, করুণালীলার আলোকসম্পাত মাত্র নয়,—ইহার তাৎপর্য আরও অনেক বেশী। শক্তিধর সার্বভৌমের এ আত্মসমর্পণ হইয়া উঠে প্রভুর নীলাচল-লীলার এক বিশিষ্ট অধ্যায়। শুধু উৎকলের রাজশক্তি, বিদ্বজ্জন সমাজই নয়, সারা ভারতের বৈদান্তিকদের মধ্যেও সার্বভৌমের এ পরাজয় আনিয়া দেয় প্রচণ্ড আলোড়ন। শ্রীচৈতন্যের নাম অচিরে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সমাজে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন প্রেমভক্তি-ধারার নব ভাগীরথরূপে।

নীলাচলে প্রায় মাস দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভু এবার স্থির করিলেন, কিছুদিনের জন্য তিনি দক্ষিণের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতে বাহির হইবেন।

সার্বভৌম কহিলেন, "প্রভু, দক্ষিণদেশে তুমি ভ্রমণে যাচ্ছো—খুব ভালো কথা। সেখানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে অবশ্য একবার দেখা ক'রো, বিদ্যানগরে উৎকলরাজের প্রতিনিধিরূপে তিনি দেশ শাসন করছেন। শূদ্র, বিষয়ী ভেবে তাঁকে যেন উপেক্ষা ক'রো না। প্রেমভক্তি সাধনার মহা অধিকারী পুরুষ এই রামানন্দ। পৃথিবীতে এমন রসজ্ঞ ভক্ত আর দু'টি নেই। বৈষ্ণব ব'লে একসময় আমি তাঁকে কত উপহাস করেছি, আজ তোমার প্রসাদে বুঝেছি, তাঁর মর্ম।"

প্রভু সাগ্রহে সম্মত হইলেন। তারপর শুরু হইল পরিব্রাজন।

কৃষ্ণ নামরসে মগ্ন হইয়া তিনি পথ চলিতেছেন—ভক্তি, প্রেম ও শরণাগতির ভাবে সদা বিভোর। কণ্ঠে চলিতেছে কীর্তন—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম ॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥

নামগান, প্রেমাবেশ ও নৃত্য কীর্তনে নবীন সন্ন্যাসী পথে পথে সবাইকে মাতাইয়া চলিয়াছেন। কেহ তাঁহার দিব্যরূপ দেখিয়া কেহ মধুর কীর্তন শুনিয়া, কেহ বা স্পর্শ পাইয়া প্রেমাবেগে অধীর হইতেছে। প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে তিনি এরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়া চলিয়াছেন।

সময় অল্প—কিন্তু পরিক্রমার পথটি দীর্ঘ। ইহার মধ্যে দূর দূরান্তে নামের বীজ প্রভুকে রোপণ করিয়া যাইতে হইবে, প্রেমধর্মের রসস্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্রুতবেগে তাই তিনি ঈশ্বর নির্দিষ্ট এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়াছেন।

দক্ষিণাপথে দিনের পর দিন চলিতে থাকে শ্রীচৈতন্যের অবিরাম পরিক্রমা, আর চারিদিকে বিস্তারিত হয় তাঁহার প্রেমের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। এ ইন্দ্রজালের প্রভাব এড়ানো সেদিন অনেকেরই পক্ষে সম্ভব নয় নাই। তার্কিক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বিষয়াসক্ত ধনীরা যেমন আকর্ষিত হয়, তেমনি পাষণ্ড, দস্যু ও পতিতা নারীরাও আসিয়া করে আত্মসমর্পণ। যে একবার প্রভুর দর্শন পায়, ভক্তিরস তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ধীরে ধীরে সে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সাধকেরা দলে দলে এই প্রেমোন্মাদ, মহা-শক্তিধর সন্ন্যাসীর আশ্রয় নিতে থাকেন।

গোদাবরীতীরে, বিদ্যানগরের এক প্রান্তে চৈতন্য সেদিন বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া নদীতে স্নান করিতে আসিলেন। সঙ্গে বহু অনুচর ও দাসদাসী।

স্নান তর্পণের শেষে অদূরস্থিত বৃক্ষতলে রামানন্দের দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, এক দিব্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। একবার তাঁহার দিকে চোখ পড়িলে আর সরানো যায় না। রামানন্দ নিকটে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

লোকলস্কর ও আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া নিতে প্রভুর দেরি হয় নাই। মৃদু মধুর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "আপনিই কি উৎকলরাজের প্রতিনিধি রামানন্দ রায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই অধম শূদ্র।"

"বাসুদেব সার্বভৌম আমায় বার বার বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। সেই জন্যেই আমার এখানে আসা। আপনি পরমভাগবত তাতে সন্দেহ নেই —আপনার দর্শনমাত্রই যে আমি কৃষ্ণপ্রেমরসে ভাসছি।"

প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দের সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল অশ্রু-কম্প-পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকার। এ রাজ্যের তিনি শাসনকর্তা, ধীর স্থির ও দোর্দণ্ড-প্রতাপ বলিয়াই লোকে তাঁহাকে জানে। কিন্তু প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র কি এক স্বর্গীয় প্রেমাবেশে তিনি মত্ত হইয়া পড়িলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

প্রকৃতিস্থ হইবার পর রামানন্দ বার বার চৈতন্যের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, অধমকে শুদ্ধ করার জন্যই যখন এসেছো, কিছুদিন এখানে অপেক্ষা ক'রে যাও। আমায় তোমার কৃপা ও আশ্রয় দাও।"

প্রভু সর্বজ্ঞ। তাঁহার জানিতে বাকী নাই—রায় রামানন্দ নিগূঢ় ব্রজরসের ভাণ্ডারী, আর অচিরে তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন তাঁহারই এক শ্রেষ্ঠ লীলাপরিকররূপে।• তাছাড়া, তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, আচার-আচরণে রামানন্দ রাজসিক ভাবাপন্ন, বৃত্তি তাঁহার রাজকার্য ও কূটনীতি, কিন্তু এই বিষয়ী আবরণের নিচে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক মহাবৈষ্ণব—প্রেমভক্তি-পথের এক অসামান্য সাধক।

প্রভু স্থির করিলেন, কয়েকটা দিন নিভৃতে এই পরমভাগবতের সহিত কাটাইবে, কৃষ্ণরস উপভোগ করিবেন. তাই রায়ের অনুরোধ শুনিয়াই বিদ্যানগরে থাকিতে তিনি রাজী হইয়া গেলেন। এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা হইল।

দশদিন তিনি এখানে যাপন করেন। প্রতিদিন রাত্রে রামানন্দ রায় তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। দুইজনের একান্ত আলাপনে প্রেমানন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উৎসারিত হয় বৈষ্ণবীয় ভজন ও সাধ্য-সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব।

রাত্রি সেদিন গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকথার আনন্দে উভয়ে মাতোয়ারা। প্রভু রামানন্দকে দিয়া মধুরভজনের রসতত্ত্বটি উদ্ঘাটন করিতে চান, জীবের কল্যাণে উহা বিস্তারিত করিতে চান। তাই সেদিন একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া রামানন্দকে তিনি উদ্দীপিত করিতেছেন, আর উভয়ের সংলাপের মধ্য দিয়া চলিতেছে সাধ্য সাধন তত্ত্বের অপরূপ মন্থন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে অমৃত সেদিন এখানে উদ্গত হয়, প্রেম ভক্তি সাধনার জগতে তাহা চির অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

প্রভু কহিলেন, "রামরায়, যে সাধন-ভজনের মাধ্যমে জীবের পরম প্রাপ্তি ঘটবে, তা আমার কাছে আজ খুলে বলো।"

কৃষ্ণপ্রেমের মরমী রসবেত্তা এই রামানন্দ রায়। প্রভু তাঁহাকে দিয়া নিজের প্রচারিত তত্ত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চান। তাই রামরায়ের বিনয়, দৈন্য, ওজর-আপত্তি কোনো কিছুই তিনি মানিলেন না। রায়কে অবশেষে মুখ খুলিতে হইল। স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি অনেক কিছুরই উল্লেখ রামানন্দ করিতেছেন, কিন্তু কোনো কিছুই আজ প্রভুর মনঃপূত হইতেছে না। প্রেমাবেশে কেবলই বলিতেছেন, "রায়, এসব কথা তো বাহ্য। নিগূঢ় তত্ত্বের কথা আমায় তুমি শোনাও।"

একান্ত ভক্তি, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যময় ভক্তি প্রভৃতি নানা সাধনের কথাই রাম রায় কহিলেন। কিন্তু প্রভুর তাহাতে মন ভরিয়া উঠে কই? ভাবাবিষ্ট হইয়া কেবলই বলিতেছেন, "রাম রায় এখানেই থেমে যেয়ো না, আরো এগিয়ে যাও, আরো—আরো গভীরের কথা বলো।"

উত্তর হইল, "প্রভু, এর পর বাকী থাকে কান্তা প্রেম, আর তাই হচ্ছে বৈষ্ণবের সর্ব সাধ্যসার।" ভাগবতে বর্ণিত প্রেম-ভক্তি সাধনার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রামানন্দ রায় এতক্ষণ পর্যন্ত ঢুঁড়িয়া আসিয়াছেন। ভাবিলেন, এবার তিনি রেহাই পাইলেন, প্রভুর জিজ্ঞাসার পালাও সাঙ্গ হইল।

কিন্তু তাহা হইবার যো কই? তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রায়, সাধনার সীমারেখা

টানতে হয় এখানেই, সে ঠিক কথা। কিন্তু এতে তো আমার সত্যকার তৃপ্তি হচ্ছে না। এর পরেও যদি আরো কিছু থাকে, তা উদ্‌ঘাটন করো।"

রামানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ়তর প্রেম-সাধনার কথা তো কেহ জানিতে চাহে না। বুঝিলেন, প্রভু তাঁহাকে দিয়া আজ চরম সাধ্যসাধন-তত্ত্বের নির্ণয় না করিয়া ছাড়িবেন না।

উত্তরে কহিলেন, "প্রভু, এর পরে রয়েছে শুধু রাধা-প্রেম। আর এ হচ্ছে প্রেমের পরম সার—সাধ্য শিরোমণি। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের স্বরূপ হল সৎ-চিৎ-আনন্দময়, আর তাঁরই আনন্দাংশে, হ্লাদিনী শক্তিরূপে, বিরাজিতা রয়েছেন শ্রীরাধা। এই রাধাপ্রেমই মহাভাব হয়ে টেনে নিয়েছে প্রেমসাধনাকে চূড়ান্ত স্তরে।"

কৃষ্ণরসের রসিক, মহাসাধক রাম রায়ের সম্মুখে বসিয়া প্রভুর প্রেমরসপানের তৃষ্ণা আজ কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাধুর্য-ভগবানের রস-ভুঞ্জনের এ আকাঙ্ক্ষার যেন আর অবধি নাই। লুব্ধনেত্রে কহিলেন, "রামরায়, তারপর আরো কিছু থাকে তো বলো—আমার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাও।"

সব শেষের পরেও আবার কি শুরু করিবেন? রামানন্দ রায় আর পারিয়া উঠিতেছেন না। এবার তাই ব্যক্ত করিলেন তাঁহার শেষ কথা। স্বরচিত একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের চরম ও একীভূত রসটি তিনি উদ্‌ঘাটিত করিলেন।—স্বরূপ আর শক্তি, দুইটি পৃথক তত্ত্ব আর সেখানে থাকে না, রাধা আর কৃষ্ণের যুগল সত্তা সেখানে এক হইয়া যায়। রাম রায়ের সে সঙ্গীতের মূল কথা—'ন সো রমণ, ন হাম রমণী। অর্থাৎ, রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ' সেখানে যে সব কিছু একাকার।

এ অবস্থায় লীলার আনন্দ আর থাকে না। বিষয় আর আশ্রয়—গোলোকপতি কৃষ্ণ আর রাধা সেখানে যে একীভূত। তবে দ্বৈত রসসত্তার বিলাসই বা থাকে কই? ব্যগ্রভাবে প্রভু তাঁহার চম্পকবর্ণ করতল দিয়া তখনি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অর্থাৎ—এ বড় নিগূঢ় কথা, সব একাকার করার কথা। রায় একথা আর নয়।'

কৃষ্ণরসের বন্যাধারা হইয়াছে অর্গলমুক্ত। মহাভাবরসে দুইজনে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

বিদ্যানগরে চৈতন্য সানন্দে দিন দশেক কাটাইলেন। রামানন্দের জীবন ইতিমধ্যেই হইয়া উঠিয়াছে প্রভুময়। এখানকার রাজকার্যে আর তাঁহার মন টিকিতেছে না। সমস্ত কর্মভার ত্যাগ করিয়া প্রভুর নিরন্তর সঙ্গ লাভের জন্যে তিনি উন্মুখ হইয়াছেন।

প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, "রাম রায়, তুমি উতলা হ'য়ো না। আমার পরিক্রমার শেষে, নীলাচলে অবশ্যই আবার আমরা মিলিত হবো। উভয়ে মিলে অন্তরঙ্গ লীলারস আস্বাদন করবো।"

প্রভু অতঃপর আরো দক্ষিণের দিকে চলিয়া গেলেন।

চৈতন্যের এ পরিক্রমা শুধু তীর্থদর্শনের জন্য নয়, এ যেন কৃপা বিতরণেরই এক লীলা। দেব-বিগ্রহ দর্শনের নাম করিয়া নিজেই পুণ্য স্থানগুলিতে দর্শন দিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে ভক্ত সেখানেই তাঁহার ঘটিতেছে আবির্ভাব। আর যেখানে তিনি আবির্ভূত হন সেখানেই উচ্ছলিত হইয়া উঠে ভক্তিরসের অমৃতস্রোত।

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু সেদিন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া তিনি রঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন। নৃত্য কীর্তন ও প্রেমাবেশে স্বর্গীয় আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

মন্দিরের এক কোণে সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতেছেন। নাম তাঁহার যুধিষ্ঠির। বিশিষ্ট ভক্ত বলিয়া এ অঞ্চলের সর্বত্র তিনি পরিচিত।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একমনে ভক্তিভরে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করেন। আর এ সময়ে তাহার দুই নয়ন হইতে অবিরাম ধারায় অশ্রু ঝরিতে থাকে। সকলেই জানে, সংস্কৃত ভাষা তিনি জানেন না। তাই গীতার শ্লোকার্থ হৃদয়ঙ্গম করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও কেন যে আদ্যোপান্ত এ গ্রন্থটি রোজ তাঁহার পড়া চাই, অনেকে ভাবিয়া পায় না। তাছাড়া, পড়িতে গিয়া এত ক্রন্দন আর অশ্রুবর্ষণই বা কেন? পাঠের এমন প্রচেষ্টা দেখিয়া অনেকে উপহাসও করে।

রঙ্গনাথজীকে প্রণামের পর চৈতন্য বাহিরে আসিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল যুধিষ্ঠিরের উপর। গীতা পাঠ তাঁহার সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। নয়নজলে দুই গণ্ড প্লাবিত। প্রেমাবেশে বিহ্বল ব্রাহ্মণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। নিকটে গিয়া প্রভু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রবর, গীতা পাঠ ক'রে এমন প্রেমোদ্বেল হতে কাউকে আমি দেখি নি। আচ্ছা, কোন্ শ্লোকটি পড়ে আপনি এ অপার্থিব আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন, তা কি দয়া ক'রে আমায় বলবেন?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "প্রভু, কোনো শ্লোকেরই শব্দার্থ আমি জানিনে, আমি যে একেবারে মূর্খ। শুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক রোজই উচ্চকণ্ঠে সমস্ত অধ্যায়গুলো পাঠ ক'রে যাই। গুরু আজ্ঞা দিয়েছেন, তাই একাজ করি। শ্লোকের অর্থ ভেদ করতে পারিনে, তার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, যখন এ মহাগ্রন্থের পাতা আমি খুলে বসি, তখনই গুরুকৃপায় দেখতে পাই—আমার শ্যামসুন্দর রথাগ্রে বসে অর্জুনকে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছেন। সে দিব্যোজ্জ্বল মূর্তিটি দেখতে দেখতে আমি প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়ি। ভেতর থেকে যে কান্না উথলে ওঠে, তা ঠেকানো যায় না। যতক্ষণ এই গীতা পাঠ করি ততক্ষণই পরমপ্রভুর দিব্য রূপ দর্শন করি। তাই আর কোনো দিকে হুঁশ থাকে না।"

বাহু প্রসারিয়া, প্রেমভরে প্রভু এই মহাভক্ত ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রু-পূরিত নয়নে কহিলেন, "ভাই, তোমায় মূর্খ কে বলবে? অন্তর যে তোমার জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। গীতার অর্থ তুমিই বুঝতে পেরেছো, তোমার পাঠই তো সার্থক। যে পাঠ পরমপ্রভুর দর্শন ঘটিয়ে দেয়, তাই তো সত্যকার পাঠ।"

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের পর প্রভু রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, পনঢরপুর প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বহুতর অঞ্চল পর্যটন করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে নীলাচলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আবার তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া ভক্তসমাজের আনন্দের অবধি রহিল না।

গৌড় হইতে প্রভুর প্রধান পার্ষদগণ দলে দলে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন। রথযাত্রার উৎসব সময়ে বৈষ্ণবদের নৃত্য কীর্তনে পুরীধাম মুখরিত হইয়া উঠে। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দণ্ড কীর্তন ও প্রেমাবেশ লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থীর হৃদয়ে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়।

উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র এই সময়ে চৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করেন—প্রভুর প্রেম-ভক্তি-ধর্মের অন্যতম ধারক ও বাহকরূপে অচিরে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

সে-বার প্রভুর সহিত আনন্দরঙ্গে গৌড়ীয়া ভক্তদের দিন কাটিতেছে। দেশ হইতে অনেক দিন হয় তাঁহারা আসিয়াছেন; কিন্তু ফিরিবার কথা উঠিলে সকলেরই মুখ শুকাইয়া যায়। প্রভুর সান্নিধ্যের এ স্বর্গ সুখ ছাড়িয়া যাইতে কাহারো মন সরে না।

এ সময়ে প্রভু একদিন শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। নিভৃতে বসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমি তো চিরজীবনের মতো ঘরসংসার ছেড়ে এলাম। তুমিও যদি অবধূতবৃত্তি নিয়ে এমন যত্রতত্র বিচরণ করতে থাকো, তবে সংসারী জীবের উদ্ধার কি করে হবে? আমার অনুরোধ শোন। তুমি গৌড়ে ফিরে যাও এবং সেখানেই থাকো। প্রতিবৎসর সবাইকে নিয়ে নীলাচলে আসবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হবে। আরো একটা কথা। আমার ইচ্ছে তুমি বিবাহ ক'রে সংসারজীবনে প্রবিষ্ট হও। অগণিত গৃহীভক্ত তোমার আশ্রয় পেয়ে বাঁচুক, তোমার আদর্শে তারা প্রকৃত বৈষ্ণব হয়ে উঠুক। ঘরে ঘরে আদর্শ গৃহী বৈষ্ণবের সৃষ্টি হোক। আমার প্রতিনিধি হয়ে গৌড়দেশের সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে, তুমি নাম প্রেমরস বিলিয়ে বেড়াও।"

নিত্যানন্দের মাথায় এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। আজীবন ব্রহ্মচারী ও অবধূত থাকিয়া তাঁহাকে আবার এ বয়সে গৃহী হইতে হইবে? সংসারের বন্ধন গলায় পরিতে হইবে? প্রভু একি কথা বলিতেছেন?

কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, আমার প্রতি এমন নির্দয় হ'লে কেন, এ কঠোর দণ্ডই বা দিতে যাচ্ছো কেন তা খুলে বলো?"

"শ্রীপাদ, সবাই জানে, তুমি আর আমি অভিন্নাত্মা। তুমি গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ না করলে সমাজের সঙ্গে জীবের সঙ্গে, আমার যোগ থাকবে কি ক'রে? প্রেমধর্মের প্রচারই বা কিরূপে হবে? তোমার পক্ষে গৃহী-জীবনে ফিরে যাওয়া কঠিন—এ এক মস্ত বড় ত্যাগ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবের কল্যাণের জন্য সেই ত্যাগই তোমার বরণ করতে হবে। তুমি কৃপা না করলে, লোকে কি ক'রে পরমবস্তু পাবে?"

নিত্যানন্দ জানেন—এ প্রভুর অনুরোধ নয়, আদেশ। বাধ্য হইয়া তাই তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইল। প্রভুর নির্দেশ মতো গার্হস্থ্যধর্মও গ্রহণ করিলেন। তারপর সমগ্র গৌড়দেশ তাঁহার হুঙ্কারে, উদ্দণ্ড নৃত্যে, আর নাম-প্রচারে মাতিয়া উঠিল। তিনি চিহ্নিত হইলেন প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই' রূপে।

বহুদিন হয় প্রভুর বৃন্দাবন ও মথুরায় যাওয়ার ইচ্ছা। তিন-তিনবার চেষ্টা করিয়াও নানা বাধা বিঘ্নের জন্য ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার একটিমাত্র সেবক সঙ্গে নিয়া তিনি তাঁহার ঈপ্সিত পর্যটনে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই শুরু হইল তাঁহার নৃত্য কীর্তন আর প্রেমাবেশ। এক একটি পুণ্যস্থান দর্শন করেন আর আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। কখনো গাভীর হাম্বারব শুনিয়া কখনো বা ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া, কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে, প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারান।

এই সময়ে দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া তিনি ব্রজমণ্ডলের বহু প্রাচীন লুপ্ত তীর্থের

পুনরুদ্ধার করেন। উত্তরভারতে প্রেমভক্তি ধর্মের উজ্জীবনে তাঁহার এ অবদানের মূল্য অপরিসীম।

ব্রজমণ্ডলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু একদিন ব্যাকুলভাবে সবাইকে প্রশ্ন করিতে থাকেন—রাধাকুণ্ড কোথায়? দীর্ঘদিন যাবৎ এ পবিত্র স্থানটির কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে, কোনো সন্ধান পাইবার আর উপায় নাই। অবশেষে একদিন দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া নিজেই রাধারাণীর স্মৃতিপূত এই কুণ্ড আবিষ্কারে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিল কৌতূহলী জনতা ও ভক্ত বৈষ্ণবের দল।

পথ চলিতে চলিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রভু হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। চারিদিকে ধানের ক্ষেত—মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ডোবা। আবেশগ্রস্ত অবস্থায় সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, "এই হচ্ছে রাধা-রাণীর স্মৃতিবিজড়িত সেই প্রাচীন রাধাকুণ্ড।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই কুণ্ড ঘিরিয়া নৃত্য ও কীর্তন শুরু করিয়া দিল।

প্রভুর আবিষ্কৃত এই রাধাকুণ্ডকে দেশের সাধকসমাজ অচিরে সম্প্রদায়নির্বিশেষে স্বীকৃতি দান করে।

মথুরা ও বৃন্দাবনের অবস্থা তখন শোচনীয়। মানুষের বসতি বড় কম, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। মুসলমান আক্রমণকারীদের উপর্যুপরি লুণ্ঠনে এ অঞ্চলে জনপদগুলি আর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। শান্তি, সমৃদ্ধ বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে।

এবার এই বনাকীর্ণ পবিত্র অঞ্চলকে চৈতন্য সারা ভারতের জন-মানবের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার, বিস্মৃতপ্রায় পুণ্যস্থানগুলির মাহাত্ম্য প্রচার, ভক্তসমাজে আলোড়ন তুলিয়া দেয়।

প্রভু ও তাঁহার প্রেরিত শক্তিধর গোস্বামীদের চেষ্টায় বৃন্দাবন আবার জাগ্রত হয়, আর বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকৃষ্ণ নূতন করিয়া সংস্থাপিত হন দেশবাসীর হৃদয়-মঞ্চে।

বৃন্দাবন ত্যাগের পর প্রভু প্রয়াগের পথে চলিয়াছেন। সঙ্গে সেবক বলদেব ভট্টাচার্য আর একটি নবাগত ভক্ত, নাম কৃষ্ণদাস, জাতিতে রাজপুত। একযোগে অনেকটা পথ চলা গিয়েছে। তাই বিশ্রামের জন্য সকলে একটি বৃক্ষতলে বসিলেন।

নিকটেই একদল গাভী চরিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ এই সময়ে এক রাখাল বংশীধ্বনি করিয়া উঠিল। আর যায় কোথায়? আগে হইতেই প্রভু বৃন্দাবনের স্মৃতিতে ভরপুর আছেন, এবার এই গোচারণের দৃশ্য ও বাঁশীর রব তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। মহাভাবের উদ্দীপনায় তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্বাস রুদ্ধ, মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতেছে, দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই।

বাদশাহের এক অশ্বারোহী পাঠান ফৌজ ঠিক এই সময়ে এখান দিয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসীর এই অবস্থা দেখিয়া তাহারা সন্দিহান হইয়া উঠিল। তবে কি সঙ্গী দুইটি উঁহাকে কোনো ছলে বিষ খাওয়াইয়াছে? হয়তো তাঁহার টাকাকড়ি নিয়া দুষ্টেরা এবার পলায়ন করিবে। ঘোড়া থামাইয়া তখনি প্রভুর সঙ্গী দুটিকে তাহারা বাঁধিয়া ফেলিল।

কৃষ্ণদাস ব্যাকুলভাবে বুঝাইতে থাকেন, "আমরা এ সন্ন্যাসীরই ভক্ত ও সেবক। ভাবাবেশে ইনি মুর্ছিত হয়েছেন। এমনধারা প্রায়ই ঘটে থাকে। আমরা দুজনে এতক্ষণ পরিচর্যা করছিলাম।"

কিন্তু পাঠানেরা কোনো কথাই কানে তুলিতে চাহে না, তাহারা এ দু'জনকে এখনি বধ করিবে।

অনুনয়-বিনয় এবং তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় চৈতন্য সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন। চোখ মেলিয়া চাহিতেই পাঠানেরা তাঁহাকে কহিল, 'সাধু, তোমার ভাগ্য ভালো, বেঁচে উঠলে। এ দুর্বৃত্তেরা তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে, টাকাকড়ি লুঠ করতে চেয়েছিল।"

প্রভু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না-না ভাই, তোমরা ভুল বুঝেছো। ওরা আমার একান্ত আপনজন। আমার এক এক সময় মূর্ছা হয়, তখন ওরাই তো সেবাযত্ন ক'রে আমার প্রাণ বাঁচায়।"

সাধুর কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায় কি? সৈন্যেরা অগত্যা বলদেব ও কৃষ্ণদাসের হাত-পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিল।

পাঠানদের সেনাপতি বেশ পণ্ডিত লোক। হিন্দুশাস্ত্রও তাঁহার কিছুটা জানা আছে। তাছাড়া চৈতন্যের এমন দিব্যকান্তি ও অদ্ভুত প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রভুর সঙ্গে তাই অধ্যাত্ম-আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন।

প্রভুর অমৃতময় কথা যত শুনিতেছিলেন, ততই তিনি বিকল হইয়া পড়িতেছেন। কি অপূর্ব সম্মোহন এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর চাহনিতে, কণ্ঠস্বরে ও তাঁহার ব্যক্তিত্বে! পাঠানের সমগ্র সত্তায় প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গেল। মুমুক্ষু হইয়া চৈতন্যের চরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। আশ্রয় দিয়া প্রভু তাঁহার নামকরণ করিলেন—রামদাস।

এই পাঠান বাহিনীর মধ্যে একটি ধর্মপ্রাণ তরুণ ছিলেন, তাঁহার নাম বিজুলি খান। ইনি এক বিশিষ্ট ওমরাহের পুত্র। এই বিজুলি খানও প্রভুর নিকট হইতে প্রেমভক্তি ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহার কৃপা লাভে ধন্য হন।

ইহার পর প্রভু প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহার চারিদিকে জমিয়া উঠে দর্শনার্থীর ভিড়। এ সময়েই তাঁহার সমীপে উপনীত হন শ্রীরূপ। গৌড়ের বাদশাহ্ হুসেন শাহের প্রাক্তন সচিব ইনি, উপাধি 'সাকর মল্লিক'। রূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন, বাদশাহের প্রধান সচিব বা দবীর খাস-রূপে তিনি সুবিখ্যাত।

রূপের কবিত্ব শক্তি ও সনাতনের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, আবার তেমনি ছিল উভয়ের বিষয়-বিরক্তি। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য দুই ভ্রাতা তখন বড় ব্যাকুল। পত্রযোগে বার বার এ সংকল্পের কথা তাঁহারা নিবেদনও করিয়াছেন।

অবশেষে রূপ আর ধৈর্য ধরিতে পারেন নাই। রাজ অমাত্যের মর্যাদা, ধনৈশ্বর্য সব কিছু ঠেলিয়া ফেলিয়া চৈতন্যের চরণতলে আসিয়া এবার মাথা ঠেকাইলেন।

এই চিহ্নিত পারিষদের আগমনে প্রভুর আনন্দ আর ধরে না। বার বার কহিতে লাগিলেন, "ভাল হলো, রূপ এতদিন পরে এবার কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করলেন, বিষয়কর্দম থেকে টেনে তুললেন।"

কয়েকদিন আপন সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রভু তাঁহাকে ব্রজরসতত্ত্বের নানা উপদেশ দান করেন। তারপর শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন বৃন্দাবনে। এই সঙ্গে নির্দেশ থাকে, রূপ যেন পরে নীলাচলে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন।

ইহার পর উপনীত হন প্রভুর অপর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাঁহার মণ্ডলীর অন্যতম স্তম্ভ—সনাতন।

সনাতন ও রূপ উভয়েই বাদশাহ্ হুসেন শাহের বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ সচিব। রূপ তাঁহার কর্মভার ত্যাগ করায় বাদশাহ্ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এবার সনাতন চলিয়া গেলে আরো বিপদের কথা। তাই বাদশাহ্ ঠিক করিলেন, কোনোমতেই তাঁহাকে গৌড় ছাড়িতে দিবেন না। সংসার-বিরক্ত সচিবকে কড়া পাহারায় বন্দী রাখা হইল।

সনাতন রূপের সাথে পত্রে যোগাযোগ রাখিতেছেন ভ্রাতা প্রভুর চরণাশ্রয় পাইয়াছে ইহা তাঁহার অজানা নাই। তাই প্রাণ তাঁহার এবার আরও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। যে কোনো উপায়ে তাঁহাকে মুক্ত হইতেই হইবে, নতুবা প্রভুর সহিত মিলিত হইবার তো কোনো আশা নাই। অবশেষে একদিন রক্ষীদের প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়া তিনি কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিধানে দীন ফকিরের বেশ। রৌদ্র, ঝড়জল কোনো কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, মুমুক্ষু সনাতন দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। প্রভু এখন বারাণসীতে, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তিনি মহা উৎকণ্ঠিত।

সনাতন জানেন, বাদশাহের সৈন্যেরা তাঁহার পিছু না নিয়া সহজে ছাড়িবে না, যে কোনো প্রকারে তাঁহাকে গৌড়ে ফিরাইয়া নিতে চাহিবে। তাই দুর্গম অরণ্যপথ দিয়া তিনি রওনা হইলেন। পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত, অর্ধাশনে ও পথশ্রমে দেহ বিশীর্ণ, তবুও ছুটিয়া চলিয়াছেন।

বারাণসীতে আসিয়াই চৈতন্যের চরণে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন। সাক্ষাৎমাত্র অপূর্ব প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, উভয়েরই নয়ন ছাপাইয়া বহিতে লাগিল পুলকাশ্রু। প্রভু ও ভক্তের এ মিলন বড় মর্মস্পর্শী।

প্রভু ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য মহাবৈরাগ্যবান্ সাধককে কৃষ্ণ আমার কাছে এনে দিলেন। তোমরা সনাতনের মস্তক মুণ্ডন করাও। গঙ্গাস্নান করিয়ে ওকে কৌপীন বহির্বাস পরতে দাও।"

সনাতনের যেমন মুমুক্ষা, তেমনি তীব্র বৈরাগ্য। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও নূতন বস্ত্রের কৌপীন ও বহির্বাস তিনি নিবেন না। পুরাতন একখণ্ড বস্ত্র চিরিয়া নিয়া দুই খণ্ড করিলেন। বেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন এভাবে মিটিয়া গেল।

আহারের ব্যাপারেও তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধন কম নয়। কোনো দিন প্রভুর কিঞ্চিৎমাত্র প্রসাদ, কোনো দিন বা মাধুকরী করিয়া উদরপূর্তি চলে। সকলের মুখে প্রিয় ভক্ত সনাতনের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া চৈতন্যের আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু মুখে যাহাই বলুন না কেন, প্রভুর মনে কি যেন একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। বার বার কেন সনাতনের স্কন্ধস্থিত ভোট-কম্বলটির দিকে তিনি চাহিতেছেন?

আসল কথাটি সনাতন বুঝিতে পারিলেন। পথে বাদশাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। এ কম্বল জোর করিয়া তিনি তাঁহার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছেন। এই বস্তুটির উপরই প্রভুর দৃষ্টি পড়িয়াছে। সনাতন ভাবিলেন, সত্যই তো, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়া এ বোঝা আর বওয়া কেন? কাঙাল বৈষ্ণব, কাঁধে দামী ভোট-কম্বলই বা থাকিবে কেন? থাকিবে জীর্ণ কন্থা। প্রভুর সদা সতর্ক দৃষ্টি পরম কল্যাণের পথটিই তাঁহাকে আজ দেখাইয়া দিয়া গেল।

অমনি দ্রুতপদে গঙ্গার ঘাটে তিনি ছুটিয়া গেলেন। এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন

এক দরিদ্র ভিখারী তাহার জীর্ণ কাঁথাটি রোদ্রে শুকাইয়া নিতেছে। মিনতি করিয়া কহিলেন, "ভাই, আমায় একটু দয়া করবে? এই নূতন ভোট কম্বলটি রেখে দিয়ে তার বদলে তোমার ঐ পুরাতন কাঁথাটি আমায় দিতে পারো?"

কাঁথার মালিক কিছুতেই এ প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না। ভাবিতেছে, লোকটা কি পাগল, না আর কিছু? সনাতনও হটিবার পাত্র নন। এ কাঁথা হস্তগত না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। বহু অনুনয়ের পর লোকটিকে রাজী করাইয়া ওখানি প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

এবার তিনি সত্যই ভারমুক্ত হইয়াছেন। কাঁধে ভোট কম্বলের স্থলে ছিন্ন কন্থা।

চৈতন্যের আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নমধুর হাসি। ব্রজমণ্ডলের ভাবী কর্তা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ভাবী শিক্ষাগুরু তাঁহার সনাতন্। এই চিহ্নিত পুরুষের বিচারবুদ্ধির ত্রুটি থাকিবে কেন? ত্যাগ-বৈরাগ্য ও আচার আচরণেই বা কেন থাকিবে ফাঁক? সনাতনকে ত্রুটি সংশোধন করিতে দেখিয়া প্রভু বড় খুশী হইলেন।

দুই মাস চৈতন্য বারাণসীতে অবস্থান করেন। এই অবসরে সনাতনকে তাঁহার নব-প্রবর্তিত ব্রজরস সাধনায় ব্রতী করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবী শাস্ত্রকারের প্রস্তুতি শুরু হইল।

সাধক সনাতন দৈন্য ও বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ। গৌড়ের বাদশাহের প্রধান সচিব আর কন্থা-করঙ্গধারী, রাজৈশ্বর্য ছাড়িয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যে এ দৃশ্য দেখে, বিস্মিত হইয়া যায়।

চৈতন্যের প্রেমভক্তির প্রচার কাশীতে এবার কিছুটা শুরু হয়। প্রথমটায় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ধরিয়া নেন এক ভাবুক সাধকরূপে। তাঁহার ভাবাদর্শ ও সাধনপদ্ধতিকেও ইঁহারা তেমন সুচক্ষে দেখেন নাই। পরে প্রভুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়া, ভক্তদের ভক্তি ও বৈরাগ্য দেখিয়া সকলে সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

কাশীতে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দের তখন বড় প্রতাপ। বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার শিষ্য। আশ্রমে সর্বদা বেদবেদান্তের শিক্ষার্থীর ভিড়। চৈতন্যের কথা প্রবোধা-নন্দ শুনিয়াছেন, কিন্তু গুরুত্ব তেমন কিছু দেন নাই। বরং নিজের সভায় একদিন তাঁহার সম্বন্ধে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপই তিনি করিলেন।

সেদিন বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া প্রভু এক মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণে আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি মহা পুলকিত। সঙ্গীগণসহ উৎসাহে ও আনন্দে নামকীর্তনে মত্ত হইলেন, প্রেমভক্তির রসতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। জনসমাগমও কম হইল না। প্রবোধানন্দ কয়েকটি শিষ্যসহ এদিক দিয়া যাইতেছিলেন, কীর্তনের মধুর স্বর তাঁহাকে টানিয়া আনিল।

নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে চৈতন্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। অশ্রুকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল সারা দেহে। তারপর ধীরে ধীরে একেবারে সংবিৎহারা হইয়া পড়িলেন। জীবনের কোনো লক্ষণই নাই। প্রবোধা-নন্দ তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত!

বিচার-নিপুণ, মায়াবাদী আচার্য প্রবোধানন্দ। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ রূপ আর প্রেমার্তি আজ তাঁহাকে কোন্ জাদুমন্ত্রে বশ করিয়া

ফেলিয়াছে ? বিদ্যা, প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস আচার্যের অসামান্য। কিন্তু সব কিছুই যে এই মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে দর্শনের পর একাকার হইয়া গেল!

প্রভু ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এবার শুরু হইল তাঁহার কৃষ্ণবিরহের বিলাপ ও কান্না। এ কান্না যেমন আবেগময়, তেমনি মর্মন্তুদ। শুষ্ক, জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীর হৃদয়কে ইহা মথিত করিয়া ফেলিল। নয়ন দুইটি বার বার অকারণে হইয়া উঠিতেছে অশ্রুসজল। নিজের অজ্ঞাতসারে চৈতন্যের অলৌকিক প্রেমে তিনি বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া প্রভু এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। প্রবীণ বৈদান্তিকের দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

আচার্য প্রবোধানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, সে কি কথা! এমন প্রেমসিদ্ধ মহাপুরুষের প্রণাম নেওয়া যে মহা-অপরাধ! তাড়াতাড়ি তখনি তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন।

প্রভু করজোড়ে কহিলেন, "যতিবর, এ আপনি কি ক'চ্ছেন? জগৎগুরুর মতো আপনার মর্যাদা, আর আমি আপনার শিষ্যের শিষ্য হবার যোগ্য। আমায় প্রণাম ক'রে অপরাধী করবেন না।"

প্রবোধানন্দ এবার দৈন্যভরে উত্তর দিলেন, "না জেনে আপনাকে কত উপহাস করেছি, নিন্দাবাদও কম করি নি। পদধূলি নিচ্ছি সেই সব দোষ স্খালনের জন্য।"

এবার শুরু হয় উভয়ের ধর্মালাপ। আগে হইতেই প্রভুর অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে প্রবোধানন্দ পর্যুদস্ত হইয়া আছেন, প্রভুর ভাবময় ব্যক্তিত্বের স্পর্শ করিয়াছে তাঁহাকে সম্মোহিত। এবার তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাস-সূত্রের অপরূপ ভক্তিব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কোন্ মহাভাবের স্ফুরণ চৈতন্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন, অবিলম্বে করিলেন আত্মসমর্পণ।

প্রভুর কৃপায় মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীরূপে প্রবোধানন্দের রূপান্তর ঘটে। তাঁহার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তদের প্রভাবে কাশীতে এ সময়ে প্রেমভক্তি ধর্ম কিছুটা ছড়াইয়া পড়ে।

চৈতন্য এবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, ভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল। এখন হইতে জগন্নাথধামে তিনি একাদিক্রমে অবস্থান করেন আঠার বৎসর।

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির মিলনভূমি এই সাগরচুম্বিত অঞ্চল। দারুব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম এখানে যুগযুগান্ত ধরিয়া অধিষ্ঠিত। এ পৌরাণিক মহাধামে বসিয়া প্রভু এবার তাঁহার ঈশ্বরনির্দিষ্ট লীলা উদ্‌ঘাটিত করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের বুকে শুরু হইল তাঁহার প্রেমধর্মের রস-বর্ষণ।

অধ্যাত্ম-ভারতের বিস্মিত দৃষ্টি নৃত্য-কীর্তনপর এই যুগপুরুষের উপর পতিত হইল, আর নীলাচলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন সচল জগন্নাথরূপে। অন্তরঙ্গ ভক্তজনের প্রভু এইবার হইলেন লক্ষ লক্ষ মানবের আরাধ্য—মহাপ্রভু।

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, অগণিত তীর্থকামী মানুষের স্রোত জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া চলিয়া যায়। দূর-দূরান্ত হইতে আগত পুণ্যার্থী নরনারীর দল অচল আর সচল—দুই জগন্নাথই দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরে।

প্রভু চৈতন্যের নর্তন-কীর্তনের মাধুর্য দেখিয়া দর্শনার্থীরা আনন্দমগ্ন হয়, অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখিয়া বিস্ময় তাহাদের চরমে উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের একি আর্তি, একি বিরহ-দহন, এই মহামানবের মধ্যে! এ প্রেমের অদ্ভুত সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়ে দিগ্‌দিগন্তে।

প্রভুর এক একটি পরিকর তাঁহার প্রেমসাম্রাজ্যের এক একটি দিক্‌পাল। ভক্তি ও প্রেমের আলোক, ত্যাগ বৈরাগ্যের অপরূপ মহিমায়, উঁহারা সমুজ্জ্বল। এই বৈষ্ণব সাধক-দের বৈরাগ্যের আচার-আচরণ ও জীবনসাধনার প্রভাব সেদিন চারিদিকের মানুষের উপর সারা সমাজের উপর বিস্তারিত হইতে থাকে।

নামপ্রেম-সর্বস্ব প্রবীণ ভক্ত হরিদাস বাস করেন নগরীর এক প্রান্তে। ত্যাগ ও দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। প্রভু ও ভক্তগণ তাঁহাকে মহাবৈষ্ণব মনে করিলে কি হয়, মুসলমান কুলে জন্ম ব'লয়া স্বেচ্ছায় কখনো তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন না, পাছে স্পর্শদোষ কাহারো গায়ে লাগে। কৃষ্ণনাম রসে আর কৃষ্ণভাবনায় তিনি থাকেন সদা বিভোর। রোজ তিন লক্ষ নামজপ সমাপ্ত করেন, আর দূর হইতে মন্দিরের চূড়ার দিকে চাহিয়া নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। প্রভু রোজই জগন্নাথের উপলভোগ দর্শনের পর হরিদাসের তত্ত্ব নিতে আসেন। পরমভক্তের সম্মুখে বসিয়া সানন্দে করেন ইষ্টগোষ্ঠী।

সেবার রূপ গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, প্রভুর সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাইবে। মুসলমান বাদশাহের সচিব ছিলেন এতকাল, দরবারে ভিন্ন ধর্মীদের সাথে অন্তরঙ্গতার সহিত কাটাইতে হইতেছে। তাই বৈষ্ণবীয় দৈন্যে নিজেকে মনে করেন অস্পৃশ্য। দীনভক্ত হরিদাসের কুটিরই হয় তাঁহার বাসস্থান।

প্রতিভাধর কবি রূপ রাধাকৃষ্ণ লীলা-নাট্য লিখিতেছেন। প্রভুর তাহাতে মহা উৎসাহ। স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তসহ রোজ রূপের কাব্যরস তিনি আস্বাদন করেন। প্রেমানন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। প্রভুর প্রেরণায় ও শক্তি সঞ্চারণে রূপ রূপান্তরিত হন লীলারসতত্ত্বের এক প্রধান সংবাহকরূপে। কয়েক মাস পরে প্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন।

ইহার পর সনাতন উপনীত হন প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য। ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া তিনি আসিয়াছেন, সেখানকার দূষিত জল পান করিয়া দেহে দেখা দিয়াছে দুরারোগ্য চর্মরোগ।

ভক্ত হরিদাসের কুটিরেই সনাতন অবস্থান করিতেছেন। প্রভু প্রতিদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে ও হরিদাসকে দেখিতে আসেন। কাছে আসিলেই, পরমানন্দে সনাতনকে আলিঙ্গন না দিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। কণ্ডুর ক্লেদ ও পুঁজ তাঁহার গায়ে রোজই লাগিয়া যায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

সনাতন কিন্তু মরমে মরিয়া যান। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলেই পিছু হটিয়া গিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "প্রভু, পায়ে পড়ি, আমায় ছোঁবেন না, ছোঁবেন না। এমনিতেই অস্পৃশ্য আমি। তার ওপর হয়েছে জঘন্য চর্মরোগ। আপনার দেবদুর্লভ দেহে এর ক্লেদ লাগে তা আমার সহ্য হয় না।"

কিন্তু প্রভুকে নিরস্ত করে কাহার সাধ্য? সবলে প্রিয় ভক্তকে বুকে টানিয়া নেন।

হাসিতে হাসিতে বলেন, "সনাতন, তুমি পরমত্যাগী মহাবৈষ্ণব, আমি যে তোমার দেহ স্পর্শ করতে আসি নিজে পবিত্র হবার জন্যে।"

বড় কঠিন সমস্যা সনাতনের। চৈতন্য তাঁহাকে নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে দিবেন না, আবার আলিঙ্গনও রোজ তাঁহার করা চাই। ফলে শ্রীঅঙ্গ তাঁহার ক্লেদাক্ত হয়। এ বড় দুঃসহ। সনাতন মনে মনে স্থির করলেন, তাঁহার যে ঘৃণ্য দেহ দ্বারা প্রভুর পবিত্র দেহ কলুষিত হইতেছে, তাহাই এবার শেষ করিবেন। সম্মুখে রথযাত্রার উৎসব। সেই সময়েই রথচক্রতলে প্রাণ বিসর্জন দিবেন।

প্রভু সর্বজ্ঞ। বলা বাহুল্য, তাঁহার কাছে সনাতনের এ গোপন সঙ্কল্প অজ্ঞাত রহে নাই। সেদিন হরিদাসের কুটিরে আসিয়া কহিতে লাগিলেন, "সনাতন, এ ভ্রান্তবুদ্ধি ছাড়ো। মনে রেখো, দেহ নাশ করলে কখনো কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না, কৃষ্ণ মিলে ভক্তি আর প্রেমে। তাছাড়া, একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছো। এ দেহ তো তোমার নয়। যেদিন থেকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছো সেদিন থেকে তোমার দেহে হয়েছে আমারই অধিকার। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ সঙ্কল্প তুমি ছেড়ে দাও।"

সনাতন বুঝিলেন, তাঁহার চিন্তার সূক্ষ্মতম তরঙ্গটির খোঁজ অন্তর্যামী প্রভু রাখেন। তাঁহাকে এড়ানোর চেষ্টা বৃথা।

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায়, প্রভুর প্রসাদে সনাতনের ব্যাধি নিরাময় হইয়াছে, সারা দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে দিব্যকান্তি।

প্রায় এক বৎসর কাল সনাতনকে নিজের কাছে রাখিয়া, প্রেমসাধনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ দিয়া প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। কহিলেন, "তুমি আর রূপ ব্রজমণ্ডলে থেকে, লুপ্ত তীর্থগুলোর উদ্ধার সাধন করো। বৃন্দাবনের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্মৃতিকে জনচিত্তে উজ্জ্বলতর ক'রে তোল। বৈষ্ণবধর্মের শাস্ত্র-ভিত্তি গড়ে উঠুক তোমাদের চেষ্টায়।"

রূপ, সনাতন ও তাঁহাদের উত্তরসাধকগণও দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপনে সফল হন। কন্থা-করঙ্গধারী এই কাঙাল বৈষ্ণবদের ছত্রচ্ছায়ায় হাজার হাজার বৈষ্ণব আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চৈতন্যের সংগঠন-ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি থাকিবার যো নাই। নিজে তিনি বিরাজমান নীলাচলে। প্রেমধর্মের তিনি মূল উৎস। তাঁহার রসোজ্জ্বল, করুণাঘন মূর্তি হইতে দিগ্‌দিগন্তে প্রেমরসধারা বিস্তারিত হইতেছে, আর অগণিত মানবের জীবনে ঘটিতেছে ভক্তি ও প্রেম সাধনার অপরূপ বিকাশ।

তাঁহার ত্যাগী, শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ পরিকরদের প্রভু পাঠাইয়াছেন বৃন্দাবনধামে। লোকনাথ ও ভূগর্ভপণ্ডিত অনেক আগে হইতেই তাঁহার নির্দেশে ব্রজমণ্ডলে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন। এবার সেখানে পৌঁছিলেন দুই প্রধান পার্ষদ রূপ ও সনাতন। পরবর্তীকালে রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি শক্তিমান্ বৈষ্ণব সাধকদের সেখানে পাঠাইয়া বৃন্দাবনধামে তিনি এক বিরাট কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন।

সমগ্র ভারতের অধ্যাত্মজীবন ব্রজমণ্ডলের এই গোস্বামীদের দ্বারা সে সময়ে প্রভাবিত হইয়া উঠে।

ভক্তি-আন্দোলনের অপর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রটি প্রভু রচনা করেন গৌড়দেশে। অভিন্ন-হৃদয় নিত্যানন্দকে তিনি এখানকার নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর তাঁহার সহযোগিতায় ব্রতী

হন অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, মুরারি, নরহরি, রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি বহু-পরীক্ষিত সাধকগণ।

লৌকিক আর অলৌকিক, এই দুই লীলাই নিজে প্রভু নীলাচলের মহাধামে প্রকটিত করিতে থাকেন। গৌড়ে বা ব্রজমণ্ডলে তিনি যান না বটে, কিন্তু বহু ভক্ত সেখানে থাকিয়াই তাঁহার অলৌকিক দর্শন পাইয়া ধন্য হয়। কখনো জননী শচীদেবীকে ঠাকুরঘরে, কখনো বা নিত্যানন্দের কীর্তনসভায় সূক্ষ্মদেহে প্রভুকে দেখা যায়। শ্রীবাসের অঙ্গনে ও পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনেও ঘটে বার বার তাঁহার আবির্ভাব। তাছাড়া বৃন্দাবনের তপস্যারত গোস্বামীদের জীবনেও প্রভুর অলৌকিক দর্শনাদি কম ঘটে নাই।

রথযাত্রার আগে গৌড়ীয় ভক্তেরা প্রতিবৎসর নীলাচলে উপনীত হন। প্রভুর নিবিড় সান্নিধ্যে কয়েকটি মাস তাঁহারা আনন্দে কাটাইয়া যান। বড় সহজ ভঙ্গিতে, বড় সহজ-ভাবে এই ভক্তেরা তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। তাই প্রভুকে ইঁহাদের আদরের কত অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়।

ভারে ভারে কত বস্তু এই গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর জন্য বহিয়া আনেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 'রাঘবের ঝালি'। রাঘব পণ্ডিতের স্ত্রী দময়ন্তীদেবীর প্রভুর প্রতি নিবিড় বাৎসল্যভাব। ধৈর্যের সহিত বহু পরিশ্রমে তিনি শত শত উপাদেয় খাদ্য তৈরি করেন। নানা রকমের শুষ্ক দ্রব্য ঘৃত ও চিনির পাকে ফেলিয়া এ সব প্রস্তুত হয়। প্রভু যাহাতে নীলাচলে বসিয়া মাসের পর মাস এগুলি ভোজন করিতে পারেন সেজন্য স্ত্রী ভক্তদের যত্ন, শ্রম ও কৌশলের অবধি নাই।

নীলাচলের মন্দির আর বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব প্রায় প্রতিদিন লাগিয়াই আছে। এসব উৎসবের দিনে প্রভুর লীলারঙ্গ হয় অফুরন্ত, ভক্তদেরও তেমনি আনন্দের অবধি থাকে না। নানারূপে, নানাভাবে, নানারসে তাঁহারা প্রভুর মোহনমূর্তি দেখেন, আর আত্মহারা হন।

জগন্নাথের গুণ্ডিচাবাড়ি মার্জন চৈতন্যের এক অপরূপ সেবালীলা। পুরীর রাজার কাছে এ কার্যভার তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। প্রতি রথযাত্রার আগে নিজ সম্মার্জনী হস্তে এই দেবস্থান পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হন। শত শত ভক্ত জলের ভাঁড় ও ঝাঁটা হস্তে তাঁহার সঙ্গে এই মার্জন-কর্মে লাগিয়া যায়। প্রভুর নৃত্য কীর্তনে এ অনুষ্ঠান রূপায়িত হইয়া উঠে মনোজ্ঞ উৎসবে।

রথযাত্রার দিনে দেখা যায় চৈতন্যের দিব্য ভাবাবেশ। চারিদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়। রমণীয় বেশ-ভূষা ও আভরণে ভূষিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ রথে উপবিষ্ট আর উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র সম্মার্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্য হইতেছেন এই বিরাট উৎসবের মধ্যমণি। কীর্তনানন্দে তিনি তখন মাতোয়ারা। মহাভাবে প্রমত্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন, আর দীর্ঘ সুন্দর সুঠাম দেহটি তরঙ্গায়িত হইতেছে। কনকদণ্ডের মতো ভুজদ্বয় ঊর্ধ্বে প্রসারিত। দুই নয়নে বহিতেছে অশ্রুর প্লাবন। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া জনতার উল্লাসের অবধি নাই। শুধু এই উৎসবক্ষেত্রই নয়, সমগ্র শ্রীক্ষেত্র এইদিন প্রভুর নর্তনে ও আনন্দাবেশে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। রথারূঢ় দারুব্রহ্মও যেন সর্বসমক্ষে হইয়া উঠেন চৈতন্যময়।

প্রতি বৎসরই রথযাত্রার সময় প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা, উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানের ভক্ত ও অনুরাগীদের মিলন ঘটে। ভক্তজন-হৃদয়ের এই মহাসঙ্গমে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। তারপর পুলকাঞ্চিত দেহে, অশ্রুসজল নয়নে, প্রভুর পুণ্যময় স্মৃতি বক্ষে নিয়া আবার তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করে।

কৃষ্ণকথা ও প্রেমাবেশে প্রভু সদা বিভোর থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিত্যকার দিনচর্যায় কোনো ফাঁক পড়ার উপায় নাই। প্রত্যূষে ভজন ও কীর্তনের পর জগন্নাথ দর্শনে যান, তারপর প্রিয় ভক্ত হরিদাসের কুটিরে আসিয়া করেন ইষ্টগোষ্ঠী। সাঙ্গোপাঙ্গসহ কোনোদিন সমুদ্রে, কোনোদিন বা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলকেলি করিয়া কুটিরে ফিরেন।

পুরীর একপ্রান্তে টোটা-গোপীনাথে প্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধরের ভজন-স্থান। এই প্রেমিক ভক্তের সেবানিষ্ঠার ফলে গোপীনাথ বিগ্রহ সেখানে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। গদাধরের ভাগবত পাঠও বড় মধুর। ভক্তদলসহ প্রতিদিন তাই প্রভু উপস্থিত হন কৃষ্ণকথার রসস্রোত সেখানে বহিয়া যায়।

প্রতি রজনীতে জগন্নাথ-মন্দিরের আরতি দর্শনের পর নয়নজলে বুক ভাসাইয়া চৈতন্য ঘরে ফিরেন। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সাগ্রহে আসিয়া জুটেন। কীর্তন, শ্লোকপাঠ ও রসতত্ত্বের বিচার শুরু হয়, আর রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণে প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠে।

মধুর ভজন, রাগানুগা ভজনের আদর্শ চৈতন্য প্রচার করেন, আর এ প্রচার তিনি করেন নিজ জীবনলীলার মাধ্যমে। গুটিকয়েক শ্লোক রচনা ছাড়া কোনো ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করেন নাই। উপদেশ দানেও তেমন উৎসাহী কখনো ছিলেন না, এমন কি একটি ভক্তকেও তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেন নাই। তবুও শত-সহস্র মানুষ তাঁহার দিকে কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটিয়াছে—সান্নিধ্যে আসিয়া, তাঁহার স্পর্শ পাইয়া পরিণত হইয়াছে একেবারে নূতন মানুষে। ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে প্রেমধর্মের সংবাহক এক বিরাট ভাগবত-গোষ্ঠী। এ দেশের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের উপর প্রভু শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পার্ষদদের প্রভাব হইয়াছে সুদূর প্রসারী।

নিজ জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া প্রভু অপূর্ব ভজনাদর্শ স্থাপন করেন। আনন্দঘন, রসঘন পরমতত্ত্বের যে কথা শ্রুতিতে আছে, সে তত্ত্ব সে মাধুর্যের ধারা ছড়াইয়া দেন তিনি দেশের জনজীবনের ক্ষেত্রে। তাঁহার লৌকিক ও অলৌকিক জীবনে প্রতিফলিত হইয়া প্রেমধর্ম হয় প্রাণবন্ত, বহুবিস্তৃত।

প্রভু কহেন,—'মাধুর্য ভগবত্তা-সার'। শ্রীভগবান অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁহার মাধুর্যের অনুগত।

জীবের কাছে প্রভুর বাণী এক পরম আশ্বাস নিয়া উপস্থিত হয়। এ বাণী ঘোষণা করে—ভগবান শাস্তিদাতা নন, তাঁহাকে ভয় করিবার কিছুই নাই, তিনি পরম করুণ, পরম প্রেমিক। তাঁহার নাম স্মরণ তো দূরের কথা, তাঁহার নামাভাসেই পাপতাপ দূরে যায়। মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধার সাধন করা যে ভগবানেরই নিজ কাজ। এজন্য তিনি নিজেই সদাউৎকণ্ঠিত, কারণ 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব'।

প্রভুর মতে—জীব ভগবানের নিত্যদাস, ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ আর এই সম্বন্ধেরই মধ্য দিয়া সে ভগবানের স্বরূপ ও মাধুর্যের আস্বাদন পাইতে পারে।

নামকীর্তন বিগ্রহ-সেবা, আর নিরন্তর ব্রজধামের রাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মনন—এই সাধনকর্মের মধ্য দিয়া তাঁহার এই নব প্রচারিত মধুর ভজনের ভিত্তিটি প্রস্তুত হইতে থাকে।

প্রভুর প্রেম-ভক্তির ধর্ম জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই ধর্ম-আচরণে আহ্বান জানায়—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ —চৈঃ চঃ

এই তো গেল ভক্তিসাধনার সাধারণ অধিকারীদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের উদারতার কথা। সাধনার নির্দেশদাতা গুরুর বেলায়ও তাঁহার মন কম সংস্কার-মুক্ত নয়। তিনি প্রচার করিলেন—

কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণবেত্তা, সেই গুরু হয়।

তাই প্রভুর ভাগবতগোষ্ঠীতে নরহরি সরকার বৈদ্যবংশীয় হইয়াও এক পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যরূপে সম্মানিত। ভক্ত হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব বৈষ্ণবের প্রণম্য প্রভুর নাম প্রচারের মহান্ ব্রতে তিনি অগ্রগণ্য। শুধু তাহাই নয়, শূদ্র রামানন্দ রায়ের মুখ দিয়াই প্রভু নিজে তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্বপ্রেমের প্রকাশ করিয়াছেন। সমসাময়িক কালের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের উপর তাঁহার এ উদার নীতির প্রভাব দ্রুত বিস্তারিত হইতে থাকে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত ভজন পদ্ধতির অভিনবত্ব বড় কম নয়। আবার এ ভজন যেমন আকর্ষণীয় তেমনি সহজসাধ্য। দেশ-কাল পাত্র নির্বিশেষে সকলে ইহা গ্রহণ করিতে পারে। বিগ্রহসেবা ও ভক্তি অঙ্গের যেসব অনুষ্ঠান এ পন্থায় করিতে হয় তাহার ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষ ক্রমে ক্রমে ঘটিতে থাকে। নামে রুচি আর কৃষ্ণপ্রেম সাধক-জীবনে বৃদ্ধি পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা এবং সর্ব আকর্ষণ খসিয়া ঝরিয়া পড়ে জীর্ণ বৃক্ষবল্কলের মতো।

কৃষ্ণপ্রেম লাভের সহজ ও স্বচ্ছন্দ পথটির কথা শ্রীচৈতন্য নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

যেরূপ করিলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি॥ —চৈঃ চঃ

এই প্রেমধর্মের নিগূঢ় ও সদা-অনুষ্ঠেয় ভজনাঙ্গ হইতেছে অষ্টকালীন লীলা স্মরণ। এ লীলা রসময় বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের লীলা। ভাগবত লীলা তিনি বিস্তারিত করিয়া নিয়াছেন নর বপুর মাধ্যমে। যেমন তাঁহার সর্বাতিশায়ী মাধুর্য, তেমনি তাঁহার অপার রস-বৈচিত্র্য। সাধকজনের চিত্ত অতি সহজেই এ রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, অষ্টপ্রহর কৃষ্ণের

নানা আচরণ ও লীলারসের স্মরণ মননে তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এ ব্যগ্রতা তাঁহার নিজের আচার-আচরণ বা নিজের ঘর-সংসারের জন্য নয়—কৃষ্ণের সংসারই তাঁহাকে ব্যাকুল করে। ক্রমে তিনি ডুবিয়া যান কৃষ্ণ প্রেমরসের সাগরে।

প্রভুর এ ভজন-পন্থায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক সম্পর্কটি। 'আমি ভগবানের', এ ভাব নিয়া এ মধুর সাধন করা হয় না। এ সাধনে রহিয়াছে, 'ভগবান আমার'—এই ভাব। নব কিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টরূপে এখানে সংস্থাপিত, আর জীবের কাজ তাঁহার আনন্দ বর্ধন করা, লীলাসুখ উৎপাদন করা। তাই মধুর ভজনের সাধকের কাছে 'তিনি আমার' এই কথাটিই বড়। ভগবানের প্রীতিবিধান করার ভেতরেই যে রহিয়াছে ভক্তের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বড় সাধনা। এই মদিরতা-ভাবকেই প্রভু করিলেন তাঁহার সাধনার ভিত্তি।

ভক্তপ্রবর রঘুনাথ দাস সে-বার প্রভুর চরণে আশ্রয় নিতে নীলাচলে আসিয়াছেন। সপ্তগ্রামের অধিকারীরা তখন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার। ধনাঢ্য ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া ইঁহাদের বিরাট খ্যাতি। রঘুনাথ এ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু তরুণ বয়সেই তাঁহার বিষয়বিরক্তি দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্বেই তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তখন তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। কিছুদিন আগে নিত্যানন্দের করুণা রঘুনাথের ভাগ্যে মিলিয়াছে। এবার বিপুল বিষয় ও সুন্দরী তরুণী ভার্যাকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া তিনি বৈরাগ্যময় সাধনার পথে পা বাড়াইয়াছেন।

নীলাচলে চৈতন্য একদিন ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, ভক্তপ্রবর রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকরকে চিনিয়া নিতে প্রভুর দেরি হইল না। স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া তখনই নবাগত ভক্তের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। তাছাড়া, ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, রঘুনাথকে যেন তাঁহার প্রসাদান্ন রোজ দেওয়া হয়।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। রঘুনাথের অন্তরে তখন বৈরাগ্যের তীব্র আগুন জ্বলিতেছে। ভাবিলেন, এভাবে প্রভুর প্রসাদান্ন খাইয়া আরামে জীবন ধারণ করা আর নয়, এবার হইতে মন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন।

উপর্যুপরি কয়েকদিন রঘুনাথকে প্রভু প্রসাদ ভোজন করিতে দেখেন নাই। সেদিন গোবিন্দকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোবিন্দ উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি তো রঘুনাথকে তোমার থালার ভোজনাবশেষ বার বারই দিতে চেয়েছি। কিন্তু তিনি স্থির ক'রে বসেছেন, দীন দরিদ্র বৈষ্ণবের মতো ভিক্ষে ক'রেই খাবেন, আর এ ভিক্ষে তিনি সংগ্রহ করবেন সিংহদ্বার থেকে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, গভীর রাতে জগন্নাথের সেবার শেষে গৃহস্থেরা যখন ঘরে ফিরে যায়, রঘুনাথ একপাশে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। কেউ কেউ দোকানীদের থেকে অন্ন কিনে তাঁকে দেয়। এইভাবেই আজকাল তাঁর দিন চলছে।"

মনে মনে প্রভু বড় খুশী হইলেন। তখনকার দিনের বার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। সমগ্র গৌড়দেশে ধনে-মানে তাঁহার তুলনীয় কেহ নাই। সিংহদ্বারে আপামর জনসাধারণের কাছে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ানো তাঁহার মতো লোকের পক্ষে কম কথা নয়। এ তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও অভিমানশূন্যতারই নিদর্শন।

প্রভু এ সময়ে বৈরাগ্যের প্রশস্তি জানাইয়া যে কথাগুলি কহিলেন, তাহা শুধু বৈষ্ণবদের কাছেই নয়, সর্বকালের সর্বসাধকদের কাছে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর রসে হয় বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্তন।
শাক-পত্র-ফল মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি চায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ —চৈঃ চঃ

ভক্ত রঘুনাথদাসের এই কৃচ্ছ্রব্রত, এই ভিক্ষাবৃত্তির কথা সপ্তগ্রামে গিয়া পৌঁছিল। পিতা গোবর্ধনদাস এ সংবাদ পাইয়া মরমে মরিয়া গেলেন। ভাবিলেন, একি অদ্ভুত পাগলামি রঘুনাথ করিতেছে? এ উঞ্ছবৃত্তি না করিলে কি সাধনভজন হয় না? পুত্রের জন্য অবিলম্বে তিনি চারিশত মুদ্রা ও একটি পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ কিন্তু মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, বৈরাগ্যসাধনের দ্বারা মুক্তি লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার পণ। তাই এই টাকা তাঁহার নিজ কার্যে ব্যয় করার তো উপায় নাই। আবার ভাবিলেন, নীলাচলের অনেক ভক্তই তো মাঝে মাঝে প্রভুকে যত্ন করিয়া ভোজন করায়, কৃতার্থ বোধ করে। তিনিও বরং তাহাই করিবেন। এই অর্থ প্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইবে।

রঘুনাথের ভজন কুটিরে মাঝে মাঝে প্রভুর নিমন্ত্রণ চলিতেছে। হঠাৎ একদিন কিন্তু তাঁহার মনে এক ধাক্কা লাগিল। ভাবিলেন, 'ছি ছি—এ আমি কি করছি? বিষয়ীর অর্থে ক্রয় করা যে অন্ন, তাই আমার প্রভুকে নিবেদন করছি। না—আর তো এ কাজ করা হবে না।'

রঘুনাথের নিমন্ত্রণ আজকাল আর হয় না। প্রভু সব কথাই জানেন, তবুও অজ্ঞতার ভান করিয়া স্বরূপকে সেদিন প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা স্বরূপ, ব্যাপার কি বল তো? রঘুনাথ তার ওখানে আমায় আর ভিক্ষা গ্রহণে ডাকছে না কেন?"

স্বরূপ উত্তরে রঘুনাথের মনোভাব জানাইলেন।

প্রভু উৎসাহভরে কহিয়া উঠিলেন, "স্বরূপ, রঘুনাথ তো বড় ভাল কাজ করেছে। সত্যই তো। বিষয়ীর অন্ন খেলে যে মন মলিন হয়। আর, মন মলিন হলে কৃষ্ণের স্মরণও সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, বিষয়ীর অন্নের আরও একটা বড় ত্রুটি আছে। রাজসিকতা থাকে এতে জড়িত। তাই দাতা আর ভোক্তা দু'য়েরই মন এতে মলিন না হয়ে পারে না। রঘুনাথ মনে ব্যথা পাবে ব'লে আমি এতদিন তার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আসছি। ভালই হয়েছে, এবার নিজের সব কিছু জেনে সে এটা ত্যাগ করলো।"

ইহার পর রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভুর সদাসতর্ক দৃষ্টি

কিন্তু তাহার উপর নিবদ্ধই রহিয়াছে। কোনো কিছু তাঁহার অজানা নয়, তবুও সেদিন কহিতে লাগিলেন, "ভাল কথা, শুনছি রঘুনাথ সিংহদ্বারেও আজকাল আর ভিক্ষা নিতে যায় না। তবে আহারের যোগাড় করছে কোথায় গিয়ে?"

স্বরূপ দামোদর জানাইলেন, "প্রভু, সে এখন থেকে ছত্রে গিয়ে ভিক্ষুকদের সঙ্গে বসে অন্ন গ্রহণ করছে।"

গম্ভীর কণ্ঠে চৈতন্য উত্তর দিলেন, "ভালই করেছে। ভিক্ষে যদি করতেই হয় এক কোণে বসে করাই ভালো। সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, সে যে বেশ্যাবৃত্তিরই মতো। ওরকম জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে দাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো ভালো নয়।"

রঘুনাথের ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধন-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রভুর বড় আনন্দ। বৃন্দাবন হইতে আনীত গুঞ্জমালা ও গোবর্ধন-শিলা দান করিয়া তিনি তাঁহাকে সংবর্ধিত করিলেন। নবভক্ত রঘুনাথের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা রহিল না।

হৃদয়ে তাঁহার সদাই জাগে এক ভাবনা। বিষয়-কূপে এতকাল অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন, বাসনার পংক ছড়ানো ছিল তাঁহার সারা দেহে মনে। চরম দৈন্য ও কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্য দিয়া সে মালিন্যের শেষ চিহ্নটুকু তিনি মুছিয়া ফেলিতে চান। ধ্যান, ভজন ও লীলা স্মরণে কোথা দিয়া দিন রাত চলিয়া যায়, হুঁশ থাকে না।

এখন হইতে যেভাবে তিনি উদরপূর্তি করিতে থাকেন তাহা বড় বিস্ময়কর। জগন্নাথমন্দিরের কোণে বহু পসারি প্রসাদান্ন বিক্রয় করে। রোজই সবটা বিক্রয় হয় না, বাসি হইলে এগুলি তাহারা তেলেঙ্গা গাভী দলের সামনে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। ঐ গাভী-দের খাওয়া হইয়া গেলে অবশিষ্ট অন্নকণিকা রঘুনাথ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া আনেন। এক একটি করিয়া দানা ধুইয়া নেন। তারপর গভীর রাত্রে ভজন কুটিরে ইহাই হয় তাঁহার সারা দিনরাতের আহার।

স্বরূপ ও গোবিন্দের মুখে চৈতন্য রঘুনাথের আহার-কৃচ্ছ্রের কথা শুনিলেন। অন্তরে তাঁহার পরম আনন্দ—রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনা সত্যই তবে সার্থকতার দিকে যাইতেছে। একদিন নিজে আসিয়া তিনি অতর্কিতে রঘুনাথের এই অদ্ভুত আহার্যের উপর হাত দিলেন। সোল্লাসে কহিলেন, "আচ্ছা রঘুনাথ, এ উপাদেয় প্রসাদ তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করছো? এমনটি তো আমি কোনোদিনই পাইনে।"

ভয়প্রস্ত রঘুনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। এ যে রাজপথ হইতে কুড়াইয়া আনা অন্নকণা। শেষকালে এই বস্তুই পড়িবে প্রভুর শ্রীমুখে। ক্ষণপরেই বুঝিয়া নিলেন ইহা প্রভুর কৃপা-লীলা। এই কদন্ন গ্রহণের জন্য হাত বাড়ানোর মানে, রঘুনাথের দৈন্য ও বৈরাগ্যকে সর্বসমক্ষে সংবর্ধনা জানানো। পরমভক্তের গণ্ড বাহিয়া তাই আনন্দাশ্রুর ঢল নামিতে থাকে।

প্রভুর চোখেমুখে কিন্তু প্রসন্নমধুর হাসির ছটা। রঘুনাথের এ দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনই যে তিনি মনে মনে এতদিন চাহিয়াছেন। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চালনা করিয়াছেন চিরতরে পাশমুক্ত করার জন্য, কৃষ্ণ-প্রেমরসে নিমজ্জিত করার জন্য। সিক্ত করার জন্যই যে ভক্তকে এমন করিয়া রিক্ত করা।

সন্ন্যাসী, তরুণ বৈষ্ণবদের জন্য প্রভুর ছিল কঠোরতম বৈরাগ্য এবং কৃচ্ছ্রব্রতের ব্যবস্থা।

ইহাদের আচার-আচরণ বা সাধনজীবনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য তিনি কখনো সহ্য করিতেন না।

ভগবান আচার্য চৈতন্যের এক বিশিষ্ট ভক্ত। একদিন প্রভুকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু সরু ও সুগন্ধি চাল অবিলম্বে যোগাড় না করিলে তো চলিবে না। খোঁজখবর নিয়া জানিলেন, প্রভুর পরমভক্ত, শিখি মাহিতির ঘরে ভাল চাল রহিয়াছে।

ছোট-হরিদাস এক তরুণ বৈষ্ণব ভক্ত। সুকণ্ঠ গায়ক ও ভাবুক বলিয়া চৈতন্যের সে বড় প্রিয়পাত্র। ভগবান আচার্যের সহিতও তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা। আচার্য তাঁহাকে কহিলেন, "ভাই প্রভু আজ আমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন—আমি তাই বড় ব্যস্ত। তুমি আমার একটা উপকার করবে? শিখি মাহিতির ঘরে নাকি খুব ভাল চাল রয়েছে। আমার নাম ক'রে ওঁর বোন মাধবী দাসীর কাছ থেকে এখানি কিছুটা চাল নিয়ে এসো।"

প্রভুর ভোজনের আয়োজন। ছোট-হরিদাসের তাই উৎসাহের অন্ত নাই। তখনই ছুটিয়া গিয়া চাল নিয়া আসিলেন। ভগবান্ পণ্ডিতেরও আনন্দ আর ধরে না, সুগন্ধি সরু চালের অন্ন ও উত্তম ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া প্রভুকে আসনে বসাইলেন।

ভোজন করিতে করিতে চৈতন্য কহিলেন, "পণ্ডিত, তোমার সব রান্নাই আজ বড় উপাদের হয়েছে। আর সব চাইতে চমৎকার তোমার এই অন্ন। এমন সূক্ষ্ম, সুগন্ধি চাল তো এখন বড় একটা দেখা যায় না। কোথায় এ বস্তু পেলে?"

"প্রভু, এ চাল শিখি মাহিতির ঘরে ছিল। মাধবী দাসীর কাছ থেকে আজই চেয়ে আনা হয়েছে।"

"তাই নাকি? বেশ, বেশ। তা কে এ চাল সেখান থেকে মেগে আনতে গিয়েছিল।"

"প্রভু, আমি আয়োজনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই ছোট-হরিদাসই আমার হয়ে গিয়েছিল মাধবী দাসীর কাছে।"

নীরবে ভোজন সমাধা করিয়া প্রভু নিজ কুটিরে ফিরিলেন তারপর ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকিয়া গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "শুনে রাখো আজ থেকে ছোট হরিদাস যেন এ কুটিরে না ঢোকে, আমার দৃষ্টির সামনে যেন না আসে। আমি আর তার মুখ দেখবো না।"

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ প্রভুর এ কি কঠোর আদেশ। এমন তো বড় একটা দেখা যায় না। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন।

প্রভুর দ্বার ছোট হরিদাসের কাছে রুদ্ধ। দুঃসহ মর্মব্যথা নিয়া তরুণ ভক্ত কেবলই এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। তিনদিন যাবৎ তিনি উপবাসী। ভক্তেরা তাঁহার বিষাদ-খিন্ন মূর্তি দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু কিন্তু অচঞ্চল। মার্জনার কোনো লক্ষণই নাই।

স্বরূপ দামোদর একদিন সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "প্রভু, ছোট-হরিদাসের কি অপরাধ? কেনই বা তার এমন কঠিন দণ্ড?"

প্রভু সরোষে কহিলেন, "তবে শোন। বৈরাগী হয়ে যে নারী সম্ভাষণ করে, তার মুখ আমি কখনো দেখতে চাইনে। যত সব দুর্বল জীব। মর্কট বৈরাগ্য নিয়ে থাকে, আর সন্ন্যাসের ধর্ম বৈরাগী-জীবনের নির্দেশ না মেনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।"

ভক্তগণ চিত্রপুত্তলীর মতো বসিয়া রহিলেন।

শিখি মাহিতি আর তাঁহার ভগ্নী মাধবী দাসী প্রভুর একনিষ্ঠভক্ত। শুধু তাই নয়, ভক্তসমাজের ধারণা—চৈতন্যের মধুর সাধনার মর্মজ্ঞ, তাঁহার প্রেমরস ধারণের উপযুক্ত পাত্র, নীলাচলে রহিয়াছে শুধু সাড়ে তিনজন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি —এই তিনজন ছাড়া অপর অর্ধপাত্র—শিখির ভগিনী মাধবী। মাধবী দাসী বয়সে বৃদ্ধা। তাছাড়া, নীলাচলের ভাগবতসমাজে তাঁহার অপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কাছে প্রভুর জন্য দুটি চাল চাহিয়া আনিতে গিয়া আজ ছোট-হরিদাসের একি দুর্গতি!

কয়েকদিন অতীত হইল। ভক্তগণ সবাই মিলিয়া আবার চৈতন্যকে ধরিয়া বসিলেন। অনুনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভু, লঘু পাপে কেন ছোট-হরিদাসের এ গুরু দণ্ড? এবারকার মতো আপনি তাঁকে মার্জনা করুন।"

তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তোমরা যার যার কাজে যাও। এমন অনুরোধ আবার যদি কেউ কখনো করো, আমায় আর নীলাচলে দেখতে পাবে না, তা জেনো।"

নিজ সংকল্পে শেষ পর্যন্ত তিনি অটলই রহিয়া যান। ছোট-হরিদাস কিছুদিন পরে মনোদুঃখে ত্রিবেণীতে গিয়া আত্মবিসর্জন করেন। এই ঘটনায় নীলাচলের ভক্তবৈষ্ণব সমাজে সেদিন মহা চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। বৈরাগ্যসাধন সম্পর্কে প্রভুর এই কঠোরতা। সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে, নারী সম্ভাষণের ব্যাপারে সাধকগণ আরো সতর্ক হন।

তরুণ বৈরাগী ছোট হরিদাসের সম্মুখে প্রভুর এই বজ্রকঠোর মূর্তি আবার রায় রামানন্দের বেলায় ফুটিয়া উঠে তাঁহার অন্যরূপ। রামানন্দ শক্তিধর সাধক—প্রেমভক্তিরসের মহা অধিকারী পুরুষ। তাঁহার ক্ষেত্রে কিন্তু নারী সান্নিধ্যকে প্রভু মোটেই বিপজ্জনক মনে করেন নাই, কোনো নীতিকঠোরতাই দেখান নাই।

ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র একবার চৈতন্যকে বড় ধরিয়া পড়িলেন, প্রভুর শ্রীমুখ হইতে তিনি কৃষ্ণকথা শুনিবেন।

দৈন্য ও বিনয়ের অভিনয়ে প্রভু সুদক্ষ। কহিলেন, "মিশ্র, কৃষ্ণ কথার আমি কি জানি? যদি শুনতেই হয়, রামানন্দের কাছে যাও। লীলারসের তিনি ভাণ্ডারী। তাঁর মুখ থেকেই যে আমি শুনি।"

প্রদ্যুম্ন পণ্ডিত সেদিন রামানন্দ রায়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভৃত্যদের নিকটে শুনিলেন, রায় আজ বড় ব্যস্ত। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক রসমধুর নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন এ সময়ে তাহারই মহড়া চলিতেছে।

সেখানে বসিয়া মিশ্র অনেক সংবাদই সংগ্রহ করিলেন।—দুইটি পরম রূপসী তরুণী রোজ রামানন্দের কাছে নৃত্যগীত ও অভিনয় শিক্ষা করে। লীলানাট্যের অভিনয় যাহাতে জীবন্ত হইয়া উঠে সেজন্য রামরায়ের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। রোজ নিজ হস্তে তরুণী দেবদাসীদের মনোহর বেশে সাজাইয়া দেন। হাবভাব এবং কটাক্ষের গূঢ় অর্থ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের বুঝাইয়া থাকেন। সেবা বুদ্ধিতে রামরায় সদা বিভাবিত। নাটক তাঁহার কাছে নাটক মাত্র নয়—জীবন্ত লীলা। তাঁহার দৃষ্টিতে এ তরুণী দুইটি হইয়াছে নায়িকা।—কৃষ্ণসুখ বর্ধনের ভূমিকা তাহাদের, আর রামরায় এই নায়িকাদের সখা।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র সবই শুনিলেন। কিন্তু মনে তাঁহার বড় খট্‌কা লাগিয়া গেল। এ কেমন বৈষ্ণবের কাছে প্রভু পাঠাইয়াছেন?

কাজকর্ম সারিয়া বহু বিলম্বে রামানন্দ রায় দেখা করিলেন। সামান্য কিছু কথা-বার্তার পর মিশ্র পণ্ডিত সেদিন কিছুটা সন্দিগ্ধ মনেই ফিরিয়া আসিলেন।

প্রভুকে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সন্ন্যাসী—নারী দর্শন, স্পর্শন দূরের কথা নামও এড়িয়ে চলি, আর দ্যাখো রামরায়ের কি অপূর্ব শক্তি। রূপ-লাবণ্যময়ী তরুণীদের স্পর্শ ক'রেও নির্বিকার! তাঁর মতন সাধকেরই শুধু এ অধিকার রয়েছে। ভক্তি প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেই তাঁর এ উচ্চ অবস্থা।"

পরদিন মিশ্র আবার রামরায়ের ভবনে উপস্থিত। প্রভুর আদেশ রহিয়াছে, কৃষ্ণ কথা তাঁহাকে শুনাতেই হইবে, রামরায়কে তাই এদিন মুখ খুলিতে হইল। কৃষ্ণরসের মন্থনে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি একেবারে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন, আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠিল। রামরায়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের এবার আর ভুল হইল না।

চৈতন্য নিজে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধন-ভজন সম্পর্কে তাই তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। মধুর ভজন আর ভাবাবেশে মত্ত থাকিলে কি হয় নিজের আচার-আচরণকে তিনি কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া রাখেন। তাঁহার নিজ শিথিলতার ফাঁক দিয়া বা অন্য কোনো সূত্র ধরিয়া ভক্তগোষ্ঠীতে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ না করে, এজন্য তিনি থাকেন সদা সজাগ।

কলাগাছের একগাদা শুষ্ক খোলের উপর প্রভু রোজ শয়ন করেন। শয্যার উপকরণ হিসাবে অপর কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করিতে রাজী নন। অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে এজন্য বড় কষ্ট। সে-বার তিনি স্থির করিলেন, প্রভুর এখন কৃচ্ছ্রসাধন আর চলিতে দিবেন না।

শয্যাটি কোমল ও আরামপ্রদ করিতে হইবে, তাই সযত্নে তুলার নরম তোষক ও বালিশ তিনি তৈরি করাইলেন। প্রভুর গৈরিক বহির্বাসে জোড় দিয়া এগুলির আবরণ তৈরি করা হইল। পণ্ডিত ভাবিলেন, এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হইবে না।

শয়ন করিতে আসিয়াই চৈতন্য রোষে গর্জি'য়া উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, "কোনো রকমে নিজের সন্ন্যাসধর্ম আমি পালন-ক'রে যাচ্ছি, কিন্তু এরা দেখছি কিছুতেই তা করতে দেবে না। জগদানন্দ আমায় বিষয় ভোগ করাতে চায়, বিলাসে ডুবিয়ে ধর্মচ্যুত করতে চায়!"

শয্যার নূতন উপকরণ কুটিরের বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন অবিলম্বে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন।

প্রভুকে তো বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শান্ত করা হইল। কিন্তু ভক্তদের মনোব্যথা কি করিয়া দূর হয়? অবশেষে স্বরূপ দামোদরের মধ্যস্থতায় আপোসের এক সূত্র আবিষ্কার করা গেল। স্থির হইল, ভক্তগণ কদলী বৃক্ষের শুষ্কপত্র সরু করিয়া নখে চিরিয়া দিবেন, তারপর গৈরিক কাপড়ে এগুলি আবরিত হইবে। এবার হইতে এই অভিনব তোষক ও বালিশই প্রভু ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

প্রেমিক ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর মান অভিমানের পালাটি কিন্তু লাগিয়াই আছে। পণ্ডিত আর একদিন এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কিছুদিন আগে তিনি গৌড়ে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রভুর জন্য এক হাঁড়ি সুগন্ধ চন্দন তেল নিয়া

আসিয়াছেন। সারা দিনের নৃত্য কীর্তনে প্রভু পরিশ্রান্ত হন, মাঝে মাঝে ভাবাবেগে অস্থির হইয়া পড়েন। জগদানন্দের বড় সহজ প্রেমের ভাব। তাই দুঃখিত চিত্তে প্রায়ই ভাবেন, আহা, প্রভুর উষ্ণ মস্তিকে যদি ভাল কবিরাজী চন্দন তেল মাখানো যাইত।

এবার তোড়জোড় করিয়া সুদূর গৌড় হইতে বহুকষ্টে মৃৎ-ভাণ্ডে তিনি এই তেল বহিয়া আনিয়াছেন।

প্রভুর সেবক গোবিন্দের হাতে হাঁড়িটি অর্পণ করিয়া জগদানন্দ কহিলেন, "ভাই, তোমার ওপর সমস্ত ভার রইলো। প্রভুর শিরে এ তেল রোজ কিছুটা মাখাবে, এতে ভুল না হয়।"

এ প্রস্তাব শুনিবামাত্র চৈতন্য উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "তোমরা কি জানো না, সন্ন্যাসীর পক্ষে তেল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ? তার ওপর সুগন্ধি তেল ব্যবহার! এ যে চরম নিন্দার কথা!"

সকলে সেদিন চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু জগদানন্দ ছাড়িবার পাত্র নন। প্রভুর সেবককে আবার তিনি খোঁচাইতে লাগিলেন।

দিন দশেক গত হইয়াছে, গোবিন্দ আবার একথা উঠাইলেন, প্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতের বড় ইচ্ছে, চন্দন-তেল আপনার মাথায় মাখানো হয়। বহু কষ্ট ক'রে দেশ থেকে ভাণ্ডটি টেনে এনেছেন।"

চৈতন্য সরোষে কহিলেন, "শুধু তেল ব্যবহার করা কেন, এবার আরামের জন্য একজন তেল-মর্দনের লোক নিযুক্ত করো। এসব সুখের জন্যই তো আমি সন্ন্যাস নিয়েছি। দেখছি আমার সর্বনাশ ক'রেই তোমাদের আনন্দ। এই সুগন্ধি তেল মেখে রাজপথ দিয়ে যাই, আর লোকে উপহাস ক'রে আমায় বলুক—ভোগী সন্ন্যাসী।"

জগদানন্দকে তখনি ডাকিয়া কহিলেন, "শুনলাম, তুমি গৌড় থেকে আমার জন্য চন্দন-তেল বয়ে এনেছো। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী—এসব আমার ব্যবহার করা তো চলে না। তুমি বরং এক কাজ করো। এ তেল জগন্নাথমন্দিরে দিয়ে এসো, সেখানে এ দিয়ে দীপ জ্বালানো হবে। তা'হলে তোমার শ্রমও সফল হবে।"

অভিমানী জগদানন্দ এ পরামর্শ শুনিবার পাত্র নন। ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁহার দেহ তখন কাঁপিতেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কে তোমায় বলেছে যে, গৌড় থেকে আমি তোমার জন্য তেল এনেছি? এ তেল কারুর মাখবার প্রয়োজন নেই!"

কিন্তু সরলস্বভাব জগদানন্দ নিজেকে আর বেশিক্ষণ সংযত রাখিতে পারিলেন না। প্রভুর কুটিরে ঢুকিয়া চন্দন-তেলের ভাঁড়টি আঙ্গিনায় টানিয়া আনিলেন। তারপরে সর্ব-সমক্ষে তখনই উহা ভাঙিয়া ফেলিয়া আপন ঘরে গিয়া কপাট দিলেন।

জগদানন্দ তিনদিন যাবৎ উপবাসী। সকলে প্রমাদ গণিলেন, কি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

ভক্তের প্রেমাভিমান প্রভুকে টলাইয়া দিল। তাই নিজেই সেদিন জগদানন্দের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। দ্বারে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত, শিগ্‌গীর বাইরে এসো! আজ যে তোমার এখানেই আমি ভিক্ষে গ্রহণ করবো। তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় করো, আমি শ্রীমন্দির থেকে ফিরে আসছি।"

প্রভু তাঁহার গৃহে অতিথি। জগদানন্দের ক্রোধ ও অভিমান মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া

গেল। পরম যত্নে স্বহস্তে তিনি অনেক কিছু রন্ধন করিলেন বলা বাহুল্য, প্রভুকে সেদিন দণ্ড কম গ্রহণ করিতে হয় নাই।

পণ্ডিতের ভয়ে সাধ্যাতিরিক্ত ভোজন করিয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি পান। ভক্তের মান-ভঞ্জনের পালা সেদিন এভাবে সমাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য। লঘু গুরু জ্ঞান ইহার নিতান্ত কম, কথাবার্তায়ও সংযমের বড় অভাব। অপরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ানোই ইঁহার প্রধান কাজ। মাধবেন্দ্র পুরীর মতো কৃপালু ও সহিষ্ণু ব্যক্তিও মরদেহ ত্যাগ করার আগে তাঁহার এই দুর্বিনীত শিষ্যকে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই রামচন্দ্র সে-বার পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত।

প্রভু ও তাঁহার ভক্তেরা পুরীজীকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইলে কি হয়, নিজ স্বভাব অনুযায়ী তিনি সকলেরই নিন্দা সমালোচনা শুরু করিয়া দিলেন। স্বয়ং চৈতন্যও এ দুর্মুখের কাছে রেহাই পাইলেন না।

প্রভু প্রায়ই ভক্তগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য সকলেই সাধ্যমতো আয়োজনের ত্রুটি করেন না। রামচন্দ্র পুরী প্রভুর এই ভোজন সম্পর্কে কথা উঠাইলেন—সন্ন্যাসীর এত ভোজনের নিমন্ত্রণ কেন? এই ভোজন পারিপাট্যই বা কেন?

গোবিন্দকে ডাকিয়া চৈতন্য কহিলেন, "আজ থেকে যে ভক্তের বাড়িতেই আমার ভিক্ষার নিমন্ত্রণ হোক, বলে দিও—এক চতুর্থাংশের বেশী অন্নব্যঞ্জন যেন না দেওয়া হয়।"

ভক্তগণ একথা শুনিয়া মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র পুরীর ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের কথা জানিতে তাঁহাদের বাকী নাই। প্রভুকে সকলে কহিলেন, "প্রভু, সবাই জানে, পুরীজী এক বিশ্ব-নিন্দুক, এঁর কথায় আপনি কেন শুধু শুধু অর্ধাশন শুরু করেছেন?"

উত্তর হইল, "তোমরা বৃথা পুরী মহারাজকে দোষ দিচ্ছো, তাঁর ওপর রুষ্ট হচ্ছো। তিনি তো সত্য কথাই বলেছেন। সন্ন্যাসী হয়ে তো জিহ্বার লাম্পট্য রাখতে নেই। সন্ন্যাসধর্ম রাখতে হলে আহারের পরিমাণ করতে হবে খুব অল্প।"

প্রভুকে এমন স্বল্পাহারী দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তাঁহারা তুমুল আন্দোলন শুরু করিলেন। ফলে প্রভু তাঁহার নিয়মিত আহারের পরিমাণ কিছুটা না বাড়াইয়া পারিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী নিজেই নীলাচল ত্যাগ করেন। ভক্তগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

সন্ন্যাসধর্ম রক্ষণ, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়া চৈতন্যের পার্ষদগণ কম যাইতেন না। কোনো কোনো সময় ইঁহাদের নীতিনিষ্ঠার আদর্শ প্রভু নিজেও মানিয়া নিতেন, অনুগামী বৈষ্ণবদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন।

সে বার একটি সুদর্শন ওড়িয়া বালক প্রায় রোজ প্রভুর কাছে যাতায়াত করিতে থাকে। বড় ভক্তিপরায়ণ সে। প্রভু যেন তাহার প্রাণস্বরূপ, দর্শন মাত্রেই সে তাঁহার চরণবন্দনা করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া তাঁহার প্রেমমধুর কথা শুনিতে থাকে। বালকটির উপর প্রভুরও খুব স্নেহ পড়িয়া গিয়াছে।

দামোদর পণ্ডিত চৈতন্যের এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আচারনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব সাধক বলিয়া তিনি সর্বত্র খ্যাত। দামোদর কিন্তু এই নবাগত ওড়িয়া বালকটির এখানে ঘন ঘন যাওয়া-আসা তেমন পছন্দ করিতেছেন না। বালককে ইতিমধ্যে নিষেধও করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহাতে বড় একটা কান দেয় না, প্রভুর প্রতি তাহার এক দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রভুকেই বা পণ্ডিত একথা কি করিয়া বলেন?

সেদিনও এই সুদর্শন বালক আসামাত্র প্রভু খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তাহাকে কাছে ডাকিয়া স্নেহভরে নানা কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভুর সান্নিধ্যে বহুক্ষণ কাটানোর পর বালকটি চলিয়া গেল।

এদিন কিন্তু দামোদর আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না। ধাঁ করিয়া বলিয়া বসিলেন, "'প্রভু' 'প্রভু' বলে সবাই অস্থির—এবার লোকে প্রভুর গুণ ভালো ক'রেই গাইতে থাকবে, সারা নীলাচলধামে বেড়ে উঠবে তাঁর প্রতিষ্ঠা।"

চৈতন্য কহিলেন, "দামোদর, তুমি যেন কি একটা বলতে চাচ্ছো। পরিষ্কার ক'রে বলো তো, আমি শুনি।"

"কি আর বলবো প্রভু। জানি তুমি স্বেচ্ছাময়—ঈশ্বর। ইচ্ছেমতো আচার-আচরণ তুমি করতে পার, তা ঠিক। কিন্তু বিচার ক'রে দ্যাখো, এ বালকের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা রাখা ঠিক কিনা। সবাই জানে, এর মা হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। শুধু বিধবা নয়—তরুণী, পরমা সুন্দরী। হতে পারে, মহিলাটি সুচরিতা, ধর্মপরায়ণা। কিন্তু তবুও বিচার করলে দেখা যাবে, সে একে রূপসী তাতে যুবতী। এদিকে তুমিও পরম সুন্দর যুবা। এ নিয়ে দুষ্ট লোক তো কানাকানি করতেও পারে। প্রভু, ভেবে দ্যাখো, সে কানাকানির সুযোগ তুমি নিজেই কি ক'রে দিচ্ছো না?"

চৈতন্যের মুখে ফুটিয়া উঠিল অপার সন্তোষের হাসি। দামোদর যে তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে তাই তো বর্মের মতো তাঁহাকে সে সদাই ঘিরিয়া রাখিতে চায়—কোনো ছিদ্র দিয়াই যেন প্রভুর ক্ষতি সাধন কেহ কখনো না করিতে পারে। এই ভালবাসার জোরেই তো সে আজ তাঁহাকেও সতর্ক করিতে সাহসী হইয়াছে। আর দামোদর তো অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু বলে নাই। যথার্থ কথাই সে বলিয়াছে। তাঁহার এ সতর্কবাণী প্রভু গ্রহণ করিলেন।

নিষ্ঠাবান্, কঠোর তপস্বী দামোদর পণ্ডিতকে চৈতন্য অতঃপর এক বড় দায়িত্ব পালনের ভার দিলেন। নবদ্বীপে জননী শচীদেবী আর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া অবস্থান করিতেছেন, আরো সেখানে রহিয়াছে অগণিত ভক্ত। ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন শক্ত, সদা সতর্ক মানুষ চাই।

এমন মানুষ দামোদর পণ্ডিত ছাড়া আর কে আছে? প্রভু তাই দামোদর পণ্ডিতকে সেদিন নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—

তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হইতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয় ॥
মাতার গৃহে রহ, চাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥

প্রভুর মধুর সান্নিধ্যের লোভ ছাড়িয়া দামোদর প্রভু প্রদত্ত দায়িত্ব ভার বহনের জন্য গৌড়ে চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে তিনি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতেন। আবার নবদ্বীপে গিয়া অধিষ্ঠিত হইতেন প্রভুর গৃহের অভিভাবক রূপে।

রামানন্দ ও বাণীনাথের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সে বার তিনি এক মহাবিপদে পড়িয়াছেন। রাজসরকারের প্রাপ্য প্রায় দুই লক্ষ কাহন তাঁহার কাছে বাকী। অনেক চাপ দিয়াও এ টাকা আদায় করা যায় নাই। শুধু তাহাই নয়—গোপীনাথ যেমন বিষয়ী তেমনি দাম্ভিক। এই সময়ে কি এক ব্যাপারে রাজা প্রতাপরুদ্রের এক পুত্রকেও হঠাৎ তিনি অপমান করিয়া বসিলেন।

ক্রুদ্ধ রাজকুমার আদেশ দিলেন, "গোপীনাথকে চাঙে চড়াও।" হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে উচ্চ মঞ্চে উঠানো হইল। নিচে বৃহদাকার এক খড়্গ। ইহার উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। রাজার প্রাপ্য অর্থ শোধ করা হয় নাই, তাই এ দণ্ড। গোপীনাথের অপর ভাইদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত বাণীনাথও আছেন।

সকলে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "প্রভু, সমগ্র পরিবারটি তোমার অনুগত ও আশ্রিত। অথচ তুমি এখানে উপস্থিত থাকতে চাঙে চড়িয়ে গোপীনাথকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে!"

শুনিয়া প্রভু তো মহাক্রুদ্ধ। কহিতে লাগিলেন, "রাজার বিষয় খেয়ে যে ফাঁকি দেয়, তার প্রাণরক্ষা কি ক'রে হবে? রাজার তো দোষ দেওয়া যায় না, তাঁর প্রাপ্য টাকাকড়ি তিনি আদায় করবেনই। তাছাড়া, আমি এ ব্যাপারে কি করবো? আমি বিষয়-বিরক্ত সন্ন্যাসী—ভিক্ষুক মাত্র। আমি কি করতে পারি? যদি গোপীনাথকে তোমরা রক্ষা করতেই চাও, বেশ তো, সকলে মিলে শ্রীজগন্নাথের চরণে প্রার্থনা করো। আমি এসব ঝঞ্ঝাটের ভেতর নেই।"

ভক্তেরা সবাই দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে অমাত্য হরিচন্দন রাজা প্রতাপরুদ্রকে গিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "গোপীনাথ যত দোষই করুক সে আপনার সেবক। তাছাড়া, তার প্রাণ নিয়ে আপনার কি লাভ? এতে তো রাজসরকারের পাওনা টাকা আদায় হবে না। যাতে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয় টাকাও ফেরত পাওয়া যায়, বরং সেই ব্যবস্থাই দয়া ক'রে আপনি করুন।"

রাজা এ যুক্তি মানিয়া নিয়া গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষার আদেশ দিলেন। পাওনা টাকা ধীরে ধীরে আদায়ের ব্যবস্থা হইল।

রাজগুরু কাশী মিশ্র প্রতিদিনকার মতো সেদিনও চৈতন্যের চরণ দর্শনে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "মিশ্র, এরা দেখছি সবাই মিলে আর আমায় এখানে থাকতে দেবে না। পুরী ছেড়ে এবার আলালনাথে গিয়ে থাকা ছাড়া আর আমার কোনো উপায় নেই। শ্রীজগন্নাথের মন্দির-চূড়া সেখান থেকে রোজ দেখবো আর নিভৃতে ভজন কীর্তন করবো। রাজার প্রাপ্য ফাঁকি দেবে, আর এসব বিষয়ী-বার্তা নিয়ে এসে সবাই আমায় বিরক্ত করবে—এ আমার আর সহ্য হয় না।"

"সে কি কথা, প্রভু! কে এমন মূর্খ যে, তোমার কাছে তুচ্ছ বৈষয়িক কথা নিয়ে আসবে—বৈষয়িক ফল মাগবে। লোকে কি চোখ চেয়ে দেখে না—রামানন্দ রায়

তোমার সঙ্গলোভে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তার পদ ত্যাগ ক'রে এসেছেন, বাদশাহের সচিব রূপ সনাতন আজ তোমার জন্য পথের কাঙাল, রাজপুত্র রঘুনাথ তোমার চরণ পাবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছেন। না প্রভু, তোমায় কেউ সাংসারিক কথা নিয়ে আর বিরক্ত করবে না। বাণীনাথের বন্ধু ও সেবকরা বিপদে দিশাহারা হয়েছিল, তাই তোমার কাছে তারা ছুটে এসেছে। তাছাড়া, প্রভু এসব তো চুকেই গেছে।"

"না মিশ্র, মোটেই চুকে যায় নি। শুনলাম, স্থির হয়েছে—বাণীনাথ কিস্তি-বন্দী ক'রে রাজার প্রাপ্য অর্থ এখন থেকে শোধ করবে। সে অমিতব্যয়ী—টাকা শোধ কখনো করতে পারবে না আবার লোকে আমার কাছে এ নিয়ে ছুটে আসবে, বিরক্ত করবে।"

কাশী মিশ্র অতঃপর প্রভুকে নানা প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রকে রোজই মধ্যাহ্নে আসিয়া গুরু কাশী মিশ্রের পদসম্বাহন করেন। সেদিনও আসিয়াছেন। মিশ্র পণ্ডিত এ সুযোগে তাঁহাকে ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, প্রভু বোধকরি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথেই চলে যাবেন। গোপীনাথের দণ্ডাদেশের কথা শুনে সবাই গিয়ে তাঁকে ধরেছিল। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, এসব বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট যেখানে রয়েছে সেখানে আর তিনি থাকবেন না।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কি কথা গুরুদেব, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য অবলীলায় সমস্ত বিষয়-আশয় আমি ত্যাগ করতে পারি—দুই লক্ষ কাহন এমন কি একটা বড় কথা হলো? গোপীনাথের দেয় টাকা আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু মহারাজ, আপনার প্রাপ্য টাকা ছেড়ে দিলে তো প্রভু সন্তুষ্ট হবেন না। বরং ভাববেন তিনিই আপনার এ ক্ষতির কারণ হলেন।"

আপনি প্রভুকে বুঝিয়ে বলবেন, গোপীনাথের পিতা ও ভ্রাতারা সবাই আমার প্রিয়, আমার তারা আপন জন। আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এ অর্থ তাদের ভোগ করতে দিয়েছি।"

রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথের সমস্ত দেনা মাপ করিয়া দিলেন। পূর্বেকার দায়িত্ব-পূর্ণ কাজেই আবার তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল, বরং এখন হইতে বেতন কিছু বাড়িয়া গেল।

প্রভুকে আর কেহ কখনো এ ধরনের বৈষয়িক ব্যাপার নিয়া বিরক্ত করে নাই।

নাম-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, প্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ, হরিদাস এখন খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। জনসংস্পর্শ হইতে নিজেকে তিনি সযতনে দূরে রাখেন। নিভৃত কুটিরে বসিয়া রোজ তিন লক্ষ নাম জপ করেন, তারপর গ্রহণ করেন মহাপ্রসাদ। এবার জরাজীর্ণ দেহে নির্দিষ্ট নাম সংখ্যা পূরণ করা যাইতেছে না, ইহাই তাঁহার বড় দুঃখ।

প্রভু সেদিন সাঙ্গোপাঙ্গসহ হরিদাসের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "হরিদাস, এ সিদ্ধ দেহে আর কেন এত জপতপ। নামের মহিমা প্রচার অনেক করেছো। বৃদ্ধ হয়েছো, এবার জপ কমিয়ে দাও। আর আমায় বলো, অন্তরে, কি তোমার অভিলাষ।"

"প্রভু, আমার মতো অস্পৃশ্য পামরকে কোথা থেকে টেনে এনে তুমি কোথায় তুলেছো। তোমার কাছে আর কি চাইবার আমার আছে? তবে মনে একটা ইচ্ছে জাগছে, তাই তোমায় বলি।"

"বল, বল হরিদাস, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।"

"প্রভু, আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি শিগ্‌গীর তোমার লীলা সংবরণ করবে।"

চৈতন্য নির্বাক—অন্তর্মুখীন। ভক্তগণ হরিদাসের কথাটি শুনামাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছেন। নীরব বিস্ময়ে প্রবীণ ভক্ত হরিদাসের দিকে সবাই নির্নিমেষে তাকাইয়া আছেন।

হরিদাস বলিয়া চলিলেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে আমায় আজ এই ভিক্ষা দাও—তোমার লীলা সাঙ্গ হবার আগেই যেন এ দেহের পতন হয়। আর কিছুই চাইবার আমার নেই।"

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহিলেন, "হরিদাস, কৃষ্ণ আমার বড় কৃপাময়। তোমার মতো মহাভক্তের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করবেন।"

পরদিন সকালেই চৈতন্য পার্ষদগণসহ হরিদাসের অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। তুমুল নামকীর্তন সেখানে শুরু হইল। প্রভু কীর্তন শেষে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরমভক্তের গুণগানে তিনি সেদিন পঞ্চমুখ।

সমবেত ভক্তগণ বুঝিলেন, আজ মহাবৈষ্ণব হরিদাসের মনোবাঞ্ছা পূরণের পালা। প্রভুকে তিনি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে কহিলেন। বক্ষে রাখিলেন তাঁহার চরণযুগল, নয়নদ্বয় নিবদ্ধ করিলেন তাঁহার শ্রীমুখপঙ্কজে, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল তাঁহার চৈতন্যময় নাম। তারপর মহাপ্রেমিক হরিদাস প্রবিষ্ট হইলেন নিত্যলীলায়।

নৃত্য ও কীর্তনের মধ্য দিয়া হরিনামের বন্যা উৎসারিত হইয়া উঠিল। প্রিয় পার্ষদ হরিদাসের মরদেহটি প্রভুর কোলে স্থাপিত। প্রেমাবেশে তিনি নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। এ দৃশ্য যে দেখিতেছে সেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছে।

সমুদ্রতীরে লোকে লোকারণ্য। মহাসমারোহে সেখানে হরিদাসের সমাধি দিয়া প্রভু আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেদিন হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব হইবে। প্রভু স্বয়ং সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পসারিদের কাছে ভিক্ষার জন্য তাঁহার আঁচল পাতিলেন। চারিদিকে তখন মহা আলোড়ন পড়িয়া গেল—প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্যেরই অভাব রহিল না। আকণ্ঠ পুরিয়া সকলে প্রসাদ ভোজনে তৃপ্ত হইল। উৎসব শেষে দেখা গেল, ভক্ত-বৎসল প্রভু যেন কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি বর দান করিলেন।

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্তন ॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন ॥
অচিরে হইবে তা সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥

সজল চক্ষে চৈতন্য সবাইকে কহিতে লাগিলেন, "কৃপা ক'রে কৃষ্ণ আমার হরিদাসের মতো বৈষ্ণবের সঙ্গ দিয়েছিলেন, সে সঙ্গ হতে তিনিই আবার নিলেন সরিয়ে। হরিদাসের নিজেরই চ'লে যাওয়ার ইচ্ছা হলো, তাই তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। তার এ মহাপ্রয়াণ যেন ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর মতন। স্বেচ্ছামতো হলো প্রাণ নিষ্ক্রমণ।"

প্রভুর প্রকট লীলার শেষ অধ্যায় এবার আসিয়া পড়িয়াছে। এ অধ্যায় নিগূঢ় মহাভাবের দ্যোতনায় সমুজ্জ্বল, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার রসে পূর্ণ—বড় মধুর, বড় করুণ এই অন্ত্যলীলা।

নিভৃত 'গম্ভীরা' গৃহে রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি দিন যাপন করেন। অন্তরতলে নিরন্তর চলে ব্রজের যুগলমিলন আর মাথুর বিরহের জোয়ার-ভাটা। কখনো বিরহবেদনা বিষে জর্জর হইয়া তিনি উন্মত্ত, কখনো বা মিলনের আনন্দে অধীর, মধুর সম্ভোগে ডগমগ। বিরহের দহন যত বাড়ে, মিলনের রস তত‍ই হয় উচ্ছলিত। আবার বিরহ, আবার মিলন—এমনি করিয়াই মহাভাব সমুদ্রের মন্থন চলে পর্যায়ক্রমে। দিনের পর দিন উদ্‌গত হইতে থাকে কৃষ্ণ-সুধারস। এ গম্ভীরালীলা বার বৎসর ব্যাপিয়া প্রকট হয়।

এই সময়কার লীলার প্রধান দুই সাথী স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ। স্বরূপ ব্রজরসের অদ্বিতীয় মর্মজ্ঞ সাধক, প্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ—তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বরূপ'। আবার কৃষ্ণ-লীলা তত্ত্বের বিচারে রামানন্দের জুড়ি নাই। বিরহ সন্তপ্ত প্রভু উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদেন, হৃদয়ের কথা উঘারিয়া বলিতে গিয়া আকুল হন। ভক্তদ্বয় তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন, শান্ত করিতে প্রয়াস পান। স্বরূপের মধুর সঙ্গীতে ও রামরায়ের মুখে লীলা-কথা শুনিয়া প্রভু মাঝে মাঝে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠেন।

প্রভুর এ যেন 'রাই-উন্মাদিনী'র দশা। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্যে এ প্রেমোন্মত্ততার রসঘন চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলও শ্রীমতীর দশা নিয়া করুণ রসের বিস্তার কম করেন নাই। কিন্তু প্রভু এ বিরহ-রস জীবকে বুঝাইলেন আপন মর্ম-জ্বালার উদ্‌ঘাটন করিয়া, অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের মধ্য দিয়া। শুধু কথায় আর কাব্যে নয়, জীবনের পরতে পরতে ব্রজরস আর কৃষ্ণবিরহের স্বরূপ তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন। এ যেন মর্তের ধূলিধূসর অঙ্গনে স্বর্গের অমৃত বিতরণ। এমন করিয়া এ অমৃত কে কবে বিলাইয়াছে? অপ্রাকৃত বৃন্দাবনকে কে এমন মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন কৃপা আর কাহার? চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত, পদকর্তা বাসুঘোষ, প্রভুর এ কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছেন—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

রসমধুর ব্রজলীলা প্রভুর মধ্যে রূপায়িত। একদিকে কৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্য, অপরদিকে রাধার সর্বাতিশায়ী প্রেম ও মাধুর্য, এ প্রেমের মাখামাখি তাঁহার সারা দেহে, মনে ও অন্তরসত্তায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সেদিন ধন্য হয়।

গম্ভীরা-গৃহে দিনের পর দিন রাতের পর রাত প্রভু এ নিগূঢ় ব্রজ রসের বিস্তার করেন। হৃদয়বিদারী আর্তি, ক্রন্দন ও প্রেমবিকারের মধ্য দিয়া রচিত হয় কৃষ্ণবিরহের জীবন্ত

ভাষ্য রাধাকৃষ্ণ প্রেম ও যুগল ভজনের আদর্শটি ধীরে ধীরে জনচৈতন্যে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু কেন প্রভুর নিজ জীবনের এ আকুলতা, কেন এই মর্মভেদী কান্না? কোথায় তাঁহার মর্মব্যথা? কৃষ্ণরসে যিনি রসায়িত, সচ্চিদানন্দ সাগরে যিনি সদা ভাসমান তাঁহার আবার কোথায় অভাব? কোথায়ই বা তাঁহার সত্যকার অভাববোধ?

কৃষ্ণরস ভুঞ্জনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে প্রভু সদা জাগ্রত রাখিয়াছেন, কারণ রাধা-গোবিন্দের মিলন বিরহ আর যুগললীলার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই যে এ রসের চিরন্তন স্ফূর্তি। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের এ ভাবচাঞ্চল্যের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।"

মহাভাবসিন্ধু শ্রীচৈতন্যের এ অস্থিরতা, প্রেমবিরহের এ উদ্বেলতা শুধু তাঁহার নিজের কৃষ্ণলীলারস আস্বাদের জন্য নয়, জনমানসে এ রস উৎসারিত করার জন্যও তিনি হইয়াছিলেন উদ্বুদ্ধ।

নির্বিশেষে পরমতত্ত্ব নয়, ঐশ্বর্যময় ভগবান্ নয়—রস-স্বরূপ, মাধুর্যময় ভগবানের উপাসনা প্রভু নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গিমায় প্রচার করিয়া যান। রস ও মাধুর্য যেখানে চরম-তত্ত্ব, সেখানে লীলা না থাকিলে চলিবে কেন? তাছাড়া যুগল নহিলে যে লীলা জমে না, রসের আস্বাদন হয় না পরিপূর্ণ।

চৈতন্য পন্থীদের মতে, এই লীলা ও ভেদ পরমসত্তার অদ্বয়তার কোনো হানি করে না। অভেদ এবং ভেদ দুই-ই ইঁহার পক্ষে সত্য। এ ভেদাভেদ অচিন্তনীয়—অনির্বচনীয়।

প্রভুর কৃষ্ণ অপ্রাকৃতিক ব্রজলোকের কৃষ্ণ। যিনি 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ', যিনি 'অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্'—তিনিই তাঁহার কৃষ্ণ। আবার তাঁহার রাধাও তেমনি এই কৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী। দুই হইয়াও স্বরূপতঃ ইঁহারা এক। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে তৈছে কভু নহে ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥"

রসাস্বাদনের এই শাশ্বত লীলা অনুষ্ঠিত হয় অপ্রাকৃতিক ব্রজে। কৃষ্ণ আর তাঁহার স্বরূপ-শক্তির প্রেম ও বিরহের পালা অবিরাম ধারায় বহিয়া চলে। বিরহের পর মিলন রসস্ফূর্তি হয়, মিলনের পর আবার আসে বিরহ, বাড়ে প্রেমের তীব্রতা। রাধার চোখের জল গোবিন্দ মোছান বার বার, কিন্তু আবার তাহা উদ্গত হয়। চিরতরে শুকায় না। লীলার ধারা এমনিভাবে অনন্তকালের বুকে বহিয়া চলে।

রাধাপ্রেমে বিভাবিত প্রভু এই লীলারই বিরহে মিলনে উদ্বেলিত। উন্মত্ত হইয়া এক একবার ডুবিয়া যান আবার ভাসিয়া উঠেন। অথচ জীবন-সাগরের তলদেশ তাঁহার একেবারে নিস্তরঙ্গ—পরমপ্রাপ্তির চির-প্রশান্তি সেখানে বিরাজিত। আর এই সাগরের

উপরকার স্তরে উঠিতেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, রাধাগোবিন্দের লীলারঙ্গে তাহা সদাচঞ্চল।

প্রভুর গম্ভীরায় বৎসরের পর বৎসর প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এই অনির্বচনীয় লীলা—প্রেমবিকার আর মহাভাবের মন্থন।

অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম এতদিন সাধারণ মানুষের মনে ছিল একটা অমূর্ত তত্ত্বভাবনারূপে। এবার তাহা মূর্ত হইয়া উঠিল প্রভু শ্রীচৈতন্যের মহাজীবনে। কৃষ্ণ বিরহের মর্মজ্বালা দিনের পর দিন সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া জীবনকে তিনি করিলেন ভগবদ্‌মুখী, আর নিগূঢ় ভক্তিপ্রেম সাধনার পুরোভাগে রাধাকে, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিকে রাখিয়া ভগবানকে করিতে চাহিলেন জীব মুখী।

রাধাকৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিণী। এই রাধাকে শ্রীচৈতন্য স্থাপন করিলেন সাধ্যসাররূপে। তাছাড়া, ইষ্টবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের যুগলভজনের সাধনাকে নবভাব নব উদ্দীপনা নিয়া তিনি প্রবর্তিত করিলেন। ভারতের অন্যান্য বৈষ্ণবসমাজে এই রাধাতত্ত্ব এমন করিয়া দেখা দেয় নাই। শ্রী, নিম্বার্ক, বল্লভী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে কৃষ্ণের সহিত রাধা আছেন, তাঁহার আরাধনাও রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাধান্য তেমন নাই। কান্তাশিরোমণি রাধার প্রেম ছাড়াও সেখানে শান্ত-দাস্য সখ্য প্রভৃতি ভক্তি ভাবের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য জোর দিলেন ভগবানের মাধুর্য-উপাসনা ও লীলাবাদের উপর। তাই তো মদনমোহন-মোহিনী রাধাকে তিনি তুলিয়া ধরিলেন এমন লীলাময়ীরূপে, সাধ্যসাররূপে। এই রাধাভাবে বিভাবিত হইয়াই প্রভুর বুকে এমন বিরহের দহন, আর নয়নে তাঁহার এমন অশ্রুবন্যা।

গোপীপ্রেমের কথা, মহাভাবের কথা সাধারণ মানুষ ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, ভক্তসাধক ও ভক্তকবিদের কাছে শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ প্রেমের প্রকাশ কবে কোথায় এমন ভাবে ঘটিয়াছে? কোন্ মানবদেহে এভাবে ইহা স্ফুরিত হইয়াছে? এইবার প্রভুর ভাগবতী তনুতে এ প্রেমের পূর্ণতা দেখা গেল। দেখিয়া মানুষ ধন্য হইল।

এ প্রেম স্বভাবত বড় মধুর—'রতিরানন্দরূপৈব'। কারণ, ইহার যে হ্লাদিনীর বৃত্তি আর তাহার বৈশিষ্ট্য। এ প্রেম যত গম্ভীর হয়, যত গাঢ় হয়, মাধুর্য ততই বাড়িয়া উঠে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই মাধুর্য উপলব্ধি করিবে কিরূপে?

মানুষ এ প্রেমের প্রমাণ পাইবে, তাৎপর্য কিছুটা বুঝিবে অশ্রুকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের মধ্য দিয়া। শ্রীচৈতন্যের দেহে তাহারা এই মহাভাবময় প্রেম-চিহ্নই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

মহাপ্রেমে প্রভু ঘন ঘন উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। আয়ত নয়নকমল হইতে পিচকারীর ধারার মতো অশ্রু নিঃসৃত হইতে থাকে। ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করেন, কীর্তন সঙ্গীরা সিক্ত হইয়া উঠেন তাঁহার নেত্রনীরে।

পুলকের তীব্রতায় দেহের রোম খাড়া হইয়া উঠে। রোমকূপে দেখা দেয় অজস্র ব্রণ, আর তাহা হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা দেয় প্রভুর সুগৌর দেহবর্ণ একেবারে শ্বেত-শঙ্খের মতো সাদা হইয়া গিয়াছে। আবার কখনো বা বর্ণ হইতেছে রক্তজবার মতো লাল।

কম্পনের তীব্রতাই বা কী অদ্ভুত। সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহটি বেতসলতার মতো কাঁপিতে

থাকে, তীব্র ভাবাবেশে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। কোনো সময় হয়তো তাঁহার গ্রন্থিসমূহ শিথিল হইয়া যায়, দেহটি দীর্ঘতর হয়। আবার এক এক সময়ে দেখা যায়, সুন্দর সুঠাম দেহটি সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের এসব দুর্লভ লক্ষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যের দেহে গোপনে বা নিভৃতে প্রকটিত হয় নাই, শত-সহস্র দর্শনার্থী ইহা বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ মহাভাব দর্শনে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে প্রলুব্ধ। এই প্রেমবিকার প্রত্যক্ষ করার ফলে অগণিত ভাগ্যবানের অন্তরসত্তায় উপজিত হইয়াছে কৃষ্ণমাধুর্যের পরম রস।

চৈতন্যকে নিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের হইয়াছে মহাবিপদ। দিব্যোন্মদের অবস্থায়ই আজকাল প্রায় সব সময়ে তিনি থাকেন। স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ রায় প্রভুর বিলাপ ও কান্নায় সান্ত্বনা প্রদান করেন। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি আর গীতগোবিন্দের মধুর শ্লোক ও সংগীত উভয়ে তাঁহাকে শ্রবণ করান। সংগীতে সম্মোহিত ভুজঙ্গ যেমন ফণা উঁচাইয়া স্থির হইয়া থাকে, প্রভুও তেমনি তখন ভাবাবেশে থাকেন নীরব, নিশ্চল। তারপরই আবার শুরু হয় তাঁহার প্রেমার্তি আর মর্মভেদী বিরহ-বিলাপ।

মিলন ও বিরহের রসমন্থনে নিত্য উৎসারিত হইয়া উঠে নব নব ভাব নব রসোদগার—উদ্‌গত হয় কৃষ্ণমাধুর্য সার। প্রতিদিনই গভীর রাতে প্রভুকে বহুতর সান্ত্বনা দিয়া, গম্ভীরাগৃহে শোয়াইয়া রাখিয়া তবে হয় স্বরূপ আর রাম রায়ের ছুটি।

একদিন নিশীথে চৈতন্য শয্যায় বসিয়া আছেন—বাহির হইতে তাঁহার উচ্চ কণ্ঠের নামকীর্তন শোনা যাইতেছে। হঠাৎ এক সময়ে কেন যেন তিনি একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। স্বরূপ ও প্রভুর সেবক গোবিন্দ কুটিরের বহির্দ্বারেই রোজ শয়ন করেন, তাঁহাকে পাহারা দেন; উভয়ের মনে বড় সন্দেহ জাগিল। তাই তো, প্রভু হঠাৎ এমন অস্বাভাবিকভাবে চুপ করিয়া গেলেন কেন?

পাছে চৈতন্য ভাবাবেশে হঠাৎ কোথাও ছুটিয়া বাহির হন, তাই ভিতর হইতে পর পর তিনটি কপাট রাত্রে বন্ধ থাকে। কিন্তু প্রভু তো শয্যায় নাই। সব দ্বারই বন্ধ, স্বরূপ ও গোবিন্দ সম্মুখভাগেই শায়িত ছিলেন, অথচ প্রভু সবার অজ্ঞাতে কোথায় উধাও হইলেন? চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। আলো নিয়া সকলে চারিদিকে খুঁজিতে বাহির হইলেন।

প্রভুকে পাওয়া গেল মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকটে। সবিস্ময়ে ভক্তেরা দেখিলেন, এক অদ্ভুত প্রেমবিকারে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। সমস্ত অস্থি-গ্রন্থি শিথিল। দেহের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছে। চক্ষু-তারকা ঊর্ধ্বদিকে স্থির। মুখ হইতে অবিরাম লালা নিঃসরণ হইতেছে। এ অবস্থা দেখিয়া সবাই কাঁদিয়া আকুল।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেহের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়া পাইতেও অতঃপর বেশী দেরি হইল না। সুস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু 'হরিবোল' বলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। ভক্তদের বুক হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়া গেল।

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের নানা দিব্য দৃশ্য সতত প্রভুর নয়নসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।

রাধা গোবিন্দের মধুর নিত্যলীলা আর তাহার বৈচিত্র্যের রসে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন। কোনো কোনো দিন দেখা যায়, প্রেমবিকারের ঘোরে মন্দিরদ্বারে জড়-পিণ্ডবৎ তিনি পড়িয়া আছেন। সারা দেহ হইয়া উঠিয়াছে কুষ্মাণ্ডের মতো। কখনো বা প্রভু পরমচঞ্চল, উন্মাদনা ও ভাবোচ্ছ্বাসের অবধি নাই। সেদিন চটক পর্বত দেখিয়াই তাঁহার গোবর্ধনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া সেখানে ভূপাতিত হন। সারা অঙ্গে দেখা দেয় সাত্ত্বিক বিকারচিহ্ন।

রোজই এই ধরনের এক একটি অভিনব ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, আর ভাবোন্মত্ত প্রভুকে নিয়া অন্তরঙ্গ পার্ষদদের উদ্বেগে অবধি থাকে না।

সেদিন পূর্ণিমার নিশি। আইটোটার দিকে শ্রীচৈতন্য একাকী উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতেছেন। দূর হইতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্র দেখিয়া তিনি উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। ভাবনিধির ভাবতরঙ্গ উচ্ছলিয়া উঠিল— ভাবিলেন, শারদ পূর্ণিমার রাতে যমুনা ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে—আর তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্যামসুন্দরের বাঁশীতে উজান বহিতেছে। উন্মত্তের মতো ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে দিলেন ঝাঁপ।

দেহখানি তাঁহার সেদিন যেন শুষ্ক কাঠের মতো লঘুভার হইয়া গিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে, স্রোতের আকর্ষণে, ক্রমে তিনি কোনার্কের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

এদিকে প্রভুকে কোথাও না দেখিয়া ভক্তেরা পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছেন। কোনো স্থানই খুঁজিতে বাকী রহিল না।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া একদল ভক্ত সমুদ্রতীর ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রভু সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, না সৈকত ধরিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কে বলিবে?

পথে এক ধীবরের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা—স্কন্ধে তাহার মাছ ধরার জাল। তটে দাঁড়াইয়া লোকটি পাগলের মতো হাসিতেছে নাচিতেছে। আবার কখনো বা সে কাঁদিয়া বিহ্বল। মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে তাহার মুখে কৃষ্ণনাম।

স্বরূপ দামোদর মুহূর্তে বুঝিয়া নিলেন— এসব যে প্রভুরই কাণ্ড। চৈতন্য পরশমণি স্পর্শ এই জেলের দেহে লাগিয়াছে, আজ তাই সে এক মহাভক্তে রূপান্তরিত।

সকলে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ভাই, বল তো, তুমি এমন করছো কেন? এ দশা তোমার কবে থেকে হলো, কি ক'রেই বা হলো শিগ্‌গীর সব খুলে বল।"

ধীবর উত্তর দিল, "কি বলবো, জাল বাইতে গিয়েছিলুম সাগরে। এক অদ্ভুত মানুষ কোথা থেকে ভেসে এসে আমার জালে আটকে পড়লো। দীঘল তার দেহ, বর্ণ শাঁখের মতো সাদা। কখনো অচেতন হয়ে থাকে, কখনো বা নেচে নেচে অস্ফুট স্বরে কৃষ্ণনাম গেয়ে ওঠে, আবার গোঁ-গোঁ শব্দ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার শরীরের ছোঁয়া লাগবার পর থেকে আমার মাথাও গেছে বিগড়ে।"

ভক্তেরা এ সংবাদে যেন প্রাণ পাইলেন। যাক্, তবে আর ভয় নাই—প্রভু নিকটেই আছেন। অচিরে তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হইল।

স্বরূপের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "কালিন্দীর স্মৃতি জেগে উঠেছিলো আমার মনে, অমনি চলে গেলাম বৃন্দাবনে। বহুক্ষণ ধরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের যমুনা-লীলাই যে আমি সম্ভোগ করছিলাম। তারপর হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান এলো। শুনলাম তোমরা কাতর স্বরে ডাকাডাকি করছো।"

'মাধুর্য ভগবত্তা-সার'—এ পরমতত্ত্বের প্রচার চৈতন্য সারা জীবন ব্যাপিয়া করিয়া যান সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবন এবং নিজ সাধনায়ও এই লীলামাধুর্য তিনি দিনের পর দিন প্রকটিত করেন। এবার আসন্ন হয় তাঁহার নরলীলা অবসানের পালা।

অন্তর্গূঢ় লীলার আস্বাদনে একাধিক্রমে প্রভুর বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মহাভাবময় জীবনের অমৃত-মন্থন পর্ব এবার ধীরে ধীরে আসিল সমাপ্তির পথে।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। আষাঢ় মাস। বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নাটমন্দিরে গরুড় স্তম্ভের নিচে প্রতিদিন গিয়া তিনি দাঁড়ান যুক্তকরে ভাবতন্ময় অবস্থায় পুরুষোত্তম বিগ্রহের চিন্ময় রূপসুধা পান করেন, নয়নজলের ধারায় সারা দেহ ভিজিয়া যায়। কিন্তু আজ কেন তিনি সরাসরি মূল বেদীকোঠায় ঢুকিয়া পড়িলেন? কেন এই অদ্ভুত ব্যতিক্রম?

ভক্তগণ সবিস্ময়ে তাঁহার কাণ্ড লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ এক সময়ে অন্তর্গৃহের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সবই বাহিরে—ভিতরে রহিলেন শুধু প্রভু আর তাঁহার শ্রীজগন্নাথ।

সম্মুখে বিরাজিত পরম জাগ্রত দারুব্রহ্ম, শ্রীচৈতন্য ধ্যানের ধন, 'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ'-এর দিব্য শ্রীবিগ্রহ। ভাবোদ্বেল প্রভু হুঙ্কার দিয়া সেদিকে ধাবিত হইলেন।

বাইশ বৎসর পূর্বে, প্রথম দর্শনের দিনটিতে এমনি আত্মহারা এমনি পাগলপারা হইয়া এই পুরুষোত্তম বিগ্রহকে কোলে নিতে তিনি ছুটিয়াছিলেন। সেদিন ঘটিয়াছিল নীলাচল-লীলার উদ্বোধন। আজ আবার এ কোন্ পর্ব? একি নিত্যলীলায় প্রবেশের সূচনা?

এইদিনও শ্রীবিগ্রহকে চৈতন্য তাঁহার বুকে তুলিয়া নিতে গেলেন। মুহূর্তমধ্যে এক মহা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চিরতরে তিনি হইলেন অন্তর্হিত।

বহু খোঁজাখুঁজিতেও প্রভুর নরদেহের সন্ধান আর পাওয়া যায় নাই। অগণিত ভক্তের ব্যাকুল অনুসন্ধান, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের আপ্রাণ প্রয়াস, সব কিছু সেদিন ব্যর্থ হয়। এ রহস্যময় অন্তর্ধান চির দুর্বোধ্য রহিয়া যায়।

সহস্র সহস্র ভক্তের আকুল ক্রন্দন সেদিন মিলাইয়া যায় সাগরের অশ্রান্ত কল্লোলে। ভুবনমোহন রূপটি নিয়া, প্রেমের মোহন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া আর প্রভু এ নরজগতে ফিরিয়া আসিবেন না!

প্রাকৃত লীলার অবসান ঘটিয়া গেল। কিন্তু প্রভুর অপ্রাকৃত লীলা? সে লীলার ধারা যে চিরন্তন—শাশ্বত! সাধক কবি এই পরম সত্যেরই জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। চারিদিকে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার। নবদ্বীপের এক-একপ্রান্তে, গঙ্গাতীরের নির্জন শ্মশানে বসিয়া কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ধ্যানমগ্ন।

লোকালয় হইতে বহুদূরে এ শ্মশান। আশেপাশে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। শুধু মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসে পেচক, শিবা আর সারমেয়ের অতর্কিত কণ্ঠস্বর। বট-পাকুড় আর শেওড়ার শাখায় শাখায় গাঢ় অন্ধকারের জটাজাল রহিয়াছে এলায়িত। জনবিরল এ শ্মশান বড় ভীতিপ্রদ। গভীর রাত্রে সহসা কেউ এদিকে আসে না।

প্রতি অমাবস্যা নিশীথে কৃষ্ণানন্দ এখানে বসিয়া শ্যামামায়ের পূজা সম্পন্ন করেন। তারপর ধ্যান জপে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সারিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া আসেন।

আগম-বিশারদ, মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের মনে বড় ক্ষোভ—সাধের তন্ত্রসাধনা বড় অবনতির বড় দুর্গতির পথে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কদাচার ও দুর্নীতির প্রাবল্য চারিদিকে। শক্তিসাধনার মহান্ ক্ষেত্র ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। সাধকপ্রবর তাই জগজ্জননীর চরণে বার বার মিনতি জানান, তন্ত্রসাধনার ধারা আবার যেন তাঁহার কৃপায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

আরও একটি বড় অভাববোধ রহিয়াছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অন্তরে। ঘট বা যন্ত্র প্রভৃতি প্রতীক পূজায় তাঁহার মন ভরিতে চায় না। ব্রহ্মময়ী শ্যামামায়ের রূপময়ী বিগ্রহ তিনি অর্চনা করিতে চান, সারা বাংলার জনসমাজে এক মাতৃমূর্তিকে, এই আদর্শ বিগ্রহকে প্রচারিত করিতে চান। নহিলে মনে তাঁহার শান্তি নাই। শক্তি-সাধনাকে মাতৃ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ভক্তিরসে রসায়িত করিয়া তিনি উহাকে সার্থকতর করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।

আজিকার অমাবস্যা তিথির পূজা অনুষ্ঠান এইমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে। ইষ্টদেবীর চরণে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া কৃষ্ণানন্দ ধ্যানস্থ হইলেন। বড় দুর্নিবার তাঁহার এই দিনকার সঙ্কল্প।

আদ্যাশক্তির প্রত্যাদেশ অবশেষে মিলিল। পূর্ণমনস্কাম সাধক 'মা-মা' আরাবে শ্মশানভূমি কম্পিত করিয়া তুলিলেন।

দেবী কহিলেন, "বৎস, তন্ত্রধৃত এই বাংলায় তন্ত্রসাধনার মূল ধারাটি আজো অব্যাহতই রয়েছে। তা যে অন্তঃসলিলা। আমার বীর সাধকদের পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে এ ধারা চিরদিন এখানে বয়ে চলবে। কিন্তু আজ এ সাধনার বহিরঙ্গ স্তরে জমে গিয়েছে নানা পঙ্কিলতা ও কলুষের কালিমা, তার অনেকটা দূর হবে তোমারই প্রচেষ্টায়। আমার মাতৃরূপিণী বিগ্রহের পূজা তুমি নিজে শুরু করে দাও, অচিরে বাংলার ঘরে ঘরে তা প্রচলিত হবে। বৎস, আরো একটা বড় কাজ তোমার রয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার আর তার এক সঙ্কলন-গ্রন্থের রচনা তুমি সম্পন্ন করো। আমার বরে তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।"

কৃষ্ণানন্দ ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু মাগো, তোমায় কোন্ রূপে আমি পুজো করবো? কোন্ মূর্তি এদেশে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠবে? কৃপা ক'রে তা আমায় দেখিয়ে দাও। ধ্যানের ধারণায় নয়, স্থূল জগতের আরাধ্য বিগ্রহকে স্থূলভাবেই আজ আমায় দেখিয়ে দাও। তারই পুজো আমি সর্বত্র প্রচার করবো।"

"বৎস, তাই হবে। যে মূর্তিতে, আর যে ভঙ্গীতে আমার এই বিগ্রহের পুজো তোমা-দ্বারা প্রচলিত হবে, তা মানবদেহের মাধ্যমেই তোমায় দেখিয়ে দেবো। নিশাবসানে কাল সর্বপ্রথমে যে নারী মূর্তি'টি যে রূপে যে ভঙ্গীতে তোমার নয়নগোচর হবে, তাই হবে আমার সাধকজনের হৃদয়বিহারিণী মূর্তি। বাংলার ঘরে ঘরে সবাই তা আরাধনা করবে।"

পরদিন প্রত্যূষে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গার দিকে চলিয়াছেন। কিছুটা অগ্রসর হইয়া অস্ফুট উষালোকে দেখিলেন, অদূরে এক শ্যামাঙ্গিনী গোপকুমারী অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দক্ষিণ পদটি কুটিরের অনুচ্চ বারান্দার উপর স্থাপিত। আর বামপদ রহিয়াছে ভূতলে। দক্ষিণ করতলে এক তাল গোময়। এমনভাবে উহা সে উঁচু করিয়া ধরিয়া আছে, মনে হয় যেন হস্তের বরাভয় মুদ্রারই এক প্রতিচ্ছবি। বাম হাতটি তাহার কর্মচঞ্চল, এই হাত দিয়া বেড়ার গায়ে দিতেছে মাটির প্রলেপ। রমণীর কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, নিটোল দেহের চারিদিকে তাহা আলুলায়িত। পরিধানে ক্ষুদ্র অপরিসর একটি শাড়ী। আচার্য কৃষ্ণানন্দকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণানন্দের অন্তস্থল যেন বিদ্যুৎ-আলোকে চমকিয়া উঠিল। মনে পড়িল ইষ্টদেবী শ্যামামায়ের প্রত্যাদেশ। প্রত্যূষে উঠিয়া সর্বপ্রথমে আজ যে এই নারী মূর্তি'টিই তিনি দেখিলেন। তবে তো ইহারই মধ্য দিয়া ঐশ নির্দেশ তাঁহার জন্য আসিয়া গিয়াছে। এই ভঙ্গিমায়ই জগন্মাতার বিগ্রহ তাঁহাকে তৈরি করিতে হইবে।

এবার প্রশ্ন কোন্ কর্মপদ্ধতি নিয়া কৃষ্ণানন্দ কাজে নামিবেন। স্থির করিলেন, শক্তি আরাধনাকে জনমানসের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিবেন প্রতিমা পূজার মধ্য দিয়া। ঘট ও যন্ত্রের স্থলে শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তিতে সাধকের ভাবকল্পনা ও পূজা-ধ্যান দানা বাঁধিয়া উঠিবে। এই মাতৃ-আরাধনা তিনি প্রচলিত করিবেন বাংলার গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি হাটে বাজারে ও বারোয়ারীতলায়। শক্তিসাধনার সঙ্গে ভক্তিরসের ঘটাইবেন সংমিশ্রণ। 'মা-মা' আরাবে দেশের দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিবে, তন্ত্রসাধনার ঘটিবে পুনরুজ্জীবন। জননী শ্মশানে আবির্ভূত হইয়া এই বরই যে তাঁহাকে দিয়া গেলেন।

সাধক কৃষ্ণানন্দের এ সঙ্কল্প অচিরে সিদ্ধ হয়। তাঁহার প্রচারিত শ্যামাপূজার পদ্ধতি ও রীতি সারা বাংলাদেশ গ্রহণ করে, সেদিনকার তন্ত্রসাধনার শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হয় মাতৃ-সাধনার উচ্ছলিত রসধারা। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্কলনে, তান্ত্রিক আচার-আচরণের শুদ্ধতা সম্পাদনে কৃষ্ণানন্দ অপূর্ব সফলতা অর্জন করেন। কয়েক শত বৎসরের ব্যবধানেও দেশ তাঁহার সে অবদান ভুলিতে পারে নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কথা। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে সাধক মহেশ্বর ভট্টাচার্যের তখন প্রবল প্রতিষ্ঠা। ধর্মনিষ্ঠ আচার্য ও তন্ত্রবিদ্‌রূপে তিনি সে অঞ্চলের সর্বত্র পরিচিত। মহেশ্বরের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলজ্ঞানির মৈত্র হিসাবে এক সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম ছিল না। নবদ্বীপে আসার পর হইতে তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া এই বংশের প্রসিদ্ধি আরও বাড়িয়া যায়। এ সময়ে মহেশ্বর পণ্ডিতকে উপাধি দেওয়া হয় গৌড়াচার্য। এই পণ্ডিতেরই জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

অর্চনা। শক্তিমান্ সাধকের আবাহন ও ধ্যান জপে মৃন্ময়ী বিগ্রহ হইয়া উঠেন চিন্ময়ী। জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া এক একদিন তাঁহার পরমভক্তের কত আবদার কত মান অভিমান জননী শ্রবণ করেন। তারপর রাত্রিশেষে আগমবাগীশ লোকচক্ষুর অগোচরে ইষ্টবিগ্রহ গঙ্গার জলে বিসর্জন দেন, আপনগৃহে ফিরিয়া আসেন।

জগন্মাতার কৃপায় কৃষ্ণানন্দ অধ্যাত্মজীবনের সাহিত এবার যুক্ত হইয়া উঠে এক মহাকৌল সাধকের শক্তি ও প্রেরণা। জটাধারী পরমহংস নামে তন্ত্রসাধকদের মধ্যে ইনি পরিচিত। অসামান্য যোগ-বিভূতির অধিকারী ছিলেন এই সিদ্ধ মহাপুরুষ। অলৌকিক শক্তির বহুতর প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার জীবনে, তাই সাধারণ লোকে তাঁহাকে অভিহিত করিত জটিয়া-জাদু নামে।

সেদিন কার্তিকী অমাবস্যা। জঙ্গলাকীর্ণ বাগিচায়, পঞ্চমুণ্ডীর আসনযুক্ত গৃহটিতে আগমবাগীশ শ্যামাপূজার আয়োজন করিয়াছেন। এই পুণ্যতিথিতে অনুষ্ঠানের বড় সমারোহ। বহু উপচার নিয়া ভক্তসাধক ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া আছেন।

কথিত আছে, পূজারত হইলে আগমবাগীশের মন্ত্র হইয়া উঠিত চৈতন্যময়, আত্মহারা 'মা-মা' রবে বিগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। মৃন্ময়ী দেবী জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া পুষ্পার্ঘ্য ও ভোগান্ন গ্রহণ করিতেন। সেদিনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে আচার্য ধ্যানাবিষ্ট হইয়া আছেন। দিব্যপ্রভায় সারা ঘর উদ্ভাসিত করিয়া জগন্মাতা গৃহমধ্যে হইয়াছেন আবির্ভূতা।

কৃষ্ণানন্দের তখন অর্ধবাহ্য অবস্থা। আনুষ্ঠানিক সব কিছু কাজই করিতেছেন যন্ত্রচালিতের মতো। বেহুঁশভাবে তাড়াতাড়ি পূজা সমাপ্ত করিলেন। ভোগের পায়সান্ন নিবেদন করিয়া দেবীকে আচমনজল নিবেদন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে কক্ষের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল, "কৃষ্ণানন্দ, দেখছো না মায়ের ভোগ গ্রহণ এখনো সম্পন্ন হয় নি! এরই মধ্যে তাঁকে আচমনের জল এগিয়ে দিয়ে বিদায় দিচ্ছো? ভালো ক'রে তাকিয়ে দ্যাখো, পুষ্প, পত্র ও নির্মাল্যের ভিড়ে তোমার নিবেদিত পায়সান্ন চাপা পড়ে গিয়েছে, আর মা তা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।"

কৃষ্ণানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন, সত্যই তো! মায়ের ভোজন তখনো শেষ হয় নাই! নিষ্ঠাভরে আবার তিনি নূতন করিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন।

এবার হুঁশ হইল। কাহার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিলেন? তাড়াতাড়ি পিছনে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখা গেল, রহস্যময় এক অপরিচিত অতিথি দণ্ডায়মান। দীর্ঘবপু, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা। মাথায় শুভ্র জটাজাল, পরিধানে রক্তাম্বর। নিষ্পলক নেত্রে কৃষ্ণানন্দের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন। কে এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী?

শ্যামা-মায়ের এ বিশেষ পূজাটি কৃষ্ণানন্দ বৃক্ষ-বাটিকার এক প্রান্তে একান্ত নিভৃতে সম্পন্ন করেন। এসময়ে পঞ্চমুণ্ডী আসনযুক্ত ঘরটি থাকে ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তবে এই তান্ত্রিক সাধক ইহার মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিলেন? ক্ষণপরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল আগমবাগীশ বুঝিলেন—শক্তিধর মহাপুরুষ আপন বিভূতি বলেই এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন।

সবিনয়ে তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ জানাইলেন, "বাবা, তোমরা যাকে জটিয়াজাদু ব'লে জানো, আমি সেই। আমার নিজের জাদু কিছু থাক্ না থাক্, শ্যামামায়ের জাদুতে যে আমি পড়েছি তাতে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণানন্দ! তোমার সাধনার কথা, তন্ত্রাচার ও তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্কার সাধনের কথা আমি শুনেছি। তাইতো ভাবলাম, মায়ে-পোয়ে একান্তে বসে যে আনন্দ তোমরা উপভোগ করো তাতে আজ কিছুটা ভাগ বসাই। তোমার এ পূজা অনুষ্ঠান, তোমার হৃদয়ের এ আকুল আকুতি আমি এতক্ষণ ধরে দেখছি, আর নয়নজলে ভাসছি! আশীর্বাদ করি, তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হোক, বাংলার শক্তিসাধনা আবার তোমার মতো সাধকের ভেতর দিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক।"

ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে আগমবাগীশ এই সিদ্ধ কৌলাচার্যের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

জটাধারী পরমহংস নবদ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন। কৃষ্ণানন্দ এই সুযোগে তাঁহার কাছে শক্তি সাধনার নানা গূঢ় ও দুরূহ তত্ত্ব শিক্ষা করেন। অচিরে তন্ত্র-সিদ্ধির আলোকে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম দিক্‌দর্শকরূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

নবরচিত গ্রন্থ 'তন্ত্রসার' ও 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানন্দ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। পণ্ডিত ও সাধকসমাজে তাঁহার রচনা সমাদৃত হইতে থাকে। তাঁহার কাছে কৌল সাধনার দীক্ষা নিয়া শত শত সাধক কৃতার্থ হন।

এখন অবধি আচার্য কৃষ্ণানন্দের প্রভাব পড়িয়াছে শুধু সমাজের উচ্চস্তরে, সাধক, পণ্ডিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে। জনসাধারণ তাঁহার এই সংস্কার আন্দোলন গ্রহণ করে নাই, শ্যামাবিগ্রহের পূজা ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। কৃষ্ণানন্দের মনে তাই ক্ষোভের সীমা নাই। নিভৃত আরাধনার সময়ে প্রতিদিন মায়ের চরণে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করেন, "জননী, তোমার আশীর্বাদ তাড়াতাড়ি সফল ক'রে তোলো, তোমার মূর্তি পূজা বাংলার ঘরে ঘরে, সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দাও।"

তিনি বুঝিলেন, তন্ত্রসাধনাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে আগে ইহার ভিতরকার অনাচার ও ক্লেদ দূর করিতে হইবে। বামাচারী সাধকেরা এসময়ে এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন অবাঞ্ছিত আচার অনুষ্ঠান। সংস্কারপন্থী আচার্য কৃষ্ণানন্দ তাই সর্ব প্রথমে তান্ত্রিক সাধকদের অনুষ্ঠের কর্মশুদ্ধির উপর জোর দিলেন। তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যান ব্যক্তিত্ব ও সাধনার সাফল্য অল্পকাল মধ্যে জনজীবনে নূতনতর চেতনা আনিয়া দিল। এ চেতনাকে তিনি উজ্জীবিত করিলেন মাতৃসাধনার ভাবপ্রবাহে। এই প্রবাহেরই রসসিঞ্চনে পুষ্ট হইয়া উঠে উত্তরকালের তন্ত্রপ্রভাবিত বাঙালীসমাজের একটা বড় অংশ।

কৃষ্ণানন্দের তিরোভাবের পরও তাঁহার প্রবর্তিত তন্ত্রসাধনার বেগ প্রশমিত হয় নাই। অনতিকাল মধ্যে মহাসমারোহে তাঁহার নির্দেশিত পদ্ধতিতে শ্যামা বিগ্রহের পূজা সম্পন্ন হইতে থাকে। দেশের দিকে দিকে, শহরে গ্রামে ও বারোয়ারীতলায় এই মাতৃমূর্তির আরাধনা সাড়ম্বরে শুরু হয়ে যায়।

শক্তি পীঠবহুল বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে আচার্য কৃষ্ণানন্দের শক্তিসাধনার প্রভাব, জগন্মাতার অনুধ্যান করিয়া তাঁহার দেশবাসী ধন্য হয়। আপন শক্তিবলে শক্তি-সাধনার গূঢ় অন্তঃসলিলা ধারাকে কৃষ্ণানন্দ আনিয়া দেন সর্বজনের দুয়ারে, ধীরে ধীরে দেশের জনচৈতন্যে ইহা বিস্তারিত হইয়া উঠে।

তুকারাম

পন্ঢরপুরে সেদিন উৎসবের মেলা বসিয়া গিয়াছে। পুণ্যতোয়া ভীমা নদীর তীরে অসংখ্য স্নানার্থীর ভিড়। কাছেই বিঠ্ঠল দেবের শ্রীমন্দির। প্রভুজী আজ সেখানে নয়নাভিরাম বেশে সাজিয়া বসিয়া আছেন। আশেপাশে সাজসজ্জা ও জাঁক-জমকের অন্ত নাই।

মালা চন্দন আর নৈবেদ্যের থালি হাতে হাজার হাজার নর-নারী পূজা নিবেদন করিতে আসিয়াছে। ভক্তদের নৃত্য কীর্তনে ও বিগ্রহের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

এই উৎসবের দিনে আর পাঁচজনের মতো ভক্ত তুকারামও ছুটিয়া আসিয়াছেন। বৈরাগ্যবান্, মুমুক্ষু এই মারাঠী যুবকের জীবনে প্রভু বিঠ্ঠলজীই হইয়া উঠিয়াছেন সর্বস্বধন। লীলাময় ঠাকুর কোন্ ফাঁকে সঙ্গোপনে আসিয়া যে তাঁহার হৃদয়বেদীতে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, তাহা নিজেও তুকা জানেন না।

তুকার একুশ বৎসরের এই জীবনে পর পর আসিতেছে দুঃখ দুর্দৈবের নানা লাঞ্ছনা। শোক দারিদ্র্যের কশাঘাতে বার বার তিনি জর্জরিত হইয়াছেন। কিন্তু পন্ঢরপুরে আসিলেই এই জাগ্রত বিগ্রহের কৃপায় পাইয়াছেন পরম শান্তি, পরম আশ্রয়।

বিঠ্ঠলজীর অমৃতনিষ্যন্দী নয়ন বার বারই তাঁহাকে এখানে টানিয়া আনিতেছে, কিন্তু জীবনের পাত্রটি পূর্ণ হইয়া উঠে কই?

তুকারামের অন্তর আজ বড় চঞ্চল হইয়াছে। প্রাণপ্রভু তাঁহাকে নিয়া এ যাবৎ কম পরীক্ষা করেন নাই। দিনের পর দিন চলিয়াছে এই ভক্তজীবনের নিষ্করুণ মন্থন। হলাহল তাহাতে ঠিকই উঠিয়াছে। কিন্তু কই? অমৃত তো তুকার জীবনে আজও উদ্গত হয় নাই? কবে প্রভুর সত্যকার কৃপা হইবে, দর্শনলাভে অভীষ্ট হইবে পূর্ণ—এই প্রশ্নটি আজ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ইষ্টবিগ্রহের কাছে ইহারই উত্তর তুকা শেষবারের মতো জানিয়া যাইতে চান।

ভজন কীর্তন ও নৃত্যের পালা শেষ হইল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে তিনি নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্নান সমাপনের পর যখন প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে আসিয়া বসিলেন, রক্তরাঙা সূর্য তখন পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে।

ভাবিলেন, এবার একটু বিশ্রাম করা যাক্। গা এলাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন দুটি মুদিয়া আসিল। উৎসবের কোলাহলও তখন অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

তন্দ্রার ঘোরে ভক্ত তুকারাম সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। এ স্বপ্ন তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় পরম সত্য উদ্ঘাটনের গূঢ় ইঙ্গিত, প্রভুজীর মিলনকুঞ্জের দুয়ারটি করে উন্মোচন। সঙ্গে সঙ্গে তুকার লৌকিক জীবনের বন্ধনটি সেদিন কি করিয়া যেন ছিন্ন হইয়া যায়। মহাভক্তের মানসপটে স্বপ্নের অলৌকিক দৃশ্যগুলি একের পর এক ভাসিয়া উঠিতে থাকে—

তুকারাম দেখেন দেবদুর্লভকান্তি এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বটবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। দিব্য প্রেমের আবেশে নয়ন ঢুলু-ঢুলু, শ্রীমুখ হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে হরিনাম।

ভক্ত সাধকের সারা অস্তিত্বের মূলে হঠাৎ সাড়া পড়িয়া গেল।

আনন্দঘনমূর্তি এই সন্ন্যাসীর আকর্ষণ বড় অমোঘ। তুকার সারা দেহমন কেন্দ্রীভূত হইয়া এই দিব্য পুরুষের চরণে লুটাইতে চায়।

ভাববিহ্বল ভক্তকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন, আর দিলেন নাম-দীক্ষা আশীর্বাদ।

তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে। অপূর্ব আনন্দাবেশে তুকা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, দীক্ষাগুরুর চিহ্ন কোথাও নাই, কিন্তু সর্বসত্তায় তরঙ্গিত হইতেছে মন্ত্রচৈতন্যময় নাম।

স্বপ্নলব্ধ এই নাম তরুণ ভক্তের জীবনে ঘটায় এক অপরূপ রূপান্তর। শুধু তাহাই নয় তুকার সাধনা তাঁহার নাম-প্রেমের প্রচার আর প্রেমরসে সিক্ত অগণিত অভঙ্ পদাবলী মহারাষ্ট্রের জনজীবনে জাগাইয়া তোলে নূতনতর অধ্যাত্মচেতনা।

ভক্ত তুকারাম তাঁহার স্বরচিত অভঙ্-এ সেদিনকার স্বপ্ন-দীক্ষার কথাটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

রাঘবচৈতন্য কেশবচৈতন্য
সাঙ্গি তলি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাজী আপনে সাঙ্গিতলে নমোঙ্গ
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্লা দশমী পাহুনী গুরুবার
কেলা অঙ্গীকার তুকা ভনে।

অর্থাৎ রাঘবচৈতন্য আর কৃষ্ণচৈতন্য ব'লে প্রভু আমায় জানালেন তাঁর গুরুপরম্পরা, তাঁর নিজের নাম বললেন—বাবাজী, আর জপ করতে দিলেন আমায় পবিত্র নাম—'রাম কৃষ্ণ হরি'। মাঘ শুক্লা দশমীর পবিত্র গুরুবারে আমায় তিনি করলেন অঙ্গীকার।

এই স্বপ্নদীক্ষা ও পথনির্দেশ তুকারামের সাধনজীবনে এক স্বর্গীয় অবদানরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে নিজ অভঙ্-এ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—'গুরু আমার সর্বজ্ঞ। জানতেন তিনি কোন্ নামমন্ত্র আমার প্রিয়, আর কোন্ মন্ত্র জপ করতে পারবো আমি অনায়াসে। কৃপা ক'রে তা-ই তিনি দান করলেন আমায়। সত্যিই তা সহজে খুলে দিয়েছে আমার সাধনার পথ। শুধু তাই নয়, এ মন্ত্র পার ক'রে দিয়েছে এ ভবার্ণবে কত সাধককে। তারা জানুক আর না-ই জানুক এর মর্ম, ভেলারূপে তরিয়ে দিয়েছে তাদের। সত্য-সত্যই এই পবিত্র ভেলায় আশ্রয় মিলেছিল আমার—আর এ আশ্রয় পেয়েছিলাম প্রাণপ্রভু পাণ্ডুরঙ্গের অপার কৃপায়।'

স্বপ্নে আবির্ভূত তুকার গুরুদেব এই 'বাবাজী' স্বপ্নালোকের পুরুষ নন। লৌকিক জীবনে এক মহাবৈষ্ণব সাধকরূপে তিনি অবতীর্ণ হন মহারাষ্ট্রভূমে। তাঁহার পবিত্র সমাধি আজও দেখা যায় বোম্বাই রাজ্যের ওতুর গ্রামে। এই পরমভাগবত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় আজো রহিয়াছে অনুদ্ঘাটিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার এই 'বাবাজী' নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধারার কোনো সিদ্ধ সাধকেরই পরিচয় জ্ঞাপন করে—রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতন্য নামের মধ্য দিয়া চৈতন্যদেবের শিষ্য-পরম্পরার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মারাঠী গবেষক রাণাডের মতে, বাবাজী ছিলেন জ্ঞানদেবের শিষ্য, সচ্চিদানন্দ বাবার সাধন ধারার এক বিশিষ্ট সংবাহক।

তুকারামের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে। পুণার আট ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দেহু নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশের উপাধি ছিল 'মোরে'। জাতিতে তাঁহারা বণিক।

মোরে পরিবার পন্ঢরপুরের বিঠোবাজীর পরম ভক্তরূপে পরিচিত ছিলেন। এই বংশেরই ভক্তিমান্ সন্তান বোহ্লাবা। ইহার পুত্ররূপে সাধক তুকারাম ভূমিষ্ঠ হন। সাধ্বী ও ধর্মপরায়ণা মহিলারূপে তাঁহার মাতা কনকাবাঈর খ্যাতিও কম ছিল না।

বোহ্লাবা বড় নিষ্ঠাবান্ পুরুষ, জপ-ধ্যানেই সদা তাঁহার দিন কাটে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজী সংসার-বিরক্ত ও উদাসীন। মধ্যম পুত্র তুকারামকে পিতা তাই অল্প বয়সে ব্যবসায় ঢুকাইয়া দেন। বিবাহও তাঁহার দেওয়া হয় নিতান্ত অল্প বয়সে। কিন্তু তুকার প্রথমা স্ত্রী রুক্মাবাঈর ক্ষয়রোগ দেখা দেওয়ায় আবার তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করানো হয়। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জিজাবাঈ।

তুকার আঠারো বৎসর অবধি তাহাদের সংসারে দুঃখদৈন্যের কোনো ছায়া পড়ে নাই। কিন্তু ইহার পরই আসে উপর্যুপরি নানা দুর্দৈবের আঘাত। প্রথমে আকস্মিকভাবে তাঁহার পিতা ও মাতার মৃত্যু ঘটে, দুই চোখে তিনি অন্ধকার দেখিতে থাকেন। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এ সময়ে সারা মহারাষ্ট্রে বিস্তারিত হয়। দরিদ্র সংসারে দুঃখ দুর্গতির সীমা থাকে না। এ দুঃসময়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাওজী একদিন গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

দুর্দশা অতঃপর চরমে আসিয়া পৌঁছিল। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত তুকার জীবনকে এসময়ে তীব্রভাবে মন্থন করিতেছে, আর অন্তরের অন্তস্তলে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পরমপ্রভুর জন্য অনুরাগের অমৃত। বহিরঙ্গ জীবনে বার বার পড়িতেছে ঝটিকার আঘাত, কিন্তু তাঁহার অন্তর্জীবনের মর্মকোষে রচিত হইয়া উঠিতেছে অধ্যাত্ম-জীবনের এক নিভৃত নীড়।

ব্যবসায়টি কিন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, তুকা দেউলিয়া হইলেন। ঋণের দায়ে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পত্নী জিজাবাঈ সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে, চেষ্টাচরিত্র করিয়া স্বামীকে কিছু অর্থ এসময়ে যোগাড় করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আবার তাঁহাকে ব্যবসায়ের কাজে প্রবৃত্ত করাইবেন। কিন্তু সংসারের বন্ধন যাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে সাংসারিক কাজের ডোরে তাঁহাকে সহজে বাঁধা যাইবে কেন?

একদিকে অভাব অনটন আর একদিকে পত্নী জিজার গঞ্জনা। তুকারাম অনন্যোপায় হইয়া আবার নূতন করিয়া এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহাতেই বা সমস্যার সমাধান হয় কই? ক্রেতারা প্রায়ই ধারে জিনিসপত্র কিনিয়া নিয়া যায়। সত্য হোক মিথ্যা হোক, তাহাদের কষ্ট শুনিলেই তুকার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া আর হইয়া উঠে না। বলা বাহুল্য, দুষ্ট প্রবঞ্চকেরা তুকার কোমলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে থাকে। ফলে অচিরে এ ব্যবসায়টিও নষ্ট হয়।

অতিকষ্টে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে, তাছাড়া বাজারের ধার দেনাও ইতিমধ্যে কম হয় নাই। মহা দুশ্চিন্তায় তুকারামের দিন কাটিতেছে। এ সময়ে হঠাৎ একটা মালের কেনাবেচা করিয়া তিনি বেশ কিছু অর্থ লাভ করিলেন। নব উপার্জিত অর্থ নিয়া সানন্দে সেদিন বাড়ি ফিরিতেছেন, পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। ঋণের দায়ে

তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পত্নীও সেখানে উপস্থিত। মহিলাটি নিরুপায়, কি আর করিবে? কেবলি কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।

এ দৃশ্য দেখিয়া তুকার হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিল। নিজের সব টাকাকড়ি ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধের জন্য দান করিয়া রিক্ত অবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরিলেন। বলা বাহুল্য, পাওনাদারদের অত্যাচার ও পত্নী জিজার গঞ্জনার অবধি রহিল না।

লীলাময় প্রভু বিঠোবা এমনি করিয়াই সেদিন দুঃখের আগুনে তাঁহার পরমভক্ত তুকারামের জীবনকে বার বার পুড়াইয়া নিতেছেন, নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতেছেন।

ভক্ত তুকার জাগতিক বন্ধনগুলিও এইবার একে একে যেন ছিন্ন হইতেছে। দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে নিজে জর্জরিত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত প্রথমা স্ত্রী আগেই মারা গিয়াছেন, এবার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোজীও ভুগিয়া ভুগিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সংসারের কোলাহল হইতে মাঝে মাঝে তুকা নিজেকে সরাইয়া নেন। দেহুর নিকটেই ভাম্বনাথ পাহাড়, এখানকার নিভৃত অরণ্যে প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যায়। প্রকৃতির শান্ত উদার পরিবেশে পর্বতের নিভৃত কন্দরে, প্রাণ প্রিয় ইষ্ট বিঠোবার ধ্যানে তিনি বিভোর থাকেন। মাথার উপর দিয়া দিনরাত্রি সমভাবে চলিয়া যায়। অনশন, অনিদ্রা, কোনো কিছুতেই তুকার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কনিষ্ঠ সহোদর কাহ্নাইয়া দেখিলেন—বড় বিপদ। বিষয় বিরক্ত ভ্রাতাকে দিয়া সংসারের কোনো কাজই আর হইবার নয়। এদিকে দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে সারা দেশ একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে এক মুষ্টি অন্নেরও সংস্থান নাই।

বহু চেষ্টায় কাহ্নাইয়া এবার পৈত্রিক সম্পত্তি কিছুটা উদ্ধার করিলেন। জমিজমা সংক্রান্ত কতকগুলি জরুরী দলিলপত্র সঙ্গে নিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন ভাম্বনাথ-এ। তাঁহার বড় ইচ্ছা, তুকাকে গৃহে আবার ফিরাইয়া আনিবেন। কিন্তু বিষয়-বিরক্ত ভক্ত সাধককে বুঝানো বড় কঠিন ব্যাপার। ভ্রাতার কোনো বৈষয়িক কথাবার্তায় তুকা কান দিলেন না, চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁহার নিজের অংশের দলিলপত্রগুলি তুলিয়া নিয়া নদীগর্ভে দিলেন বিসর্জন। কাহ্নাইয়া সংসারী জীব, সভয়ে সে তাহার হিস্যার কাগজপত্র গুছাইয়া নিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ইন্দ্রায়ণীর তীরে বসিয়া তুকারাম প্রভুর নামজপ ও ধ্যান করেন। একদিন এক কৃষক অনুরোধ জানাইয়া বলে—"তুকা তুমি তো এখানে বসে নিষ্কর্মা হয়েই দিন কাটাচ্ছো, আমার ক্ষেতের শস্যগুলো তুমি পাহারা দাও না কেন? এজন্য মজুরি অবশ্য তুমি পাবে —তোমার ঘরে আমি কিছু শস্য দিয়ে আসবো।"

তুকারাম রাজী হইলেন। কিন্তু পাহারা দিবেন কি, পাখির দল শস্যের উপর উড়িয়া আসিয়া বসে—আর তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। ভাবেন, 'আহা, ভগবান্ তো পৃথিবীর বুকে শস্য ঢেলে দিচ্ছেন তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য। তবে অনাহারে এচারারা কেন মরবে?'

ফলে ক্ষেতের শস্য উজাড় হইয়া গেল, তারপর পঞ্চায়েতের বিচারে তুকার লাঞ্ছনার সীমা রহিল না।

হরিকথা ও হরিকীর্তন যখন যেখানে অনুষ্ঠিত হয় ভক্ত তুকা সাগ্রহে তখনি সেখানে ছুটিয়া যান। অপূর্ব তাঁহার দৈন্য ও সেবানিষ্ঠা। কীর্তনস্থলীতে আগত ভক্তদের চরণে

কাঁকরের আঘাত লাগে—তুকা তাই স্বহস্তে মন্দির চত্বর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখেন। গ্রীষ্মের দিনে গায়ক ও শ্রোতাদের দেহ ঘর্মাক্ত হয়, তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের ব্যজন করেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোনো কশাঘাতই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ভক্ত তুকার পরমধন ইষ্ট বিঠ্ঠলজী, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—নিরন্তর প্রাণপ্রভুর লীলাকীর্তন। সাধকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ প্রভৃতির অপূর্ব ভক্তিসংগীতের আস্বাদনে হৃদয় তাঁহার উথলিয়া উঠে। এক একদিন মনে অভিলাষ জাগে প্রভুজীর চরণে প্রাণের আকুতিটি নিবেদন করিবে, নিজের রচিত অভঙ্-এর মধ্য দিয়া। কিন্তু সে আশা যে দুরাশা। নিতান্ত দীনহীন তিনি। প্রকৃত ভক্তি নিবেদনের সামর্থ্য তাঁহার কোথায় ? তাছাড়া, কোথায় তাঁহার রচনাশক্তি ও ভাবের মাধুর্য ? শব্দের লালিত্য আর সুরের মধু ঝঙ্কারই বা কই ? ভক্ত তুকা কেবলই ভাবিয়া আকুল হন প্রভুর প্রীতি-বর্ধনের কোনো উপকরণই যে তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

ক্রমে এক অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে তুকার মধ্যে। মারাঠী ভক্তসাধকদের গ্রন্থপাঠে তিনি তৎপর হন। শাস্ত্র পড়া নাই বটে, কিন্তু মর্মার্থ গ্রহণের সহজাত শক্তি নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। অল্পকালের মধ্যে তাই গীতা ও ভাগবতের তত্ত্বে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। জ্ঞানেশ্বরী, একনাথের ভাগবতভাষ্য, নামদেবের অভঙ্ প্রভৃতি পাঠের ফলে ভক্তিশাস্ত্রে তিনি নিপুণ হইয়া উঠিলেন।

রসজ্ঞ ভক্তের নূতনতর অধ্যাত্ম-প্রস্তুতির সঙ্গে হঠাৎ একদিন বিঠ্ঠলজীর আদেশও আসিয়া গেল।

কার্তিক মাসের এক স্নিগ্ধ রাত্রি, চারিদিকে চাঁদের আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। বিঠোবাজীর দর্শনে তুকা পন্ঢরপুরে চলিয়াছেন। হঠাৎ এক দিব্য আনন্দের তরঙ্গে পথিমধ্যে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। স্বপ্নে দেখিলেন—বিঠোবাজী স্নেহভরে কহিতেছেন, "তুকা, আমার ভক্ত নামদেব যতগুলো অভঙ্ রচনা করবে বলে সঙ্কল্প করেছিল, তাতে সে সফল হয় নি। তুমি সে অপূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ ক'রে তোল !"

আদিষ্ট অভঙ্ রচনায় তুকারাম এবার অগ্রসর হইলেন। ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পদাবলী রচনার পর অজস্র ভক্তিরসাত্মক অভঙ্ তিনি রচনা করিয়া চলিলেন।

এবার ভক্ত তুকারামের অনুরাগীর দল ক্রমে বাড়িতে থাকে। বিঠোবাজীর মন্দির আর তাঁহার গৃহের অঙ্গনে যেন ভক্তিগঙ্গার বান ডাকিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের অনেকে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পায়ের ধুলাও সোৎসাহে ইঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রক্ষণশীল সমাজপতিরা বিক্ষুব্ধ হন।

সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে গঙ্গাধর পান্তের খ্যাতি যথেষ্ট। আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্যমান্য সন্তোজী তেলী—এই দুই প্রভাবশালী শিষ্য হইতেছেন তুকার পার্শ্বচর। বীণা ও করতাল বাজাইয়া ইঁহারা তুকার নামকীর্তনের আসর মাতাইয়া তোলেন। অথচ গুরু তুকা হইতেছেন নীচ জাতীয়। অনেকেরই ইহা অসহ্য হয় এবং তাহারা শত্রুতা সাধন করিতে থাকে।

মম্বাজী গোঁসাই দেহু গ্রামের এক প্রতিপত্তিশালী মোহান্ত। তুকার উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। শূদ্রের এই প্রাধান্য কেন ? কেনই বা সকলে তাঁহার কাছে

আশ্রয় নিতে যায় ? এ অনাচার তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। কুচক্রীর চক্রান্ত ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠিল, শুরু হইল তুকার উপর অত্যাচার।

একদিন ভাবাবেগে বিঠ্‌ঠলজীর নাম করিতে করিতে তুকারাম গ্রামের পথে চলিয়াছেন। নিভৃতে সুযোগ বুঝিয়া মম্বাজী এক কাঁটা গাছের ডাল নিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। আঘাতের পর আঘাতে তুকার পিঠ বাহিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু নামপ্রেমের রসে তুকা মাতোয়ারা। কোনো হুঁশ তাঁহার নাই।

মম্বাজী প্রায়ই তুকারামের হরিকীর্তনের আসরে উপস্থিত থাকেন। আসল উদ্দেশ্য, এই শূদ্র ধর্মনেতার আচরণ ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করা। সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু কীর্তনে তাঁহাকে দেখা গেল না। নিজের অপকর্ম ও নিষ্ঠুরতার কথা বার বার এই মোহান্তের মনে পড়িতে থাকে, অনুতাপ এবং লোকলজ্জা ভয়ও দেখা দেয়।

তুকা কিন্তু রাত্রে মম্বাজীর গৃহে গিয়া উপস্থিত। চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন —"গোঁসাই দোষ আমারই। বহুক্ষণ ধরে আমায় প্রহার ক'রে ক'রে আপনাকে শ্রান্ত হতে হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ আপনার পদসম্বাহন করছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন, দয়া ক'রে কীর্তনাঙ্গনে এসে বসুন।"

এমনিতেই অনুতাপের জ্বালায় মম্বাজী গোঁসাই জ্বলিতেছেন। এবার তুকার এই অমানুষী দৈন্য ও ভক্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "তুকা, তুমি ভক্ত, তুমি মহৎ একথা শুনেছি। কিন্তু এত মহৎ তুমি, তা কিন্তু বুঝতে পারিনি। বিঠোবার চরণে নিজের অহংবোধকে অর্পণ ক'রে তুমি তাঁকে পেয়েছ। আর আমি রয়েছি নিজের আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হয়ে। এ অন্ধকে কি তুমি আলো দেখাতে পারবে ? তোমার হাতেই আজ থেকে নিজেকে আমি ছেড়ে দিলাম।"

তুকা পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

তুকারামের খ্যাতি এসময়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দূর-দূরান্ত হইতে প্রায়ই ভক্ত ও মুমুক্ষুর দল তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সে-বার এক ব্রাহ্মণ সাধক পন্ঢরপুরের মন্দিরে আসিয়া ধর্না দেয়। সকাতর প্রার্থনা জানায়, "প্রভু বিঠ্‌ঠলজী, আর যে এ অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকতে পারিনে। আমায় কৃপা করো, জ্ঞানের দীপটি জ্বালিয়ে দাও।"

ঠাকুরের আদেশ আসিল—"বৎস, সিদ্ধ মহাত্মা জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা করো, কামনা তোমার পূর্ণ হবে।"

অচিরে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ধ্যান জপে মগ্ন হইলেন। এখানে বসিয়া যে দৈববাণী শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ঠাকুর কহিলেন,—"বৎস, তুমি দেহুতে চলে যাও। সেখানে আমার পরমভক্ত তুকারামের শরণ নাও, মনস্কামনা তোমার অবশ্য সিদ্ধ হবে।"

মুক্তিকামী সাধকটি এবার তুকারামের কাছে উপস্থিত হইলেন। তুকা সযত্নে তাঁহাকে দিলেন ভক্তিসাধনার কতকগুলি নিগূঢ় নির্দেশ। এই সঙ্গে তাঁহার জন্য রচনা করিয়া দিলেন এগারটি বিশেষ ধরনের ভক্তিপূর্ণ অভঙ্। ভগবৎ প্রসাদস্বরূপ একটি নারিকেলও দিলেন এই ভক্ত ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণের কিন্তু বড় খটকা লাগিয়া গেল। ভগবানের স্তবস্তুতি রচিত হইবে সংস্কৃত

ভাষায়। তা নয়। এ আবার কি? তুচ্ছ মারাঠী ভাষায় রচিত এ সব অভঙ্ এবং এই সামান্য নারিকেল প্রসাদ তাঁহার ভাল লাগে নাই। এগুলি উপেক্ষা করিয়া আবার তিনি জ্ঞানদেবের সমাধি মন্দিরে চলিয়া আসিলেন।

কোণ্ডবা নামে এক ব্রাহ্মণ এই অভঙ্ ও নারিকেলটি ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ভাবসিদ্ধ অভঙ্-পদগুলির সঙ্গে সেদিন নারিকেলের ভিতর রক্ষিত প্রচুর গুপ্তধনও তিনি পাইয়াছিলেন। কোনো এক ধনাঢ্য ভক্তের বাসনা ছিল, ভক্তবর তুকারামকে কিছু ধনরত্ন দান করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু বৈরাগীপুরুষ তুকাকে এ যাবৎ কোনো অর্থ বা বিত্ত-বিষয় গ্রহণ করানো যায় নাই। ভক্তটি এবার তাই তুকা ও তাঁহার সেবকদের জন্য নারিকেলের অভ্যন্তরে গোপনে স্বর্ণ ও রত্নাদি পুরিয়া দেন।

তুকার ঐ সময়কার রচিত অভঙ্ উত্তরকালে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং 'উত্তমজ্ঞান' নামে পরিচিত হয়।

মম্বাজীর মতো আরও এক ব্যক্তি তুকারামের উপর অত্যাচার শুরু করিয়া দেন। ইনি উগ্র ধরনের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, নাম রামেশ্বর ভট্ট। ব্রাহ্মণেরা শূদ্র তুকার পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। তদুপরি সনাতন সংস্কৃত ভাষায় না লিখিয়া তুকা তাঁহার অভঙ্ লিখিয়া চলিয়াছেন মারাঠী ভাষায়। এ যে এক মস্ত সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। সনাতনপন্থী রামেশ্বর ভট্টের কাছে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। এখানকার জমিদারও ভিড়লেন তাঁহার পক্ষে। উভয়ে মিলিয়া ঠিক করিলেন তুকারামকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবেন।

রামেশ্বরের মতিগতির কথা তুকার অজানা নাই। তবু একদিন একলা তিনি তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত। দৈন্যভরে চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "শুনলাম প্রভু আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। হবারই কথা। সত্যিই তো। বিঠোবাজীর নাম ক'রে বেড়াই, কিন্তু প্রকৃত ভক্তির উদয় যে আজও আমার হলো না। আপনি আমায় কৃপা করুন, কখনো যেন পায়ে ঠেলবেন না। আপনার আজ্ঞা এখন থেকে হবে আমার শিরোধার্য।"

ভট্ট হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"তুকা, তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। নীচু জাত হয়ে তুমি ব্রাহ্মণকে পদধূলি দিচ্ছো। তোমার উপদেশ আর অভঙ্-এর মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মের উচ্ছেদ ক'রে চলেছো। অথচ মুখে ব'লছো, আমার আদেশ মেনে চলবে। বেশ, এ যেন শুধু কথার কথা হয়ে না থাকে। তোমার সত্য রক্ষা করো। এক্ষুনি তোমার অভঙ্-রচনা ইন্দ্রায়ণীর জলে ফেলে দাও।"

সত্য রক্ষা না করিয়া সেদিন তুকারামের আর কোনো উপায় রহিল না। বিরোধী দল পরম উৎসাহে তখনই সমস্ত অভঙ্ এর পাণ্ডুলিপি তাঁহার বাড়ি হইতে নিয়া আসিল এই অমূল্য রত্নরাজী নিক্ষিপ্ত হইল নদীগর্ভে।

পরক্ষণেই ভক্ত তুকারামের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল তীব্র অনুতাপের জ্বালা। এ তিনি কি করিয়া বসিলেন? প্রভু বিঠোবার চরণেই যে তাঁহার সমস্ত অভঙ্ নিবেদিত! নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব তাহাতে কি আছে? কেন তিনি মিছামিছি এ সত্যরক্ষার মোহে পড়িলেন?

তের দিন তুকার অনাহারে কাটিয়া গেল।

মনে তাঁহার খেদের আর অন্ত নাই। রামেশ্বর ভট্টের সেদিনকার চক্রান্তের ফলে তাঁহার অভঙ্গুলি চিরতরে নদীগর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত প্রাণের কত আকূতি,

কতো রসোচ্ছল সংবেদনে এই সংগীত সমৃদ্ধ। ইহা শুধু তাঁহার ভক্তদেরই উপকারে আসিত না, তিনি নিজেও গাহিয়া কত উদ্দীপিত হইতেন।

বিঠোবার চরণে তুকা সেদিন ব্যাকুল মিনতি জানাইলেন, "প্রভু, তোমার চরণে উৎসর্গ করা অভঙ্‌গুলো যে তোমারই নিজস্ব বস্তু। মূর্খ আমি, এ মহাসম্পদের মর্যাদা আগে বুঝতে পারি নি। তোমার ধন এবার তুমিই আবার উদ্ধার ক'রে দাও।"

পরমভক্তের এই আকুল আবেদন বিঠোবা সেদিন গ্রহণ করেন। সেই রাত্রেই স্বপ্নযোগে দেহুর এক বিশিষ্ট ভক্তের সম্মুখে তিনি আবির্ভূত হন। তাহাকে কহেন, "তুকাকে তার অনশন ভাঙতে বলো। তাকে আরো জানিয়ে দাও, অভঙ্‌গুলো নষ্ট হয় নি। আমার প্রিয় ভক্তের নিবেদিত ধন আমি সযত্নে রক্ষা করছি। তোমরা ইন্দ্রায়ণীর জলের নিচ থেকে তা তুলে নিয়ে এসো।"

এই স্বপ্ন কাহিনী শুনিয়া গ্রামে সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। অবিলম্বে নদীতে জাল ফেলিয়া তুকার অভঙ্ গানের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। সকলে সবিস্ময়ে দেখেন, এতদিন জল গর্ভে থাকার পরও পাণ্ডুলিপির একটি পাতাও নষ্ট হয় নাই।

যে রামেশ্বর ভট্টের শত্রুতা ও অত্যাচারে তুকা জর্জরিত, অতঃপর তাঁহার দুর্গতিও কম হয় নাই। দুর্ব্যবহার করার ফলে তিনি এক ফকিরের কোপে পড়েন, সারা দেহে দেখা দেয় ঘৃণ্য মারাত্মক ব্যাধি।

ভট্টজীর সর্ব দেহ ও মন তখন বিধ্বস্তপ্রায়। বার বার তাঁহার মনে পড়িতেছে, বিঠ্‌ঠলজীর প্রিয়জন তুকারামের কথা। কত শত্রুতাই না তিনি তাঁহার সঙ্গে করিয়াছেন। আজ এ মহাভক্তের শরণ নিলে কি প্রভুজীর কৃপা মিলিবে না?

আর্ত রামেশ্বর তুকারামের চরণতলে আসিয়া পতিত হইলেন। বলা বাহুল্য, মার্জনা পাইতে তাঁহার একটুও দেরি হয় নাই, ভক্তবর পরম আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন।

ইহার পর হইতেই রামেশ্বর ভট্ট ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইয়া উঠেন, তাঁহার জীবন-ধারারও পরিবর্তন ঘটে। উত্তরকালে তুকার এক বিশিষ্ট ভক্তরূপে ইনি পরিচিত হন।

গৃহিণী জিজাবাঈর হইয়াছে মহাবিপদ। স্বামী তাঁহার উদাসীন। কখনো ভাবা-বেশে, কখনো বা অর্ধবাহ্য অবস্থাতেই তিনি থাকেন। সংসারের দিকে দৃষ্টি একেবারে নাই। এদিকে দুটি অন্নসংস্থানের জন্য দিনের পর দিন জিজাকে দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হয়। ইহার উপর তাঁহাদের গৃহে সাধুসন্ত, ভক্ত অভ্যাগতের আসা-যাওয়া তো রোজ লাগিয়াই রহিয়াছে। স্বামীর এই বৈরাগ্যময় জীবন, তাঁহার এই অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে জিজার ধারণা চিরদিনই বড় অস্পষ্ট, ইহা নিয়া মাথা ঘামাইতেও তিনি চান না। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালায় বিশেষত পুত্র-কন্যাদের কষ্টে অধীর হইয়া এক একদিন তাঁহাকে বিদ্রোহ করিতে হয়।

একবার দাম্পত্য কলহ চরমে পৌঁছিল। তুকারাম নিতান্ত বিরক্তিভরে সেদিন গৃহ-ত্যাগ করিয়া দেহু হইতে কিছুটা দূরে এক অরণ্যে চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, ভালই হইল, চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া নিভৃতে এখানে সাধনভজনে দিন কাটাইতে পারিবেন।

বেশ কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। স্বামীর আর ঘরে ফিরিবার কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, জিজাবাঈ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অন্তরে অনুতাপও খুব হইল। বুঝিলেন, সর্ব আসক্তি ও মায়ার বন্ধন যাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে সংসারী

করিয়া তোলার চেষ্টা বৃথা। বরং স্বামী যেমনভাবে চলিতে চান, তাহাই মানিয়া নেওয়া ভালো। ঘরে থাকিয়াই তিনি সাধনভজন করুন।

জিজা তুকারামের অরণ্যাবাসে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। পত্নীর স্বভাব তুকারামের অজানা নাই—অনুতাপের তাপ কমিলেই আবার হয়তো সে উল্টা সুর গাহিতে থাকিবে। জিজাকে তাই বুঝাইয়া কহিলেন, "দ্যাখো, তোমার ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। তবে কেন শুধু শুধু এই দ্বন্দ্ব আর অশান্তিকে বার বার ডেকে আনা? জিজা, তুমি আমায় মাপ করো। এই নিভৃতবাসেই আমায় আমার নিজ সাধনায় রত থাকতে দাও।"

পত্নী এবার ভাঙিয়া পড়িলেন। কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওগো, আমি শপথ ক'রে বলছি, আর আমি তোমার কোনো কাজে বাধা দেবো না। তুমি তোমার নিজের ঘর সংসারে ফিরে এসো। যেমনভাবে থাকতে চাও, তেমনি থাকো।"

তুকারাম আবার দেহুতে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি চাহেন, পত্নী তাঁহারই মতো বিঠোবাজীর নামরসে মত্ত হইয়া উঠুক, প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ সে গ্রহণ করুক। সস্নেহে নানা তত্ত্বোপদেশও তাঁহাকে দিলেন। তারপর কহিলেন, "ওগো, সংসারের মায়া এবার ছাড়ো। সংসার যে কেবল সরে সরেই যায়—চিরদিনের বস্তু তো এ নয়। চিরন্তন পরমবস্তু হচ্ছে আমার বিঠোবা, তাঁর চরণে সব কিছু উৎসর্গ ক'রে দাও। দেখবে, তাঁকে পাবে, আর তাঁর ভেতর দিয়ে আসবে শান্তি—আসবে সব কিছু।"

কথা কয়টি জিজার অন্তরে স্পর্শ করিল। সাময়িকভাবে তিনি নরম হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, সত্যই তো! কি লাভ নিত্যকার জীবনের এই জঘন্য কাড়াকাড়িতে? সব-কিছু বিলাইয়া দিয়া ভারমুক্ত হইলে মন্দ কি?

তুকারাম স্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিলেন, "দ্যাখো, আর দেরি করা নয়। ঘরের সমস্ত কিছু তৈজসপত্র দীনদুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। এসো, এবার আমরা হাল্‌কা হয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যময় জীবন বরণ করি, বিঠোবার নাম-কীর্তনে মত্ত হই। পরম আনন্দে দিন কাটাই।"

স্বামীর চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা। কথাগুলিও বড় মধুময়। জিজার অন্তর গলিয়া জল হইয়া গেল। ভাবের ঘোরে এ প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিলেন।

প্রচণ্ড উৎসাহে তুকা তখনি গৃহের সমস্ত কিছু বিতরণ করিতে লাগিলেন। সব শেষে পত্নীর একমাত্র জীর্ণ বস্ত্রখানিও যখন তিনি দান করিতে গেলেন, তখন জিজাবাঈর আর সহ্য হইল না। ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। গৃহকোণে ছিল একটি ইক্ষু দণ্ড তাহাই যষ্টিরূপে তুলিয়া নিয়া স্বামীর পিঠে সজোরে প্রহার করিতে লাগিলেন।

তুকা কিন্তু নীরব, অচঞ্চলভাবেই বসিয়া আছেন। গোটা আখটি তাঁহার পিঠের উপর দুইখণ্ড হইয়া গেল। জিজার চিৎকার শুনিয়া ইতিমধ্যে গৃহের অঙ্গনে প্রতিবেশীরা ভিড় করিয়াছে। ভাঙা আখের টুকরা দুইটি হাতে নিয়া তুকারাম শুধু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "দ্যাখো, আমার জিজার কি বিবেচনা। আমাদের দুজনের দু'খণ্ড আখ দরকার তাই সে হঠাৎ একটা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে এটাকে দু'খণ্ড ক'রে নিল।"

বীতরাগভয়ক্রোধ ভক্তপ্রবরের এ আচরণ দেখিয়া দেহুর লোকেদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

লোহাগাঁও-এর সিবাবা কাসার গোড়ার দিকে এক বৈরিতার মধ্য দিয়াই তুকারামের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তুকার ভাগবত জীবনের প্রকৃত স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারেন, অচিরে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন।

সিবাবা কাসারের স্ত্রী বড় উদ্ধত ধরনের, স্বামীর এ পরিবর্তন সে মোটেই পছন্দ করে নাই। তাছাড়া মনে কিছুটা আতঙ্কও হইয়াছে। তুকারামের প্রভাবে একবার পড়িলে স্বামী কি আর ব্যবসায়ের কাজে আগের মতো মনোযোগ দিবে? দিবারাত্র নামগানে মত্ত হইয়া বরং বিষয়-আশয় ছাড়িয়া দিতেই সে চাহিবে। যে করিয়াই হোক্, এ বিপদ না এড়াইলে চলিবে না। তুকারামের প্রাণনাশের জন্য এই নারী তাই এক ফন্দি আঁটিয়া বসিল।

তুকা সেদিন সিবাবা কাসারের গৃহে কীর্তন করিতে আসিয়াছেন। নামগান ও ভজন শেষ হইয়া গেলে ভক্তগণসহ তিনি বাড়ির বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। ঠিক সেই সময়ে কাসার-পত্নী বাড়ির ছাদ হইতে তুকারামের গায়ে এক হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দেয়। ফলে তাঁহার সর্বশরীরে ফোস্কা পড়িয়া যায়, মারাত্মক ঘা হয়। এই ঘা নিয়া বহুদিন তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছিল।

ভক্ত তুকা কিন্তু অম্লানবদনে সেদিনকার এই অত্যাচার সহ্য করেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার নির্দেশে এই কোপনস্বভাব রমণীকে সেদিন কেহ কোনো দুর্বাক্যও বলিতে পারে নাই। পরে কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া কাসার পত্নী তুকারামের চরণে আত্মসমর্পণ করে।

তুকার সাধনার পথ দৈন্য ও বৈরাগ্যের পথ। এ পথে সহজেই আসে শরণাগতি, জীবনকে রাঙাইয়া তোলে পরমতমের অনুরাগে—উত্তরণ ঘটে বিঠোবার দর্শন ও পরম-প্রাপ্তিতে।

তাঁহার উদার ও সহজ সুন্দর ভক্তিসাধনা গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ধনী ও প্রতিপত্তি-শালী লোকেরাও অনেকে উপস্থিত হন। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, কেন ভক্তপ্রবর তুকার এই কৃচ্ছ্রব্রত? তাঁহার সাধনপথে দুঃখ দৈন্যের এ তীব্র কশাঘাত কি গ্রহণ না করিলেই নয়?

তুকা বলেন,—এই দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ভগবানের অভিশাপ নয়—ইহা যে তাঁহার আশীর্বাদ। সমস্ত কিছু আবরণ আভরণের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া প্রভু এই পথেই যে টানিয়া নেন ভক্তকে একেবারে তাঁহার বুকের কাছে। স্বীয় অভঙ্-এ তুকা গাহিয়াছেন—

"ওগো, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় পথে ভগবান্ চলতে দেন না তাঁর প্রিয়তম ভক্তকে। সাংসারিক স্নেহপ্রেমের সমস্ত পাশকে তিনি করে দেন অপসারিত। তিনি যে জানেন, ভক্তের বিত্তবিভব বাড়ালে তা শুধু স্ফীত ক'রে তোলে তার অভিমান, তাই তো দারিদ্র্যের চৈতন্যময় আঘাত বার বার পাঠান আমার প্রভু!"

তুকা দাস্য-ভক্তির প্রচারক। কিন্তু কোনো দিনই দুর্বলের ভক্তিবাদ তিনি প্রচার করেন নাই। দৈন্যময় প্রপত্তিময় জীবনের মধ্য দিয়া সর্বসমর্পিতপ্রাণ সাধক তাঁহার ইষ্টেরই তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন, ইষ্টের মতন পরম জ্ঞানী ও শক্তিধর তিনি হইয়া উঠেন। এই বাণীও তাঁহার অভঙ্-এ পাওয়া যায়—

"ভাই, নিরন্তর গোবিন্দের নাম জপ ক'রে যাও, এ জপের ফলে তুমি হয়ে উঠবে গোবিন্দ-স্বরূপ। তোমার আর তোমার প্রভুর মধ্যে সকল পার্থক্যই যাবে ঘুচে। সারা অন্তর সদা ঝল্‌মল্ করলে আনন্দে, নয়ন প্লাবিত হবে প্রেমের অশ্রুধারায়।

"ওরে ভাই, নিজেকে কেন ভাবছো ক্ষুদ্র ব'লে ? তুমি যে এ বিশ্ব-সৃষ্টির মতোই মহান্। পার্থিব জীবনের গণ্ডীকে দাও অপসারিত করে এই মুহূর্তেই। নিজেকে নিরত ভাব্‌ছো বদ্ধ ও ক্ষুদ্র, তাইতো আঁধারে তুমি নিমজ্জিত, তাইতো দুঃখময় হয়েছে তোমার জীবন।"

ভক্তিরসপিপাসু নরনারীর কাছে তাঁহার এসব অভঙ্‌ অপূর্ব উদ্দীপনা ও আশ্বাসবাণী নিয়া উপস্থিত হয়।

সাধনার দীর্ঘ বন্ধুর পথ বাহিয়া তুকারাম তাঁহার পরমপ্রভুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। এবার পথপরিক্রমা তাঁহার সমাপ্তপ্রায়। সিদ্ধির সাফল্য অরুণোদয়ের আলোকচ্ছটার মতো তাঁহার জীবনসত্তাকে আজ রাঙাইয়া তুলিয়াছে। ভক্তির মাধুর্যে, শক্তির ঐশ্বর্যে, জ্ঞানের প্রভায় তিনি আজ ভরপুর।

এ সাফল্যের কথা, ভগবৎ দর্শনের কথা, তাঁহার স্বরচিত অভঙ্‌-এ ধ্বনিত হইতে শুনি—

"ওগো, আমি যে নয়নভরে দেখছি ভগবানের আননখানি, আর এ দর্শনের ফলে মিলছে আমার অপার অফুরন্ত আনন্দ। আমার নয়ন রয়েছে ঐ শ্রীমুখে কেন্দ্রীভূত আমার হাত দু'টি স্পর্শ ক'রে আছে তাঁর চরণ। একবার তাঁর দর্শন লাভ হলে অন্তরের সব তাপ যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। তাই তো আনন্দের স্তর থেকে স্তরে কেবলই চলছে আমার উত্তরণ।"

তুকা তাঁহার আর একটি প্রসিদ্ধ পদে ঘোষণা করিয়াছেন—

"আজ ধন্য আমি, আমার প্রয়াস হয়েছে সার্থক, প্রার্থিত পরিণতি হয়েছে আমাতে রূপায়িত। ঈশ্বরের চরণতলে হৃদয় স্থাপন করেছি—মন হয়ে গিয়েছে শান্ত। মৃত্যু আর বার্ধক্যের জরা গিয়েছে ঘুচে, দেহের ঘটেছে রূপান্তর—তার উপর পড়েছে ভাগবত আলোকের ধারা। সীমাহীন ঐশ্বর্যের আমি হয়েছি অধিকারী, দেখেছি কায়াহীন পরম-পুরুষের পরমপদ। শাশ্বত সম্পদ হয়েছে আমার করায়ত্ত।"

তুকার প্রেমভক্তিময় সাধনার খ্যাতি, তাঁহার অলৌকিক শক্তির নানা বিস্ময়কর কাহিনী এসময়ে দিকে দিকে প্রচারিত হইতে থাকে। তাঁহার চারিদিকে আসিয়া জড় হয় সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ও সাধনকামী মুমুক্ষু নরনারী। ভক্ত তুকার এ সময়কার জীবন তাঁহার সাধনৈশ্বর্যের নানা অলৌকিকত্বে ভরপুর।

একদিন লোহাগাঁও নামক স্থানে তুকারাম নামকীর্তনে মত্ত হইয়া আছেন। প্রভু পাণ্ডুরঙ্গের স্তুতি ও জয়গানে জনতার মধ্যে এক বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সময়ে একটি দরিদ্রা নারী তাঁহার মৃত পুত্রকে কোলে করিয়া সেখানে উপস্থিত। মৃতদেহটি তুকারামের সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিয়া পুত্র-শোকাতুরা মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ দৃশ্য বড় করুণ, বড় মর্মন্তুদ।

কীর্তন-নর্তন থামাইয়া তুকা নীরবে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "বাবা, আমার এ পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দাও, এ দুঃখিনীরে বাঁচতে দাও। বিঠ্‌ঠলজীর সত্যিকার ভক্ত যদি হও তা'হলে আমার পুত্রের জীবনভিক্ষা অনায়াসে

তুমি দিতে পারবে। আর এ কাজ না পারলে বুঝবো, প্রভুকে উদ্দেশ্য ক'রে যত কিছু নামকীর্তন করছো তা একেবারে নিরর্থক—এ সবই তোমার ভণ্ডামি।"

অভাগিনীর আর্তি ও ক্রন্দন কোনোমতেই থামতে চায় না। তুকা করুণায় গলিয়া গেলেন, গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই সঙ্গে প্রভু বিঠোবার করুণা-ধারাও করিল অবতরণ।

ধীর পদক্ষেপে মৃত বালকের কাছে গিয়া তুকা তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার হইতেছে। অতঃপর ধীরে ধীরে সে দুই চক্ষু উন্মীলন করিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকা ও তাঁহার প্রভু বিঠোবার জয়ধ্বনিতে সেদিন লোহাগাঁও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সাধনার ফলে একি বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে ভক্তবর তুকারামের সত্তায়! এক বিশিষ্ট ভক্ত প্রশ্ন করিয়া বসেন, "আচ্ছা, আপনার এ অলৌকিক শক্তির উৎস রয়েছে কোথায়? কোন্ নিগূঢ় সাধনার বলে অর্জন করেছেন এ অদ্ভুত ক্ষমতা?"

সাধক তুকা তাঁহার সদ্য রচিত এক অভঙ্-এর মাধ্যমে এই কথার চমৎকার উত্তর দেন:

"ভক্তির রস সাগরে নিহিত রয়েছে কত অমূল্য মণিমুক্তা, ভাগবতের করুণার কত ঐশ্বর্য। রাজা স্বেচ্ছামত সব কিছু দাবি ক'রে বসেন, কেউ তাতে দিতে পারে না বাধা। ভক্তি আর সেবা দিয়ে ভৃত্যই হয়ে পড়ে এই রাজার মতো শক্তিমান্—অপ্রতিরোধ্য। কারণ, সাধক তখন হয়েছে প্রভুর সাথে একাত্মক। আর তখন উঁচু সিংহাসনের ওপর বসে নিচের দিকে সবাইকে সে তাকিয়ে দেখে। ওগো, বিশ্বাস আর শরণাগতির জোরেই তুকা পেয়েছে তার সিংহাসন, তাই তো মানুষ তাঁকে নিবেদন করেছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।"

"প্রভুকে আমার পেয়ে গিয়েছি আমার এই বুকের ভেতর, আয়ত্তের ভেতর। যে প্রশ্ন আমি করি, পাই তারই উত্তর। সংসার আমি ছেড়েছিলাম, তাই তো পেয়েছি সংসারের সার। যা কিছু আমি করি প্রার্থনা, তা-ই তিনি করেন পূর্ণ।"

তুকারাম ত্যাগী সাধক, ঈশ্বরের চরণে তিনি সর্ব সমর্পিতপ্রাণ। একান্ত নিভৃতে বসিয়া প্রেমময়ের সাথে তিনি দিবানিশি অতিবাহিত করিবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু করিতেছেন ঠিক ইহার বিপরীত। নিজের ঘরে সহস্র নরনারী ভিড় জমাইয়া বসিয়াছেন।

জনৈক দর্শনার্থী তাঁহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তুকারাম তাঁহার অভঙ্-এর মধ্য দিয়া উত্তর দেন:

"সংসারকে এড়িয়ে কোথায় আমি ছুটে পালাবো, বলতো? যে দিকেই চাই, দেখি প্রভু আমার বিরাজ করছেন সেখানেই। একি অদ্ভুত তাঁর লীলা? নির্জনতা থেকে আজ তিনি বঞ্চিত করেছেন আমাকে—অথচ তাঁকে ছাড়া কোনো স্থানই যে আমি দেখতে পাইনে। একথাও তো রয়েছে জানা—ঘুম থেকে কোনো মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন সে দেখে নিজেরই ঘরে সে করছে অবস্থান।"

সিদ্ধপুরুষরূপে তুকারাম এখন সর্বত্র খ্যাত। যেসব ভক্ত একে একে তাঁহার চরণে আশ্রয় নেন তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই সব ভক্ত এবং শিষ্যের মধ্যে আছেন নিলোবা, সন্তাজী তেলী, গঙ্গারাম মাভল, রামেশ্বর ভট্ট, সিবাবা কাসার, মহাদাজী পন্ত,

বহিনাবাঈ প্রভৃতি। চারিত্রিক ধৃতি, মহত্ত্ব, গুরুনিষ্ঠা ও ভক্তিসাধনার সাফল্যে ইঁহারা সকলেই স্বনামধন্য হইয়া উঠেন।

তুকার বৈরাগ্যময় জীবন, তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের ভাবৈশ্বর্য, সারা মহারাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে উদ্দীপিত করিয়া তোলে। নবতর ভাবময়তা ও নবতর চেতনা সেখানে জাগ্রত হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছলিত হইয়া উঠে নূতন প্রাণের জোয়ার। তুকার শত শত ভক্তিমূলক অভঙ্ সমাজের উচ্চ-নীচ সমস্ত স্তরে প্রচারিত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর ও সাধারণ মারাঠীদের মধ্যে তাঁহার ধর্মাদর্শ প্রবল আত্মপ্রত্যয় আনয়ন করে। মারাঠা জাতির সংগঠন ও পুনরুজ্জীবনে পরম সহায়ক হয়। রাণাডে প্রভৃতি মনীষিগণ একবাক্যে ভক্তসাধক তুকার এ অবদানের মহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, মহারাষ্ট্রের সাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনা সেদিন বীজাকারে নিহিত ছিল তুকারই অভঙ্-এ।

চারিদিকে তখন সাধু তুকারামের খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। অগণিত ভক্ত ও শিষ্য নিয়া দেহু ও লোহাগাঁও-এ তিনি সর্বদা নামকীর্তন করিয়া বেড়ান। মারাঠা-নায়ক শিবাজীর অন্যতম আবাসস্থল পুণা এই দেহু ও লোহাগাঁও-এরই মধ্যবর্তী। বয়সের দিক দিয়া শিবাজী তখন নিতান্ত তরুণ। সবেমাত্র তোরণা দুর্গ জয় করিয়াছেন, ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে রহিয়াছেন ভরপুর। তাই এ সময়ে তুকার সহিত মাঝে মাঝে তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

সিদ্ধসাধক তুকা কিন্তু বুঝিয়া নিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের সাধনপথ আর শিবাজীর অধ্যাত্ম-আদর্শ সহধর্মী নয়। শিবাজীকে তাই তিনি রামদাস স্বামীর নির্দেশে চলিতে এবং তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। এ পরামর্শের ফল কল্যাণকর হয়, মারাঠার জাতীয় জীবনের উন্মেষে ইহা সাহায্য করে।

ভক্তবর তুকা ও শিবাজীর গুরু কর্মযোগী রামদাসের একবার মিলন ঘটে। প্রবীণ সাধক তুকার জীবন তখন অন্তর্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। পন্ঢরপুরে বিঠ্ঠল মন্দিরের কাছেই তিনি বেশী সময় অবস্থান করেন। আর রামদাস সাধনা করেন কৃষ্ণা নদীর তীরে কুটির বাঁধিয়া।

বিঠ্ঠল মন্দিরে তুকার সহিত রামদাস সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদের এ মিলন বড় মর্মস্পর্শী হইয়া উঠে। দর্শনমাত্রেই উভয়কে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতে দেখা যায়। নিগূঢ় অধ্যাত্ম-ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া দুই মহাপুরুষের আনন প্রসন্নতার দীপ্তিতে ভরিয়া উঠে।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাস। দিকে দিকে নূতন প্রাণের সাড়া আর নূতন জীবনের স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে। বনে তরুলতার কচি কিশলয়ের হাতছানি, আকাশে বাতাসে অজানালোকের দিব্য মধুর স্পর্শ। ইন্দ্রায়ণী নদীর কলগানে অবিরাম শোনা যায় ঘর-পালানো গানের সুর। দেহু গ্রামের নিভৃত কুটিরটিতে বসিয়া তুকার হৃদয়েও জাগে সেই সুরের অনুরণন। জীবনে তাঁহার ওপারের ডাক আসিয়া গিয়াছে।

এবার শুধু আর আলোক-সঙ্কেত নয়—আলোকের প্লাবন নামিয়া আসে মহাভক্তের জীবনে। এ প্লাবনের বেগ মরজীবনের প্রাকারটি একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চায়।

জীবনে আসিয়াছে পরমপ্রাপ্তি। তাই সাধক তুকারামের এবার আপ্তকাম। এসময়কার রচিত অভঙ্-এ তিনি বলিতেছেন :

"ওগো, দিন-রাতের মধ্যে কোনো পার্থক্যই আজ আর আমি খুঁজে পাইনে। নিখিল বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে আছে আলোকের একি মহা উদ্ভাসন! যে পরমশান্তি আমি করছি উপভোগ, কি ক'রে করবো তার বর্ণনা? প্রভু, তোমার নামের অলঙ্কার করেছি আমি পরিধান। তোমার শক্তি আর তোমার ঐশ্বর্য আমার দোরগোড়ায় এনে জড়ো করেছ সব কিছু। কোনো অভাব তো আর আমার নেই।"

এবার একাকারের পালা। প্রভু ও ভৃত্য ইষ্ট ও ভক্ত এবার একই পরমরসে একীভূত হইয়া যাইতেছেন। মরলীলার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া ভক্তরাজ তুকা বিদায় নিতে উন্মুখ। শেষ অভঙ্গুলিতে ইহারই ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে :

"দেখ্‌ছি ঈশ্বরই সব কিছুর দাতা—আবার ভোক্তাও শুধু তিনিই নিজে। অনুভূতির আর কি বাকী? প্রকাশ করবো এই পরমতত্ত্ব—এমন ভাষাই বা কই আমার কণ্ঠে। ওরে ভাই, আজ নয়ন দুটি মেলে দেখলে, কেবলি চোখে পড়ে আমার নিজেরই রূপ।"

"অতল গভীর আজ ডাক দিয়েছে আমার গভীরকে। সব কিছু মিশে গিয়েছে এক পরমসত্তায়! তরঙ্গ আর মহাসাগর হয়ে গিয়েছে একীভূত। এ বিশ্বজগতে কোনো কিছুই হয় না আবির্ভূত—তিরোহিতও হতে পারে না কোনো কিছু। আত্মা নিজেকে নিরন্তর বেষ্টন ক'রে চলেছে চারদিকে শুধু নিজেকেই দিয়ে। মহাবিরতির লগ্ন এসে গিয়েছে। কোথায় আজ সূর্যের উদয়—কোথায়ই বা তার অস্ত?"

একাকারের মহাবন্যা উত্তাল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে!

ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারামের দেহের প্রকারটি এবার টুটিয়া গেল। প্রভু বিঠ্‌ঠলজীর নিত্যধামে ঘটিল তাঁহার মহা উত্তরণ।

সাশ্রুনয়নে ভক্তের দল তাঁহার মরদেহটি সেদিন ইন্দ্রায়ণীর পবিত্র স্রোতধারায় ভাসাইয়া দিল।

গোস্বামী তুলসীদাস

আকাশে তখন মেঘের প্রচুর ঘনঘটা। সন্ধ্যার অন্ধকারও নামিয়া আসিয়াছে। তুলসীদাস দ্বিবেদী বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন যজমান-বাড়ির কাজে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, দেরিও কম হয় নাই। এবার স্বগ্রাম রাজাপুরে না ফিরিলে নয়। দ্রুতপদে তাঁহাকে ছুটিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন স্ত্রী ঘরে নাই। সে কি কথা। এমন অসময়ে রত্নাবলীর তো কোথাও যাইবার কথা নয়। ঘর অঙ্গন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তুলসী প্রতিবেশীদের বাড়িতে স্ত্রীর সন্ধানে গেলেন। শুনিলেন, তাঁহার শ্বশুরের অন্তিম সময় উপস্থিত—এ সংবাদ পাইয়া রত্না তাড়াতাড়ি পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

শিশুকালেই তুলসী পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। সত্যকার আপনার বলিতে রত্না ছাড়া আর তাঁহার কেহ নাই। আজিকার নিঃসঙ্গ সংসারে এই পত্নীই হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার জীবনসর্বস্ব, তাঁহাকে চোখের আড়াল করা তুলসীর পক্ষে তাই বড় কঠিন।

স্ত্রী তাঁহার পরম রূপলাবণ্যবতী, গুণপনার দিক দিয়াও কম নয়। সারা মনপ্রাণ দিয়া তুলসী তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, আর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তুলসীর জীবন হইতেছে আবর্তিত।

বিবাহের পর বার বার শ্বশুরালয় হইতে রত্নাকে নিতে আসিয়াছে। কিন্তু পত্নী বিরহ কোনো মতেই সহ্য করিতে পারিবেন না, তাই কখনো তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। পাড়ার লোকে স্ত্রৈণ, মোহান্ধ বলিয়া কত গালি দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

রত্না যদি আজ পিত্রালয়ে গেলই, তুলসীর জন্য একটু অপেক্ষা করা তাহার সহিল না? অভিমানের কান্নায় তিনি ফাটিয়া পড়িলেন।

শ্বশুরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। স্ত্রীকে কতদিন থাকিতে হইবে কে জানে। অন্তরে জাগিয়া উঠিল অধীর উন্মত্ততা।

ঝটিকার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তবুও ইহারই মধ্যে এক বস্ত্রে তুলসী বাহির হইয়া গেলেন।

ঝড়-বাদলের মহাতাণ্ডবে তাঁহার আজ কোনো হুঁশই নাই। আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ-নাগিনীরা গর্জিয়া ফিরিতেছে। বজ্রপাতের শব্দে কান পাতা দায়। মড়্মড়্ শব্দে ঘরবাড়ি গাছপালা ভাঙিয়া পড়িতেছে। তুলসীর দেহ ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু কোনো হুঁশ নাই। ঝটিকার মত্ততা আজ পাইয়া বসিয়াছে তাঁহাকেও।

সিক্ত দেহে, ছিন্ন বস্ত্রে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্ত্রৈণ স্বামীর একি অকারণ উন্মত্ততা? লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে রত্না যেন মাটিতে মিশিয়া যায়। কুটুম্বের দল শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণের জন্য তুলসীকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

রত্নার আয়ত নয়ন দুইটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সব পাগলামিরই একটা সীমা আছে। একি কাণ্ড, নাঃ—আর সহ্য করা যায় না। কঠোর স্বরে স্বামীকে সে ভৎ'সনা করিয়া উঠিল—"শোনো, আমি আজ ঠিকই বুঝতে পেরেছি, আমার প্রতি তোমার এ

আকর্ষণ মোহের, প্রেমের নয়। এই হাড়-মাসের দেহটার পিছনে যে আসক্তি যে অনুরাগ আজ অবধি দেখিয়েছ, তা ভগবান্ রামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করলে বেঁচে যেতে, পেতে পারতে সর্বসিদ্ধি। আজ থেকে তোমার এই উন্মত্ততা থেকে আমায় বাঁচাও। আমায় তুমি মুক্তি দাও।"

বড় অতর্কিত, আর বড় তীব্র রত্নার এ আঘাত। এ আঘাত নিমেষ মধ্যে তুলসীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। ধীর পদক্ষেপে মোহাবিষ্টের মতো তিনি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে রত্না সশব্দে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তুলসীদাসের সম্মুখের বাহির দুয়ার সেদিন বন্ধ হইলেও ভিতর-দুয়ার কিন্তু হঠাৎ খুলিয়া যায়। মহালগ্ন যে সেদিন তাঁহার জীবনে উপস্থিত। তাইতো রত্নাবলীর এ অপমান হইয়া উঠিয়াছে চৈতন্যময়। দুঃসহ বেদনায় তুলসী নয়ন মুদিলেন। জীবনের কেন্দ্র হইতে আজ তিনি বিচ্যুত, একেবারে নিরাশ্রয়। সহসা মানসলোকে এ সময়ে ভাসিয়া উঠিল নবদূর্বাদল-শ্যাম শ্রীরঘুনাথের মূর্তি। হাতছানি দিয়া এ মূর্তি তাঁহাকে কোথায় টানিয়া নিতে চায়?

পথের কথা কিছু জানা নাই, কিন্তু তুলসীদাসকে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে হইল। অন্তরাত্মার আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, আর যে তাহা প্রত্যাখ্যানের উপায় নাই।

শ্বশুরালয় হইতে নিক্রান্ত হইয়া দ্রুতপদে আগাইয়া চলিলেন। পিছন হইতে অনুতপ্তা স্ত্রীর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি তখনও ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ আর তো ফিরিবার উপায় নাই। বন-পাহাড় ভাঙিয়া তিনি গ্রামের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেদিনকার এই গৃহত্যাগী যুবকই উত্তরকালের বহুখ্যাত গোস্বামী তুলসীদাস। উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিরূপে লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনমূলে তিনি রামনামের যে রসধারা সিঞ্চন করেন সমাজের সর্বস্তরে তাহা বেগবতী ভক্তি-প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দেন।

তুলসীর সমগ্র অধ্যাত্মজীবনটি হইয়া উঠে এক পবিত্র তুলসীতরু বিশেষ। এ ভক্ত সাধকের এ কল্যাণময় রূপ সমসাময়িক কালের মহাবেদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর শ্লোকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—

আনন্দকাননেহ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসী তরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর ভূষিতাঃ॥

—বারাণসীর আনন্দকাননে তুলসীদাস হইতেছে একটি চলমান তুলসীতরু, এ তরুর কবিতা মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকুলে ভূষিত।

রামভক্তিরসের অমৃত তুলসী অকৃপণ হস্তে বিলাইয়াছেন। সেই সঙ্গে গাহিয়া গিয়াছেন 'কলিবিটপ কুঠারী', কলিরূপ বৃক্ষের বিনাশকারী কুঠার, রামশক্তির প্রশস্তি। ভাবের ঐশ্বর্যে, ভাষার লালিত্যে, রামরাজ্যের বর্ণনাকে তিনি করিয়া তুলিয়াছেন অবিস্মরণীয়। যে ধর্মরাজ্য বা রামরাজ্যের বাণী তুলসী ভারতের অধ্যাত্মক্ষেত্রে প্রচার করিয়া যান, দুই শত বৎসর পরে এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে সেই আদর্শই স্থাপন করিতে দেখা যায়।

রঘুনাথজীর সাধনায় মহাসাধক তুলসীদাস সিদ্ধিলাভ করেন, নানা অলৌকিক যোগ-বিভূতি লাভেও তিনি সমর্থ হন। তারপর ব্রতী হন আদর্শ রামনাম প্রচার-কর্মে।

প্রয়াগের নিকটে বান্দা জেলার রামপুর গ্রাম। এই গ্রাম ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা ছিলেন পণ্ডিত আত্মারাম দ্বিবেদী, আর মাতা হুলসী দেবী। দ্বিবেদী মহাশয় পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ধর্মপ্রাণ ও সুপণ্ডিত বলিয়া স্থানীয় অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

নিজের রচিত দোঁহাতে তুলসীদাস লিখিয়া গিয়াছেন, 'মাতু পিতা জগ জায় তজ্যো'। অর্থাৎ, তাঁহার জন্মের কিছুকাল পরেই জনক-জননীর লোকান্তর ঘটে। শুধু তাহাই নহে প্রধানত দুঃখ কষ্ট ও অবহেলার মধ্যদিয়া শৈশবে তিনি বাড়িয়া উঠেন। এই খেদ তাঁহার কবিতা ও গানে পাওয়া যায়।

মাতা পিতা উভয়ের মৃত্যুর পর তুলসী তাঁহার পিতার গুরুদেব নরসিংদাসের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। এই সুদর্শন, নিরাশ্রয় বালকের উপর বৃদ্ধের স্নেহ পড়ে, পুত্র-নির্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিতে থাকেন। বালকের শিক্ষা-দীক্ষা শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

তুলসীদাস বয়সে তখনো নিতান্ত তরুণ কিন্তু সংসারাশ্রমে তাঁহাকে না ঢুকানো অবধি নরসিংদাসের স্বস্তি নাই। তোড়জোড় করিয়া তিনি তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

কয়েকখানি গ্রামের পরেই দীনবন্ধু পাঠকের বাস। সৎ ও ধার্মিক বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। এই ব্রাহ্মণের কন্যা রত্নাবলীকে তুলসী বিবাহ করিলেন।

কিশোরী রত্নার রূপের তুলনা নাই, আবার তেমনি মধুর তার স্বভাব। তুলসীর জীবনে সে হইয়া উঠিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

ছেলেবেলা হইতেই তুলসী বড় ভাবপ্রবণ, কাব্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ। রত্নার রূপের মোহ, রত্নার ভালবাসা তাই বড় সহজে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার অদর্শন এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সে-ই কিনা আজ চরম আঘাত তাঁহাকে হানিয়া গেল!

এ আঘাত কিন্তু আনিয়া দেয় সত্যকার চৈতন্য, তুলসীদাসকে ঠেলিয়া বাহির করে ইষ্ট-প্রাপ্তির পরম পথে।

অন্তরে সেদিন ঝলকিয়া উঠিয়াছে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রঘুবীরজীর প্রেমঘন মূর্তি। চরম আহ্বান জীবনের দ্বারে আসিয়া গিয়াছে। পাগলের মতো তুলসী ঘর ছাড়িয়া বা হর হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, কে ইষ্টলাভের পন্থা জানাইয়া দিবে, কিছুই জানা নাই। শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন—বারাণসী ভারতের প্রাণকেন্দ্র, বহু সাধক ও আচার্যের বাসভূমি। সেই দিকেই তিনি পা বাড়াইলেন। অন্তরে তিনি নিলেন মুক্তির সংকল্প, বদনে নিরন্তর রামনাম জপ।

আকাশে প্রকৃতির তাণ্ডব তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। তুলসীর জীবনেও বিক্ষোভ শেষে আসিয়াছে এক পরম প্রশান্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইষ্টনামের অস্ফুট গুঞ্জন তখন নিরন্তর তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে।

আশ্রয় মিলিতে দেরি হয় নাই। বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ সনাতনদাসের দৃষ্টি এই ভক্তিমান্ সর্বত্যাগী যুবকের উপর পড়িল। পরম স্নেহে আচার্য তাঁহাকে নিজের টোলে আশ্রয় দিলেন।

তুলসী এখানে শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হন, আর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে ইষ্টদেব রঘুনাথজীর নামকীর্তন ও লীলা-বিবরণ পাঠ। এ টোলে নানা দিগ্‌-দেশাগত ছাত্রের ভিড় লাগিয়াই আছে। সাধনভজনের জন্য যে নিভৃতের প্রয়োজন তাহা মোটেই নাই। তুলসী নগরীর প্রান্তে এক বনে আসিয়া আশ্রয় নিলেন।

দৈহিক সুখ দুঃখ, অশন বসনের দিকে দৃষ্টি নাই। একান্ত নিষ্ঠায় দন্যভরে তুলসী তাঁহার সাধনায় রত হইয়াছেন। কিন্তু কোথায় পথ। কোথায় আলো? পরমপ্রভুর দর্শন কি করিয়া মিলিবে? দুশ্চিন্তায় ক্রমে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

প্রত্যূষে ভজনকুটিরের কাছেই এক ঝোপে তুলসীদাস শৌচকার্য করেন। তারপর সম্মুখস্থ এক গাছের নিচে ঘটির অবশিষ্ট জলটুকু ঢালিয়া দিয়া আসেন। ইহাই তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস।

ঐ বৃক্ষে বাস করে এক ব্রহ্মদৈত্য। রোজ তুলসীদাসের প্রদত্ত জলে সে তাহার পিপাসা মিটায়। সেদিন গভীর রাত্রে প্রেতটি হঠাৎ তুলসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। বলে, "তুলসী, তোমার ওপর আমি বড় প্রসন্ন হয়েছি। এই গাছের গোড়ায় রোজ তুমি জল সিঞ্চন করো তাতে আমি তৃপ্ত হই। তোমার কি উপকার আমি করতে পারি, বল।"

তুলসী সবিনয়ে কহেন, 'সূক্ষ্মলোকচারী যিনিই আপনি হোন, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। সত্যিই যদি আমার কোনো উপকার করতে চান, বর দিন যেন ইষ্টলাভ হয়?"

প্রেত খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে, "সেকি গো, এত শক্তিই যদি থাকবে, নিজে এমন দুর্ভোগে ভুগবো কেন? তা পারবো না, ভাই। তবে তোমায় আমি তোমার রঘুনাথজীর সত্যকার পথ-প্রদর্শকের সন্ধান দিতে পারি।"

তুলসী সাগ্রহে সন্ধান জানিতে চাহিলেন।

ব্রহ্মদৈত্য কহিল, "কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছুটা উত্তরে রোজ রামায়ণ পাঠ হয়। সেই সভার এক কোণে দেখবে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীরব নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। রোজকার পাঠের তিনি একনিষ্ঠ শ্রোতা। সকলের আগে রামায়ণ সভায় প্রবেশ করেন, নিভৃতে নাম গান শোনেন, আর সকলের শেষে তাঁকে দেখা যায় স্থান ত্যাগ করতে। তিনিই তোমার প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান দিতে পারবেন।"

তুলসীদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া আছেন।

প্রেতপুরুষ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তুলসী, তবে শোন, এই ছদ্মবেশী বৃদ্ধই ভক্তরাজ পবননন্দন হনুমান। তাঁর শরণাগত হও প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অচিরে দেবেন দর্শন।"

নির্দিষ্ট রামায়ণের আসরে গিয়া তুলসী দেখিলেন,—সত্যই তাই। একটি বৃদ্ধ পরম ভক্তিভরে সভার কোণটিতে বসিয়া আছেন, সমাহিত চিত্তে পাঠ শুনিতেছেন।

পাঠ ও ভজন শেষ হইল। সভাস্থল প্রায় জনশূন্য। সর্বশেষে বৃদ্ধ শ্রোতাটিকে নির্গত হইতে দেখা গেল। দূরে এক নিভৃত স্থানে গিয়া তুলসীদাস তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। পরমভাগবত তুলসীর আর্ত ক্রন্দন সেদিন আর থামিতে চায় না। ভক্তরাজ মারুতি করুণার্দ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। তুলসীর শিরে বর্ষিত হইল তাঁহার কৃপার ধারা।

ভক্তবীর মারুতিই যে প্রভুর রঘুনাথজীর দ্বার অধিকার করিয়া আছেন। সাধক তুলসীদাসের ভাগ্য ভালো তাঁহাকেই সদ্গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

তুলসী ভক্তদের মতে, মারুতি কৃপাভরে নরবপু ধারণ করিয়া তুলসীকে সাধনমার্গের সঙ্কেত প্রদান করিয়া যান। তাঁহারই উদ্দেশে তুলসী লিখিয়া গিয়াছেন—

বন্দউঁ গুরুপদ কঞ্জ
কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি

ভক্ত তুলসী ধ্যান-কল্পনায় ভক্তরাজ অঞ্জনাতনয় হইতেছেন শৈব শক্তির এক মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার মতে, স্বয়ং মহেশ্বরই রামনাম কীর্তনের লোভে মহাবীর হনুমানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।

সূক্ষ্মলোকচারী মহাবীরজীর আশীর্বাদ তুলসীর জীবনের পরম সম্পদ। শুধু তাহাই নয়, তুলসীর সাধনজীবনের সর্ব প্রয়োজনে তাঁহার মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যাইত, কৃপা করিয়া অনেক কিছু সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া দিতেন।

এই রঘুনাথ-দূত সম্বন্ধে তুলসী লিখিয়া গিয়াছেন—

ধীর বীর রঘুবীর প্রিয়
সুধীন সমীরকুমার।
আগম সুগম সব কাজ কর
করতল সিদ্ধিবিচার।

অর্থাৎ, রঘুবীরের প্রিয়পাত্র, ধীর ও বীর পবনকুমার হনুমানের ধ্যান করো, সর্বসাধনা এবং সর্বসিদ্ধি হবে তোমার করতলগত।

মাসের পর মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু যে জন্য সকল কিছু ত্যাগ করিয়া তুলসী আসিয়াছেন, তাহা কই? ইষ্ট সাক্ষাৎ তো এখনো হইতেছে না। তিনি ক্রমেই বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছেন।

ছদ্মবেশী মহাবীরজীকে ভক্তবর একদিন খুব চাপিয়া ধরিলেন। রঘুনাথজীর দর্শন করাইয়া দিতেই হইবে নতুবা তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘপথ সেদিন তুলসী তাঁহার অনুসরণও করিলেন।

মহাবীরজীর আননে খেলিয়া গেল রহস্যময় হাসি।

কহিলেন, "বৎস, আর আমার অনুসরণ ক'রো না, ফিরে যাও। আগামী পরশুদিন পবিত্র রামনবমী তিথি। ঐদিন নিজের কুটিরে বসেই তুমি প্রভু রামচন্দ্রজীর দর্শন লাভ করবে।"

রামনবমী তিথি সমাগত। প্রতীক্ষা বহুক্ষণই করা হইল, কিন্তু ইষ্টদেবের আবির্ভাব তো হইল না। মহাবীরজীর বাণী কি তবে মিথ্যা হইবে? অথবা আবাহনের কোনো ত্রুটি হইয়াছে, তাই কি প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল এক কোলাহল। তুলসী অঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক বেদে ও বেদিনী সেখানে বাঁদর নাচ দেখাইতে আসিয়াছে—আর পিছে রহিয়াছে ভিক্ষা-ঝুলি স্কন্ধে এক সুদর্শন তরুণ। গোস্বামীজীকে তাহারা নৃত্য না দেখাইয়া ছাড়িবে না।

এ আবার কি আপদ জুটিল! সারাদিন প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠায় কাটিয়াছে এবার হতাশায় তুলসী যেন ভাঙিয়া পড়িতেছেন। রুক্ষস্বরে কহিলেন, "যাও, এখনি চলে যাও এখান থেকে! নাচের কোনো প্রয়োজন নেই।" সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দরজাও হইল রুদ্ধ।

অন্তর তাঁহার অনুশোচনার দহনে জ্বলিতেছে। তিনি নীচ, নিতান্ত হীনবুদ্ধি—তাই তো আজ মারুতির বাণীও মিথ্যা হইয়া গেল।

রামায়ণ পাঠ ভাঙিয়া গেলে সেইদিনই ছদ্মবেশী পবননন্দনকে তুলসী চাপিয়া ধরিলেন। মহাবীরজী বলিলেন, "সে কি কথা, তুলসী! প্রভু রামচন্দ্রজী, মা জানকী, লক্ষ্মণ আর আমি—সবাই তো গিয়েছিলাম! প্রমাণ চাও? চেয়ে দ্যাখো, আমার গলায় এখনও দড়ির দাগ রয়েছে। বেদের দলটিকে তুমি চিনতে পারো নি। জ্যোতির্ময় দর্শন তুমি এখন সহ্য করতে সমর্থ হবে কেন, তুলসী? তাই তো ছদ্মবেশে কৃপাময়ের এই দর্শন দান! সাধনার গভীরে এবার থেকে তুমি ডুবে যাও, পরমপ্রভুর চিন্ময় রাজ্যে প্রবেশ করো। আমি দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।"

নাম জপ আর কঠোর তপস্যায় তুলসী নিমজ্জিত হন। আর এই সঙ্গে চলতে থাকে তাঁহার ভজন আর কাতর প্রার্থনা। এক একটি দিন কাটিয়া যায় আর ব্যর্থতার বেদনায় তুলসী অঝোর ধারে কাঁদিতে থাকেন। আর্ত স্বরে ইষ্টদেবকে কহেন—

সঠ সেবক কী প্রীতি রুচি রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিয়ে জলযান জেহিঁ সচিব সুমতি কপি ভালু॥

অর্থাৎ, হে কৃপালু শ্রীরাম, আমার মতো শঠ-সেবকের প্রতি রেখো তোমার অগাধ প্রীতি। প্রভু!—তুমি মহাশক্তিধর, অসাধ্য তোমার কিছুই নেই। শিলা তুমি জলে ভাসালে, বানর-ভালুককে বানালে বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী, আবার আমার মতো অভাজনকেও করলে করুণা।

কঠোরতপা তুলসী এবার হইলেন নামসিদ্ধ। তাঁহার দেহমন-প্রাণে, সর্ব অস্তিত্বে রামনামের মালা অবিরাম আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। সারা সাধনসত্তা হইয়া উঠিয়াছে রামনামের আলোকে ঝলমল। এই আলোকের জয়গান শোনা যায় তাঁহার গানে—

রামনাম-মণি দীপ ধরু জীহ দেহরীদ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিয়ার॥

—দেহ তুলসীর দেউল, জিহ্বা তাঁহার দ্বার। যদি দেহের ভিতর বাহির আলোকময় করতে চাও, তবে রামনামের মণিদীপ জিহ্বায় করো স্থাপন। তুলসীর ভিতর বাহির উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাই সর্ব সৃষ্টিকে রামময় জেনেও নিবেদন করেছেন তাঁর প্রণাম।

সাধনার তীব্রতা দেখিয়া মহাবীরজী খুশী হইলেন। কহিলেন, "তুলসী, তুমি এবার চিত্রকূট পর্বতে যাও। শ্রীরামের অবতারলীলার শুরু এই পর্বতাঞ্চল থেকে। এখানকার ভূমি হয়েছে তাঁর পদস্পর্শে পবিত্র। পরিবেশও সাধনার বড় অনুকূল। এখানে বসে তুমি কিছুদিন তপস্যা করো, কমললোচন তোমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন।"

তখন সূর্যগ্রহণের মেলা। চিত্রকূটে অগণিত সাধু-সমাগম হইয়াছে। রামনাম কীর্তনে রামায়ণের ব্যাখ্যানে আকাশ বাতাস মুখরিত। তুলসী পাহাড়ের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ভজনকুটির নির্মাণ করিয়া মনের আনন্দে কিছুদিন বাস করিতে থাকেন।

কিছুদিনের মধ্যে মেলা ভাঙিয়া গেল। চিত্রকূটের বনস্থলী এবার প্রায় জনশূন্য। তুলসীদাস একান্ত নিরালায়, আরো কঠোর তপস্যা শুরু করিয়া দিলেন।

রোজ প্রত্যূষে ঝর্ণার জলে স্নান করিয়া তিনি ভজনে বসেন। সারা দিনের শেষে সামান্য কিছু অরণ্য-ফলে হয় ক্ষুধার নিবৃত্তি।

একদিন প্রভাতে তুলসী তাঁহার সংকল্পিত পূজার আয়োজনে বড় ব্যস্ত আছেন। খুজি

হইতে চন্দন কাঠ ও শিলা নিয়া একমনে তিনি চন্দন ঘষিতেছেন। হঠাৎ এক নয়না-ভিরাম বালক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

সুন্দর সুঠাম শ্যামতনু এই বালক। সারা দেহে তাহার অপরূপ লাবণ্যের ছটা, শিরে জটাভার, পরনে বল্কল। আয়ত নয়নে দিব্য দ্যুতি! আজানুলম্বিত বাহুতে রহিয়াছে ক্ষুদ্র একটি ধনু।

দুষ্ট বালক হয়তো আজ গহন অরণ্যের পাখি শিকারে বাহির হইয়াছে। তুলসীদাস তাহাকে নিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। আব্দার ও অত্যাচারের সীমা নাই, তুলসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বায়না তুলিয়াছে, "ওগো, তোমার নিজহাতে আমায় চন্দন পরিয়ে দাও।"

এড়ানোর যো নাই। ইষ্টদেবের জন্য যে চন্দন তুলসী ঘষিতেছেন, তাহার উপরই বালকের মহা ঝোঁক।

অকস্মাৎ তুলসীর মনশ্চক্ষে খেলিয়া গেল রামনবমী দিবসে লীলাময়ের সেই ছলনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাজ মারুতির আশীর্বাদও জাগিয়া উঠিল তাঁহার স্মৃতিপটে। পুলকাপ্লুত দেহে, ভাবাবিষ্ট সাধক ধনুর্ধারী বালকের ললাটে চন্দনের ফোঁটা আঁকিয়া দিলেন। তারপর কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বালক শুনহু বিনয় মম এহু
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহু?

বালকের কমলনয়নে হাসির ঝলক্। কণ্ঠস্বরে সুধা ছড়াইয়া সে শুধু উত্তর দিল—"সকল শ্রীরাম অবতার!"

একি বিস্ময়কর অনুভূতির স্রোত উৎসারিত হইতেছে তুলসীর সর্ব সত্তায়। জ্যোতি-র্লোকের সীমাহীন বিস্তারে তিনি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছেন? এ জ্যোতির, এ আনন্দের যে আর পারাপার নাই। তুলসী আত্মসংবিৎ হারাইয়া ফেলিলেন।

বহুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণে তাঁহার সব কিছু একাকার করিয়া দিয়া চঞ্চল বালক বনপথ দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

নয়নে কেবলি প্রেমাশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে। বার বার তাহা মুছিয়া তুলসী লিখিয়া রাখিলেন।

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সন্তান কী ভীড়।
তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর।

তুলসীর কাঁদন আর থামে না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহেন, "হে পরমপ্রভু, কি তোমার ছলনা লীলাময়! তুলসীর জীবনে তুমি অনন্ত লীলাবিলাস নিয়ে কেন বিরাজ করছো না?"

এসময়ে রঘুনাথজী আর একদিন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কৃপাভরে তাঁহাকে কহিলেন, "তুলসীদাস, ভেবো না। আমার তুমি পাবে, আমার লীলাও তোমার হৃদয়ে থাকবে চিরজাগরূক হয়ে। এবার আমার লীলা কাহিনীকে তুমি জনমানসের সামনে তুলে ধরো, তোমার অপরূপ ভাবৈশ্বর্য ও কাব্যসুষমায় মণ্ডিত ক'রে, সমাজের সর্বস্তরে তা বিতরণ করো। কলিযুগের উপযোগী ক'রে কলির কলুষ মোচনের জন্য রচনা করো আমার নব-রামায়ণ।"

রামনাম ও রামলীলা প্রচারের আদেশ মিলিয়াছে। তুলসী এবার চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্যে

প্রভুর লীলাস্থলগুলি পরিক্রমা করিয়া বেড়ান। রঘুনাথজীর পদধূলিপূত এসব তীর্থ। অগণিত সাধক এখানে উদ্ধার পাইয়া যাইতেছেন। প্রভুর এ স্মৃতিবিজড়িত স্থানে বিচরণ করার ফলে তুলসীর দেহ-মন-প্রাণে লীলামাহাত্ম্য ওতপ্রোত হইয়া গেল।

দণ্ডকবন দর্শনে ইষ্টদেব রামচন্দ্রের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। এই অপরূপ স্মৃতি ও অনুভূতিই কাব্যের মালিকায় গাঁথিয়া ভক্তবীর গাহিলেন—

দণ্ডকবন প্রভু কীন্হ সোহাবন।
জন মন অমিত নাম কিয় পাবন।
নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন।
নাম সকল কলি কলুষ নিকন্দন।

অর্থাৎ, দণ্ডকারণ্যের শোভা প্রভু আমার সত্যিই দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। কিন্তু এই দণ্ডকে তো একটি মাত্র বন—তাঁর নাম যে অগণিত মানবের মনোবনকেই করেছে পবিত্র। বীরবিক্রমে সেদিন রঘুনন্দন দলিত করেছেন রাক্ষসকুল, কিন্তু তাঁর নাম আজ করছে কলির পাপরূপ সকল রাক্ষসকে বধ।

নাম প্রচারের জন্য নূতনতর রামায়ণ লিখিতে হইবে। এজন্য প্রস্তুতও তিনি হইয়াছেন। ইষ্টদেব রঘুবীরের ধ্যানে ও জপে সদাই তিনি থাকেন বিভোর। বুকে আঁকিয়া দিয়াছেন প্রভুজীর 'মঞ্জুল মঙ্গল-মোহময়' মূর্তি। চোখে পুরিয়াছেন তাঁহার 'নীলকঞ্জ' নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠে রাখিয়াছেন তাঁহার অমিয়-মধুর নাম। তুলসীর সর্বসত্তা হইয়া উঠিয়াছে আজ রামময়।

তিনি স্থির করিলেন, এই নব-রামায়ণ রচনায় হাত দিবার আগে একবার উত্তর ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিবেন। পরিক্রমার ফলে ইষ্টপদে মতি জন্মিবে, তেমনি প্রভুর মনোরম লীলাকাহিনীর উপকরণও সংগ্রহ করা যাইবে।

রঘুনাথজীর জন্মস্থান অযোধ্যার সরযূতীরে তিনি কিছুদিন বাস করেন। এই সময় হইতে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা এবং অপ্রাকৃত দর্শন তাঁহার জীবনে ঘটিতে থাকে নিরন্তর ধারায়।

মহাসাধকের জীবনে তখন নানা যোগবিভূতি উপজিত হইতেছে কিন্তু তাহাতে মনোযোগ দিবার অবসর তাঁহার কোথায়? রামভক্তিতে তিনি তখন রসায়িত। চিন্ময় ইষ্টমূর্তি'র সহিত পরমভক্তের আনন্দলীলা চলিয়াছে অবিরাম ধারায়।

নানা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীদাস সেবার বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকেই শুনেন রাধাকৃষ্ণ নামের ধ্বনি। কোনো মন্দিরেই তাঁহার আরাধ্য সীতারামের নামকীর্তন হয় না। তুলসী প্রায়ই বড় ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া থাকেন। সেদিন বৃন্দাবনে উৎসব হইতেছে, মন্দিরে মন্দিরে সমারোহ, মহা ধুমধাম। পরম রমণীয় বেশে শ্রীবিগ্রহ সাজানো হইয়াছে। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুলসীদাসকে সোৎসাহে মদনগোপালজীর মন্দিরে নিয়া গেলেন।

শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করিতে হইবে, তুলসী বেদীর সম্মুখে আগাইয়া গেলেন কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড? এরূপে তো মন ভরিতেছে না। শির তাঁহার এ মূর্তি'র সামনে নত হইতে চাহে না। যে রূপ, যে ভঙ্গীর সহিত তুলসীদাসের নিরন্তর যোগ, যে লীলাস্মৃতি তাঁহার সর্বসত্তায় জড়াইয়া আছে, আজ তাহাই যে তিনি চান। চির প্রিয় রঘুবীরজী না

হইলে যে। তাঁহার ভক্তিভাব জন্মিবে না। ভক্তচূড়ামণি তখন বংশীধারী মদনমোহন মূর্তির দিকে চাহিয়া করজোড়ে বলিলেন—

কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনো হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বাণ লো হাথ ॥

অর্থাৎ, হে নাথ! আজকের এ শোভার কি বর্ণনা আমি দেব? অপরূপ মনোহরণ বেশে তুমি সেজে রয়েছ। কিন্তু প্রভু, তুলসী যখন চরণে মস্তক নোয়াবে তখন কিন্তু তোমায় ধনুর্বাণ হাতে নিতেই হবে—বাঁশীতে আর চলবে না।

কথিত আছে, মদনগোপালজী সেদিন এই মহাভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ধনুর্ধারীরূপেই সেখানে প্রকট হন। তুলসীদাস নিজের লেখায় ইহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন—

ক্রীট মুকুট মাথে ধরেো ধনুষ বাণ লিয় হাথ।
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥

অর্থাৎ, নিজ ভক্ত তুলসীদাসের আশার রাখার জন্য প্রভু সেদিন রঘুনাথরূপে শিরে ধরেন রাজকিরীট, হাতে তুলে নেন গাণ্ডীব।

বৃন্দাবন ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ভ্রমণের পর তুলসী কাশীতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। গোড়ার দিকে তিনি নিজের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন কাশীর হনুমান ফটকে। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের অনাচারে বিরক্ত হইয়া শীঘ্রই এ অঞ্চল তিনি ত্যাগ করেন এবং কিছুদিনের জন্য এসময়ে গোপাল মন্দিরে আশ্রয় নেন।

এখানকার বল্লভকুলী গোস্বামীরা বড় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিযুক্ত। ইঁহাদের সহিত মতভেদ হওয়ায় তুলসী অসিঘাটে চলিয়া যান। এই ঘাটের গুহা ও মন্দিরটিতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অবস্থান করেন।

তুলসীদাসের এই সাধনস্থল বারাণসীর ধর্ম ও সমাজ-জীবনে তখনকার দিনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অসিঘাটে আজও তাঁহার সাধনগুহা ও নানা স্মৃতি-চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে।

কাশীধামে বসিয়া তুলসী প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই রামায়ণ রচনা শুরু করেন। কথিত আছে, এসময়ে প্রভু বিশ্বনাথজী সাধারণের কথ্য ভাষাতেই তাঁকে রামচরিত বর্ণনার প্রত্যাদেশ দেন।

কাশীধাম হইতে তুলসীদাস সেবার অযোধ্যা তীর্থে আসিয়াছেন। এখানে এক যোগীর সঙ্গে ভাগ্যক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই যোগীবর তাঁহাকে 'নবযুগের বাল্মীক' বলিয়া আবাহন করেন। ইঁহারই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তুলসীদাস তাঁহার অমর কীর্তি 'রামচরিত মানস' রচনায় ব্রতী হন।

তুলসীদাসের এই নবলব্ধ যোগী বন্ধুটি যোগশক্তি বলে এসময়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। তারপর অযোধ্যার সরযূতটে ইঁহারই পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরে বসিয়া তুলসী রামায়ণ রচনায় হাত দেন।

'রামচরিত-মানস'-এর কাজ এবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। শুধুমাত্র রাম চরিত্র ও রামায়ণ-

কথার মধ্যে তাঁহার এ রচনাকে নিবদ্ধ না রাখিয়া ভক্ত-কবি গ্রহণ করেন এক বৃহত্তর পটভূমিকা।

এই মহাগ্রন্থে তুলসী শ্রুতিসম্মত আদর্শ ও আচারানুষ্ঠানের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরেন। এই মহান সাহিত্যেকর্মের জন্য তাঁহাকে দোহন করিতে হয় বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্মরামায়ণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ও বহুতর কাব্য। তাছাড়া, প্রসন্ন রাঘব, হনুমন্নাটিকা রঘুবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও উত্তর রামচরিত মন্থন করিয়াও তিনি অজস্র তত্ত্ব ও রসবস্তু সংগ্রহ করেন। এই মধুকর-বৃত্তির ফলে রচিত হয় এক অনবদ্য সৃষ্টি। সর্বোপরি আউধী হিন্দী ও ব্রজবুলির সংমিশ্রণের ফলে এ গ্রন্থ সহজবোধ্য হয়, অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তুলসীদাস একাধারে কবি ও দার্শনিক, ভক্ত সাধক ও শক্তিমান যোগী। দিগ্বিদিকে তাই তাঁহার খ্যাতির অন্ত নাই। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র অভ্যাগত ও দর্শনার্থীর ভিড় সর্বদা লাগিয়াই আছে।

এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কাশীর একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুশূল হইয়া উঠে। নানারূপে তাহারা তুলসীর অনিষ্ট সাধনে লাগিয়া যায়।

হিন্দিতে লেখা তুলসীর রামচরিত-মানস-এর উপরই ইহাদের বেশী আক্রোশ। এ গ্রন্থ সাধারণের কাছে রামায়ণকে সহজ করিয়া দিয়াছে। তাই পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে যাহারা জীবিকা অর্জন করে তাহারা বড় চিন্তিত হইয়া উঠিল।

দুইটি কুখ্যাত চোরের সহিত এই দুষ্টের দল ষড়যন্ত্র করে। স্থির হয় তুলসীদাসের ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং আশ্রমের তৈজসপত্র তাহারা চুরি করিবে।

তস্করদ্বয় রাত্রিযোগে আশ্রমে ঢুকিতে যাইতেছে, হঠাৎ তাহারা থামিয়া গেল। সম্মুখে দণ্ডায়মান এক দিব্যকান্তি শ্যামল কিশোর। হাতে তাঁহার ধনুর্বাণ। তুলসীর আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া তিনি পাহারা দিতেছেন। বার বার চেষ্টার পরও তস্করেরা তাঁহাকে এড়াইতে পারে নাই। ধনুর্ধারী এ তরুণের যেন শ্রান্তি ক্লান্তি বলিয়া কিছু নাই, সারা রাতই তিনি জাগিয়া আছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তস্কর দুইটি গোস্বামী তুলসীদাসের নিকট গিয়া উপস্থিত। আশ্রমের এই তরুণ সুদর্শন রক্ষীটি কে, সে কথা জানিতে তাহাদের কৌতূহল হইয়াছে। এমন তেজঃপুঞ্জকলেবর দিব্যকান্তি মানুষ সচরাচর তো চোখে পড়ে না। কি জানি কেন, বার বারই তাঁহার মূর্তিটি উভয়ের মন জুড়িয়া বসে। কৌতূহলের সহিত আত্মগ্লানিও তাহাদের হইয়াছে।

চোর দুইটি অকপটে তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ও পূর্বরাত্রির অভিজ্ঞতা বিবৃত করিল।

তুলসী এক মনে তাহাদের কাহিনী শুনিতেছেন, আর দরদর ধারে তাঁহার নয়ন বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। আর্তস্বরে কহিলেন, "ভাই, তোমরা ধন্য। তোমাদের দেখা পেয়ে আর কথা শুনে আমিও ধন্য। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্যবলে তোমরা আমার প্রভু রঘুনাথজীর দর্শন পেয়েছো। এসো, আলিঙ্গন দিয়ে আমায় পবিত্র করো।"

স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্র তুলসীর সামান্য বিত্ত রক্ষণের জন্য রাত জাগিয়া পাহারা দিতেছেন। এ চিন্তা যেন তাঁহার অসহ্য। আশ্রমের ভোগরাগ ও পূজার বাসনপত্র সবই সেদিন তিনি দরিদ্রের বিলাইয়া দিলেন। হস্তলিখিত রামচরিত-মানস পুঁথিটি পাছে অপহৃত হয়, এই

ভয়ে তাহা স্থানান্তরিত করিলেন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গৃহে। এবার তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তুলসীর নীতি-নিষ্ঠা এবং সদাচার রক্ষার কঠোরতাও কিছু সংখ্যক শত্রু সৃষ্টি করিয়া বসে। একদল তান্ত্রিক এ সময়ে অভিচার প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু তুলসীর অভিভাবক মহাবীরজীর কৃপায় এ সময়ে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়।

রামনামের প্রচারে তুলসীদাস একেবারে মাতোয়ারা। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া দিকে দিকে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত রামমন্ত্র সর্বত্র হইয়া উঠিতেছে চৈতন্যময়। নানা বিস্ময়কর কাণ্ড এই মন্ত্রের মাধ্যমে দিনের পর দিন সংঘটিত হইতেছে।

সেদিন প্রত্যূষে এক ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়া সে মহাপাপ করিয়াছে। অনুতাপের জ্বালা দুঃসহ, কিন্তু কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ পাপ দূর হইবে তাহা সে জানে না। কাশীর রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা বিধান দিয়াছেন, আত্মত্যাগ ছাড়া এ পাপ হইতে মুক্তি নাই।

লোকটি তুলসীদাসের চরণতলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি অভয় দিয়া কহিলেন, "সে কি কথা, ভাই। সর্বপাপহর রামনাম থাকতে তোমায় আত্মহত্যা করতে হবে কেন?"

তুলসী তাঁহার কানে দিলেন রামনাম মহামন্ত্র।

রক্ষণশীলেরা এ ব্যবস্থা মানিতে রাজী নয়, অথচ তুলসী ঘোষণা করিতেছেন যে, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাহার মতে পৃথিবীতে এমন কোনো পাপী নাই, যাহা রামনামে ভস্মীভূত না হয়।

তুলসী প্রশ্ন করিলেন, কি নিদর্শন দেখিলে এই মহাপাপ স্খলনের কথা তাঁহারা মানিয়া নিবেন? পণ্ডিতেরা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "বেশ, তুলসী তোমার দেওয়া রামনামের যদি এতই শক্তি হয় তার প্রমাণ আমরা পেতে চাই অলৌকিক শক্তি স্ফুরণের মধ্যে দিয়ে। ব্রহ্মবধের পাতকী মন্দিরপ্রাঙ্গণের শিলানির্মিত বৃষটিকে তৃণ ভক্ষণ করতে দিক—আর ঐ বৃষ জীবন্ত হয়ে তা গ্রহণ করুক। তবেই বুঝবো তোমার রামমন্ত্রের মাহাত্ম্য। তবেই স্বীকার করবো—ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে এ ব্যক্তি নিষ্কৃতি পেয়েছে।"

তুলসী বলিলেন, "তথাস্তু!"

কথিত আছে, সমবেত জনতার সম্মুখে, তুলসীর আশ্রিত ঐ ব্যক্তির হস্ত হইতে পাষাণ-বৃষ সেদিন আহার্য গ্রহণ করে।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সেদিন এক বিধবা নারী মৃত পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তুলসী ঘাটের পাশ দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। পতিহারা নারী এ সময়ে তাঁহার পদবন্দনা করে। পরনে তাহার রহিয়াছে লালপাড় শাড়ী, সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা।

তুলসী ভাবাবেগে ছিলেন, ভাবিলেন রমণী তাঁহার আশীর্বাদ চায়। মুখ হইতে অমনি বাণী নির্গত হইল, "মা, পতিপুত্রবতী হয়ে আনন্দে তুমি সংসার করো।"

এ কি অদ্ভুত আশিস্! মৃত পতির দিকে তুলসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে যোগৈশ্বর্য-বলে ঐ শবকে সেদিন তিনি বাঁচাইয়া তোলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ঐশ্বর্যস্মৃতিতে তুলসীর হৃদয় সদা পরিপূর্ণ। তাই দরিদ্রের কোনো দুঃখকষ্টই তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার গানে শোনা যায়—নহীঁ দারিদ্র্য সম দুঃখ জগমাহীঁ।

সুযোগ পাইলেই মহাসাধক তুলসী আর্ত ও দরিদ্রের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইতেন।

একবার কাশীর এক নিরন্ন ব্রাহ্মণ তুলসীকে অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী জানিয়া তাঁহার নিকট নিজ দুঃখ মোচনের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকেন। তুলসী তখন গঙ্গার ধারে এক মনে রামনাম জপ করিতেছেন। এই সময় গঙ্গামাঈকে অনুরোধ জানাইয়া ব্রাহ্মণের জন্য কতটা জমি তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন—গঙ্গার স্রোত তট হইতে দূরে সরিয়া যায়, আর ঐ জলমুক্ত জমিখণ্ড ব্রাহ্মণকে দানের ব্যবস্থা তিনি করেন।

চিত্রকূটে ধ্যানস্থ থাকাকালীন এক দরিদ্রের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি তাঁহাকে একটি দারিদ্র্যমোচন শিলাদান করেন। শোনা যায়, এই শিলার প্রভাবে এ ব্যক্তির সংসার ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তুলসীদাসের শেষ জীবনের যোগৈশ্বর্য বহু লোককে তাঁহার চরণতলে টানিয়া আনে। তাঁহার সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর জনপ্রবাদের সৃষ্টিও এই সময়ে হয়। এই সব জনশ্রুতি শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট্ শাহজাহান তাঁহাকে একবার রাজধানীতে আনয়ন করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতেও অনুরোধ জানান।

তুলসী সবিনয়ে উত্তর দেন, "সম্রাট্, আমি রামচন্দ্রজীর এক দীন সেবক। আমি অলৌকিকত্বের কি জানি!"

বাদশাহ্ কিন্তু তুলসীদাসের এ কথায় বড় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, তুলসী তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। বাদশাহের আজ্ঞায় তাঁহাকে সেদিন কারারুদ্ধ হইতে হয়। কথিত আছে, ইহার অব্যবহিত পরেই সারা রাজধানী বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। বিশিষ্ট হিন্দু নেতারা তখন বাদশাহ্‌কে বুঝাইতে থাকেন, এ সব রামভক্ত তুলসীদাসেরই যোগবিভূতির লীলা! সত্বর তাঁহাকে মুক্ত না করিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঠেকানো যাইবে না। বাদশাহ্ তখন তুলসীকে ছাড়িয়া দিলেন।

তুলসী এবার দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রভু রামচন্দ্রের নামমাহাত্ম্য আর ধর্মরাজ্যের আদর্শ প্রচারে তিনি ছিলেন আদিষ্ট। সে আদেশ তিনি সাধ্যমতো পালন করিয়াছেন, মহাব্রত হইয়াছে উদ্‌যাপিত।

এসময়ে দেহে দেখা দেয় মারাত্মক ব্রণের আক্রমণ। জীর্ণ দেহও আর যুঝিতে পারে না। তবে কি রঘুনাথজী এবার তাঁহার প্রিয় ভক্তকে বুকে টানিয়া নিতে চান? তুলসী সেদিন সেবকদের কহিলেন—

রামনাম জস বরনিকৈ হোন চহঁত অব মৌন।
তুলসীকে মুখ দীজিযে অবহী তুলসী সৌন॥

—অর্থাৎ, যে জিহ্বা রামনামের যশ করতো বর্ণনা, আজ তা হতে চায় একেবারে মৌন! এবার তুলসীর মুখে তুলে দাও তুলসীপাতা আর সোনা।

অসিঘাটের আশ্রমকক্ষে তুলসীদাস তাঁহার শেষ শয্যায় শুইয়া আছেন। মিলন-বিরহের তরঙ্গায়িত জীবনের শেষে চিরমিলনের লগ্নটির জন্য তিনি প্রতীক্ষমাণ।

অদূরে শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা উচ্ছল হইয়া ছুটিয়াছে অভিসারে, সাগরসঙ্গমের দিকে। মহাভাগবত তুলসীর জীবনধারাও এমনিভাবে আজ মিলাইতে চায় প্রিয়মিলন সাগরে।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষামুখর দিনটিতে এ মিলনযাত্রা সার্থক হইয়া উঠিল। শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ভক্তকবি তুলসীদাস চিরতরে তাঁহার নরদেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ

বাংলার শক্তিসাধনার চারণ-কবিরূপে, মাতৃনাম-যজ্ঞের হোতারূপে আবির্ভূত হন রামপ্রসাদ। তন্ত্রের গূঢ় গহন সাধনলোকে ছিল তাঁহার অনায়াস বিচরণ, যে সুধা সেখান হইতে তিনি আহরণ করিয়া আনেন, সহজ স্বচ্ছন্দ, প্রাণময় সংগীতের মধ্য দিয়া দিগ্‌-বিদিকে তাহা ছড়াইয়া দিয়া যান। বাংলার পথে প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে এই সংগীতের মূর্ছনা জাগিয়া উঠে। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সকলেরই কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় মধুস্রাবী প্রসাদী গান, মাতৃনামের মহাপ্রসাদে তৃপ্ত হয় ভক্ত নরনারী।

বাংলার সাধনায়, বাংলার সমাজচেতনায় শক্তিবাদ আর ভাবুকতা এ দুয়েরই রহিয়াছে সমন্বয়। রামপ্রসাদের সাধনজীবনে এ সমন্বয় অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুক্ষ কঠোর কৌলসাধনাকে তিনি স্নিগ্ধমধুর করিয়াছেন ভক্তিপ্রেমের রসধারায়।

শ্যামা-মা রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী। তত্ত্বদর্শী সাধকের দৃষ্টিতে এই মা হইতেছেন ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তি। এ মহাশক্তিকে রামপ্রসাদ বার বার আবাহন জানাইয়াছেন, চিন্ময়-রূপে করাইয়াছেন আবির্ভূত।

আদুরে শিশুর মতো অবলীলায় তাঁহার আঁচল ধরিয়া বসিয়াছেন।

দেবী অসুরনাশিনী—ভীমা ভয়ঙ্করা প্রলয়ঙ্করী! কিন্তু রামপ্রসাদের কাছে তাঁহার আরো বড় পরিচয়, তিনি—মা! মাতৃভাবনায় উদ্বুদ্ধ সাধক তাই মাতিয়াছেন মান-অভিমানের লীলাখেলায়। মায়ের কোলে বসিয়া গাঁথিয়াছেন অপরূপ ভক্তিসংগীতের মালা। এ মালা শুধু শক্তিমান্ সাধকদের কণ্ঠেই নয়, অগণিত সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও তিনি দোলাইয়া দিয়াছেন।

প্রসাদী গান বাংলা সাহিত্যের অপরূপ অক্ষয় সম্পদ। আবার বাঙালী অধ্যাত্মজীবনকে ইহা করিয়াছে প্রভাবিত। কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা ও রামকৃষ্ণের মতো সাধকদের যেমন এ গান উদ্দীপিত করিয়াছে, তেমনি মাতাইয়াছে সাধারণ ভক্ত মানুষকে। বাংলার পথে-প্রান্তরে হাটে-বাজারে আজও এ গানই আমরা শুনি, কৃষাণ মজুর আর নৌকার মাঝির মুখে ধ্বনিত হয় ইহারই সুর-গুঞ্জন।

ভাগীরথীর পূর্ব তটে হালিশহরে শক্তিসাধক রামপ্রসাদ আবির্ভূত হন। চৈতন্যের দীক্ষাগুরু, বৈষ্ণবাচার্য ঈশ্বরপুরীর জন্মও এই জনপদে। শ্যাম ও শ্যামার নামামৃত দুই-ই দীর্ঘদিন এই পুণ্যভূমিতে তাই ছড়ানো রহিয়াছে।

১১২৭ সালে আশ্বিন মাসে, এক শুভদিনে রামরাম সেনের পুত্ররূপে রামপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হন। সেনমহাশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সাধনভজনেও বেশ উৎসাহী। তাছাড়া, তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের সে অঞ্চলে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল।

পিতার ইচ্ছা, রামপ্রসাদ তাঁহার পৈত্রিক বিদ্যাব্যবসায় শিক্ষা করুক, টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা, সে অর্জন করুক। কিন্তু পুত্রের সেদিকে কোনো মনোযোগ নাই। অথচ সে অসাধারণ মেধাবী। অল্পদিনেই ব্যাকরণ ও কাব্য আয়ত্ত করিয়াছে। তখনকার দিনে

ফার্সী ও উর্দু না শিখিলে উন্নতি করা যাইত না—এই দুইটি ভাষা শিখিতেও রামপ্রসাদের বেশী সময় লাগে নাই।

ঘর-সংসারে পুত্রের কোনো আকর্ষণ নাই, বৈষয়িক কাজেও তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। এদিকে বয়স বাড়িয়াই যাইতেছে।

বাইশ বৎসর পার হইলে পিতা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। ভাবিলেন, যদি বা ছেলের মন কিছুটা ফিরে। সুলক্ষণা বধূ সর্বাণীকে সাদরে ঘরে আনা হইল।

বংশের রীতি অনুযায়ী কিছুদিন পরে রামপ্রসাদ সস্ত্রীক কুলগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রের দীক্ষা নিলেন।

রামপ্রসাদের পিতা হঠাৎ এ সময়ে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই মৃত্যু সংসারে আনিয়া দিল এক বিপর্যয়।

পিতার ব্যবস্থায় এতদিন কোনো প্রকারে দিন চলিতেছিল। কিন্তু এইবার উপায়? অভাবের তাড়নায় রামপ্রসাদ বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একটা কিছু কাজকর্ম যোগাড় না করিলে আর চলে না। এত বড় পরিবারের অন্নসংস্থান কিরূপে হইবে? শেষটায় চাকুরীর খোঁজে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে রামপ্রসাদের বরাবরই অনুরাগ। গান ও কবিতা লেখায় হাত-মধ্যেই কিছুটা পারদর্শিতা হইয়াছে। তাছাড়া, ফার্সী ও উর্দু তিনি বেশ ভালই জানেন। এতগুলি গুণ থাকিতে কোনো একটা কাজ জোটানো অবশ্যই কঠিন কথা নয়। কিন্তু এ অপরিচিত নগরে কে তাঁহাকে জানে? কেই-ই বা সাহায্য করিবে? রামপ্রসাদ বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গরাণহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের দপ্তরে ত্রিশ টাকা বেতনে এক মুহুরীর কাজ কোনোমতে যোগাড় হইল।

অল্প কয়েকদিন পরের কথা। শ্যামামায়ের কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। রামপ্রসাদ খানিকটা নিশ্চিন্ত। দপ্তরে বসিয়া রোজ খাতা লিখিতে বসেন। কিন্তু হিসাবের অঙ্ক লিখিবেন কি, কবিচিত্ত হইতে কেবলি উৎসারিত হইতে থাকে ভক্তি-সংগীত।

মায়ের তিনি স্বভাবভক্ত। সদাই তাই আনমনা ও উদাসীনভাবে বসিয়া থাকেন। মুহুরীর কাজে তাঁহার মন বসিবে কেন? অজ্ঞাতসারে মায়েরই সংগীত কলমের গোড়ায় আসিয়া পড়ে। ভাবতন্ময়তা তাঁহার দিন দিন বাড়িতেই থাকে. হিসাবের খাতা ভরিয়া উঠে গানে আর কবিতায়।

মনিবের খাতায় জমা খরচের অঙ্ক হয়তো তেমন বসিতেছে না। কিন্তু শ্যামামায়ের খাতায় রামপ্রসাদের জমার হিসাব নিঃসন্দেহে সেদিন ভারী হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু বিষয়ী মানুষের দল এ হিসাব মানিতে চাহিবে কেন? কাজে এমন অমনোযোগ দেখিয়া দপ্তরের কর্মচারীরা কানাকানি করে—হিসাবের বইগুলি কেন সে নষ্ট করিতেছে। এ আবার কি পাগলামি? মনিবের কানেও এ কথা উঠিতে থাকে।

প্রায়ই নূতন মুহুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আসে। মনিব সেদিন বড় চটিয়া গেলেন। খাস কামরায় বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হিসাবের খাতা হস্তে নূতন মুহুরী উপস্থিত। আশঙ্কায় বুক তাঁহার দুরুদুরু করিতেছে।

তবে কি চাকুরীটিই আজ যাইবে। বেকার হইয়া পড়িলে পরিবারের যে আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না, জমিজমা যাহা কিছু ছিল সবই তো গিয়াছে।

জমিদার সেরেস্তায় সেদিন বড় চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। মনিব এমনিতেই রাশভারী লোক। তদুপরি আজ যে ক্রোধে অগ্নিশর্মা। সবাই বলাবলি করিতে থাকে, রামপ্রসাদের আজ আর রক্ষা নাই।

মনিব খাতাখানি হাতে নিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে কালী দুর্গার নাম, আর ভক্তিরসাত্মক গান। নূতন কবির কবিত্বসম্পদের ভারে হিসাবের অঙ্ক অনেক জায়গায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

অবশেষে মিত্রমহাশয়ের চোখ পড়িল একটি অপূর্ব রচনার উপর। এক নিশ্বাসে তিনি প ড়য়া চলিলেন—

আমায় দে ও মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্ধ-অঙ্গ জায়গীর—মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥

মিত্রমহাশয়ের দুই চোখ ততক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। একি অদ্ভুত প্রাণগলানো মাতৃসংগীত! এমনটি তো আর দেখেন নাই!

খুঁজিয়া-পাতিয়া আরও কতকগুলি রসমধুর পদের সন্ধান তিনি এই হিসাবের খাতায় পাইলেন। এ আবিষ্কারের আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। আর কেবলই থাকিয়া থাকিয়া অন্তরে চলিতেছে একটি অবিস্মরণীয় কলির গুঞ্জরণ —

আমি বিনা মাইনের চাকর,
কেবল চরণ ধুলার অধিকারী॥

রামপ্রসাদ এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন, এবার প্রাণে কিছুটা বল আসিল। জমিদার মিত্রমহাশয় ধীরকণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন. "শোন, রামপ্রসাদ, এই হিসেবের অঙ্ক কষতে তোমার জন্ম হয় নি। তোমার ভেতরে রয়েছে অনেক বড় বস্তু। এ বস্তু নষ্ট হোক্ তা আমি চাইনে। যে ত্রিশ টাকা এখানকার কাজ করে পেতে তাই তুমি আমার সরকার থেকে পাবে। এবার দেশে ফিরে যাও। সেখানে থেকে মায়ের নামগান কারো। আর মনের আনন্দে তোমার কাব্যের ফুল ফোটাও।"

রামপ্রসাদ স্বগ্রাম হালিশহরে ফিরিয়া আসিলেন। সংসারের অভাব অনটন এবার কিছুটা কমিল। সোৎসাহে তিনি শ্যামামায়ের নামগান আর জপধ্যানে লাগিয়া গেলেন।

প্রাণে জাগিয়াছে ভক্তিরসের জোয়ার! মাতৃনামের অমৃতধারা তাই তিনি চারিদিকে

ছড়াইয়া চলিয়াছেন। কখনো গঙ্গায় আবক্ষ নির্মজ্জিত হইয়া ভক্ত সাধক জগজ্জননীর উদ্দেশে তাঁহার গানের অর্ঘ্য ঢালিয়া দেন। কখনো বা নিজের নিভৃত সাধন কুটিরে বসিয়া একেবারে ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন।

রামপ্রসাদের গান যেন জাদুতে ভরা। ভক্তপ্রাণের এ আকুতি, এ সুরলহরী কানে আসিলেই গঙ্গাবক্ষচারী নৌকারোহীরা আত্মহারা হইয়া যায়, দাঁড়ির হাতের দাঁড় নিশ্চল হইয়া পড়ে।

এমনি পাগলপারা ভক্তিসংগীতের সুর একদিন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়া আনে।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত জহুরী। রামপ্রসাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে তাই তাঁহার দেরি হয় নাই। ভক্ত কবিকে তাঁহার রাজসভায় যাইতে বার বার এ সময়ে তিনি অনুরোধ জানান। কিন্তু আপন সাধনায় রত রামপ্রসাদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মাতৃসাধনা ও নিভৃত কাব্য-কূজন ফেলিয়া রাজসভায় যাইতে তিনি স্বীকৃত নন। তাছাড়া, রামপ্রসাদ তখন হালিশহরে নিজের সাধন-আসন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কোথাও বাহিরে গিয়া থাকা আর সম্ভব নয়।

ভক্তকবির নিরাসক্তি, শ্যামামায়ের প্রতি এই ঐকান্তিকী ভক্তি, দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্ধ হন। এ সময়ে প্রায় একশত বিঘা নিষ্কর জমি তিনি তাঁহাকে দান করেন। প্রতিদানে রাজাকে রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" নাটক রচনা করিয়া উপহার দেন।

সে-বার নবাব সিরাজদ্দৌলা নৌকাযোগে গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়াছেন। রামপ্রসাদ তখন ঘাটে বসিয়া শ্যামাসংগীত গাহিতেছিলেন। প্রাণগলানো এ গান শুনিয়া সিরাজ মুগ্ধ হন। সাদরে তাঁহাকে নৌকায় আনাইয়া গান গাহিতে অনুরোধ করেন।

নবাবের রুচি অনুমান করিয়া রামপ্রসাদ ফার্সী ও হিন্দীতে গান ধরিলেন। কিন্তু নবাবের তাহাতে মন ভরিল না। রামপ্রসাদ নিজস্ব সুর ও ভাব নিয়া যে শ্যামা-সংগীত গাহেন, তাহাই তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "না রামপ্রসাদ, তুমি তোমার নিজের গান গাও, সে-গানই আমি আজ শুনতে চাই।"

রামপ্রসাদ তন্ময় হইয়া গাহিলেন। শুনিয়া নবাবের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

এবার ভক্ত রামপ্রসাদের সাধনজীবনে আসিতে থাকে সাধনার নিগূঢ়তর পর্ব। নব প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ। জগন্মাতার উদ্দেশে ভক্তি ভরা গানের অর্ঘ্য নিবেদন করেন দিনের পর দিন। আবার তেমনি একনিষ্ঠভাবে গভীর নিশীথে তন্ত্রোক্ত কালী সাধনা তাঁহার অগ্রসর হইয়া চলে। গৃহ সন্নিহিত জঙ্গলে রামপ্রসাদ এক পঞ্চবটী প্রস্তুত করাইয়াছেন। উহাতে স্থাপিত হয় তাঁহার বিখ্যাত পঞ্চমুণ্ডীর আসন।

সাধকের হৃদয়-কন্দর ভাবৈশ্বর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করিয়া উঠিতে থাকে। মায়ের নামে নূতন নূতন হৃদয়স্পর্শী গান রচনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে তিনি অঞ্জলি দেন। ভক্তি-ভরে নিজ হস্তে রোজ মহাকালীর মূর্তি গড়িয়া করেন অর্চনা।

সাধন-সাগরের গভীরে রামপ্রসাদ এবার ধীরে ধীরে নির্মজ্জিত হইতেছেন। 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিতেছেন বার বার। কিন্তু কোথায় তাহার তল ? তাইতো গাহিয়া উঠেন—

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥

শুধু তাহাই নয়, এক একবার তিনি ভাবিতে বসেন, মহাশক্তি ব্রহ্মময়ীর দর্শন—এ যে বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ারই মতন। সখেদে রচনা করেন মাতৃ সংগীত:

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না।
ধরবে শশী হয়ে বামন।

এ মহাসিন্ধুর শেষ কোথায় তাহা কে জানে? আদুরে ছেলের দাবি ও আব্‌দার নিয়া ভক্ত সাধক বার বার অগ্রসর হইয়া আসেন, সীমাহীনা ব্রহ্মময়ীকে সীমার মধ্যে ধরিতে প্রয়াস পান। নিরাকারকে দিতে চান আকার। নিতান্ত সহজ অধিকারে, সহজ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জগজ্জননী মহামায়াকে তিনি পাইতে চাহেন। তাই ভক্ত নিবেদনের মধ্যে থাকে তাঁহার ভীতি প্রদর্শন, আবদারের সহিত থাকে তাঁহার কলহের ঝাঁজ। প্রসাদের গান ও কবিতায় সর্বত্র দেখা যায় এই অদ্ভুত লীলারঙ্গ! 'মায়ে পোয়ের' আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে এক অপরূপ মাধুর্য! জগতের খুব কম ধর্মসাহিত্যেই এই ভাবময়তার তুলনা মিলিবে, সাধক ও ইষ্টের মধ্যেকার এমন অন্তরঙ্গতার সুরও সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রসাদ গাহিয়াছেন—

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাঙ্‌ খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা,
কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে, এবার মোলে
ডাকবো সর্বনাশী বলে॥

মা তাঁহার ব্রহ্মময়ী বিশ্ব-প্রসবিনী, বিশ্ব-পালয়িত্রী, বিশ্ব সংহারিণী। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি যে ভক্ত রামপ্রসাদেরই মা, তাঁহার একান্ত আপনার জন। তাই তো সন্তানের চিরন্তন দাবি নিয়া তিনি কখনো মাকে ভয় দেখান, কখনো শাসাইতে থাকেন—

মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে ল'বে কোলে।

মায়ের চরণ-সম্পদ নিয়া রামপ্রসাদ বাবা আশুতোষের সঙ্গেই না কত কলহ করিতেছেন—

এবার আমি বুঝবো হরে।
মায়ের ধরবো চরণ ল'ব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি—
ব'লবো এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥

প্রতিদিন এমনি মান-অভিমান ও দ্বন্দ্বের পালা চলে। কিন্তু 'হৃদি রত্নাকরের অথৈ জলে' দিবানিশি ডুবিয়াও রামপ্রসাদ তো ঈপ্সিত মণিমুক্তার সন্ধান পাইতেছে না! পরম অভীষ্টলাভ তো হইতেছে না! তাইতো আশা নিরাশার দোলায় সারা অস্তিত্ব তাঁহার দোদুল্যমান।

এমন সময়ে একদিন ছদ্মবেশিনী ইষ্টদেবীর আবির্ভাব ঘটিল। এক অলৌকিক লীলার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া জগজ্জননী রামপ্রসাদকে সচকিত করিয়া গেলেন।

আগের দিন রাত্রে হালিশহরে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যায়। ফলে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙিয়া পড়ে।

গৃহে তখন অর্থাভাব। মজুর লাগাইয়া মেরামতি-কাজ সম্পন্ন করার কোনো সাধ্য নাই। তাছাড়া, মজুরের অপেক্ষায় ইহা একদিনও ফেলিয়া রাখা চলে না। সাধক রামপ্রসাদ নিজেই তাই ঘরের বেড়া বাঁধিতে বসিলেন। কনিষ্ঠ কন্যা জগদীশ্বরীকে রাখিলেন উল্টাদিকে। দড়ির খুঁটটি বার বার ফিরাইয়া দিয়া সে তাঁহার পিতাকে সাহায্য করিতে থাকে।

একমনে রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিয়া চলিয়াছেন, আর কণ্ঠে চলিতেছে মাতৃসংগীতের অস্ফুট গুঞ্জন।

হাতের কাজ আর নামগানে তিনি নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, এদিকে চঞ্চলা বালিকা কন্যা খেয়াল খুশিমতো কোথায় চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বরীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সত্যিই তো, বেড়া-বাঁধার কাজে পিতাকে সে তো অনেকটা সাহায্য করিতেছিল! সেদিকে যাওয়ার কথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নাই। তাড়াতাড়ি সে তখনি ছুটিয়া আসিল।

গিয়া দেখে, বেড়া সংস্কারের কাজ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। বিস্মিত হইয়া পিতাকে প্রশ্ন করে - "বাবা, তোমার বেড়া বাঁধা তো প্রায় শেষ হয়েছে দেখছি। একলা কি ক'রে এতটা এগুলে? কে-ই বা তোমার দড়ির খুঁট ফিরিয়ে দিচ্ছিল, বলতো?"

"কেন, মা, তুই-ই তো ওপাশে থেকে বরাবর দিয়ে যাচ্ছিস্।"

"সে কি কথা বাবা! আমি তো অনেকক্ষণ এখান থেকে উঠে গেছি। ওঘর থেকে খেয়েদেয়ে এই মাত্র যে এলুম।"

কন্যার কথা শুনিয়া রামপ্রসাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বুঝিলেন তাঁহার ধ্যানের ঠাকুরাণীর আসন টলিয়াছে। জগন্মাতা ভক্তের ভক্তিপ্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িয়াছেন—তাহারই টানে আজ তাঁহাকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। পুত্রের গৃহকাজে লীলাচ্ছলে একটু সাহায্য করিয়া আবার দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন। ভক্তের কাছে, অবোধ সন্তানের কাছে, মায়ের এ কি অদ্ভুত লুকোচুরি। হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া জগদম্বা কোথায় আত্ম-গোপন করিলেন? রামপ্রসাদের অন্তরে উঠে প্রবল ঝড়, —দুই নয়নে বহিতে থাকে অশ্রুধারা।

ভক্তের আকর্ষণে ব্রহ্মময়ীকে মর্তের ধুলায় নামিয়া আসিতে হইয়াছে। শ্যামামায়ের একি অপার করুণা! কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া নিজেই বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। ভক্ত সাধকের অন্তর্লোকে সেদিন তাই অতি সহজে পরম বন্ধনের যোগসূত্রটি গাঁথা হইয়া গেল। সাশ্রু নয়নে রামপ্রসাদ গাহিলেন—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ?
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া।
নয়ন থাকতে দেখলে না মন
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।

অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় রামপ্রসাদ যত অধীর হইয়া উঠেন, ছলনাময়ী মায়ের লীলা-রঙ্গও তেমনি চলে বিচিত্র ধারায়।

সেদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ এক অপরিচিতা নারী তাঁহার অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়ান। সুন্দর সুঠাম শ্যাম তনুতে দিব্য লাবণ্যশ্রী টলমল করিতেছে। সুমধুর স্বরে নারী অনুরোধ জানান, "বাবা, তোমার কণ্ঠের শ্যামাসংগীত যেন সুধামাখা। সেই সংগীত আমি শুনতে এলাম। আমায় কিছু শোনাও।"

প্রসাদের তখন বড় তাড়াতাড়ি। বেলা গড়াইয়া যাইতেছে, এখনি গঙ্গাস্নান সারিয়া না আসিলে মায়ের দ্বিপ্রহরের ভোগ নিবেদন আরো দেরি হইয়া যাইবে। মিনতি করিয়া কহিলেন, "মা, তুমি একটু অপেক্ষা করো। গঙ্গা থেকে এসেই তোমায় গান শোনাচ্ছি।"

স্নানের ঘাট থেকে ফিরিয়া আসিয়াই দেখেন, রমণী অন্তর্হিত। অনেক খুঁজিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

পূজামণ্ডপে মায়ের ভোগ আরতি হইয়া গেল, সাধক রামপ্রসাদ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। এবার তাঁহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল সেই পূর্বদৃষ্ট নারীমূর্তি। তাঁহার অঙ্গের জ্যোতির ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। এ যে মা অন্নপূর্ণা!

অনুযোগের সুরে মা কহিলেন, "বাবা প্রসাদ, তোমার মধুর গান শোন্‌বার লোভেই যে কাশী থেকে এসে তোমার দুয়ারে অতিথি হয়েছিলাম। তোমার নিবেদিত গান আমি তোমারই কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে তো শোনালে না, বাবা!"

একি রঙ্গ ছলনাময়ীর। ভক্ত রামপ্রসাদের অন্তর অব্যক্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। চঞ্চল চরণে বারাণসীর পথে তখনই রওনা হইলেন। জননী অন্নপূর্ণাকে যে তাঁহার প্রসাদী সংগীত শুনাইতেই হইবে।

পদব্রজে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সম্মুখেই পড়িল ত্রিবেণীর ঘাট। শ্রান্ত দেহে রামপ্রসাদ এখানে বিশ্রাম করিতে বসিলেন।

আবার বিশ্বজননীর সে সুধামাখা স্বর। কহিলেন, "রামপ্রসাদ, কাশীর পথে ছুটতে গিয়ে কেন নিজেকে এমন ক'রে শ্রান্ত ক্লান্ত করছো। বাবা, আমি কি শুধু কাশীতেই থাকি ? সারা সৃষ্টি পূর্ণ ক'রে কি আমি বিরাজ করছিনে ? আমি রয়েছি বিশেষ ক'রে আমার ভক্তেরই হৃদয়বেদীতে। তুমি আমার পরম ভক্ত। তোমার হৃদয়েই আমায় খোঁজো। কাশীতে আস্‌বার দরকার কি ? এই ত্রিবেণীর ঘাটে বসেই প্রাণভরে আমায় গান শোনাও।"

রামপ্রসাদ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত যে কয়খানি গান এ সময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হয়, তাহা এদেশের শাক্তসংগীতের পরম সম্পদ।

অতঃপর কাশীযাত্রায় নিরস্ত হইয়া রামপ্রসাদ হালিশহরে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিবেণী সঙ্গমে সেদিন যে তত্ত্ব রামপ্রসাদের মাতৃসংগীতে স্ফুরিত হইয়া উঠে, ভক্তজনের তাহা চিরস্মরণীয়—

আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে
গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে
আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ,
তীর্থ রাশি রাশি॥

রীদেবী এ সময়ে পরলোক গমন করিলেন। গর্ভধারিণীর এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় জাগতিক বন্ধন টুটিয়া গেল।

প্রসাদের পুত্র রামদুলাল বুঝিলেন, পিতাকে দিয়া সংসারের কাজ আর চলিবে না। তিনি তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

তীব্রতম বৈরাগ্য এ সময়ে দেখা গিয়াছে রামপ্রসাদের জীবনে। সর্ব বন্ধন ও বোধের ঊর্ধ্বে, সীমাহীন নভোলোকে জীবন-বিহঙ্গ তাঁহার কেবলি উড়িয়া চলিয়াছে। উগ্র তপস্যা ও বীরাচারী সাধনার মধ্যে তিনি মত্ত হইয়া গিয়াছেন।

মা জগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির দর্শন তাঁহার চাই, সর্ব মন প্রাণ এজন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তামসী অমাবস্যা পর পর আবর্তিত হইয়া আসে, গভীর নিশীথে পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে বসিয়া জপধ্যানে সাধক রামপ্রসাদ ডুবিয়া যান। মাতৃনামের ঘোর আরাবে বনভূমি উচ্চকিত হইয়া উঠে।

পঞ্চবটীর সিদ্ধাসনে তমিস্রাঘন এক অমানিশায় প্রসাদ জীবন-মরণ পণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। জগন্মাতা এইদিন আর তাঁহার বীর সাধককে এড়াইতে পারেন নাই।

ধ্যানমগ্ন সাধকের সম্মুখে জননী আবির্ভূতা হইয়াছেন। অমৃতজ্যোতির প্লাবন বহিয়া যাইতেছে চারিদিকে। রামপ্রসাদের সমস্ত সত্তা তাহাতে ডুবিয়া যাইতে চায়। মাতৃমূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সেদিন তিনি উপনীত হইলেন বোধাতীত চিন্ময় রাজ্যে।

পরদিন প্রভাতে তাঁহার অচেতন দেহে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল পঞ্চবটীতে তখন লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

বড় অপরূপ আনন্দময়ীর এ দর্শন। জ্যোতির্লোকের দুয়ার ইহা ভক্তের নয়নসমক্ষে খুলিয়া দিয়াছে। নূতনতর চেতনা, নূতনতর জীবনের আস্বাদে রামপ্রসাদ এবার পূর্ণ। নব নব ভক্তি সংগীতের ডালা সোৎসাহে তিনি সাজাইতে বসিলেন। কণ্ঠে তাঁহার মধু—রচনায় ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সমাহার। যে একবার তাঁহার শ্যামাসংগীত শুনে, অলৌকিক ভাবরসে আপ্লুত হইয়া যায়। সিদ্ধদেহে দিব্য কান্তি ও ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শক্তিমান্ কালীসাধক বলিয়া সর্বত্র তিনি খ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহাকে দর্শনের জন্য, তাঁহার সংগীত শোনার জন্য, অঙ্গনে ভিড়ের অন্ত নাই।

গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ অঞ্চলে আসিলেই মাঝে মাঝে সাধক কবির পঞ্চবটীতলে আসিয়া বসেন। শ্যামামায়ের নাম-গানে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। মায়ের পরম অনুগৃহীত ভক্ত এই রামপ্রসাদ। মহারাজ তাই তাঁহারই অনুগ্রহের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া থাকেন।

সুরসিক বলিয়া হালিশহরের আজু গোঁসাইর খুব নাম। তাঁহার উপস্থিতি মাঝে মাঝে রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণচন্দ্রের ধর্মালোচনার ফাঁকে ফাঁকে হাস্যরসের যোগান দেয়। আজু গোঁসাই বৈষ্ণব কবি, তাঁহার ভাল নাম অযোধ্যানাথ গোস্বামী। তেমন প্রতিভাবান্ না হইয়াও প্রসাদের সান্নিধ্যে থাকিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়া যান।

হালিশহর শাক্তপ্রধান স্থান। কিন্তু ইহার আশপাশে বৈষ্ণবদের বাসও তখন কম ছিল না। প্রায়ই এইসব স্থানীয় বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ চলিত। এই সময়ে আজু গোঁসাই হাস্যরসের ভিয়ান চড়াইতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কাছে উপস্থিত হইলেই আজু গোঁসাইয়ের ডাক পড়ে। প্রসাদ ভাবোন্মত্ত হইয়া নব নব সাধনসংগীত রচনা করেন, উচ্চকণ্ঠে সকলকে গাহিয়া শোনান। আর সঙ্গে সঙ্গে আজু গোঁসাই এক একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া বাঁধিয়া ফেলেন। রামপ্রসাদ হয়তো গাহিতেছেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

যেমন আজু গোঁসাইর অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি, তেমনি তাঁহার পরিহাস নিপুণতা। কৌতুকোজ্জ্বল গানের পদ রচনা করিয়া তখনই মুখে মুখে তিনি উত্তর দেন—

ডুবিস্‌নে মন ঘড়ি ঘড়ি,
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফের নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
হলে পরে জ্বরজ্বারি মন,
যেতে হবে যমের বাড়ি।

রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ গান, 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'কে পরিহাস করিয়া আজু গোঁসাই গাহিতেন—

এ সংসার রসের কুটি—
হেথা, খাই দাই আর মজা লুটি।

রঙ্গরস ও হাস্য বিদ্রূপের পালা শেষ হইলে আজু চলিয়া যাইতেন। মহারাজ কৃষ্ণ-

চন্দ্রের সম্মুখে অতঃপর উন্মোচিত হইত রামপ্রসাদের আর এক মূর্তি। রাত্রির গভীর অন্ধকারে আপন সিদ্ধাসনে ধীরে ধীরে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হইতেন। মায়ের আরাধনা ও সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়াদি একান্তে বসিয়া সম্পন্ন করিতেন।

মায়ের দর্শন রামপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু এ দর্শনে তাঁহার মন যে ভরে না। জগন্মাতার নিরন্তন সান্নিধ্যের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্রতী হন নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়ায়। পরম নিষ্ঠায় আগাইয়া চলে তাঁহার শক্তিসাধনা।

প্রথমে বাহ্যিক পঞ্চ-মকারযুক্ত বীরভাবের সাধনায়ই তিনি ব্রতী হন। আট দশ বৎসরকাল কৌলাচারের এই পন্থা অনুসরণের পর দিব্যাচারী সাধনার স্তরে ঘটে তাঁহার উত্তরণ।

বীরাচারী সাধনার কালে রামপ্রসাদ তাঁহার গুরুরূপে বরণ করেন আগমবাগীশ আখ্যাধারী সে সময়কার এক তন্ত্রাচার্যকে। শুনা যায়, ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধনধারায় এক সংবাহক।

শক্তিসাধনায় সিদ্ধির স্তরগুলি রামপ্রসাদ একটির পর একটি ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। এবার প্রয়োজন নূতন পথপ্রদর্শকের। এই নিগূঢ় সাধনার পথে জগজ্জননী কোন্ সদ্গুরুকে আজ পাঠাইবেন, কে জানে? প্রসাদ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

গুরু অচিরেই একদিন মিলিয়া গেল, ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই সেদিন ঘটিল তাঁহার আবির্ভাব। একদা শ্যামনগরের পথে গঙ্গার ধার দিয়া রামপ্রসাদ পথ চলিতেছেন। হঠাৎ দিব্যকান্তি দীর্ঘকায় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ। এই মহাপুরুষেরই নির্দেশে এসময়ে শব-সাধনায় তিনি সিদ্ধ হন, তারপর শক্তি-সাধনায় উচ্চতম স্তরে হন অধিষ্ঠিত। বর্তমানে ইছাপুর ও শ্যামনগরের মাঝখানে, বড়তির বিলের নিকটে ছিল এক পুরাতন শ্মশান। সেখানে অমাবস্যার নিশীথে শক্তিধর গুরু নিগূঢ়তম ক্রিয়াগুলি তাঁহাকে অনুষ্ঠান করান।

সিদ্ধ রামপ্রসাদের দেহে এসময়ে দিব্যকান্তি ফুটিয়া উঠে। নয়ন দুইটি ভাববিভোর, বেশী সময় মৌনীভাবে অতিবাহিত করেন। অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরতর স্তরে দিনের পর দিন ডুবিয়া চলিয়াছেন, ব্রহ্মময়ী শ্যামা-মা ওতপ্রোত হইতেছেন সর্ব অস্তিত্বে।

শক্তিধর সাধকের জীবনে এ সময়ে বহু অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। দূর দূরান্ত হইতে আর্ত, ভক্ত ও মুমুক্ষুর দল তাঁহার হালিশহরের অঙ্গনে জড়ো হইতে থাকে।

সেদিন পঞ্চবটীর সিদ্ধাসনে বসিয়া রামপ্রসাদ ব্যাকুলকণ্ঠে মাকে আহ্বান জানাইতেছেন। হঠাৎ চতুর্দিক আলোয় আলোময় হইয়া উঠিল, জগন্মাতা সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে, রামপ্রসাদ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায় কই? নিশীথে কোনো পুষ্প-উপচারই যে আর অবশিষ্ট নাই। যাহা কিছু ছিল পূজা-অনুষ্ঠান শেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। অথচ মায়ের পায়ে দু'টি ফুল যে না দিলেই নয়।

কথিত আছে, সিদ্ধপুরুষের এ আকুলতা ও ইচ্ছাশক্তি সেদিন এক অঘটন ঘটাইয়া দেয়। পঞ্চবটীর পাশেই আছে একটি গাব গাছ। রামপ্রসাদ ইহারই নিচে দিয়া ফুলের

সন্ধানে যাইতেছেন, হঠাই দেখিলেন এক অলৌকিক কাণ্ড। এই গাব গাছটির শাখায় ফুটিয়া রহিয়াছে মায়ের প্রিয় কয়েকটি রক্তজবা।

আর এক অমাবস্যার রাত্রির কথা। প্রসাদ মায়ের আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন। এসময়ে হালিশহর অঞ্চলে প্রচণ্ড এক ঝড় বহিয়া যায়। এই ঝড়-বাদলের তাণ্ডবে গঙ্গার দুই তীরের অধিকাংশ গৃহ ও বৃক্ষাদি বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, মাতৃধ্যানে বিভোর রামপ্রসাদের পঞ্চবটী ও গৃহ চত্বরে এ ঝড়ের বেগ সে সময়ে একটুও বুঝা যায় নাই। এক ফোঁটা বৃষ্টিও সেখানে পড়ে নাই। পরের দিন ভোরবেলায় তাঁহার বাসভবন ও বাগান সম্পূর্ণরূপে অক্ষত দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যায়।

মাতৃসংগীতের সঞ্জীবনী শক্তিতে, নিজের আশীর্বাদ ও করস্পর্শে রামপ্রসাদ যে কত শুষ্ক জীবনে ফুল ফুটাইয়া গিয়াছেন, কত মানুষের মুক্তির দুয়ার উন্মোচিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সিদ্ধ সাধকের দৃষ্টির কাছে ভেদবুদ্ধির গণ্ডী এখন আর নাই। এক অখণ্ড বোধের রাজ্যে তিনি উপনীত। শ্যামা ও শ্যামের সমন্বয়ের তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া রামপ্রসাদ তাই গাহিতেছেন—

মন, ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণ করিলাম কত খোঁজ-তালাস।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রাম-রূপে ধর ধনু, কালী রূপে করে অসি॥

সর্ব ভেদ ও দ্বন্দ্বের অতীত এ পরম দর্শনের তত্ত্ব প্রসাদের আরও দুই একটি প্রসিদ্ধ সংগীতে রহিয়াছে। পরমানন্দে সেখানে তিনি গাহিয়াছেন, 'কালী হলি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে।'

'জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়'—এই সংগীতেও অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামপ্রসাদের সাধনলব্ধ সংগীতের এই অখণ্ড পরম বোধ বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মজগৎকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছে, উত্তরকালে সমন্বয় আদর্শের প্রচার সম্ভব করিয়াছে।

সাধনজীবনের পরবর্তী স্তরে, এক অখণ্ড চৈতন্যের রসে রামপ্রসাদ নিমজ্জিত হইয়া যান, ধীরে ধীরে আপনাকে তিনি হারাইয়া ফেলেন নিঃসীম পারাবারে।

তাঁহার এই সময়কার সংগীতগুলি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদতত্ত্বের বর্ণনায় ভরপুর। 'তারা আমার নিরাকার,' 'এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি' প্রভৃতি মনোহর সংগীতে তাঁহার চরম অনুভূতির পরিচয় মিলে।

প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা-মাকে বাঁধিয়া ফেলেন ভক্তির ডোরে। তারপর তান্ত্রিক গুরুর উপদিষ্ট সাধনার মধ্য দিয়া বীরভাবের অধ্যাত্মস্রোত তাঁহার জীবনে প্রবাহিত হয়। সর্বশেষে আসে দিব্যভাব আর কৌলসাধনার চরম সাফল্য।

শেষ জীবনে কিন্তু রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম-সত্তায় নূতন এক রূপান্তর দেখা দেয়। এ-সময়ে তিনি হইয়া পড়েন জগন্মাতার এক অবোধ শিশু। চিন্ময় জননীর সাথে সর্বসত্তা তাঁ

জড়াইয়া গিয়াছে। ভক্তির ভাবে তিনি সদা বিভোর। বালকবৎ এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মুখে শুনা যায় শুধু শ্যামামায়ের নাম। এ নামামৃতের প্রভাবে তিনি সমসাময়িক এবং উত্তরকালের শক্তিসাধকদের জীবনে অফুরন্ত রসের প্রস্রবণ যোগাইয়া যান। রামপ্রসাদের এই সময়কার গানগুলি মা ও ছেলের নিবিড় অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই তাঁহাকে গাহিতে শোনা যায়—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি।

এবার তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। মায়ের ইঙ্গিতে, মায়ের নাম মুখে করিয়া মায়েরই ভাব বুকে বাঁধিয়া তাঁহাকে চলিতে হয়। কণ্ঠে তাঁহার ধ্বনিত হয়—'ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী।

এ সময়কার সাধনজীবনে রামপ্রসাদ শুদ্ধাভক্তির এক রসভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াছেন। শক্তি ও জ্ঞানমার্গের পথ দুর্গম নয়, ইহা যে মহাশক্তির চরণে ভক্তহৃদয়ের রক্ত-জবা অর্পণেরই পথ। প্রসাদের ভাবময়তা, তাঁহার ভক্তির দাক্ষিণ্য ভক্ত সাধারণের জন্য এই সহজ রাজপথটি সেদিন উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মাতৃনামের চারণ গাহেন—

প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কি গুণ বল না।

আবার কখনো বা ভক্তিবাদের মূল কথাটি উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া রস ও রসিকের মাধুর্য-আস্বাদনের তত্ত্বটি জানাইয়া দেন—

ওরে, সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্বাণে কি আছে ফল।
জলেতে মিশায় জল ॥
ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয়।
মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥

সব কিছু তত্ত্ববিশ্লেষণ, আর বিচার বিতর্কের অবসানের দাবি জানাইয়া ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহার এক অবিস্মরণীয় সংগীতে ভাবময়ী মায়ের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন—

মন কি করে তত্ত্ব তারে, ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে?

শক্তি সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ প্রায় আশী বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। ইহার পর আসে তাঁহার জীবনলীলার শেষ অঙ্ক।

বহুদিন আগের কথা। সাধক-জীবনের মধ্যযুগে এক সময়ে মায়ের কাছে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছিলেন, 'প্রাণ যাবার বেলা এই কোরো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে'। জগজ্জননী তাঁহার প্রিয় পুত্রের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

শেষের দিনটির কথা রামপ্রসাদ বুঝিতে পারেন। তাই জানাইয়া দেন— এবার তাঁহার নরদেহ ত্যাগ করিবার পালা। দাবানলের মত এ সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গঙ্গার

ওঠে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। পবিত্র গঙ্গাবারিতে আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া সানন্দে মাতৃনাম গাহিতে গাহিতে সাধক করেন দেহরক্ষা। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু বাহির্গত হয়।

'আমায় দাও মা তবিলদারী' বলিয়া প্রসাদ রচনা করেন তাঁহার প্রথম প্রার্থনা সংগীত। ভক্তের সে প্রার্থনা ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন, আর এই তহবিলের বিপুল ঐশ্বর্য ভক্ত সাধক অকৃপণ হস্তে চারিদিকে বিলাইয়া দিয়া যান। সর্বোপরি, শক্তি-সাধনার ঊষর পথকে তিনি সিঞ্চিত করেন কালীনামের অমৃতধারায়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। দীর্ঘদিনের সুষুপ্তি আর জড়তা কাটাইয়া জাতি সবেমাত্র জাগিয়াছে—ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে ছড়াইয়াছে মুক্তির প্রাণধারা। ভারতীয় জীবন-নির্ঝরের ঘটিয়াছে সেদিন স্বপ্নভঙ্গ।

বহু বিশিষ্ট সাধক ও মনীষী সে সময়ে এদেশে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া দিকে দিকে গড়িয়া উঠে নূতন প্রাণ-তরঙ্গ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ছিলেন এই কীর্তিমানদেরই অন্যতম। শক্তিধর আচার্যরূপে, এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ভারত ধর্মের উজ্জীবনের জন্য শুরু হয় তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াস। স্বামী বিবেকানন্দেরও অনেক আগে এই শক্তিধর সন্ন্যাসী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন নবতর চেতনায়।

ওজস্বিনী বাগ্মিতা, অধ্যাত্মশক্তি ও সংগঠনের বলে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সারা উত্তর ভারত আলোড়িত করিয়া তোলেন। সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে ত্যাগ তিতিক্ষা তিনি বরণ করেন তাহার পরিমাপ আজো করা সম্ভব হয় নাই।

বাংলা ও হিন্দী ভাষায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ধর্মবক্তা। শাস্ত্রবিদ্ হিসাবেও প্রতিষ্ঠা তাঁহার ছিল অসামান্য। তাঁহার দর্শন ও ভাষণ অগণিত মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিত।

স্বামীজীর শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতের ধর্মান্দোলনে এই সময়ে আত্মনিয়োগ করেন আত্মানন্দ পরমহংসজী, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল প্রভৃতি ধর্মনেতা।

প্রায় পাঁচ শতাধিক আর্যসভা, হরিসভা শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রেরণায় গড়িয়া উঠে। জ্ঞান ও ভক্তিবাদের প্রচারে ধর্মসংগীতের জাদু স্পর্শে সমগ্র দেশ তিনি মাতাইয়া তোলেন, সহস্র সহস্র লোক ধন্য হয় তাঁহার অনুপ্রেরণায়।

সিদ্ধাবধূত বাবা-দয়ালদাসজীর আশিস্ কোন্ শুভ মুহূর্তে একদিন ঝরিয়া পড়ে কৃষ্ণানন্দের উপর, অধ্যাত্মসাধনার বীজটি তাঁহার জীবনে রোপিত হয়। তারপর কর্মময়, ভাবময় সাধনার পথ বাহিয়া উত্তরকালে এ জীবন সার্থক হইয়া উঠে। গুরুকৃপার কল্যাণধারাকে দেশের দিকে দিকে তিনি ছড়াইয়া দেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দের জন্মস্থান। এই গ্রামে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবির্ভূত হন। প্রবীণ চিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র সেনের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম ভবসুন্দরী। বালককালে তাঁহাকে ডাকা হইত কৃষ্ণপ্রসন্ন নামে। তাঁহার এ সময়কার জীবনে প্রতিভার ছাপ তেমন কিছু দেখা যায় নাই। আঠার বৎসর অবধি পড়াশুনা করার পর বাধ্য হইয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। সংসারে তখন দারুণ অভাব অনটন চলিতেছে, তাড়াতাড়ি তাই চাকুরী না নিয়া উপায় রহিল না।

তরুণ বয়স হইতেই কৃষ্ণপ্রসন্নের মর্মমূলে রহিয়াছে এক অজানা লোকের আকর্ষণ। এ আকর্ষণ তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

জীবনের অন্তস্তলে কোন্ এক ফল্গুধারা বহিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহারই খানিকটা উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। এ বয়সেই বহু অধ্যাত্ম রসের কবিতা তিনি রচনা করিয়া ফেলেন, সঙ্গী-সাথীদের কাছে হইয়া উঠেন বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বস্তু।

সেদিন কৃষ্ণপ্রসন্ন একটি নৌকা নিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। সঙ্গে দুই-তিনটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিগন্তের দিকে চাহিতেই মন উধাও হইয়া গেল অনন্তের পানে। মহামায়ার অলৌকিক শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে চৈতন্যের এক অতল গভীরে তিনি তলাইয়া গেলেন, কোনো বাহ্যজ্ঞান রহিল না। এক দিব্য অনুভূতিতে হৃদয় তাঁহার পূর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন বলিতেন, উত্তর জীবনের আত্মিক পাথেয়রূপে সেদিনকার এ অনুভূতি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

গৃহে অর্থাভাব। পড়াশুনার খরচ চালানোর কোনো উপায় নাই। পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনই বা কি করিয়া চলিবে? বহু ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণপ্রসন্ন জামালপুরে রেল-অফিসে এক চাকুরী গ্রহণ করিলেন।

অফিসের কাজকর্ম শেষ হইলেই বাসায় ফিরিয়া আসেন। তারপর চলে বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রচর্চা। যে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা তরুণ হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। ভগবৎ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে উদগ্র হইয়া উঠে।

শহরে কোনো ভাল সাধু-সন্ন্যাসী আসিলেই কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে ছুটিয়া যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাছে গিয়া বসিয়া থাকেন, সোৎসাহে সেবাযত্ন করেন।

অন্তরে গুমরিয়া উঠিতেছে মুক্তির দুর্নিবার ইচ্ছা। জনবিরল গঙ্গাসৈকতে যখনই তিনি উপস্থিত হন, তখনই কি জানি কেন মর্মতল হইতে জাগিয়া উঠে এক অস্ফুট কান্না, অব্যক্ত বেদনায় অধীর হইয়া পড়েন। কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে পরম পথের বার্তা?

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। মুঙ্গেরের গঙ্গাতটে সেদিন সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। শত শত গৈরিকধারী দণ্ডী সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রী। শহরের উপকণ্ঠে দুই-একদিন তাঁহারা বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। কষ্টহারিণী ঘাটে বিশিষ্ট সাধু-সন্ন্যাসীর এক জমায়েৎ বসিয়াছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রায়ই এখানে বসিয়া থকেন, ভক্তিভরে করেন মহাপুরুষদের সেবা-যত্ন। পুণ্যসঙ্গ পাইয়া তাঁহার মহা আনন্দ।

সেদিন গঙ্গার ঘাটের কোণে হঠাৎ এক জটাজুটধারী দিব্যকান্তি সাধুকে দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। খোঁজ নিয়া জানিলেন, ইনি এক উচ্চকোটির সাধু—পরমহংস। সম্মুখে গিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অনেক কিছু কথাবার্তাও হইল। কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর সন্ন্যাসীকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহার আবাসে গিয়া কৃপা করিয়া একদিন ভোগ চড়াইতে হইবে।

পরমহংসজী অনুরোধ শুনিলেন বটে কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না। কৃষ্ণপ্রসন্ন ছাড়িবার পাত্র নন, পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ হাসিয়া কহিলেন, "বাচ্চা, নদী সাগরমে মিল্‌তি হ্যায়, লেকিন সাগর কোভি নদীমে আ কর নেহী মিল্‌তি হ্যায়"—অর্থাৎ, বাবা স্বভাবধর্ম অনুসারে নদীই সাগরে গিয়ে পড়ে। সাগর কিন্তু কখনো উল্টো পথ বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে আসে না, সে থাকে নিজেকে নিয়ে অপারসন্তোষে।

কৃষ্ণপ্রসন্নকে হটানো বড় সহজ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি জবাব দিলেন, "মহারাজ, পশ্চিম দেশে হয় তো এ নিয়ম খাটে, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অন্য রকম ব্যাপার। সাগরসঙ্গমে গিয়ে দেখতে পাবেন, সাগরই নিজের গরজে তার জোয়ারের জল নদীর বুকে এনে পৌঁছে দেয়।"

চমৎকার উত্তর এ প্রতিভাদীপ্ত যুবকের। চোখে মুখে মুক্তিকামী সাধকের ছাপ। পরমহংসজী খুশী হইয়া পড়িলেন। এবার আর তাঁহার আবাসে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণে আপত্তি দেখা গেল না। এই তরুণকে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেলেন।

কৃষ্ণপ্রসন্নের জীবন-নদীতে সাগরের জল কিন্তু সত্যই এবার আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কষ্টহারিণী ঘাটেই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি সৎগুরুর সাক্ষাৎ পান।

সাধুদের নানা জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন যোগী দয়ালদাস বাবার দর্শন পাইলেন। মহাত্মার যোগবিভূতির খ্যাতি তখন চারিদিকে। দিনের বেলায় তাঁহার কাছে লোকের ভিড়ে আগাইবার উপায় নাই। একদিন তাই গভীর রাত্রে নিভৃতে কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার আসনের সামনে আসিয়া দাঁড়ান।

সাশ্রুনয়নে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়া কহেন, "বাবা, ঈশ্বরলাভ ছাড়া জীবনে আমার আর কোনো কাম্য নেই। এ অধমকে কৃপা করুন, দেখিয়ে দিন অভীষ্ট সিদ্ধির পথ।"

ঋদ্ধি সিদ্ধি সব কিছু মহাপুরুষের করতলগত। নিগূঢ় যোগসাধনার তিনি এক সর্বজনমান্য পথপ্রদর্শক। অথচ কি সহজ তাঁহার আচরণ, আর কি মধুর তাঁহার বাণী! চরণতলে বসামাত্র মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্নের তাপিত হৃদয় শীতল হইয়া গেল।

মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "শোন বাচ্চা, তোমায় আমি একটা গল্প শোনাচ্ছি—এক ব্রাহ্মণ তাঁর যজমান বাড়ি থেকে ফিরছেন। ভারী ধনী যজমান। অনেক টাকাকড়ি তাঁকে প্রণামী দিয়েছে। সব কিছু তাঁর একটা পোঁটলায় বেঁধে নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। পথে রাত হলো অনেক। সামনে পড়লো এক অরণ্য পথ। রাত কাটাবার জন্য এক জীর্ণ পরিত্যক্ত কুটিরে তিনি আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর পোঁট্‌লাটি চুরি হয়ে গেল। জেগে উঠে ব্রাহ্মণ তো কেঁদে আকুল! চারিদিকে অনেক ছুটোছুটি ক'রেও তাঁর পোঁট্‌লার কোনো সন্ধান হলো না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি রাজার শরণ নিলেন। এবার কিন্তু কাজ হলো—কয়েকদিনের ভেতর চোর ধরা পড়লো। টাকা-কড়ি ফেরত পেয়ে ব্রাহ্মণের মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি।"

গল্প বলা শেষ হইল। দয়ালদাসজী কহিলেন, "আচ্ছা বাবা, বল তো, এ থেকে তুমি কি বুঝলে।"

মর্মার্থ বুঝিয়া নিতে কৃষ্ণপ্রসন্নের দেরি হইল না। কহিলেন, "বাবা, আমি আপনার বালক। বেশ, যেটুকু বুঝেছি, তা-ই বলবো। আপনার এই রূপক গল্পের ব্রাহ্মণটি হচ্ছে জীব। সাত্ত্বিক সংস্কারের নানা সম্পদ নিয়েই সে পৃথিবীতে আসে। পথিমধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপু তার সে সম্পদ হরণ ক'রে নেয়। এর পুনরুদ্ধার শুধু হ'তে পারে ঐ ব্রাহ্মণেরই মতো রাজার শরণ নিলে। অর্থাৎ, ভগবানের চরণে শরণাগতি না হওয়া অবধি হৃতসম্পদ ফিরে পাবার উপায় নেই।"

সাক্ষাৎমাত্রেই এ ভক্তিমান্ তরুণকে দয়ালদাসজী ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এবার এই উত্তরে খুশী হইয়া তাঁহাকে বার বার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

সেদিনকার এ বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকের জীবনে দয়ালদাসজী কৃপাভরে যে বীজ-মন্ত্র রোপণ করেন, উত্তরকালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট মহীরুহে। কৃষ্ণপ্রসন্ন হন শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

দীক্ষা দানের পরই দয়ালদাস-বাবা সহাস্যে শিষ্যকে কহিলেন, "ব্যাস যে কাজের জন্য আমার এখানে আসা, পরমাত্মার ইচ্ছায় তা পূর্ণ হলো। এবার আমায় ডেরা-ডাণ্ডা উঠাতে হবে। একটা কথা স্মরণ রেখো, বাবা। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কখনো ব্যস্ত হ'য়ো না। প্রয়োজন মতো এবং উপযুক্ত সময়ে আমার সাক্ষাৎ মিলবে।"

গুরুপ্রদর্শিত সাধনপথ এবার শ্রীকৃষ্ণানন্দের সম্মুখে প্রসারিত। সিদ্ধির সংকল্প বুকে নিয়া নির্ভীক সাধক ব্রতী হইলেন তপস্যায়।

অন্তরাত্মার গভীর হইতে মাঝে মাঝে আসে অস্ফুট আহ্বান—'শ্রীকৃষ্ণানন্দ, ওঠো, জাগো। ভারত-ধর্মকে ক'রে তোল উজ্জীবিত।' চমকিয়া উঠেন তিনি। এ কোন্ ঐশ ইঙ্গিত? কি ইহার তাৎপর্য।

এ কাজে চাই কঠোর সাধনার প্রস্তুতি। ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সাগর তাঁহাকে করিতে হইবে মন্থন। সনাতনধর্মের উজ্জীবন—ইহা যে তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু! এই উজ্জীবনের মধ্য দিয়া ভারতভূমিতে আসিবে লোকমঙ্গলের প্রবাহ। আগামী দিনের অদ্বিতীয় ধর্মবক্তা, আচার্য শ্রীকৃষ্ণানন্দের মনোলোকে এই চিন্তাধারা ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে।

চিরকুমার থাকার ব্রত কৃষ্ণানন্দ গ্রহণ করিলেন, ঝাঁপ দিলেন ধর্মান্দোলনের বন্যায়। প্রথমে মুঙ্গেরের জনজীবনে তাঁহার প্রবর্তিত আর্যসভা ও হরিসভার কর্ম প্রচণ্ড বেগে শুরু হয়, তারপর উহা ছড়াইয়া পড়ে সারা উত্তরভারতে।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের ধর্মপ্রচারের বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায় দিকে দিকে। অতুলনীয় বাগ্মিতা আর মনীষাদীপ্ত শাস্ত্রব্যাখ্যায় শিক্ষিতসমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে, আর তাঁহার প্রবর্তিত নামকীর্তনের ধারা দিগ্‌বিদিকে বিস্তারিত হয়। যেমন অফুরন্ত তাঁহার প্রাণশক্তি, তেমনি বিস্ময়কর তাঁহার সংগঠন-প্রতিভা আর্যধর্ম প্রবাহিণী সভা ও হরিসভাগুলি দেশবাসীর ক্লৈব্য ও ধর্মবুদ্ধির শিথিলতা দূর করিতে থাকে। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা, ধর্ম প্রচারক, জাগাইয়া তোলে প্রবল উদ্দীপনা।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। আচার্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ এখানে সোৎসাহে যোগদান করেন। এই বিশাল ধর্মক্ষেত্রের সাধু-জমায়েৎ তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব আত্ম-বিশ্বাস জাগাইয়া তোলে।

দয়ালদাসবাবাও এই ধর্মমেলায় উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিভরে যোগীবরের চরণতলে গিয়া উপবেশন করিলেন নানা নিগূঢ় সাধন নির্দেশ পাইয়া অন্তর তাঁহার নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। গুরুদেবের এ সময়কার ঋদ্ধি সিদ্ধির অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:

"শ্রীমদ্ গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া দেখি, তথায় সহস্রাধিক পরমহংস ও অবধূত বাস করিতেছেন। তাঁহারা অগ্নি ও মুদ্রা স্পর্শ করেন না, যাচ্ঞাও তাঁহাদের নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদের জন্য উত্তম ঘৃতপক্ব মিষ্টান্নাদি আয়োজন করিয়া দিতেন। তখন তথাকার দৈনিক ব্যয় অন্যূন দুইশত টাকা। যিনি কল্পতরুমূলে বাস করেন তাঁহার

আর অভাব কি ? গুরুদেব নানা উপদেশ দানের পর আমায় একটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন,—বৎস ! যদি অরূপের রূপ দেখতে চাও, দৃষ্টিকে অন্তঃবৃত্তিশীল করো ।”

শ্রীকৃষ্ণানন্দের বুকে জ্বলিয়া উঠে মুমুক্ষার আগুন, প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। বৈষয়িক পরিবেশ হয় অসহ্য। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা তাড়াতাড়ি স্থির করিয়া ফেলেন। তাই চাকুরী পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছেন। এবার উপনীত হন ভারতের প্রাণকেন্দ্র কাশীধামে, সেখানেই স্থাপিত হয় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কর্মক্ষেত্র।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের আর্যধর্ম-প্রচারণী সভার শক্তি ক্রমে বাড়িতে থাকে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে সভার ধর্মাচার্যরূপে তিনি নিযুক্ত করেন। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবও তাঁহাকে এ সময় যথেষ্ট সাহায্য করিতে থাকেন। বিশিষ্ট আচার্যদের শক্তি ও সহযোগিতাকে স্বামীজী কেন্দ্রীভূত করেন তাঁহার গঠনমূলক কর্মে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে শুরু করেন সনাতন ধর্মের সংঘবদ্ধ প্রচার। এদিক দিয়া আধুনিক ভারতে এক অনন্য সাধারণ কীর্তি তিনি রাখিয়া যান।

পিতা পূর্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাতাও কাশীধামে দেহরক্ষা করিলেন। জাগতিক বন্ধনগুলি এভাবে স্খলিত হইয়া গেল। এবার হইতে সারা দেহ-মন প্রাণ তিনি ধর্ম ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যায়, হরিকীর্তনের ভাববন্যায় সেদিন উত্তরভারত টলমল করিয়া উঠে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমাহার ঘটে এই সন্ন্যাসীর জীবনে, ধীরে ধীরে জনগণের হৃদয় তিনি জয় করিয়া নেন।

দেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় তখনো ঘটে নাই। শিক্ষিত ভারতীয়দের জীবনে বহিতেছে ধর্মবিমুখতার স্রোত। এই স্রোতেরই বিরুদ্ধে কৃষ্ণানন্দ দাঁড়ান একক শক্তিতে, ধ্বনিত করেন ভারতাত্মার মহাবাণী। তাঁহার উদ্দীপনা ও প্রেরণা ভারতের নব্য সমাজের বুকে নূতনতর চেতনা আনিয়া দিতে থাকে।

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ একবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরমহংসদেবের ভক্ত রাম দত্তমহাশয়ের সহিত তাঁহার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রধানত তাঁহারই সাহায্যে ঠাকুর সম্বন্ধে নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। কেশব সেনমহাশয় যেমন ইংরেজী শিক্ষিতসমাজে রামকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণানন্দও তাঁহার 'ধর্ম প্রচারক' পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতের সম্মুখে ঠাকুরের দিব্য জীবনের আলেখ্যটি তুলিয়া ধরেন।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি লিখেন—"যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল—মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন ? যেখানে পাগলের খেলা পাগলের হাট বাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে কোনো গ্রাহক যাউক না কেন সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল। ··

"এক-একদিন তিনি তাঁহার প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটে বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন। আর বলিতেন, 'মা ! আমাকে ভক্তি দেও, আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। কখন কখন তিনি প্রান্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত তুমিই ধন্য ! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ, তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ ।···

"মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে। অথচ ইঁহাকে লোকে কেন পরমহংস বলে বুঝিয়াছ? ইনি পরিচ্ছেদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস।

"যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত-চলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহাকে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা জাগ্রত হইয়া থাকে।...

"পরমহংস মহাশয়ের উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের রঙ ধরিয়াছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজীর এই বর্ণনা তাঁহার নিজেরই অসামান্য গুণ-গ্রাহিতা ও ভক্তিরসমধুর জীবনের পরিচয় বহন করে।

সহবাস-সম্মতি আইন নিয়া এক সময়ে সারা দেশে এক তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণানন্দ কলিকাতায় গড়ের মাঠের এক সভায় ইহার বিরুদ্ধে যে বাগ্‌বিভূতি প্রদর্শন করেন, আজও তাহা স্মরণীয় আছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া জনমণ্ডলী মহা উত্তেজিত হয়, লাটপ্রাসাদের দিকে ছুটিয়া যায়। 'আমরা আইন চাই না' বলিয়া বার বার দাবি ঘোষণা করিতে থাকে। ভারতীয় জনসাধারণের উপর স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব সেদিনকার সরকারকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। স্বামীজী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য গুরুর দর্শন ও উপদেশ লাভ। গঙ্গাসৈকতে দয়াল-দাস মহারাজ সমাসীন, উচ্চকোটির সাধুদের দ্বারা তিনি পরিবৃত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিভরে সদ্‌গুরুর চরণতলে উপবেশন করিলেন। গুরুকৃপার অমৃতরসে প্রাণকুম্ভটি পূর্ণ করিয়া আবার জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইতে চান।

একুশ বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত শ্রীকৃষ্ণানন্দ পালন করিয়াছেন। এইবার গঙ্গার পবিত্র তটে গুরুজী দয়ালদাস-বাবা শিষ্যের লৌকিক জীবনের রূপান্তর সাধন করিলেন। জাতিকুল ও শিখাসূত্র সমস্ত কিছু ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে দিলেন পূর্ণ সন্ন্যাস। এই সময়েই তাঁহার নামকরণ হয় শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

দায়লদাসজী মহারাজ ছিলেন এই মেলার এক দর্শনীয় বস্তু। গঙ্গার সৈকতে, নবনির্মিত এক আশ্রমে তিনি অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে কয়েকশত সন্ন্যাসী। পরমহংস ও অবধূত-শ্রেণীর মহাত্মাও বহু রহিয়াছেন।

অগণিত ভক্ত ও দর্শনার্থী এই মহাপুরুষের পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। দয়াল-দাস-বাবা নিজে কপর্দকহীন। কাহারো কাছে কোনো কিছু যাচ্ঞা করা, কাহারো গৃহে পদার্পণ করা তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ। অথচ প্রতিদিন কয়েক সহস্র সন্ন্যাসী, গৃহীভক্ত, অভ্যাগত ও কাঙাল আশ্রমে আশ্রয় পাইতেছে, ভোজনে তৃপ্ত হইতেছে। কোথা হইতে খাদ্য আসিতেছে, কে যোগাইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

শুধু আশ্রয় ও অন্নদানই নয়—ভজন, কীর্তন ও শাস্ত্রালাপে সারা মেলাক্ষেত্রে মহাপুরুষ আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন।

নিকটেই গঙ্গার বাঁকের উপর এক মহাত্মা অবস্থান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া

সাধকমহলে তাঁহার খুব খ্যাতি। দয়ালদাসজীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দকে তিনি মহাত্মার কাছে আশীর্বাদ নিতে পাঠাইলেন।

শিবকল্প সাধককে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দের আনন্দের সীমা নাই। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বাবা, আপনার উপদেশ দিয়ে আজ আমায় কৃতার্থ করুন।"

মহাত্মা সস্নেহে আশীর্বাদ জানাইলেন। শান্তস্বরে কহিলেন, "বাচ্চা, লোকে ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলে বস্তু দেখা যায়। কিন্তু এ তাদের ভ্রম। মানুষ যখন মায়ের গর্ভে থাকে, দুই চক্ষু নিমীলিত থাকে। 'বস্তু' অর্থাৎ শাশ্বত পুরুষের সহিত দেখা যায় তখনই। যেদিন থেকে দুই চোখ মেলে সে চায়, সেদিন থেকে দৃষ্টিতে কেবলই পড়ে 'অবস্তু' অর্থাৎ মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চ। যে 'বস্তু' এর আগে দেখা যাচ্ছিল, তার সন্ধান আর তখন পাওয়া যায় না। তাই বলি—বৎস, গুরুর উপদেশ পেয়েছ, এবার চক্ষু মুদিত করো—সমাধিস্থ হও, তবেই প্রকৃত বস্তুর দর্শন পাবে।"

আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া স্বামীজী কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন।

অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রচার ও লোকোদ্ধার কার্যে আত্মনিয়োগ করার অনুমতি গুরুদেব আগেই শ্রীকৃষ্ণানন্দকে দিয়াছেন। এবার তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক এখন হইতে তাঁহার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে, সাধন লাভ করিয়া ধন্য হয়।

আশ্রিতেরা আসে নানা দেশ-দেশান্তর হইতে। ইহাদের অনেকেরই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী আজো লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে।

বর্ধমানের মহড়া গ্রামের সৌদামিনী দেবী বড় দুর্ভাগিনী। স্বামী আগেই লোকান্তরে গিয়াছেন। এবার পালিত পুত্রটিও হঠাৎ মারা গেল। মহিলাটি শোকে মুষড়িয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনে আসিল তীব্র সংসার-বিতৃষ্ণা।

কিন্তু কোথায় মুক্তির পথ, কোথায় পথপ্রদর্শক গুরু? ব্যাকুল হইয়া বৈদ্যনাথধামে আসিয়া তিনি 'হত্যা' দেন। এখানে প্রত্যাদেশ মিলে—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের উপদেশে তাঁহার ইষ্টলাভ হইবে। জাগ্রত বিগ্রহ বাবা-বৈদ্যনাথ তাঁহার ভবিষ্যৎ গুরুর মূর্তি'টিও চিনাইয়া দিলেন। এ মূর্তি'র চারিদিকে জ্বলিতে দেখা গেল আগুনের শিখা।

এই মহিলাটি শ্রীকৃষ্ণানন্দকে জানেন না, কখনো তাঁহার নামও শুনেন নাই। নানা স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া কাশীধামে তাঁহার সন্ধানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তখন হরিদ্বার, জলন্ধর ও কাংড়া অঞ্চল পরিক্রমা করিতেছেন। মহিলাটি তাঁহার উদ্দেশে জ্বালা-মুখী অবধিও ছুটিয়া যান। কিন্তু একি দুর্ভাগ্য তাঁহার? কোথাও তো চিহ্নিত গুরুর সন্ধান মিলিতেছে না!

এসময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়া মহিলা ভক্তটি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বড় বিস্ময়কর—

"মায়ের পীঠস্থান দর্শন করিয়া একদিন কাঁদিতেছি ও ভাবিতেছি, তবে কি প্রত্যাদেশ মিথ্যা? তখনই দেখিলাম, শুভ্র শ্মশ্রু ও শুভ্র কেশধারী দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষ বলিতেছেন, 'বাছা, তুমি চিন্তা ক'রো না, এইখানেই তাঁকে পাবে।' আমার চমক লাগিয়া গেল, কিন্তু তাঁহাকে আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

"সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমি বাসায় শুইয়া আছি, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে

একটি নানালঙ্কারে ভূষিতা পরমাসুন্দরী কুমারী আমায় চেতন করাইয়া জ্বালাজীর মন্দিরের দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তাঁহার হাস্যময়ী মূর্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। ভাবিলাম, এ কোন্ দেবীমূর্তি? এরূপ মূর্তি কোনো তীর্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

"আমি ধীরে ধীরে মায়ের মন্দিরে গেলাম। গিয়া দেখি চারিদিকে জ্বালামালা জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন শ্রীমান্ সাধু চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় ভক্তি হইল।

"তাঁহার ধ্যান ভাঙিতে একটু বিলম্ব দেখিলাম। এই অবকাশে আমারও কি জানি কেন বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিল। অমনি কে যেন আমাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল —ওরে, এই তো!

"যেইমাত্র সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল অমনি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার নামই কি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী? তিনি কহিলেন—হ্যাঁ।

"তিনি দয়া করিয়া একটি শিবালয়ের পার্শ্বে, একান্ত স্থানে, আমাকে সাধনমার্গের উপদেশ করিলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। তখন আমার মনে হইল যে, আমি, বৈদ্যনাথে ভবিষ্যৎ গুরুর চারিপার্শ্বে যে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এই জ্বালামুখীরই প্রজ্বলিত জ্বালামালা।"

কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণানন্দ কাশীর যোগাশ্রমে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহের নাম দেওয়া হয় যোগেশ্বরী। আশ্রমের গুহায় তাঁহার যোগসাধনা ও ধ্যান জপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

মা-যোগেশ্বরী যেমন জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকেন তেমনি এইসময়ে স্বামীজীর মধ্যেও নানা অলৌকিক যোগবিভূতির প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। বহুতর কৃপাপ্রার্থী তাঁহার কৃপায় সাধন লাভ করেন। ব্যাধির কবল হইতেও অনেকে মুক্ত হন।

স্বামীজীর যোগবিভূতির খ্যাতি তখন চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। সে-বার হাতোয়ার মহারাজার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা স্বামীজীর কাছে আসিয়া ধর্না দিলেন। রোগীর ডাক্তারটিও সঙ্গে রহিয়াছেন।

স্বামীজী কহিলেন, "আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার নিজের তো কোনো ক্ষমতা নেই যা করবার করেন মা-যোগেশ্বরী। তাঁকে জিজ্ঞেস না ক'রে তো আমি কিছু বলতে পারিনে।"

ডাক্তার ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু স্বামীজী এ রোগীর পক্ষাঘাতের মূর্ছা যদি আর দু'একবার হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই একে বাঁচানো যাবে না। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করুন।"

"কি করবো বাবা, সবই মায়ের হাতে। তাঁকে ব'লে দেখি। তোমরা কাল একবার এসো।"

সন্ধ্যারতির পর মায়েপোয়ে কথাবার্তা হইল। চিন্ময়ী দেবীবিগ্রহ কহিলেন, "এ তুই আবার কি সব কচ্ছিস? এ রোগী তো বাঁচবে না। প্রাক্তন শেষ হয়ে এসেছে।"

"মা, তুমি দয়া করলে কেন বাঁচবে না? তাছাড়া, ওরা যে বড় বিপন্ন হয়ে, বড় ভরসা ক'রে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। একটা কিছু ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে।"

"বেশ কথা, ওরা তো পক্ষাঘাতের জন্যই তোর শরণ নিয়েছে। এ দুঃসাধ্য। তবু এ রোগ থেকে রোগী এবার বেঁচে যাবে। কিন্তু জীবনান্ত হবে আর এক রোগে।"

ঘটিলও তাহাই। প্রধান ও দক্ষ ডাক্তারদের বিস্মিত করিয়া মরণোন্মুখ পক্ষাঘাত-রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে, আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সামান্য জ্বরে ভুগিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

নিজের কোনো পীড়ার বেলায় কিন্তু দেখা যাইত স্বামীজীর আর এক মনোভাব। সেস্থলে তিনি পরম উদাসীন। মায়ের দেওয়া আনন্দের সঙ্গে তাঁহার দেওয়া দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতও নির্বিকার চিত্তে সদাই তিনি বরণ করিয়া নেন।

সে-বার শরীর তাঁহার খুব অসুস্থ। একটি ভক্ত বড় ব্যাকুল হইয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তটি কহিলেন, "স্বামীজী, আপনার মতো মহাপুরুষেরও আবার অসুখ। মায়ের কত কৃপা আপনার ওপর ; তবে এত দেহকষ্ট আপনার হবে কেন ?"

রোগশয্যায় উঠিয়া বসিয়া স্বামীজী কহিলেন, "সে কি গো, এ তোমাদের কেমন আব্‌দারের কথা। শরীর অসুস্থ হলেই কি বুঝতে হবে মায়ের অ-কৃপা হয়েছে। দেহ ধারণ করলেই তার জন্য রোগ, শোক, দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাছাড়া, সব দুঃখ মোচনের জন্যই কি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে আছে ? যা আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাই যে তাঁর কাছে চাইতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিই হচ্ছে মা'র গুপ্ত ভাণ্ডারের নিধি, সেই মহাবস্তুই তাঁর কাছে চেয়ে নিতে হয়। মনে রেখো—টাকাকড়ি, ধানচা'ল যোগাড় ক'রে দেওয়া মা-যোগেশ্বরীর কাজ নয়, তাঁর কাজ হচ্ছে ত্যাগ, সেবাবুদ্ধি ভক্তি এসব এনে দেওয়া।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী আবার হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এ দেহের রোগ যতবারই সারাও না কেন, দেহের পতন তো একদিন হবেই। তখন কি বলবে,—এ মায়ের অ-কৃপা ?"

ভক্তটির মন এতক্ষণে ভরিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন মনে তিনি উঠিয়া গেলেন।

দয়ালদাস-বাবা এই সময়ে একবার সদলে কাশীধামে আসেন। তিনি যোগাশ্রমে প্রবেশ করামাত্র মা-যোগেশ্বরীর জাগ্রত স্বরূপটি উপলব্ধি করেন। শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ হর্ষভরে বলিয়া উঠেন, "মাঈ তো ইঁহা প্রকট হুই হ্যায়।"

গুরুদেবের আশিসধারা এসময়ে কৃষ্ণানন্দের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হয়। দয়ালদাসজীর সহিত সর্বদাই কয়েক শত শিষ্য ও অনুরাগী সন্ন্যাসী ভ্রমণরত থাকেন। ইঁহারা সবাই স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দকে দয়ালদাস-বাবার এক বিশিষ্ট ও অনুগৃহীত শিষ্য হিসাবে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহার দর্শন পাইলেই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিতেন, "মেরে বড়া ভাই আগয়ে।"

দয়ালদাসজী সম্বন্ধে এই সময়কার একটি সুন্দর কাহিনী রহিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার নিজের ও শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দের সাধনতত্ত্ব ও উদার আদর্শবাদ কিছুটা বুঝা যাইবে।

সে-বার দয়ালদাস-বাবা কাশীতে আসিয়াছেন। বহু শিষ্য, ভক্ত ও বিশিষ্ট সাধকদের দ্বারা তিনি পরিবৃত। এমন সময়ে কাশীর পণ্ডিতসমাজের এক নেতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দয়ালদাসজীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনি কোন্ শ্রেণীর স্বামী ?"

বাবা স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "আমি দাস-স্বামী"

কথাটি শুনিয়া পণ্ডিতের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কহিলেন, "সে কি কথা মহারাজ! দাস-স্বামী বলে সন্ন্যাস আশ্রমে কোনো কিছু আছে ব'লে তো আমাদের জানা নেই!"

"তা'হলে শুনে রাখুন, প্রত্যেক সন্ন্যাসীই চিরদিন থাকেন দাস তাঁর নিজের গুরুদেবের কাছে, আর তিনি স্বামীরূপে বিরাজমান হন তাঁর শিষ্যদের সম্মুখে!"

পণ্ডিত আবার দয়ালদাসজীকে চাপিয়া ধরিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আপনি কোন্ মঠের অন্তর্ভুক্ত?

"গগন মঠের।"

চমকিয়া উঠিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "এ আপনার বড় অদ্ভুত কথা। শৃঙ্গেরী, যোশী প্রভৃতি মঠের নাম আমরা শুনেছি—গগনমঠের নাম তো কখনো শুনি নি!"

দয়ালদাসজীর অধরে দেখা দিল স্মিতহাস্য। বলিলেন, "ঐ সব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত? না, কেউ তাদের নূতন প্রবর্তন করেছেন?"

"কেন, এ সবই আচার্য শঙ্করের সৃষ্টি!"

"উত্তর। কিন্তু বলুন তো, আচার্য শঙ্কর ও তাঁর গুরু গোবিন্দপদস্বামী কোন্ মঠের। তাঁরা তো ছিলেন আমার মতোই গগন-মঠের সন্ন্যাসী। অখণ্ড, উদার আকাশের তলে আকাশবৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকা—তাই যে আমার গগন মঠ!"

এবার পণ্ডিতজী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, স্বামীজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়েন।

দয়ালদাসজীর সাধনপন্থায় ছিল যোগ, তন্ত্র ও জ্ঞানের এক অপরূপ সমন্বয়। এই পাঞ্জাবী মহাপুরুষের উত্তরসাধক শ্রীকৃষ্ণানন্দের জীবনেও এ সাধনবৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে।

দয়ালদাসজী আর বেশী দিন নরদেহে বাস করেন নাই। কিন্তু অপ্রকটের আগে শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

সন্ন্যাসের পর হইতেই দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণানন্দ অধ্যাত্মসাধনায় রত আছেন। শক্তিমান্ আচার্যরূপে ভারতের প্রতি তীর্থে ও নগরে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। বহু মুমুক্ষু তাঁহার কাছে সাধন-ভজনের নির্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। গুরু দয়ালদাসজীর এবার তাই প্রিয় শিষ্যকে পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করান।

বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র মহামায়ার লীলাখেলা। এ খেলায় তনয় শ্রীকৃষ্ণানন্দকে তিনি এক অদ্ভুত পরিণতির দিকে টানিয়া নেন।

স্বামীজীর কর্মবহুল জীবনের কোণে এবার কোথা হইতে ঘনাইয়া আসে এক কালো মেঘ। একদল দুরাত্মার ষড়যন্ত্রে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য হঠাৎ মহাবিপন্ন হইয়া পড়েন। সমগ্র উত্তর ভারতে তখন তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা একদল পরশ্রীকাতর মানুষের সহ্য হয় নাই। তাছাড়া, নিজে অব্রাহ্মণ হইয়া বহু ব্রাহ্মণকে তিনি দীক্ষা ও সাধন দিতেছেন, এজন্যও কিছু সংখ্যক গোঁড়া সনাতনী তাঁহার উপর মারমুখী হইয়া উঠে। বিরোধীদের হীন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলার ফলে স্বামীজীর জীবনে নামিয়া আসে চরম লাঞ্ছনা।

আচার্য, ধর্মবক্তা ও সংগঠকরূপে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ এতদিন ছিলেন বহুজনের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য। এবার মা-যোগেশ্বরী তাঁহার প্রিয় তনয়কে ফিরাইয়া নিতে চান আপন অঙ্কে। বহিরঙ্গ জীবনের উপর ছেদ টানিয়া দিয়া স্বামীজী তাই বুঝি পুরাপুরি-

ভাবে অন্তর্মুখীন হইয়া গেলেন। সম্মান আর লাঞ্ছনা, হাসি আর অশ্রু এবার তাঁহার কাছে সব একাকার! বহিরঙ্গ জীবনের কর্মময় জীবনের আকর্ষণ আর কিছু নাই। বাহিরের খেলা ফেলিয়া মায়ের বালক এবার মায়ের কোলে ফিরিতে ব্যাকুল। স্বামীজীর এসময়কার রচিত সংগীতে এই মানসিকতাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কেন আর বারংবার ডাকিস তোরা ভাই,
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই'।
যায় যে বেলা, আর করবোনা খেলা,
বুঝি সাঙ্গ হ'লো, বঙ্গভূমির শ্রীরাস-লীলা।
এখন মা'র ছেলে মা'র কোলে বসে,
নাচি আর মা'র গুণ গাই।
আমি খেলিতে গেলে, তোরা দিস্ ঠেলে ফেলে
তাই মা ব'লেছে, কাজ কী বাছা ও-খেলা খেলে ?
আমি মা পেয়েছি মা'র হয়েছি,
আমাতে আর আমি নাই।

কর্ম-জ্ঞান-ও-ভক্তিময় জীবন এবার সার্থকতায় ভরপুর হইয়া গিয়াছে। নরদেহটি জীর্ণ নির্মোকের মতো খসিয়া পড়িতে চায়।

১৩০৯ সনের তেসরা আশ্বিন অমরলোকের পরম আহ্বান আসিয়া গেল। জীবন-যজ্ঞের পবিত্র আগুনে শেষ হবিটুকু নিঃশেষে অর্পণ করিয়া সাধক শ্রীকৃষ্ণনন্দ নরলোক ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

গঙ্গার বুকে সায়াহ্নের রক্তরাগ তখনো মিলাইয়া যায় নাই। দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে বাজিতেছে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা। এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে দেখা দিলেন এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী। সুন্দর সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহ। আননে অপার প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি, দুই চোখে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। আপন মনে তিনি পাদচারণা করিয়া চলিয়াছেন।

ঘাটের এক পাশে সাধক গদাধর ভাবতন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল। দিব্যকান্তি, আত্মভোলা কে এই তরুণ? সমাধিবান্ সাধকের লক্ষণ তাঁহার সারা অঙ্গে। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। তন্ত্র আর ভক্তিবাদের দেশ বাংলায় বেদান্তের এমন উত্তম অধিকারীও থাকিতে পারে? ইহা তো তাঁহার ধারণায় আসে নাই।

সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম'ায় তুম্‌কো বেদান্ত সিদ্ধি অওর নির্বিকল্প সমাধি দুঙ্গা! তুম্ লেওগে?"

জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী একি বলিতেছেন? মা-ভবতারিণীর ধ্যানে, তাঁহার চিন্ময় রূপে, গদাধরের অন্তর বাহির রহিয়াছে পূর্ণ। মাতৃসাধনা তাঁহার সারা অস্তিত্বে ওতপ্রোত। আনন্দময়ী মায়ের রূপ ধ্যানই যে তাঁহার জীবন। আজ তাহা হইবে একাকার! নিরাকারের দৌত্য নিয়া আসিয়াছেন কে এই নাগা সন্ন্যাসী?

মাতৃ-বিরহের আশঙ্কায় গদাধরের বুক কাঁপিয়া উঠে, আবার দুর্নিবার আকর্ষণেও টানিতে থাকেন এই মায়াবাদী তপস্বী।

সেদিনকার মোহময় সন্ধ্যায়, আলো আর আঁধারের সন্ধিক্ষণে, নিরাকারের দূত সাকারের বরপুত্রের কাছে আপন হস্তটি প্রসারিত করিয়া দেয়। এই সন্ন্যাসী দূতই ভারতবিখ্যাত মহাবৈদান্তিক—তোতাপুরী স্বামী।

ঐশ ইঙ্গিতেই ন্যাংটা মহারাজ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হন। এ আবির্ভাবের আলোকচ্ছটা তরুণ সাধক গদাধরের অধ্যাত্মজীবনে আনিয়া দেয় নূতনতর পথের সন্ধান, তাঁহার উত্তরণ ঘটায় শক্তিধর লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণরূপে।

সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহাকে এড়ানো আরো কঠিন। জন্ম-জন্মান্তরের কি এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে, কে জানে? উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গদাধর শুধু কহিলেন, "কি করবো না করবো, বাবু, কিছুই জানিনে। সব জানেন আমার মা। তাঁর আদেশ যদি পাই, তবেই আমি তোমার কথামতো কাজ করবো।"

মাতার আদেশ মিলিল। গদাধর বুঝিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেই সন্ন্যাসীর এই শুভাগমন।

মন্দিরের শ্যামা বিগ্রহই যে গদাধরের মা, আর এই মায়েরই আদেশের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন, প্রথমটায় পুরীজী বুঝিতে পারেন নাই। সব কথা শোনার পর অদ্বৈতবাদী সাধকের অধরে চকিত হাসি খেলিয়া গেল। মায়াময় বিশ্ব-প্রপঞ্চের পরপারে, ভাবাতীত

রাজ্যে এই বেদান্তীর সদা বিচরণ। মানবহৃদয়ের পরমধন, ভগবৎ প্রেমকেও যে তিনি মায়া জ্ঞানে বিশুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছেন। নির্বিকার সমাধির পথে করিয়াছেন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ। সাকার ধ্যান আর ইষ্টপূজা আজ তাই তাঁহার চোখে একেবারে অর্থহীন।

বালকস্বভাব মাতৃসাধক গদাধরের কথা শুনিয়া তোতাপুরী সেদিন হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই।

পঞ্চবটীতলে পুরীজী তাঁহার আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শুরু করিলেন। আজ পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ ও নিজ পিণ্ড প্রদান করিয়া সাধক গদাধর গ্রহণ করিবেন সন্ন্যাস। পুরীজীর নির্দেশমতোই সব কাজ সম্পন্ন হইল। যাহা কিছু নিয়া এতকাল গদাধর বাঁচিয়া ছিলেন —ভবতারিণীর প্রতি মমতা, ভক্তি, প্রেম সাধনার সমস্ত কিছু পুণ্যসঞ্চয়—সবই তিনি চিরতরে দিলেন বিসর্জন। বিরজা হোম সমাপ্তির পর তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ।

সর্বপাশমুক্ত সাধকের এবার সমাধির গভীরে নিমজ্জনের পালা।

উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বলিতেন, "দ্যাখ, সমুদ্রের তীরে যে সর্বদা বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে, মার কাছে সর্বদা থেকেও তখন মনে হত—অনন্ত ভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে নানা ভাবে, নানা রূপে দেখবো।" এবার তাঁহার সেই আনন্দরূপিণী ইষ্টদেবীকে রূপাতীত পর্যায়ে নিয়া যাইতে হইবে—নামরূপের সেখানে ঘটিবে প্রলয়। লাভ করিতে হইবে জ্ঞানমার্গের চরমতম উপলব্ধি। তাই গুরুর নির্দেশে তিনি আসনে গিয়া বসিলেন।

ইষ্টদেবীর চিন্ময়ী ভাবময়ী মূর্তি রামকৃষ্ণের ধ্যানের ধন, তাহার সারা সত্তায় তাহা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। নির্বিকার পরমাত্মধ্যানে এই মূর্তি তো সহজে বিলীন হইতে চাহে না। চেষ্টা বার বার তাঁহার বিফল হইল।

তোতা গর্জিয়া উঠিলেন, "কেঁও হোগা নহী!"—একখণ্ড ভগ্ন কাঁচখণ্ড নিয়া রামকৃষ্ণের ভ্রূর মধ্যস্থানে তিনি বিদ্ধ করিলেন। গভীরকণ্ঠে কহিলেন, "ব্যস্, এবার এখানে তোমার সারা মন, সারা চেতনা কেন্দ্রীভূত ক'রে নাও, পৌঁছে যাও চরম উপলব্ধির স্তরে।"

তখনকার অবস্থার কথা ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"জগদম্বার মূর্তি আগের মতো মনে উদয় হওয়া মাত্র, জ্ঞানকে অসি কল্পনা ক'রে ওটা মনে মনে দ্বিখণ্ড ক'রে ফেললাম। তখন আর মনে কোনো বিকল্প নেই; একেবারে হু-হু ক'রে সব নাম-রূপ রাজ্যের উপরে উঠে গেল। সমাধিতে আমি ডুবে গেলাম।"—(লীলাপ্রসঙ্গ)

শিষ্যের সমাধির পথে কোনো বিঘ্ন হয়, তোতা তাহা চান না। তাই রামকৃষ্ণের কুটিরের দ্বার তিনি তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পর পর তিন দিন কাটিয়া গেল। বিস্ময়বিমুগ্ধ গুরুদেব এবার দুয়ার খুলিলেন। দেখিলেন, শিষ্য তখনো সমাধিস্থ। নিজ আসনে জ্যোতির্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নিশ্চল, নিস্পন্দ—একেবারে চৈতন্য-বিহীন। সর্বসত্তা যেন নিবাত নিষ্কল দীপশিখার মত জ্বলিতেছে।

একি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কাণ্ড! নর্মদা নদীর তীরে চল্লিশ বৎসরের কঠোরতম তপস্যার পর তোতা পুরীজী যাহা লাভ করিয়াছেন, কোন্ ঐশী কৃপাবলে এই তরুণ সাধক এত সহজে তাহা লাভ করিলেন? বিস্ময় তাঁহার চরমে উঠে। কেবলই কহিতে থাকেন,

"ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া ! ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া !" শিষ্য রামকৃষ্ণের সেদিনকার কৃতিত্বে গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না।

জ্ঞানবাদী, সর্বপাশমুক্ত তোতাপুরীস্বামী এবার এই মহা অধিকারী শিষ্যের প্রেমে বাঁধা পড়িলেন। তীর্থ পরিক্রমার পথে কয়েকটি দিনের জন্য এখানে তিনি আসিয়াছিলেন। অতি সহজে চলিয়া যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না। আপন সান্নিধ্য দিয়া শিষ্যকে অদ্বৈত-বোধের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি তৎপর হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একাদিক্রমে প্রায় ছয়মাস কাল পুরীমহারাজ অবস্থান করেন আর দিনের পর দিন রামকৃষ্ণের উচ্চতম উপলব্ধিগুলি তাহাকে বিস্মিত করিতে থাকে।

রামকৃষ্ণের উপাস্য, তাঁহার ধ্যানের ধন—জগন্মাতা। মায়ের এই চিন্ময় মূর্তি তোতার জ্ঞানাগ্নির স্পর্শে নামরূপের বাহিরে চলিয়া যায়। আবার তোতাও কিন্তু নিজে রামকৃষ্ণের জাদুস্পর্শকে এড়াইতে পারেন নাই। নিরাকারের আকারকে, ব্রহ্মশক্তিকে, তিনি স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হন। মায়াতীতের মায়া-মোহাঞ্জন অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মবাদীর নয়নেও সেদিন লাগিয়া যায়।

নর্মদার ধারা এবার গঙ্গার স্রোতে আসিয়া মিশে—জ্ঞান আসিয়া ধারণ করে ভক্তি ও শক্তির লীলা চঞ্চলতাকে।

জগন্মাতার নামগান করা সাধক রামকৃষ্ণের নিত্যকার অভ্যাস। করতালি দিয়া নাম গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠেন। মায়াবাদী তোতাপুরীজীর চোখে এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত লাগে, প্রায়ই হাসি চাপা দায় হয়। সেদিন পরিহাস করিয়া শিষ্যকে বলেন, "ক্যা ! রোটি ঠুক্তে হো ?"

বালক-স্বভাব রামকৃষ্ণ খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠেন। বলেন, "শালা বলে কি। আমি প্রাণের টানে মা-ব্রহ্মময়ীর নাম করি, আর ও তা বুঝ্‌বেই চায় না !"

সুদূর নর্মদার তীর হইতে মা-ভবতারিণী তোতাপুরীকে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রিয়পুত্র গদাধরের সাধনসত্তায় বহিতেছে ভক্তি ও শক্তির ধারাস্রোত, এবার তাহাতে তোতার জ্ঞান-সাধনার প্রবাহ তিনি মিলাইয়া দিলেন। আবার মহামায়ার সর্বব্যাপিনী মায়াও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবনকে করিল প্রভাবিত। রামকৃষ্ণ আর তাঁর মায়ের কাছে আসিয়া তোতা বদ্‌লাইয়া গেলেন। শোনা যায়, শেষের দিকে রামকৃষ্ণের সুমধুর মাতৃসংগীত তিনি কান পাতিয়া শুনিতেন—আর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিত।

ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তির কথা নিয়া গুরু শিষ্যে প্রণয়-কলহ এ সময়ে হইত না। সেদিন তোতাপুরী তাঁহার ধুনির সম্মুখে বসিয়া আছেন। মন্দিরের এক পরিচালক হঠাৎ আসিয়া ধুনি হইতে কিছুটা কাঠ সরাইয়া নিল। পবিত্র হোমাগ্নির অমর্যাদায় তোতা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন।

এমন মহাজ্ঞানীর রোষ ! চিত্তচাঞ্চল্য ! কৌতুকোচ্ছল রামকৃষ্ণ উচ্চহাস্যে করতালি দিয়া কহিলেন, "তবেই দ্যাখো মহামায়ার দুর্বার মায়া-শক্তির কাছে কি তুমি হার মানো নি ?"

নাগা সন্ন্যাসী তোতার বজ্রসম দেহ কিন্তু বাংলার জলবায়ুতে ক্রমে ভাঙিয়া পড়ে, দুরন্ত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হন। ব্যাধি যেমন দুরারোগ্য, যন্ত্রণাও তেমনি দুঃসহ।

অবশেষে একদিন ভাবিলেন—কি কাজ এই ভঙ্গুর দেহের পরিচর্যায় ? কি-ই বা লাভ ইহার রক্ষণে আজই নদীজলে এ দেহ বিসর্জন দিবেন।

গঙ্গার মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া তোতা আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত। ব্যাপার ? ডুবিয়া মরিবার মতো জল তো নদীতে তিনি পাইতেছেন না। এপারে ওপারে হাঁটাহাঁটিই শুধু সার হইল। মহামায়ার মায়ায় সঙ্কল্প তাঁহার সেদিন টুটিয়া গেল। তোতা হার মানিলেন। রামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিলেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। রামকৃষ্ণের মা, মহামায়াকে মানিয়া নিতে হইল।

রামকৃষ্ণের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ করিয়া গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের এ অজ্ঞাত অখ্যাত পুরোহিত প্রবেশ করিলেন যুগাচার্যের ভূমিকায়। জড়বাদী সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে তখন সমকালীন ভারতে। এই তরঙ্গের মুখোমুখি আসিয়া রামকৃষ্ণ দাঁড়াইলেন। চৈতন্যময় জীবনের কথা, ব্রহ্মসাক্ষাতের কথা শুনিয়া এ যুগের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

কামারপুকুরের নগণ্য, নিরক্ষর এই ব্রাহ্মণতনয়ের বিবর্তনের কাহিনী বড় বিস্ময়কর—

রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জেলার দেরে গ্রামে। নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ তিনি। কুলদেবতা রঘুবীরের পূজা সমাপন না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। সত্যসন্ধ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। একবার কোনো এক মিথ্যা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে তিনি অস্বীকার করেন ফলে স্থানীয় জমিদারের সহিত তাঁহার সংঘাত বাধে। কিন্তু কোনো অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ধর্মপ্রাণ ক্ষুদিরামকে সেদিন তাঁহার সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করেন, কামারপুকুরের শান্ত পরিবেশে বাঁধেন নূতন কুটির।

অনেকদিন পরের কথা। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সেদিন গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছেন। দেহ বড় ক্লান্ত, তাই মাঠের কোণে এক গাছের নিচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইল।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন।—ইষ্টদেব রঘুনাথজী কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, একটি স্থান দেখাইয়া বলিতেছেন, "ওরে, ওখান থেকে আমায় নিয়ে চল। বাড়িতে নিয়ে সেবা পূজা কর্।"

ঘুম ভাঙিয়া গেল। ক্ষুদিরাম চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। নির্দিষ্ট স্থানটির কাছে গিয়া বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। একটি শালগ্রাম শিলা অর্ধপ্রোথিত রহিয়াছে, আর তাঁহার উপর ফণা বিস্তার করিয়া আছে এক বিষধর সর্প।

এই শিলা ভক্তিভরে গৃহে আনিয়া স্থাপন করিলেন। দেখা গেল, এটি রঘুবীর চক্র। ভক্তিমতী স্ত্রী চন্দ্রাদেবীও স্বামীর সহিত এই বিগ্রহের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন।

ইষ্ট সেবার ফল ফলিতে দেরি হয় নাই। ক্ষুদিরাম সেবার গয়ায় তীর্থ করিতে গিয়াছেন। সেখানে রাত্রে দেখিলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন।—জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রভু গদাধর রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট, সহাস্যে ক্ষুদিরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তিনি পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। পরে জানা গেল, ঠিক এই সময়ে কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীরও ঘটে এক অদ্ভুত দৈব আদেশ।

১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। শুভ্র মুহূর্তে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরামের গৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল এক সুদর্শন শিশু। প্রভু গদাধরেব বরে পুত্রের জন্ম। তাই আদর করিয়া তাহার নাম রাখা হইল—গদাধর।

কামারপুকুরে স্বেচ্ছাবিহারী গদাধরের বাল্যজীবন কাটে পরম আনন্দে। ধর্মযাত্রা বা শিবের গান শুনিলেই বালক সোৎসাহে ভিড়িয়া পড়ে। মনসার ভাসান, হরিবাসরের গীত, কীর্তন, কোনো কিছুই ফাঁক যাইবার যো নাই। যে কোনো গান, যে কোনো অভিনয় এই মেধাবী বালকের কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকলেরই সে পরমপ্রিয়, সকলেরই আনন্দ-ধন।

বড় অদ্ভুত এই বালক। মাঝে মাঝে তাহার ভাবাবেশ হয়। সেদিন মাঠের ধারে বেড়াইতেছে, হঠাৎ আকাশপথে চোখে পড়ে এক উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসংবিৎ হারাইয়া ফেলে। অসীমের ছোঁয়া কখন যেন তাহার মগ্ন চৈতন্যে দোলা দিয়াছে, কোন্ গভীরে তাহাকে তলাইয়া ফেলিয়াছে!

মাঠ হইতে বালক গদাধরের অচেতন দেহটি তুলিয়া আনা হয়। মা চন্দ্রামণি আতঙ্কে কাঁদিতে থাকেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া তবে তিনি স্থির হন।

আর একদিনের কথা। গ্রামের মেয়েরা সবাই বিশালাক্ষীর মন্দিরে চলিয়াছে। গদাধরও তাহাদের সঙ্গ নেয়। পথিমধ্যে হঠাৎ তাহার দেহে দেখা দেয় দিব্য ভাবাবেশ। সংজ্ঞা-হীন হইয়া পড়িলে মেয়েরা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। কানাকানি শুরু হয়—বিশালাক্ষীর ভর হয় নাই তো? সকলে অচেতন গদাধরের স্তবস্তুতি শুরু করে।

সে-বার গ্রামে যাত্রা গানের পালা হইতেছে। গদাধর উহাতে শিব সাজিলেন। জটা বাঘছাল আর হাড়ের মালা পরার সঙ্গে সঙ্গে বালক অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গেল—শিবের সাজসজ্জা জাগাইয়া তুলিল শিবের দৈবী আবেশ। সংবিৎ হারাইয়া সে ভূতলে পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে ঘটে এক অদ্ভুত ভাবান্তর। একলা অনেক সময় ভূতির খালের শ্মশান বা নির্জন আমবাগানে সে কাটাইয়া আসে। কামারপুকুরের পাশ দিয়াই পুরীধামের যাত্রীদের আনাগোনা। প্রায়ই লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে পরিব্রাজক সাধু বৈরাগীদেব আড্ডা জমে। গদাধর তাঁহাদের কাছে আসিয়া জুটে, কৌতূহলভরে তাঁহাদের আচার-আচবণ লক্ষ্য করে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ভাব জমিয়া যায়। আদর করিয়া প্রিয়দর্শন বালককে অনেকে ভজনও শিখায়।

গদাধর স্বেচ্ছামতো যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। লেখাপড়ায়ও দেখা যায় তাহার তেমনি খেয়ালিপনা। পাঠশালার পড়ায় একটুও মন নাই। তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, "ও চাল-কলা বাঁধার পড়ায় কি লাভ? ও আমি পড়তে চাইনে।" বালককে নিয়া বাড়িতে সকলে চিন্তিত হয়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে ঘটে তাহার ভাবাবেশ, তাই পড়াশুনার জন্য কেউ তাহাকে তেমন চাপ দেয় না।

বড় মধুর গদাধরের কণ্ঠ। কীর্তন ও যাত্রার গান যে শোনে, মুগ্ধ হইয়া যায়। অভিনয়ে দক্ষতাও তাহার কম নয়। সহজ সুন্দর গ্রাম্য জীবনের পরিবেশে এমনিভাবে দিন কাটে, প্রকৃতির আনন্দলোকে সে বাড়িয়া উঠে দিনের পর দিন।

বয়স ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, এমনভাবে কতদিন আর গদাধরকে রাখা যায়? সংসারের অ ভাব-অনটন যথেষ্ট। তার উপর ছেলের নিজের ভবিষ্যৎও একটা আছে তো!

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় নিয়া আসিলেন। গদাধরের বয়স তখন সতের।

কলিকাতায় রামকুমার তখন টোল খুলিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রাভাবে অল্প কিছুদিন পরে ইহা উঠিয়া যায়।

রাণী রাসমণির নব প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে এসময়ে এক পুরোহিতের দরকার। রামকুমারকে এ কাজের জন্য ডাকা হইল।

শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। তা হোক্। রামকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতই উদার, তেমন গোঁড়ামি তাঁহার নাই। মন্দিরের পৌরোহিত্য তিনি গ্রহণ করিলেন।

দাদার সঙ্গে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। কখনো মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন, কখনো ঘুরিয়া বেড়ান গঙ্গাতীরে।

দাদা প্রায়ই পীড়াপীড়ি করেন, "ওরে, কাজ তো একটা করতেই হবে, তবে ভব·তারিণী মন্দিরে থেকেই কেন কিছু করিসনে ?"

গদাধর এ কথায় কান পাতেন না। ভগবানের কাজ ছাড়া আর কাহার চাকুরি তিনি করিবেন।

মন তাঁহার বার বারই ছুটিয়া যায় দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে। কি অমোঘ আকর্ষণ আছে এই বিগ্রহের, বুঝা কঠিন। এই মনোরম গঙ্গাতীরও তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। মন ক্রমে নরম হইয়া আসে—দেবীর বেশকারীর কাজ নিতে তিনি সম্মত হন। ইহার পর মন্দির পূজারীর পদগ্রহণ তাঁহার জীবনে সূচনা করে নূতন অধ্যায়ের।

পুরোহিত গদাধরের সাথে ভবতারিণী বিগ্রহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়। ভক্ত সাধক আর জগন্মাতার আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন।

শাক্তী দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দেবীপূজা ঠিকভাবে করা যায় না। গদাধর চিন্তায় পড়িলেন। তন্ত্রাচার্য কেনারাম ভট্টাচার্যকে তাঁহার পছন্দ, তাঁহার কাছেই দীক্ষা নিলেন। এ দীক্ষার পরই ঘটিল এক অদ্ভুত কাণ্ড, ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মনের মতো কাজ ভবতারিণীর এই পূজা। গদাধর একাজে তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেন। ভক্তির জোয়ার নামে জীবনের দুই কূল ছাপাইয়া, আর প্রাণে জাগে মুমুক্ষার আর্তি। সূক্ষ্মলোকের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব অপাপবিদ্ধ সাধকের অন্তরে ফুটিয়া উঠে পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার। প্রকাশ দেখা যায় নানা লোকোত্তর বিভূতির।

দেবীর অর্চনায় হয়তো বসিয়াছেন, অঙ্গন্যাস করন্যাসের সময় দেখেন অপূর্ব দৃশ্য! তাঁহার নিজ অঙ্গের নানাস্থানে ঝলকিয়া উঠে জ্যোতির ছটা। পূজার আগে ভূতশুদ্ধি করিতে বসেন, ক্রিয়ার পর নিজেই চমকিয়া উঠেন। চাহিয়া দেখেন পূজাক্ষেত্রের চারিদিকে, কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে অলৌকিক অগ্নিশিখা, পূজার অনুষ্ঠানকে উহা রক্ষা করিতেছে।

মায়ের আহ্বান মন্ত্রেরই বা একি প্রতিক্রিয়া! এ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সারা দেহ দিব্য সত্তায় পূর্ণ হইয়া যায়। মন্দিরগৃহের বায়ু মন্থর হইয়া উঠে। এক অপার্থিব ভাব মহিমায় সমগ্র পরিবেশ থম্‌-থম্ করিতে থাকে। তেজঃপুঞ্জময় ভাবাবিষ্ট তরুণ পূজারীর

মূর্তি যে দেখে অবাক হইয়া যায়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন আবির্ভূত হইয়াছেন, বসিয়াছেন ব্রহ্মময়ীর পূজায় !

পূজা শেষ হয়। এবার ঠাকুর মন্দিরগর্ভের কোণে বসিয়া, প্রাণ ভরিয়া মাকে গাহিয়া শুনান রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গান। প্রেম-বিহ্বল সাধকের বুক অশ্রুজলে সিক্ত হইতে থাকে।

রাত্রে মন্দির বন্ধ হইলে পঞ্চবটীর সংলগ্ন বনে ঠাকুর ধ্যানস্থ হন। বহিরঙ্গ জীবন হইতে নিজেকে তিনি একেবারে গুটাইয়া নিয়াছেন। ইষ্টদেবী জগন্মাতার পাদপদ্মে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছেন নিঃশেষে। সংসারের আহ্বান তাঁহার নিকট আজ অবান্তর—নিরর্থক। তাই মাতৃধ্যানে থাকেন সদা বিভোর।

ঈশ্বরলাভের জন্য কোনো কষ্ট, কোনো ত্যাগই আজ আর তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কোনো সাধন-কৃচ্ছ্রেই তিনি পরাঙ্মুখ নন।

'সমলোষ্ঠাশ্ম কাঞ্চনঃ' হইতে হইবে ? ঠাকুর শুরু করেন এক অদ্ভুত খেলা। হাতে কতকগুলি টাকা ও মাটির ঢেলা নিয়া, 'মাটি-টাকা টাকা-মাটি' বলিয়া বার বার গঙ্গায় ছুঁড়িতে থাকেন।

সাধনজীবনের মূল কথা, সাধকের অহংভাব নাশ করিতে হইবে। সর্বজীবে আনিতে হইবে শিবজ্ঞান। ঠাকুর কালীবাড়ির কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বসিয়া যান। এই কাঙালীরাই যে তাঁহার ইষ্টদেবীর রূপ ! তাহাদের পাতের প্রসাদ যে দেবীরই প্রসাদ। তাই এ বস্তু শিরে ধারণ করিয়া নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ভিখারীদের পাতা ও উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসেন।

সাধনার সিদ্ধির পথে কোনো ক্রিয়া কোনো কর্তব্যই যে তাঁহার অকরণীয় নাই ! জগন্মাতার দর্শন তাঁহাকে পাইতেই হইবে, আর এ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে কোনো ফাঁক রাখিলে তো চলিবে না। চরম প্রস্তুতির পথে দিন দিন ঠাকুর আগাইয়া চলেন।

পিতামাতার স্বভাবজাত শুদ্ধতা ও পবিত্রতা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। নিজের ভিতরেও উপজিত হইয়াছে প্রেমভক্তির অপরিমেয় ঐশ্বর্য। অধ্যাত্ম-জীবনের পরম প্রাপ্তির জন্য সর্বস্বপণ তিনি করিয়াছেন দুর্বার গতিতে তাই চলিয়াছেন ছুটিয়া।

ঈশ্বরপ্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা ঠাকুরকে যেন উন্মাদ করিয়া তুলিল। জগন্মাতার দর্শন না মিলিলে এ জীবনই যে বৃথা ! আর্তি শুনিলে পাষাণও বুঝি বিগলিত হয়। দুঃসহ জ্বালায় প্রায়ই অস্থির হইয়া বলেন, "মা, এত যে ডাক্‌ছি, তুই কি শুনছিস না ? ভক্ত রামপ্রসাদকে এসে দেখা দিয়েছিস, তেমনি আমাকে কি দেখা দিবি না !"

হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ঠাকুর সেদিন ছুটিয়া গিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। খড়্গাঘাতেই এ জীবন নাশ করিবেন !

চৈতন্যঘন মহাসত্তার মূলে আকর্ষণ পড়িল। জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে আদ্যাশক্তি উদ্ভাসিত হইলেন তাঁহার নয়নসমক্ষে। এই তো তাঁহার চিন্ময়ী ইষ্টদেবী—এই তো তাঁহার মা ! রামকৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

এই দিব্যদর্শনের পরে দুই দিন তাঁহাকে নিরন্তর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়।

পরবর্তীকালে এ সময়কার দিব্য অনুভূতির কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন, "ঘর-দ্বার মন্দির সব কিছু যেন মিলিয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই, কেবল এক অনন্ত চেতনার

জ্যোতিঃসমুদ্র ! যেদিকে যতদূর দেখি, তার ঢেউ আমায় গ্রাস করতে আসছে। অবশেষে আমায় একেবারে তলিয়ে দিল। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম।”

—(লীলাপ্রসঙ্গ)

তারপর ঘটিল অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে চিন্ময়ী মাতৃমূর্তিতে ব্রহ্মময়ীর আবির্ভাব !

দর্শন শেষে ঠাকুর উচ্চ স্বরে 'মা, মা' বলিয়া সেদিন ক্রন্দন করিয়া উঠেন। সারা অন্তরসত্তা ব্যাপিয়া এক অপার্থিব আনন্দের ঢেউ বহিয়া যায়। জগজ্জননীর দিব্য প্রকাশ ও অলৌকিক অনুভূতিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন।

ইষ্টদেবীর অদর্শনের পরই আবার জাগে বিরহ যন্ত্রণা। রামকৃষ্ণের জীবন দুঃসহ

মায়ের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না। শুরু হয় হৃদয়ভেদী কান্না। অধীর হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন, মিনতি করিতে থাকেন, “মা-গো ! আমায় কৃপা কর্, দেখা দে।”

মন্দিরগাত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরে এই আর্তধ্বনি। কখনো কখনো ভগবৎ-বিরহে ঠাকুর উন্মাদের মতো হন। পাষাণে মুখ ঘষিয়া বলিতে থাকেন, “পাষাণী, তুই দেখা দিবিনে !” রক্ত ঝরে মুখ দিয়া, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়া যায়।

উত্তরকালে ঠাকুর বলিয়াছেন, সে সময়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা লোপ পাইলেই মায়ের বরাভয়হস্ত ও জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তিনি দেখিতে পাইতেন। এই মূর্তি ব্যাকুল সাধককে সান্ত্বনা দিত, আর দিত, অধ্যাত্ম পথের নির্দেশ। আবার কখনো বা মা আর ছেলের মধ্যে চলিত কত অন্তরঙ্গ হাস্যালাপ।

নানা অনুভূতি ও দর্শনের স্রোত তখন ঠাকুরের সাধনজীবনে বহিতেছে। প্রবল গতিবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছেন, কে জানে ?

মাঝে মাঝে মা'কে ডাকিয়া বলেন, "মা গো, আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝিনে। তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্রও কিছুই আমি জানিনে। যা করলে তোকে চিরতরে পাওয়া যায়, তাই তুই আমায় শিখিয়ে দে। তুই ছাড়া আমার সহায় বা গতি যে আর কেউ নেই !”

ভক্তি ও শরণাগতির মূর্ত বিগ্রহ ঠাকুর। মায়ের চরণে এবার তিনি নিজেকে একেবারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। নিজে তিনি যন্ত্র—আর জগজ্জননী হইয়াছেন তাঁহার যন্ত্রী। মা যেমনি চালান, তেমনি বহিয়া চলে সাধকপুত্রের জীবনধারা।

আগে ঠাকুর পূজা বা ধ্যানের সময় মায়ের দিব্য মূর্তিটি শুধু দেখিতে পাইতেন। এবার সদাই ঘটিতেছে তাঁহার সান্নিধ্যলাভ। ভোরে ফুল তুলিতে যান, মালা গাঁথেন, মা-ও দিব্য মূর্তিতে আসিয়া সঙ্গে জুটেন। অবিরাম চলে বাক্যালাপ। দু'জনের হাসি আনন্দ, রঙ্গরসের বিরাম নাই। পূজাঘরে মন্দির চত্বরে, বাগানে বা চাঁদনীতে যখন যেখানে যান আনন্দময়ী ভবতারিণী থাকেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে।

‘ওরে, তুই এটা কর, ওটা করিস্‌নে’—বলিয়া মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে নির্দেশের পর নির্দেশ দিয়া চলেন।

ভবতারিণীকে ঠাকুর ভোগ নিবেদন করিতে বসেন। দেখেন এক আশ্চর্য দৃশ্য !

দেবীর নয়ন হইতে দিব্যজ্যোতির রশ্মি নির্গত হইয়া আসিয়া পড়ে ভোগান্নের উপর। দেবী আবার তাহা সংহরণ করিয়া নেন। পাষাণ প্রতিমা যেন জীবন্ত, সচলা। এক একদিন কিন্তু এমনও হয়, ঠাকুর হয়তো ভোগ নিবেদন শেষ করেন নাই। কিন্তু মা ভবতারিণীর আর তর সহিতেছে না। মন্দির-গর্ভ আলোয় আলোময় করিয়া তাড়াতাড়ি আহারে বসিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর পড়েন মহাবিপদে। ব্যাকুলভাবে মাকে বলেন, "রোস্ রোস্ আগে মন্ত্রটা বলি তারপর খাস্।"

মৃন্ময়ী দেবী শুধু চিন্ময়ী হন নাই, লীলাময়ীও হইয়া উঠিয়াছেন। হাস্যলাস্যময়ীরূপে মন্দিরকক্ষে সদা থাকেন বিরাজমানা।

এ সময়কার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যি সত্যি নিশ্বাস ফেলছেন। মন্দিরের দেয়ালে চিন্ময়ীর কোনো ছায়া পড়তো না। নিজের ঘরে বসে বসে শুনেছি, মা পাঁয়জোর প'রে আনন্দময়ী ছোট এক মেয়ের মতো ঝম্‌ঝম্ করে মন্দিরের ওপর তলায় উঠে যাচ্ছেন।"

এক একদিন দেখিতেন জগন্মাতা জীবন্ত মূর্তিতে মন্দিরের দোতলায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছেন।

ইষ্টদেবীর সহিত একাত্মতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ঠাকুরের বৈধী ভক্তি বাঁধনও তাই দিন দিন হইতেছে শিথিল। পূজা ও ভোগরাগের নিয়মকানুন আজকাল আর মানিয়া চলা তাই সম্ভব হয় না। পাগ্‌লা বামুনের এই অদ্ভুত ও বিপরীত চালচলন দেখিয়া মন্দিরের লোকজন ঘাব্‌ড়াইয়া যায়।

জবা বিল্বদলের অর্ঘ্য তুলিয়া নিয়া ঠাকুর কখনো নিজের মাথায় রাখেন। আবার ভাবাবেশে কখনো বা বুকে—এমন কি পায়ের উপর হয়তো ঢালিয়া দেন। শুধু তাহাই নয়, এই পুষ্পদলেই আবার ভবতারিণীর পাদপদ্মে দিতেছেন অঞ্জলি।

মাঝে মাঝে ভাবাবেশে নয়নদ্বয় ও বক্ষ রক্তবর্ণ হয়। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে পূজার আসনটি ছাড়িয়া উঠেন। তারপর দেবীর সিংহাসনের উপর অবলীলায় নিজের পা তুলিয়া দেন। সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করেন, আদর করেন। কখনো-বা দেখা যায়, বিগ্রহের হাত ধরিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন।

নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনের থালা ঠাকুর তুলিয়া ধরেন, ভবতারিণীকে নিজহাতে খাওয়াইতে থাকেন। সে এক প্রেমমধুর দৃশ্য! গদ্‌গদ স্বরে ঠাকুরকে এক এক সময় বলিতে শোনা যায়, "মা, আমায় কি বলছিস! আমি খাবো? আচ্ছা আচ্ছা, এই আমি খাচ্ছি।"

নিজে ভোগান্ন খাইয়া কখন যে উচ্ছিষ্ট অন্নের অংশ মায়ের মুখে পুরিয়া দিতেছেন, কোন হুঁশ নাই।

কর্তৃপক্ষের কাছে এবার অভিযোগ গেল, দেবীর ভোগরাগ কিছুই ভালভাবে দেওয়া হইতেছে না। উন্মাদ পুরোহিত সব কি ওলোট-পালোট করিয়া ফেলিতেছেন।

রাণীর জামাতা, এস্টেটের কর্তা মথুর স্বয়ং তদন্তে আসিলেন। লুকাইয়া নিজ চক্ষে সমস্ত কিছু দেখিলেন। ভাবাবেগে চোখে তাঁহার জল আসিয়া পড়িল। ভাবিলেন

এ কি অদ্ভুত প্রেম-ভক্তি এই তরুণ পুরোহিতের ? এমন ভক্তি এমন ব্যাকুলতায়ও যদি মন্দিরের দেবী বিগ্রহ জাগ্রত না হন, তবে আর কিসে হইবেন ?

রাণী রাসমণি ও মথুর উভয়ে উপলব্ধি করিলেন, বহু পুণ্যের ফলে তাঁহারা এমন পূজারী পাইয়াছেন।

আদেশ প্রচারিত হইল, গদাধর ভট্টাচার্য স্বেচ্ছামতো মা ভবতারিণীর পূজা করিবেন। তাঁহার কাজে, আচরণে ও চলাফেরায় কেহ যেন কখনো বাধা না দেয়।

কর্তৃপক্ষ ইহাও বুঝিয়া নিলেন, ঠাকুরের পক্ষে এখন আর বৈধ আরাধনা সম্ভব নয়। আনুষ্ঠানিক কাজকর্মের ভার আর তাঁহার উপর রাখা যায় না। এ দায়িত্ব এখন হইতে দেওয়া হইল অপরকে।

মথুরানাথ রাণীর জামাতা, তাঁহার সমস্ত কিছু কার্যের পরিচালক। প্রথম হইতেই ঠাকুরের প্রতি মথুরের এক অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মে। অনেকদিন আগের কথা। সে-বার মন্দিরের পুরোহিতের অসাবধানতায় গোবিন্দজী বিগ্রহের একটি পা ভাঙিয়া যায়। সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন, কি করা কর্তব্য তাহা বুঝিতেছেন না। রাণী রাসমণি ও মথুর পণ্ডিতদের সহিত বহু পরামর্শ করিলেন। সকলেরই মত—এই বিগ্রহ বিসর্জন দিয়া নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হোক্। কারণ, ভগ্ন মূর্তিতে পূজা শুদ্ধ হইবে না।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক, ছোট ভট্চাজের কথা মথুরানাথের মনে পড়িল।

পরামর্শের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঠাকুরের সহজাত প্রজ্ঞা অতি সহজে সেদিন সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। তিনি বলিয়া উঠেন, "এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো ! আচ্ছা, রাণীর জামাইদের কারো হঠাৎ পা ভাঙলে কি হবে বলতো ? তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে কি আর এক জামাই আনা হবে ? না, তার চিকিৎসা চালাবে ? গোবিন্দজীর ভাঙা পা জোড়া লাগিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

যেমন সহজ সরল কথা, তেমনি অকাট্য যুক্তি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রাণী ও মথুর এ পরামর্শই মানিয়া নিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই থাকেন মায়ের ধ্যানে বিভোর এবং ভাবতন্ময়। একবার এজন্য তাঁহাকে বড় বিপদে পড়িতে হয়। সেদিন রাণী রাসমণি দেবী দর্শনে আসিয়াছেন। ঠাকুরের প্রাণ-গলানো গান শুনিতে তিনি খুব ভালবাসেন, তাই তাঁহাকে গাহিতে কহিলেন।

ঠাকুর তখনি পরমানন্দে শুরু করিলেন মাতৃসংগীত। রাণী কিন্তু বেশীক্ষণ উহা মন দিয়া শুনিতে পারিলেন না। এস্টেটের একটা জটিল মামলা তখন চলিতেছে, এ সম্পর্কিত কি একটা কথা তিনি ভাবিয়া নিতেছিলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, "এখানেও ওসব চিন্তা !" সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া গেল রাণী রাসমণির গালে এক চপেটাঘাত।

কি সর্বনাশ ! গদাধর ভট্টাচার্য কি পাগল হইয়া গিয়াছে ! মন্দিরের কর্মচারীরা মারমুখী হইয়া ছুটিয়া আসে।

রাণীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকলে নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করিয়া যায়। রাণী বুঝিয়াছেন, শুদ্ধাচারী সাধকের কাছে তাঁহার বিষয়ী মনের চিন্তাতরঙ্গ ধরা পড়িয়াছে। সত্যিই তো।

কালীঘরে বসিয়া কালীর গান শুনিতেছেন, এখানে বৈষয়িক কথা ভাবা তাঁহার উচিত হয় নাই। এ যে তাঁহারই লজ্জার কথা।

মথুরানাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সংশয়ী বিচারশীল মানুষ। কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিবার পর হইতেই তাঁহার জীবনে শুরু হয় এক অপূর্ব পরিবর্তন। শুধু ঠাকুরের রসদদারী করাই নয়, দীর্ঘকাল তিনি একান্ত নিষ্ঠায় তাঁহার সেবা করিয়াছেন। ভক্তবৎসল ঠাকুরের প্রথম ভক্ত এই মথুরানাথ। তিনি ও তাঁহার পত্নী ঠাকুরকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর এই খেয়ালী বাবার সমস্ত আবদার অত্যাচার মথুর সহ্য করিতেন হাসিমুখে। বাবার কোনো ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পাইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। বিষয়ানুরাগী মথুরানাথ এক অহৈতুক মমত্বের বন্ধনে এই বিষয়-বৈরাগীর সাথে আবদ্ধ হন।

মথুরের সেবা ও ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বলিতেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করেছিল তা কি অমনি করেছিল? মা তাকে এই শরীরের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন। সেই জন্যেই সে এত সেবা করতে পেরেছিল।"

অনেক দিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মথুরানাথ চমকিয়া উঠিলেন। বাবার মধ্যে আজ তিনি এ কি দেখিতেছেন? ভবতারিণী ও মহাদেবের মূর্তি যে তাঁহার মধ্যে আবির্ভূত। এ কি বিস্ময়। মথুর বার বার চক্ষু মার্জন করেন, কিন্তু দেখেন সেই একই অলৌকিক দৃশ্য! অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতে থাকে। ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের পদতলে তখনি লুটাইয়া পড়েন।

শুধু ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর সেবা নয়, ঠাকুরের চারদিককার সমস্ত পরিবেশকে মথুরানাথ তাঁহার সাধনার পক্ষে সহায়ক করিয়া তোলেন। তাই পরমহংসদেব বলিতেন, "মাকে বলেছিলাম, এ দেহ কেমন ক'রে রক্ষা হবে, আর সাধু ভক্তদের নিয়ে কেমন করেই বা থাকবো? তাই তো সেজবাবু চৌদ্দ বৎসর সেবা করলে।"

মথুরের সহিত ঠাকুর সে-বার তীর্থভ্রমণে যান এবং বৈদ্যনাথধামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানকার কাঙালীদের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত হয়। মথুরকে ধরিয়া বসেন, "এই সব দীন-দুঃখীদের খাওয়াতে হবে, সবাইকে কাপড় দিতে হবে।"

মথুর দেখিলেন মহাবিপদ। দূর তীর্থে চলিয়াছেন। যেখানে সেখানে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করিলে চলিবে কেন? কিন্তু যত তিনি বুঝাইতে থাকেন, ঠাকুর ততই বাঁকিয়া বসেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, "তুমি হচ্ছো মায়ের দেওয়ান। তবে কেন এদের দেবে না!"

শেষটায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যাঃ! তোর সঙ্গে আমি কাশী যাবো না, আমি এদের কাছেই থাকবো। এদের যে দেখবার কেউ নেই।"

অগত্যা মথুরকে রাজী হইতে হইল।

মথুরের সহিত ঠাকুরের একবার তর্ক হয়। মথুর বলিতেছেন, "ঈশ্বর আইন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকেও তাঁর নিজের বিধান মেনে চলতে হয়।"

ঠাকুর উত্তর দিলেন, "সে কি গো! এ আবার কি কথা! তাঁর আইন তিনি সব সময়ে যে রদ করতে পারেন!"

যুক্তিবাদী মথুর একথা মানিতে রাজী নন। কহিলেন, 'তা কি ক'রে হয় বাবা? লাল ফুলের গাছে যে লাল ফুল হওই হবে, সাদা ফুল সেখানে হবে কি ক'রে?"

পরের দিনই কিন্তু তাঁহাদের এ বিতর্কের সমাধান ঘটিল। প্রত্যুষে বাগানে গিয়া ঠাকুর দেখেন,—কি আশ্চর্য! একটি লাল জবাগাছে শ্বেত জবাও ফুটিয়া রহিয়াছে—একই ডালে দুই বর্ণের ফুল। তখনি ছুটিয়া গিয়া মথুরের চোখের সামনে এই বিস্ময়কর ব্যতিক্রমটি তুলিয়া ধরিলেন। মথুরকে হার মানিতে হইল।

এক মথুরানাথই তখন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। বালকস্বভাব ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "দ্যাখো, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন, এখানকার ঢের অন্তরঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আসবে, আর এখান থেকে ঈশ্বরকে লাভ করবে। মা এই খোলটা দিয়ে অনেক খেলা খেলবে। অনেকের কল্যাণ করবে। তাই এটাকে রেখেছ, এখনো ভাঙে নি। হ্যাঁগো, তুমি কি বল? এসব কি ভুল?"

মথুর আশ্বাস দেন, "না বাবা, তোমাকে মা এ অবধি কোনোটাই ভুল দেখান নি, তবে এ কেন ভুল হতে যাবে? নিশ্চয়ই তারা আসবে। কিন্তু বাবা, তারা দেরি করছে কেন? শিগ্‌গীর আসুক না, তাদের নিয়ে আমি আনন্দ করি?"

আবার যখন ভক্তদের আগমন সম্পর্কে ঠাকুর মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া উঠেন, মথুর তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলেন, "তাতে আর কি হয়েছে, বাবা? আমি একাই তো তোমার একশো ভক্ত?"

বালকস্বভাব ঠাকুর ক্ষুণ্ণমনে উত্তর দেন, "কি জানি বাবু, তারা আসবে এটা যে মা আমায় দেখিয়ে দিলেন!"

ঠাকুরের সাধনার পথে এ সময়ে সূক্ষ্মলোক হইতেও সাহায্য কম আসিত না। উত্তর-কালে নিজেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—"আমারই মতো দেখতে এক যুবক সন্ন্যাসীর মূর্তি আমার দেহের ভেতর থেকে যখন তখন বেরিয়ে আসতো, আর সব বিষয়ে আমায় উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাইরে এলে, কখনো আমার সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকতো, কখনো-বা আমি জড়বৎ পড়ে থেকে তারই চেষ্টা সফল দেখতে পেতুম, তারই কথা শুনতে পেতুম।"

এ সময়কার উন্মত্ত অবস্থার তথ্যও ঠাকুরের কথায় কিছু পাওয়া যায়—"এর এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হলে যে কোনো সাধকের শরীর ত্যাগ হয়! এ সময়ে দিন-রাতের অধিকাংশ সময় মা'র কোনো না কোনো রূপ দর্শনাদি পেয়ে ভুলে থাকতাম, তাই রক্ষে! নতুবা শরীরের এ খোলটা থাকা অসম্ভব হত। এখন থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ ছয় বছর কাল ঘুম হয় নি, চোখ পলকশূন্য হয়ে গিয়েছিল। চেষ্টা ক'রেও পলক ফেলা যেত না।"

এক সময়ে ঠাকুরের এক দিব্যোন্মাদের ভাব খুব বাড়িয়া যায়। বায়ু ঊর্ধ্বগতি, বক্ষ

রক্তবর্ণ, মাথার চুল সব রুক্ষ, জট পাকাইয়া গিয়াছে। পরিধানের কাপড় বিস্রস্ত। দিনরাত মাতৃভাবনায় তিনি উন্মাদ। সমস্ত দেহে মনে যেন এক ঝড়ের মত্ততা।

এঁড়েদার বৈষ্ণব পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁহার উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন কেন?

ঠাকুর জবাব দিলেন, "আমার যখন এই অবস্থা হলো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল! আগের চিহ্ন কিছুই রইলো না। হুঁশ নেই, কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতা থাকবে কি ক'রে? তোমার দিব্যোন্মাদ হ'লে তবে বুঝতে পারতে।"

হলধারী ঠাকুরের আত্মীয়, মন্দিরের তিনি অন্যতম পুরোহিত। জ্ঞানমার্গীয় এক গ্রন্থ পড়িয়া সেদিন ঠাকুরকে বুঝাইলেন—ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ভাবাতীত নামরূপাদি উপাধি-বর্জিত। ভাব ভক্তি ইত্যাদি সহায়ে তাঁহার সম্বন্ধে যে সব অনুভূতি হয়, তাহা মিথ্যা।

এ কথা শুনিয়া ঠাকুর বালকের মতো বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, 'তবে কি ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, যা কিছু শুনেছি, তা সবই ভুল।'

মা ভবতারিণীর কাছে কাঁদিয়া কহিলেন, "মাগো নিরক্ষর মুখ্যু বলে আমায় কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিতে হয়।"

কান্নার বেগ আর যেন থামিতে চাহে না। অকস্মাৎ সম্মুখের মেঝে হইতে কুয়াশার ধোঁয়ার মতো কি যেন উঠিতে থাকে। উহার ভিতর হইতে আবির্ভূত হন এক দিব্য পুরুষ। ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া কহেন, 'ওরে, তুই ভাব মুখে থাক্, ভাব মুখে থাক্।'

যেমন আকস্মিকভাবে এই অলৌকিক মূর্তি আবির্ভূত হন তেমনি আবার হন অন্তর্হিত।

ঠাকুর দিব্যোন্মদগ্রস্ত। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে নানা ধরনের কথা পল্লবিত হইয়া জননী চন্দ্রমণির কানে পৌঁছিতে থাকে। তবে কি গদাধর সত্যই পাগল হইয়া গেল? উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই।

জননীকে শান্ত করা দরকার, ঠাকুর তাই কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজেও খানিকটা স্থির হইয়াছেন। আগের সে উদ্দাম ভাবাবেশ, সে চঞ্চলতা আর নাই। গাঁয়ে আসিয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান, মাঝে মাঝে ভূতির খাল, বুধই মোড়লের নিভৃত শ্মশানে হন ধ্যানস্থ।

জননী আশ্বস্ত হইলেন, পুত্রের বায়ুরোগ তবে কিছুটা কমিয়াছে। এবার ব্যস্ত হইয়া পড়েন তাঁহার বিবাহের জন্যে। মনে আশা ইহার ফলে যদি বা সংসারের প্রতি কিছুটা টান হয়।

চেষ্টা খুবই চলিতেছে। কিন্তু পাত্রী কই? অচিরে দেখা গেল ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনীর খবরটি ঠাকুরের অজানা নয়।

মাতাকে ডাকিয়া স্মিতহাস্যে পাত্রীর সন্ধান নিজেই সেদিন দিলেন। কহিলেন, "হেথায় হোথায় ছুটে কি হবে? জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্যের বাড়িতে খুঁজে দেখোগে বিয়ের কনে কুটাবাঁধা হয়ে আছে।"

সত্যিই কনের সন্ধান সেখানে মিলিল। বালিকা বধূ সারদামণিকে মা সানন্দে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বধূর বয়েস পাঁচ, আর ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বৎসর।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পরই আবার দেখা দিল তাঁহার দিব্যোন্মাদের অবস্থা। দিবারাত্র জগন্মাতার ভাবে থাকেন বিভোর, বহিরঙ্গ জীবনের কোনো ধারই ধারেন না। ভাবাবিষ্ট দেহে মহাবায়ুর গতি কেবল থাকে উর্ধ্ব দিকে। বক্ষ সদা আরক্তিম, চক্ষু পলকহীন, নিদ্রার লেশমাত্র নাই। তীব্র গাত্রদাহের জন্য প্রায় সময়েই অস্থির থাকেন। যে কোনো সাংসারিক প্রসঙ্গ তাঁহার কাছে হইয়া গিয়াছে বিষবৎ। শহরের প্রবীণ কবিরাজের দল এ ব্যাধির স্বরূপ বুঝিতে পারেন না, হার মানিয়া যান। কেহ বা বলেন —এ তো সাধারণ ব্যাধি নয়, যোগজ ব্যাধি। সারানো বড় কঠিন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। গঙ্গাতীরে ছোট বাগানটিতে ঠাকুর সেদিন পুষ্প চয়ন করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বকুলতলার ঘাটে একটি নৌকা আসিয়া ভিড়িল। ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক ভৈরবী। বয়স তাঁহার চল্লিশের বেশী হইবে না। পরিধানে গৈরিক বেশ। দীর্ঘ কেশরাশি আলুলায়িত। সুন্দর সুঠাম দেহে অঙ্গকান্তি উছলিয়া পড়িতেছে।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে হৃদে, চট্ করে যা তো ঐ ভৈরবীকে এখানে ডেকে আন।"

হৃদয় তো অবাক্। সাধিকা স্ত্রীলোকটি একেবারে অপরিচিতা—তাঁহার আহ্বানে সে আসিতে চাহিবে কেন?

ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিয়া দিলেন, "ওরে যা না। আমার নাম ক'রে তুই বল্‌গে। ঠিক আসবে।"

ঠাকুরকে দেখিয়াই ভৈরবীর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। কহিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রয়েছ? তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে, তোমায় যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এতদিনে আজ তোমার দেখা পেলাম।"

ভৈরবী ও ঠাকুর সাক্ষাৎভাবে কেহ কাহাকেও জানেন না। নামও শোনা নাই। কিন্তু কোন্ সূক্ষ্ম যোগসূত্র উভয়ে সেদিন খুঁজিয়া পাইলেন তাহা কে বলিবে?

ভৈরবী যেন ঠাকুরের এক নূতন অভিভাবিকা। ঠাকুরও হইয়া গিয়াছেন এক বালক বিশেষ। নিজের নানা অভিজ্ঞতার কথা কহিতে থাকেন। দিব্যোন্মাদের দশা* তখন চলিতেছে। কবে এই দশা হইতে মুক্তি পাইবেন কে জানে? ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন "হ্যাঁগা, আমি কি পাগল হলুম! আমায় এ সকল কি হয়?"

ভৈরবী উত্তর দেন, "তোমায় কে পাগল বলে বাবা? তোমার যে মহাভাব হয়েছে। রাধারাণী, চৈতন্যদেব এঁদের যা হয়েছিল। আমি শাস্ত্র থেকে এসব সকলের কাছে প্রমাণ করবো!"

ভক্তিশাস্ত্র ও তন্ত্র-গ্রন্থ হইতে ভৈরবী ঠাকুরকে নানা তথ্য ও প্রমাণ পড়িয়া শুনান, তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন।

আলাপ আলোচনায় বেলা সেদিন অনেকটা গড়াইয়া গেল। ভৈরবীর কণ্ঠলগ্ন ইষ্ট রঘুবীর-চক্র তখনো রহিয়াছেন অভুক্ত। মন্দির হইতে ভিক্ষা নিয়া তিনি পঞ্চবটীতে রাঁধিতে বসিলেন।

ভোগ নিবেদন করিতে গিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন, দুই নয়নে বহিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা বাহ্যজ্ঞান নাই।

এসময়ে ঠাকুর হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কি যেন এক অলৌকিক আকর্ষণে তিনি তখন পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত। ভাবাবেশে উদ্বেল। ভৈরবীর ইষ্টকে নিবেদন-করা অন্ন কখন যে নিজেই গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন হুঁশ নাই।

স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরের লজ্জার আর অবধি রহিল না। কহিতে লাগিলেন, "তাই তো! কে জানে বাবু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ ক'রে ফেললুম।"

ভৈরবী তাঁহাকে সাহস দিয়া কহিলেন, "একাজ তুমি করো নি বাবা! যিনি তোমার ভিতর বিরাজিত আছেন, তিনিই যে করেছেন। ধ্যানে যাঁকে দেখছি, এ যে তাঁরই কাজ। কেন এরূপ হলো, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। আর আমার পুজোর কাজ নেই, পুজো এবার সার্থক হয়েছে।"

সেদিনকার ভোগপ্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া ভৈরবী তাঁহার দীর্ঘ দিনের পূজিত রঘুবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

ঠাকুরের দিব্য ভাব দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক অনুভূতির কথা শুনিয়া ভৈরবীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। নানা দেহলক্ষণ মিলাইয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া যান। শাস্ত্রে ভৈরবীর অসামান্য অধিকার, সাধ্যসাধন তত্ত্বও কম জানা নাই। সব দিক বিচার করিয়া এই তরুণ সাধকের চরম সাধনাবস্থারই সমর্থন তিনি পাইতেছেন।

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ঠাকুরের এই আবির্ভাব জীবোদ্ধারের জন্য। তাছাড়া তাঁহার এ উন্মত্ততা দিব্যোন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়, মহাভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার মধ্যে। এ তত্ত্ব শুধু নিজে বিশ্বাস করা নয়, আশেপাশে সকলের কাছে ভৈরবী উহা প্রচার করিতে ছাড়িতেছেন না।

একদিন সোৎসাহে ঘোষণা করিয়া বসিলেন, "রামকৃষ্ণ অবতার—এবারে নিতায়ের খোলে চৈতন্যের অবতরণ!"

ভৈরবী এসব কি বলিতেছে? কালীবাড়িতে এক মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এই উক্তির ফলে সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পতিত হইল দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ ব্রাহ্মণের দিকে।

ভৈরবী নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চান, তাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আহ্বান করিতে বলিলেন। ঠাকুরের কৌতূহল বালকের মতো—মথুরকে সরল মনে অনুরোধ করিতেছেন, "বামনী এত সব কথা জোর দিয়ে বলছে, তা একটা মীমাংসার জন্য তাদের সবাইকে ডাকো না বাবু!"

বীরভূম ইন্দেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন গৌরীপণ্ডিত। মথুরানাথ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। এ পণ্ডিতের সিদ্ধাইর তখন খুব প্রসিদ্ধি। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণও ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

গৌরীপণ্ডিত এক অলৌকিক ধরনের হোম করিতেন। বামহস্তটি শূন্যে প্রসারিত করিয়া করতলের উপর প্রায় একমণ যজ্ঞকাষ্ঠ তিনি সাজাইয়া দিতেন। তারপর উহাতে করা হইত অগ্নিসংযোগ। এই অদ্ভুত ভঙ্গিতে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া চলিত ক্রিয়ানুষ্ঠান। বিস্ময়ের কথা, হাতের তালু তাঁহার অক্ষতই থাকিত।

গৌরীপণ্ডিতের আরো একটি সিদ্ধাই ছিল। এটি প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এ সিদ্ধাই নিয়া ঠাকুরের সঙ্গে গৌরীপণ্ডিতের সংঘাত হয় এবং পণ্ডিত পরাস্ত হন।

দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে পৌঁছামাত্র গৌরীপণ্ডিত উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনি করেন এক তান্ত্রিক আরাব। হা-রে-রে-রে নিরালম্বো লম্বোদর জননী তাম্ যামি শরণং—প্রভৃতি মন্ত্র ঘোর রবে বলিয়া চলেন।

তাঁহার মুখ হইতে এগুলি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো শক্তিমান্ সাধকের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, আর পণ্ডিত অবলীলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হন।

সেদিন গৌরীপণ্ডিতের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসেন। কি জানি কেন, অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় আরও উচ্চ রব—'হা-রে-রে'।

চারিদিকে তখন এক প্রচণ্ড কোলাহল পড়িয়া যায়। ভারস্বরে হঠাৎ এমন রে-রে শব্দ কেন? তবে কি মন্দিরে ডাকাত পড়িয়াছে? ভবতারিণীর গহনার লোভে দলবলে আজ হানা দিয়াছে? লাঠি-সোটা হাতে নিয়া হন্তদন্ত হইয়া দারোয়ানেরা ছুটিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, ক্ষণপরেই আসল ব্যাপারটা বুঝা গেল, সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে বহিয়া গেল এক হাসির তরঙ্গ।

গৌরীপণ্ডিতের সমস্ত কিছু শক্তি, আর সমস্ত সিদ্ধাই কে যেন ইতিমধ্যেই নিষ্কাষিত করিয়া নিয়াছে! হতবীর্য হইয়া বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে তিনি কালীমন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

উত্তরকালে ঠাকুর এ সম্পর্কে ভক্তদের বলেন, "মা এরপর আমায় জানিয়ে দিলেন গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাই দিয়ে লোকের বল হরণ ক'রে অজেয় থাকতো, সেই শক্তির এখানে ঐরূপে পরাজয় হয়ে যায়। তাই তার সিদ্ধাই আর থাকলো না। মা তার কল্যাণের জন্যই তার শক্তিটা আমার এই খোলটার ভেতরে টেনে নিলেন।"

গৌরীপণ্ডিত অতঃপর কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেন। ঠাকুরের দিব্যভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি মোহিত হন, ভক্তিভরে তাঁহার কাছে করেন আত্মসমর্পণ। অল্পকাল পরে পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, অভীষ্টসিদ্ধির পথে যাত্রা তাঁহার শুরু হয়।

এমনিতেই ঠাকুরের প্রতি মথুরের শ্রদ্ধা অসীম। তদুপরি ভৈরবী তাঁহার ভগবত্তা প্রমাণ করিতে চাওয়ায় মথুরের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের এক সভা তিনি আহ্বান করিলেন।

বৈষ্ণবচরণ কলিকাতার চৈতন্যসভার সভাপতি, সে সময়কার বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি যথেষ্ট। সদলবলে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

সভা শুরু হইতে দেরি নাই। ঠাকুর ভবতারিণীকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। প্রণামের সাথে সাথেই দেহে নামিল দিব্য আনন্দ-রসের ঢল। মহাভাবে তিনি প্রমত্ত।

মন্দির-দ্বারে আসিয়াই ঠাকুর হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ান। অপূর্ব ভাবাবিষ্ট মূর্তি। চোখেমুখে স্বর্গীয় জ্যোতির ছটা। এ মূর্তি বৈষ্ণব-চরণের নয়নপথে পড়ামাত্র তিনি অভিভূত হইয়া যান। ঠাকুরের চরণে পড়িয়া বার বার আর্তি প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঠাকুর এ সময়ে বৈষ্ণবচরণের কাঁধের উপর বসিয়া পড়েন। পণ্ডিত তো আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা, কৃতকৃতার্থ। অপার উৎসাহে গাহিতে থাকেন ঠাকুরের স্তব-গাথা। গৌরীপণ্ডিত, মথুরানাথ প্রভৃতি নীরবে দাঁড়াইয়া এই নাটকীয় দৃশ্য দেখিতেছেন।

সভার বির্তকের মীমাংসা এভাবে আগে হইতেই প্রায় হইয়া গেল। সমবেত পণ্ডিত ও দর্শকদের সম্মুখে ভৈরবীও সেদিন তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন।

ঠাকুরের নানা লক্ষণ ও শাস্ত্রের প্রমাণ নিয়া সে সময়ে আলোচনা চলিতেছে। গৌরী-পণ্ডিত, বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য আচার্যেরা প্রবল উৎসাহে বিতর্কে মাতিয়াছেন। অথচ যাহাকে নিয়া এত কথা, তিনি কিন্তু একেবারে নির্লিপ্ত। সকলের মাঝখানে অর্ধনগ্ন হইয়া ঠাকুর উপবিষ্ট। মাঝে মাঝে বালসুলভ ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকান, কখনো কৌতুকভরে আপন মনে রহস্য করেন। কখনো-বা সম্মুখের বটুয়া হইতে কিছু মৌরি নিয়া মুখে পুরিয়া দেন।

পণ্ডিতদের বাক্‌বিতণ্ডা উত্তেজনা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, যেন অপর কাহারো প্রসঙ্গ শুনিয়া যাইতেছেন।

উৎসাহভরে এক একবার ঠাকুর বিতর্কে যোগ দেন। উত্তেজিত পণ্ডিতদের হাত টানিয়া ধরিয়া ছোট বালকের মতো হাসিতে থাকেন, কখনো-বা বলিয়া বসেন, 'না গো না, তা নয়—আমার কিন্তু এরকমটা নয়।"

ভৈরবীর কথা বৈষ্ণবচরণ মানিয়া নিলেন। সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠাকুরের মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত মহাভাবই সঞ্চারিত হইয়াছে। উনিশ প্রকারের এই মহাভাব। ইহার দুই চারিটি উপস্থিত হইলেই জীবের দেহ চলিয়া যায়। সভার শেষে সেদিন ঘোষিত হইল—ঠাকুর ঈশ্বরাবতার।

গৌরী পণ্ডিত ঠাকুরকে আগেই মানিয়া নিয়াছেন, তিনি আর কোনো বিতর্কে অগ্রসর হইলেন না।

বিষ্ণবচরণের ঘোষণা শুনিয়া মথুর ও অন্যান্য সকলে তো বিস্ময়ে হতবাক্। বালক-স্বভাব ঠাকুর বিস্মিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। মথুরকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলেন, "ওগো, এসব বলে কি ? যা হোক বাবু, রোগ-টোগ নয় - শুনে কিন্তু মনটায় আনন্দ হচ্ছে।"

মথুর এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন, পরম সৌভাগ্য তাঁহার তাই এই দেবকল্প মহাপুরুষের সেবার ভার পাইয়াছেন, আর পাইয়াছেন তাঁহার কৃপা।

ভৈরবী স্থির করিলেন, এবার হইতে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় ঠাকুরের সাধনা অগ্রসর হোক্। প্রতিভাময়ী সাধিকা নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিলেন—হইলেন ঠাকুরের প্রথম লৌকিক শিক্ষাগুরু।

নানা বিচিত্র সাধনধারা আসিয়া মিলিয়াছে ভৈরবীর জীবনে। কণ্ঠে সদাই তাঁহার ঝুলানো থাকে ইষ্টদেব রঘুবীরের চক্র। তন্ত্র-শাস্ত্রে তাঁহার অদ্ভুত অধিকার। আবার বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র ও সাধনাও তাঁহার কম আয়ত্তে নয়।

শুদ্ধাভক্তির বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইবার ভৈরবী তাঁহার মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া দেন শক্তি সাধনার নূতনতর প্রাণধারা। চৌষট্টিখানা তন্ত্রের নানা ধরনের দুরূহ অনুষ্ঠান তিনি ঠাকুরকে দিয়া একে একে সম্পন্ন করান। তারপর তন্ত্রমতে ঠাকুরের পূর্ণাভিষেক ক্রিয়া উদ্‌যাপিত হয়। বেলতলা ও পঞ্চবটীতে দুইটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত করাইয়া ভৈরবী নিখুঁতভাবে দিনের পর দিন তন্ত্রসাধনার সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান।

পূর্ণাভিষেক বা তান্ত্রিক সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঠাকুরকে বহুতর তান্ত্রিক সাধন-ক্রিয়া করানো হয়। এ কাজে মা ভবতারিণীর আদেশ মিলিয়াছে, ঠাকুরের তাই ইহাতে নিজেরও উৎসাহের অভাব নাই। এই সাধনকালে বহু অলৌকিক দর্শন ও অভিজ্ঞতা একের পর এক তাঁহার হইতে থাকে।

তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দরকার হয়। ভৈরবী রোজই দূর-দূরান্ত হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়া আনেন।

একদিন শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া ঠাকুর মা-জগদম্বাকে ভোগ দিলেন নিজেও তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভৈরবী যেদিন তাঁহাকে নিবেদিত নরমাংস গ্রহণ করিতে বলিলেন, সেদিন তিনি ঘৃণায় সংকুচিত না হইয়া পারেন নাই। ভৈরবী অবলীলায় ঐ মাংস নিজে ভোজন করিলেন। তারপর দৃঢ়স্বরে ঠাকুরকে কহিলেন, "বাবা, এবার তুমি এই মহামাংসের প্রসাদ মুখে দাও।"

ঠাকুর 'মা-মা' বলিয়া মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, আর ভিতরে তাঁহার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে চণ্ডিকার ভাব। এই ভাবাবেশের পর আর ঐ মাংস গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ রহিল না।

আর একদিনকার কথা। গভীর অমানিশায় বিশেষ একটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। ভৈরবী কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা রূপসী রমণীকে দক্ষিণেশ্বরে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুরকে কহিলেন, "বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে আজ তুমি পুজো করো।"

পূজা শেষ হইয়া গেল। ভৈরবী এবার এই নারীকে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে নির্দেশ দিলেন, "বাবা, এখন মেয়েটির কোলে বসে তোমার জপসাধন করতে হবে।"

নারীমাত্রেই আজীবন যাঁহার মাতৃজ্ঞান সেই মহাসাধকের অন্তরও প্রথমটায় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কৃপাময় কৃপাসিদ্ধ যিনি তাঁহার আবার ভয় কি? জগজ্জননীকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মাতৃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বীর সাধক দিব্য আবেশভরে ঐ উলঙ্গ নারীর অঙ্কে গিয়া বসিলেন। বসিবামাত্রই ধ্যানস্রোতে কোথায় ডুবিয়া গেলেন, কোনো বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া ঠাকুর নয়ন উন্মীলন করিলেন। ভৈরবী তখন তাঁহাকে বলিতেছেন, "বাবা, তোমার ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। খুব কম সাধকই এ সাধনকালে আত্মসংবরণ করতে পারে। সামান্য কিছুকাল জপ করেই তারা ক্ষান্ত হয়। আর তুমি এসময়ে একেবারে সমস্ত বোধের পরপারে চলে গিয়েছিলে।"

তন্ত্রসাধনকালে রামকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এক অপূর্ব দিব্যশ্রী ধারণ করে। ফুটিয়া উঠে সিদ্ধ সাধকের নয়নাভিরাম রূপ। যেখানেই যান লোকে নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। মার কাছে তাই মিনতি জানান বার বার, "মা, আমার এ বাহ্য রূপে কোনো দরকার নেই, এটা নিয়ে নিয়ে, তুই আমায় ভেতরের রূপ দে।"

এই সময়কার তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল ফলিয়া উঠে। ঠাকুরের সাধনজীবনে আসে বিভূতির ঐশ্বর্য, বহুতর অলৌকিক দর্শন এবং অনুভূতিও তিনি লাভ করেন।

কিন্তু বরাবরই তিনি ছিলেন শুদ্ধাভক্তির একনিষ্ঠ সাধক, তাই এই বিভূতি সম্বন্ধে কোনোদিনই ঔৎসুক্য দেখান নাই, এ সম্বন্ধে সচেতনও তেমন হন নাই।

ঠাকুরের সেবক, ভাগিনের হৃদয়নাথের বড় দুঃখ—লোকের সাধনায় কত ফল ফলে, কিন্তু কই, তাহার মামার জীবনে তো চমকপ্রদ সিদ্ধাই কিছু দেখা যাইতেছে না ? বৈষয়িক উন্নতিতেও তো এ সিদ্ধাই লাগানো যাইত !

একদিন সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন, "মামা, পঞ্চবটীতে কত সব শক্তিমান্ সাধু সন্ন্যাসী আসে, কত তাদের সিদ্ধাই ! তারা ধুলোকে সোনা করে, আরও কত কিছু করে। তুমি তো এতকাল কত কঠোর সাধন করলে, কিন্তু মামা তোমার কিছুই হ'লো না।"

বালকবৎ স্বভাব ঠাকুরের। ভবতারিণীর কাছে ছুটিয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগো, হৃদু কত সব বল্ছে, আমার নাকি কিছুই হয়নি !"

জগজ্জননী অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইয়া দিলেন—বিষ্ঠার স্তূপ অর্থাৎ, সিদ্ধাই সাধকের কাছে বিষ্ঠার মতোই ঘৃণ্য।

মন্দির হইতে ফিরিয়া ঠাকুর হৃদয়কে ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "শালা, তুই আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলি !"

ইহার পর হইতে অষ্টসিদ্ধি ও বিভূতির উপর ঠাকুরের ঘৃণার ভাব চিরতরে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

তন্ত্রসিদ্ধ হওয়ার কালেই ঠাকুর দিব্য শক্তিবলে ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। স্পষ্টত বুঝিতে পারেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া যুগাচার্যের ভূমিকা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকেরা সব আসিবে আশ্রয়ের জন্য। এই উপলব্ধির সাথে ঠাকুরের জীবনে আসে গুরুভাবের নূতনতর চেতনা।

নেপথ্যের মহানাট্যকার রামকৃষ্ণজীবনের নূতন নূতন দৃশ্য তখন উন্মোচন করিয়া চলিয়াছেন। তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর আবার এক পটপরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

সাধক জটাধারী সে-বার দক্ষিণেশ্বর বাগানে আসিয়া উপস্থিত। বাৎসল্য-রসের এক সিদ্ধ সাধক তিনি। নবদূর্বাদলশ্যাম বালক শ্রীরাম তাঁহার উপাস্য। ধাতুময়-বিগ্রহ 'রামলালা' জটাধারীর কাছে শুধু চিন্ময় রূপ পরিগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, এক নিত্য সহচররূপে প্রিয় ভক্তের সঙ্গে করেন লীলাবিহার। জটাধারীর পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ান, আব্দার উপদ্রব করেন, আর বাৎসল্যরসে বিভোর সাধক সমস্ত ঝঞ্ঝাট সানন্দে পোহাতেই থাকেন।

জটাধারী আর তাঁহার ইষ্টবিগ্রহ, কি জানি কেন, ঠাকুরকে কেবলি আকর্ষণ করে। প্রায় সময়ই তিনি তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকেন। রামলালার নব নব লীলা আর নাটুকেপনা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না।

রামলালা বিগ্রহ কিন্তু অচিরেই ডিগ্‌বাজী খাইয়া বসে—হঠাৎ সে একদিন ঠাকুরের প্রেমে পড়িয়া যায়। গভীর ভক্তিনিষ্ঠা নিয়া সাধক জটাধারী দিবারাত্রি এত সেবাযত্ন করিতেছেন, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই নাই। চতুর চূড়ামণি এবার নূতন লীলারঙ্গে মাতিয়াছেন। ঠাকুরের দিকেই এখন তাঁহার ঝোঁক পড়িয়াছে। ঠাকুর জটাধারীর কাছ হইতে সরিয়া আসিলেই, রামলালা চিন্ময়রূপে অমনি তাহার ঘরে আসিয়া হাজির হয়। বারণ করিলেও মানে না। ঠাকুরের কোলে উঠিয়া নাচে, দৌড়ায় আর সকল রকমের উৎপাত করিয়া বেড়ায়।

রামলালার এ সময়কার লীলারস বড় মধুর। এই লীলা যেভাবে ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর বলিয়াছেন, "সেদিন রামলালা বায়না করছে দেখে, ভোলাবার জন্য চারিটি ধানসুদ্ধ খই খেতে দিলুম। তারপর দেখি, ঐ খই খেতে গিয়ে, ধানের তুষ লেগে তার নরম জিভ চিরে গেছে। তখন মনে যা কষ্ট হ'লো! তাকে কোলে ক'রে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম—যে মুখে মা-কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও সন্তর্পণে তুলে দিতেন আমি এত অভাগা যে, সেই মুখে এই কদর্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্কোচ হ'লো না!"

এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া ঠাকুরের শোকের পাথার উথলিয়া উঠিত। তখন ভক্ত ও দর্শনার্থীরাও স্থির থাকিতে পারিতেন না।

অনেক দিন আগে কুলদেবতা রঘুবীরের সেবা ও পূজার সুবিধার জন্য ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবার সেই রঘুবীরের প্রতি জাগিয়া উঠে গভীর বাৎসল্যভাব। নূতন মন্ত্র তিনি জটাধারীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন, আর বালক শ্রীরামের ধ্যানে থাকেন সদা বিভোর। সদাই প্রত্যক্ষ করেন—

যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট্‌ ঘটমে লেটা
ওহি রাম জগৎপসেরা
ওহি রাম সবসে নেয়ারা।

ভক্ত জটাধারীর মনে কিন্তু ক্ষোভ হইয়াছে। একি আচরণ তাঁহার রামলালার? এতদিনের সেবা পূজা সব ভুলিয়া গেল?

রামলালা সেদিন তাঁহার খেদ মিটাইয়া দেয়, আনিয়া দেয় সাধকজীবনের চরম উপলব্ধি। জটাধারী দেখিলেন—তাঁহার ইষ্টদেব পরম চৈতন্যময়, সমস্ত বিশ্বসংসারে তিনি রহিয়াছেন ওতপ্রোত।

এবারে অন্তরে আর তাঁহার কোনো ক্ষোভ নাই। রামকৃষ্ণের কাছে থাকিয়াই যখন রামলালার সত্যকার আনন্দ তখন জটাধারী তাহাতে বাদ সাধিবেন কেন? এই জাগ্রত বিগ্রহকে ঠাকুরের নিকটে রাখিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাৎসল্যভাবে সিদ্ধির পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব্রতী হন মধুর ভাবের সাধনায়। সখীভাবে করেন দেহসজ্জা, প্রেমভাবে হন ভাবিত। শুরু হয় তাঁহার মধুর রসের রাগানুগা-সাধন।

ভাবনা ও সাধনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেরি হয় নাই। নারীবেশে জানবাজার রাজবাড়ির অন্তঃপুরে ঠাকুর এসময়ে কিছুকাল বাস করেন। পুরমহিলারা অনেকে ভুলিয়াই যান যে তিনি পুরুষ। ঠাকুরের মধ্যে ফুটিয়া উঠে কান্তাভাব—প্রেম-ভক্তির এই সাধন অতঃপর পরিণত হয় মহাভাবে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ ও মাধুর্য আস্বাদন করিয়া ঠাকুর মধুর-সাধনের চরম পর্যায়ে উপনীত হন।

বিভিন্ন সাধনার অন্তর্হিত সূত্র যে এক ও অভিন্ন—এ সত্যটি উপলব্ধি করিতে ঠাকুরের দেরি হয় নাই। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব তাঁহার মধ্যে সমন্বিত হয় এক অখণ্ড অধ্যাত্মচেতনায়।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের সাধনতত্ত্বের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিতেন তাহাতে এই অখণ্ডবোধের পরিচয় মিলে। তিনি বলিতেন, "হাতীর বাইরের দাঁত থাকে শত্রুকে

আক্রমণের জন্য, আর ভেতরের দাঁতে সে খাবার চিবিয়ে খায় শরীর পোষণের জন্য। গৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাইরে তেমনি ছিল দুইটি ভাবের প্রকাশ। বাইরের মধুর ভাব সহায়ে তিনি লোকের কল্যাণ করিতেন, আর ভেতরে থাকতো অদ্বৈত ভাব—প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে তিনি ভূমানন্দে একেবারে গলে যেতেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাবে থাকতেন অধিষ্ঠিত।”

মধুর সাধনার পট পরিবর্তনের পরই ঠাকুরের জীবনে ঘটে তোতাপুরীর আবির্ভাব—আসে বেদান্তের পরম উপলব্ধি।

অদ্বৈতবোধের প্রবাহ ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম জীবনে মাসের পর মাস ব্যাপিয়া বহিয়া চলে। এসময়কার অবস্থার বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

“যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীর টেকে, শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তেমনি পড়ে যায়—সেইখানে ছয় মাস ছিলুম। কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আসতো, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢুকে তেমনি ঢুকতো, কিন্তু সাড়া হ'ত না। চুল-গুলো ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। হয় তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নি।

“শরীর কি আর থাকতো ?—এই সময়েই যেত। তবে এ সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মতো একগাছা লাঠি ছিল। আমার অবস্থা দেখেই চিনেছিল। আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মা'র অনেক কাজ এখনো বাকী আছে—এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে, মেরে হুঁশ আনার চেষ্টা করতো। একটু হুঁশ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোনো দিন একটু আধটু পেটে যেত, কোনো দিন যেত না। এই ভাবে ছ'মাস গেছে।

“তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম মা'র কথা—ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাব মুখে থাক্।

“তারপর অসুখ হ'লো—রক্ত আমাশয় ; পেটে খুব মোচড়, আর খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ'মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নামলো—সাধারণ মানুষের তখন মতো হুঁশ এলো। নইলে থাকতে থাকতে মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে একেবারে সেই নির্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত !

ঠাকুরের স্ত্রী সারদামণি ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। স্বামীর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। মস্ত বড় সাধক তিনি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নাকি তাঁহার প্রতি-পত্তির সীমা নাই।

অন্তরের ব্যথা গুমরিয়া উঠে, এমন স্বামীর সেবার অধিকার কি তাঁহার হইবে না ? সেবার পিতাকে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধন-ভজনে সদাই ডুবিয়া থাকিলে কি হয়, সেদিন পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার কিন্তু দেখা গেল বড় স্বাভাবিক, বড় আন্তরিক। পরম সমাদরে তাঁহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন। স্থান দিলেন নিজেরই কক্ষে, নিজেরই শয্যায়। বিবাহিতা তরুণী স্ত্রীকে নিজের আয়ত্তাধীন স্ত্রীকে, নিকটে রাখিয়া ইন্দ্রিয়সংযমের পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিলেন।

উভয়ের দাম্পত্য জীবনের এক শুদ্ধসত্ত্ব, স্বর্গীয় রূপ সেদিন ফুটিয়া উঠিল। এ রূপ বড় দুর্লভ। দাম্পত্য জীবনের এ দিব্য রূপায়ণে ঠাকুরের তুলনায় সারদামণির কৃতিত্ব কম নয়। আপন সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য দিয়া স্বামীর ব্রতকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

উত্তরকালে পত্নী সম্পর্কে ঠাকুর বলিয়াছেন, "ও যদি এত ভাল না হ'ত, আত্মহারা হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করতো তাহ'লে আমার সংযমের বাঁধ ভাঙতো কিনা, দেহবুদ্ধি আসতো কিনা, কে বলতেপারে? বিয়ের পর মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরে পড়েছিলাম। বলেছিলাম—মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে। ওর সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে এ সময়ে বুঝেছিলাম, মা আমার সে কথা সত্যিই শুনেছিলেন।"

স্বামী সারদানন্দ তাঁহার রচিত লীলাপ্রসঙ্গ-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পূর্ণযৌবন ঠাকুর ও নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানবহৃদয় স্বতই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধ বিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এক ক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।"

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছানোর দুই একদিন পরে পত্নী সারদামণিকে একান্তে পাইয়া ঠাকুর বলেন, "কি গো আমায় কি তুমি মায়ার বন্ধ করতে এসেছো?"

কিশোরী বধূ তখনি দৃঢ়, সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দেন, "না, তা কেন? আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার ধর্মপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি।"

রাতের পর রাত শয্যায় বসিয়া ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়। সারদামণি বড় ঘাবড়াইয়া যান। এক একদিন ত্রস্তে ব্যস্তে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া আনেন। কানে বার বার নাম শুনানোর পরে তবে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠেন।

ইহার পর হইতে ঠাকুর নিজেই সারদামণিকে বলিয়া রাখিতেন, কোন্ রকমের ভাব-সমাধি হইবে। কিন্তু রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই সারদার আর দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। কখন কি ভাবাবেশ ঠাকুরের হয়, কখন মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তাহা জ্ঞান নাই। প্রায় সারারাত তিনি জাগিয়া কাটান। ঠাকুর একদিন সেকথা জানিতে পারিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। কাছেই নহবৎখানার ঘর, এখন হইতে সেখানেই সারদামণির শয়নের ব্যবস্থা করা হইল।

একদিন সারদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরকে তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'ওগো, ঠিক ক'রে বল তো, আমায় তোমার কি মনে হয়?"

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "মন্দিরে যে মায়ের পূজা হয়, সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করছেন। আবার তিনি এখন কচ্ছেন আমার পদসেবা। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্তি বলেই যে তোমায় সর্বদা আমি দেখি।"

নিজের পত্নীতে ও সমস্ত নারীতেই ঠাকুরের এই মাতৃভাব। ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ তিনি

তাঁহাদের সকলের মধ্যেই উপলব্ধি করেন। এবার তাঁহার এ উপলব্ধিকে তিনি পূর্ণতর করিয়া তুলিতে চাহেন।

সেদিন অমাবস্যা। ফলহারিণী কালীপূজা। ঠাকুর নিজে শয়নঘরে যোড়শী পূজার আয়োজন করিয়া বসিলেন। পত্নী সারদামণিকে তিনি মহামায়া জ্ঞানে পূজা করিবেন, জপতপ ও ধ্যান ধারণার সব কিছু ফল তাঁহার চরণে করিবেন সমর্পণ।

গঙ্গাজলে অভিষেকের পর সারদামণিকে নব বস্ত্র পরানো হইল। পুষ্প-চন্দনে সজ্জিত হইয়া তিনি পূজাবেদীতে বসিলেন। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। পূজা শেষে মা-মা রবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিয়া রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বেদীতে উপবিষ্টা সারদামণিরও তখন বাহ্যজ্ঞান নাই।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এ সময় হইতে ঠাকুরের জীবন-লীলানাট্যে এক নূতনতর দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। আত্মসমাহিত সাধক এবার আত্মপ্রকাশ করেন লোকগুরুরূপে।

মনীষী, বাগ্মী ও ধর্মনেতারূপে কলিকাতায় তখন কেশব সেনের বিরাট প্রতিষ্ঠা। তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, ক্রমে এ সম্পর্ক হয় ঘনিষ্ঠতর। কেশব সেনের দেখাদেখি বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও আসিতে থাকেন।

এবার হইতে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের ভগবৎ-কথা শুনিতে সকলে ভিড় করেন, ভাগবত জীবনের প্রকাশ তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে অনেকেই হন মহা কৌতূহলী। এই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষের দিকে কলিকাতার শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তারপর তাঁহার চরণতলে আসিয়া জড়ো হইতে থাকে একের পর এক ভক্তবৃন্দ ও আত্মার পরমাত্মীয় শিষ্যদল।

সারা দেশের সমাজজীবনে তখন চলিতেছে এক মানস-সঙ্কট। একদিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ সংঘাত, আর একদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে জাতির আত্মপরিচয় সাধন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোথায় আলো কোথায় পথ? বিভ্রান্ত মানুষকে কে দিবে সত্যের সন্ধান? এই সময়ে ঘটিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়!

সংশয়াচ্ছন্ন, জড়বাদী মানুষকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন,—ঈশ্বর দূরের বস্তু নয়, তিনি পর নন। আমাদের একান্ত আপনজন। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে, সর্বত্যাগী হইলে অবশ্য তাঁহাকে পাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার সন্ধানও তিনি অবগত আছেন।

শত শত ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ তাঁহার দেহে দেখিয়া বিশ্বাসবান্ হয়, নূতনতর চৈতন্য লাভ ক'রে। ত্যাগবৈরাগ্যবান্ সাধকেরাও আসেন দলে দলে। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়া উঠে দৃঢ়তর, পরমাশ্রয়রূপে এ মহা-পুরুষকে আরো আঁকড়িয়া ধরেন।

কেশব সেন একদিন সখেদে রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "মশাই, বলে দিন, কেন আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না।"

ঠাকুরের জীবন ঈশ্বরধৃত। ঈশ্বরময় তিনি হইয়া গিয়াছেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁহার মুখে মনরাখা কথা শোনা যায় না। সোজা বলিয়া দিলেন, "লোকমান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছো কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ (ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুষি। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন চী

করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। তুমি মোড়লী করছো, মা ভাবছে— ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। এভাবে আছে তো থাক্।"

শিবনাথ শাস্ত্রী এক সময়ে প্রায়ই রামকৃষ্ণের কাছে যাইতেন। কিন্তু তাঁহার ভাব-সমাধি যে কি বস্তু তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কেহ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে শিবনাথ মত প্রকাশ করিতেন—এই ভাবসমাধি স্নায়ুবিকার প্রসূত।

সেদিন আচার্য শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে কোণ্ঠাসা করিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "হ্যাগো শিবনাথ, তুমি নাকি এ-গুলোকে রোগ বল? আর বল যে, ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব জড় জিনিসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকবে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য হলুম! এ কোন্ দিশি বুদ্ধি তোমার?"

শিবনাথ নির্বাক, নতশির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বিষয়ী ও অর্ধ বিষয়ী লোকের ভিড়ে রামকৃষ্ণ কেবলি হাঁপাইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু কই? যে শুদ্ধসত্ত্ব, ত্যাগ-বৈরাগ্যবান্ সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন, তাহাদের তো এখনো দেখা নাই। জগজ্জননী যে নিজে বলিয়াছেন তাহাদের আগমনের কথা। সে কথা তো মিথ্যা হইবার নয়। কিন্তু ঠাকুর যে আর ধৈর্য ধরিতে পারেন না।

এক একটা দিন চলিয়া যায়, আর তাঁহার বিরহযন্ত্রণা হয় তীব্রতর। হতাশ হইয়া ভাবিতে বসেন—আরও একটা দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল, কই? যাহাদের আসিবার কথা, তাহারা তো আজো আসিল না!

সন্ধ্যার আকাশে অন্ধকার নামিয়া আসে। মন্দিরের আরতির শব্দ দূরে—বহুদূরে মিলাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ির ছাদে চুপি চুপি উঠিয়া যান। তারপর সেখানে গিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে থাকেন, "ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয়। তোদের না দেখে যে আর আমি একদিনও থাকতে পারছিনে।"

মিলনের লগ্ন আসিয়া যায়। এবার একের পর এক আসিতে থাকে শুদ্ধাত্মা, মুমুক্ষু ভক্তের দল—রামকৃষ্ণের আদর্শের ইহারা ধারকবাহক, নব ধর্মান্দোলনের এক একটি স্তম্ভ।

চিহ্নিত শিষ্যদের কাহার কি পরিচয়, কে কোন্ দিক হইতে আসিতেছেন কোনো কিছু ঠাকুরের অজানা নয়। এক একদিন মনের আনন্দে দু'এক কথা প্রকাশও করেন। দেখা হইলেই পরম আত্মীয়ের মতো তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় এই ভক্ত সাধকদের গড়িয়া তোলার পর্ব।

অদ্ভুত অধ্যাত্মশিল্পী এই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ! বিস্ময়কর তাঁহার সৃজনী প্রতিভা। আর অমোঘ তাঁহার অলৌকিক সাধন শক্তির স্পর্শ। দূরসন্ধানী দৃষ্টি দিয়া প্রতিটি শিষ্যের অন্তস্তল দিনের পর দিন তিনি দেখিতেছেন, নিপুণ হস্তে করিতেছেন রূপান্তরিত। সর্বজ্ঞ এবং শক্তিধর সদ্গুরুরূপে সদা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাঁহাদের সূক্ষ্মতম চিন্তাতরঙ্গ।

সাধক ভক্তদের উপর ঠাকুরের কৃপা বর্ষণের কথা জানাইতে গিয়া লীলা-প্রসঙ্গকার সারদানন্দজী লিখিয়াছেন—

"প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করাইতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোনো কোনো স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্মুখী

হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কার সকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে উহার প্রভাবে কাহারও দিব্যজ্যোতি মাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতির্ময় মূর্তিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দ কাহারও হৃদ্‌গ্রন্থি সকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশে ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্বিকল্প সমাধির পূর্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত।

"তাঁহার নিকট আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না।

"তারকের মনে ঐরূপ বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থি সকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্বিকল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই দেখা গিয়াছিল।

"ভক্তাদিগের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপ স্পর্শ করা ভিন্ন কখনও কখনও আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠীবিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না, কিন্তু যোগদৃষ্টি সহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্র নির্দেশ করিয়া দিতেন।"

নবাগত তরুণ সাধকেরা ঠাকুরের কাছে আসেন। নিজস্ব সমস্যার কথা, অভিজ্ঞতার কথা জানাইয়া নির্দেশ চান। এ সময়ে ঠাকুর যেন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সখা, সুহৃদ। সাধ্য ও সাধন সম্পর্কে ফাঁকা আওয়াজ তাঁহার নাই। উঁচুতে বসিয়া, নাগালের বাহিরে থাকিয়া উপদেশ বর্ষণ করিয়া তিনি কর্তব্য সমাধা করেন না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া একান্ত অন্তরঙ্গতায় আশ্রিতের হাতটি ধরেন। তাহার পর ধীরে ধীরে টানিয়া নেন তাহাকে পরম প্রাপ্তির দিকে।

সে-বার এক তরুণ ভক্ত সখেদে কহিলেন, 'ঠাকুর, আমার যে কাম যাচ্ছে না, এত সাধনভজন ক'রে চলেছি কিন্তু মাঝে মাঝেই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য এসে পড়ছে। কি করবো, আমায় বলে দিন।"

ঠাকুর যেন প্রশ্নকর্তার এক প্রবীণ বন্ধু। তাহাকে কাছে বসাইয়া আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়া কহিতে লাগিলেন—

"ওরে, ভগবৎদর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা, ভগবানের দর্শন হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস্, আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল, কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, এমনি কামের তোড় এলো যে, আর যেন সামলাতে পারিনি। তারপর ধুলোয় মুখ ঘষড়ে কাঁদি আর বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও ভাববো না যে কাম জয় করেছি',—তবে যায়।

"কি জানিস—তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্ না। বান যখন আসে, তখন কি আর বাঁধ বাঁধ টাঁধ মানে? বাঁধ উপচে ভেঙে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধানক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়।

"তবে বলে—কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। আর, মনে একবার আধবার কখনো কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখনো কখনো শরীরের ধর্মে আসে যায়—শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মতো মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেইরকম ওই ভ বগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান ক'রে মনে আনবি না।

"আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বশ মানবে।"

গম্ভীরাত্মা, বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ। কিন্তু মুমুক্ষু বালক ভক্তদের নিয়া এক একদিন কি হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গই না তুলিয়া দেন। যে কক্ষটিতে প্রতিদিন জ্ঞান, বৈরাগ্য আর ঈশ্বরতত্ত্বের সুগভীর আলোচনা হয়, সেখানে অনাবিল হাস্যরসের ঝড় বহিয়া যায়। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে অনেক সময় বলেন, "দ্যাখো, আমি এ ছোকরাদের কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁষ ধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হলে আসবে কেন?"

ঠাকুরের ভক্ত কথামৃত-কার শ্রীম একদিনকার এরূপ একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতেছেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। নিজের ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসাইতেছেন। কীর্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায়ের সঙ্গে গান গাহিতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া। হাতে রঙীন রুমাল। মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুতু ফেলিতেছেন। আবার যদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে—'আসুন'। আবার মাঝে মাঝে হাতের তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।"

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের এ এক লীলারঙ্গ, অপূর্ব রসোচ্ছল ভাব। হাত নাড়িয়া মুখ বাঁকাইয়া একাই তিনি ঢপওয়ালীর অভিনয় জমাইয়া তুলিতেছেন, আর অন্তরঙ্গ বালক ভক্তদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে তুমুল হাস্যরোল। একটি ভক্তের বয়স বড় কম, ঠাকুরের কাণ্ড দেখিয়া সে তো হাসিয়া লুটোপুটি।

ঠাকুর তৃপ্তির হাসি হাসিয়া কহিতেছেন, "ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

পরক্ষণেই আবার এ বালক ভক্তটিকে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন, "ওরে পল্টু, দেখিস তোর বাবাকে যেন এসব কথা বলিসনি। যা-ও আমার ওপর এক-আধটুকু টান ছিল, তা-ও তাহলে যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।"

ভক্ত নরেন্দ্রনাথ তখন জীবনযুদ্ধে বড় ক্ষতবিক্ষত, চরম দারিদ্র্যের আঘাতে মুহ্যমান। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িয়াছে। অথচ বহু চেষ্টায় একটা চাকুরী জুটাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা, বাড়ির একটা সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, তারপর একেবারে অধ্যাত্মজীবনের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। কিন্তু ঠাকুরের হিসাব অন্য প্রকার। তাঁহার মতে, ঈশ্বরপ্রেম যখন উত্তাল হইয়া উঠে, বিরহের তীব্রতায় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, সাংসারিক বিলিব্যবস্থার কথা, সতর্কতার কথা, তখন প্রকৃত মুক্তিকামী ভক্তের মনে উঠিবে কেন?

সেদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। সারা দেহে মনে ক্লান্তি আর বিষাদের ছাপ। ঠাকুর এমন সময় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বক্রোক্তির বাণ ছাড়িতে লাগিলেন। ভক্ত মাস্টারমহাশয় কাছেই উপবিষ্ট। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, "দ্যাখো, যে বড় ঘরের ছেলে তার খাবার ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মাসোহারা পায়। আচ্ছা নরেনের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন, বল তো ? ভগবানে মন সবটা সমর্পণ করলে তবে তো তিনি সব যোগাড় ক'রে দেবেন।"

একটু পরেই এ প্রসঙ্গের জের টানিয়া ঠাকুর শুরু করিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি। কহিলেন, "একটা মাগীর ভারি শোক হয়েছিল। আগে নথ্‌টা কাপড়ের আঁচলে সে বাঁধলে, তারপর—'ওগো, দিদিগো আমার কি হ'লো গো' বলে সকলের সামনে আছড়ে পড়লো ; কিন্তু খুব সাবধান রয়েছে সে, নথটা যেন ভেঙে না যায় !"

সকলে হাসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরের এই শাণিত বিদ্রূপের খোঁচা সেদিন নরেনের মর্মে গিয়া বিঁধিল। মন মেজাজ এমনিতেই তেমন ভাল নয়। কক্ষের মেঝেতে শ্রান্ত দেহটি ধীরে ধীরে এলাইয়া দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ভক্তপ্রবর মাস্টারমহাশয় ঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে কৌতুকোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন। স্মিতহাস্যে নরেনের দিকে চাহিয়া ফোড়ন কাটিলেন, "একেবারে শুয়ে পড়লে যে !"

মাস্টারমহাশয় নরেনের চাইতে বেশী সংসারী। মুহূর্তমধ্যে ঠাকুর তাঁহার লক্ষ্য ঘুরাইয়া নিয়া মাস্টারের দিকে তাক্ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হানিলেন তীক্ষ্ণতর শ্লেষ ও ব্যঙ্গভরা উক্তি, "এ যেন সেইরকম কথাই হ'লো—আমি তো আছি নিজের ভাশুরকে নিয়ে তাইতেই লজ্জায় মরি, অন্য মাগীরা পরপুরুষ নিয়ে থাকে কি ক'রে লো ?"

তরুণ ভক্তদের তুমুল হাস্যরোলে সারা ঘর মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু হাসি ও ব্যঙ্গোক্তির অন্তরালে যে তীক্ষ্ণ শায়ক ঠাকুর সেদিন নিক্ষেপ করেন তাহা প্রবিষ্ট হয় সাধনপ্রয়াসী সকল ভক্তেরই মর্মমূলে। পূর্ব-পশ্চাৎ ভাবিতে গেলে যে ঈশ্বরপ্রেমের স্রোতে ঝাঁপ দেওয়া যায় না, এ সার কথাটি তাঁহারা আর কখনো বিস্মৃত হন নাই।

আবার এই রঙ্গ উচ্ছল আপনভোলা মহাপুরুষের দেখা যায় আর এক কঠোর রূপ। কঠিন শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া শিষ্যদের তিনি দিনের পর দিন গড়িয়া তোলেন। ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধ্যান জপের মধ্য দিয়া তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনকে করিয়া তোলেন কেন্দ্রীভূত। তীক্ষ্ণ সজাগ নয়ন দুইটি নিরন্তর ভক্তশিষ্যদের পাহারা দিয়া চলে। কোনো ক্ষুদ্রতম ত্রুটিবিচ্যুতি, কোনো ফাঁকি তাঁহার এই শ্যেন দৃষ্টিকে এড়াইয়া যাইতে পারে না।

রাখাল মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র। স্নেহ ও আদর দিয়া সদাই ঠাকুর তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন। হঠাৎ একদিন রহস্যচ্ছলে কোনো সঙ্গীর কাছে রাখাল মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অন্তর্যামী ঠাকুরের কাছে এ তথ্যটি অজানা রহে নাই। দোষ যত নগণ্যই হোক্ ভক্তের কল্যাণের জন্য উহা সংশোধন করিতেই হইবে। রাখালকে তিনি চাপিয়া ধরিলেন। কঠোর স্বরে কহিলেন, "ওরে, তোর মুখ ওরকম দেখছি কেন ? নিশ্চয়ই তুই আজ মিছে কথা বলেছিস।"

দোষ স্বীকার করিয়া তবে রাখাল নিষ্কৃতি পান।

ভাতের সহিত একটু বেশী পরিমাণ ঘি খাওয়া ভক্ত নিরঞ্জনের চিরকালের অভ্যাস। নতুবা ভোজনে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। ব্যাপারটি নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু রামকৃষ্ণ ইহা নিয়াই এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। নিরঞ্জন সেদিন কেবলমাত্র ভাতের থালাটি নিয়া

খাইতে বসিয়াছেন, চটি ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া দ্রুতপদে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা! অত ঘি খাওয়া! শেষকালে কি তুই লোকের ঝি বউ বার করবি?"

নিরঞ্জন সৎ ও শুদ্ধাচারী সাধক। তাই বিশেষ করিয়া এ মন্তব্যে বড় মর্মাহত হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের তিরস্কারে মিতাচার ও কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শটি চিরতরে তাঁহার মনে গাঁথা হইয়া গেল।

শিষ্যদের অধ্যাত্ম-রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঠাকুরের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত লোকোত্তর রূপ! সেখানে তিনি মহাশক্তিধর আচার্য, সদ্‌গুরুসত্তার মহিমময় প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। শিষ্যদের জীবনতরীর তিনি কাণ্ডারী। অবলীলায় এই তরীকে পৌঁছাইয়া দিতেছেন ওপারে।

অতীন্দ্রিয় রাজ্যের চাবিকাঠিটি রহিয়াছে তাঁহার হস্তে। শুধু কথায় ও স্পর্শে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে; শিষ্যদের জীবনে আসিতেছে নব নব অধ্যাত্ম অনুভূতি। শুধু দৃষ্টি সম্পাতে ও পদাঙ্গুষ্ঠের ছোঁয়ায় ঘটিতেছে মানুষের নবজন্ম।

রাখাল তখন খুব কঠোর সাধনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মনে বড় দুঃখ, অলৌকিক দর্শন কিছু হইতেছে না। ঠাকুরকে মাঝে মাঝেই এজন্য অনুযোগ দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহার কৃপা হইল, কহিলেন, "আচ্ছা, যা—মা তোকে কিছু দেখাবেন।"

সেই দিনই এক কাণ্ড ঘটিল। রাখাল মহারাজ মন্দিরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। সম্মুখে দেখিলেন এক দিব্য জ্যোতির স্রোতধারা। শুধু তাহাই নয়, এই স্রোত তাঁহারই দিকে ধাইয়া আসিতেছে। নবীন সাধক বড় ঘাবড়াইয়া যান, ছুটিয়া মন্দির হইতে বাহির হন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়েন।

অন্তর্যামী গুরু সবই জানেন। হাসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে, ঝট্‌পট্‌ দর্শন-টর্শন চাইবি, আবার পালিয়েও আসবি। তা হলে কি ক'রে হবে বল্‌ তো?"

আরো কিছুদিন পরের কথা। একনিষ্ঠ কঠোর সাধনভজনের ফলে রাখাল মহারাজের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক বিভূতি স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মনের অভ্যন্তর তিনি অনায়াসে দেখিতে পান। নূতন সাধক—তাই মাঝে মাঝে এসব দেখার জন্য কিছুটা ইচ্ছা মনে জাগে। অচিরেই ঠাকুর এ ইচ্ছার মূলোৎপাটন করিলেন।

রাখালকে ডাকিয়া আনিলেন। তারপর তীব্র ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "ওরে, তোর এমন হীন বুদ্ধি কেন রে? কোথায় শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধন-ভজনে মেতে থাকবি, তা না অষ্ট-সিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস।"

প্রথম সাক্ষাতের মাসখানেক পরে নরেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে ঠাকুর দক্ষিণ পদদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের সম্মুখে খুলিয়া গেল এক অপূর্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতার দ্বার।

দেখিলেন, কক্ষের সব কিছু বেগে ঘূর্ণমান হইয়া নিঃসীম আকাশে মিশিয়া গেল। তাঁহার আমিত্ব বোধও তখন লোপ পাইবার পথে। মহাশূন্যের সহিত সমস্ত কিছু অস্তিত্ব যেন একাকার হইতে চলিয়াছে। আমিত্বের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতেছে সর্ববিলুপ্তি! সর্বগ্রাসী মৃত্যু তাঁহার কাছে আগাইয়া আসিতেছে।

নরেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমার এ কি করলে। আমার যে মা ভাই সব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর কহিলেন, "আচ্ছা তবে এখন থাক্। একবারে কাজ নেই, কালে হবে।"

অতঃপর নরেনের নব রূপান্তর সাধনে দেরি লাগে নাই। ঠাকুর তাঁহার ঐশী লীলার প্রধান পরিকরকে, তাঁহার এই বাণীবাহককে, পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে নরেন ফুটিয়া উঠেন তাঁহার 'সহস্রদল কমল'-রূপে, স্বামী বিবেকানন্দরূপে আধুনিক ভারতের প্রাণশক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। প্রতীচীর দ্বারে এই মহাসাধক ভারতের শাশ্বতবাণী পৌঁছাইয়া দেন, গড়িয়া তোলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার মহা-মিলনের সেতু।

এক জোড়া চটি পায়ে, কাপড়ের খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া সাধারণ পূজারী বামুনের মতোই চলাফেরা করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। বাহিরের লোকের চোখে নিরীহ ভক্ত মানুষটি। শুধু অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা জানেন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। জানেন, তাঁহার কৃপা মুহূর্তে আনিয়া দেয় উচ্চতর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি, সাধকজীবনের বৃন্তে অবলীলায় ফোটায় বর্ণাঢ্য পুষ্পদল।

সাধনরত তারকের বুকে রামকৃষ্ণ সেদিন পদস্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এক বিস্ময়কর কাণ্ড! তরুণ ভক্ত ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া যান। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া দেখেন, ঠাকুর তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন আর অস্ফুটস্বরে কহিতেছেন, "মা, নেমে এসো নেমে এসো।"

ঠাকুর আর তাঁহার মায়ের এ কৃপালীলা দেখিয়া ভক্ত শিষ্যেরা বিস্ময়-মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে।

ভক্ত কালী তখন একাগ্রমনে সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। ধ্যানে বসিয়া ইষ্ট ও দেব-দেবীর কত চিন্ময়মূর্তি দর্শন করেন, ঠাকুরকে প্রায়ই এসব অভিজ্ঞতার কথা জানাইতেও থাকেন। পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। হঠাৎ ঠাকুর একদিন বলিয়া দিলেন, "ওরে, তোর এসব দর্শন-টর্শন আর হবে না।"

সেদিন হইতে ঘটিলও সেইরূপ। নবীন সাধক ইহার পর হইতে আর কোনো চিন্ময়-মূর্তি দেখেন না। শক্তিধর ঠাকুরের নির্দেশে বশংবদের মতো সেগুলি কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞানপন্থী তরুণ শিষ্যের সাধনা ও সিদ্ধির পথে এই ব্যবস্থাই ঠাকুর সেদিন কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন।

বিশাল ও বিচিত্র এই রামকৃষ্ণরূপী সদ্‌গুরুসত্তার মহাসমুদ্র। ভক্ত ও শিষ্যদের পক্ষে ইহার কূল-কিনারা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সেদিন এক গৃহী ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া লাটু মহারাজকে এক-জোড়া নূতন চটি দিয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া গেল। বাৎসল্য রসে ভরপুর ঠাকুর একথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল, তিনি ঐ হারানো চটির পাটির জন্য বাগানে খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়াছেন।

লাটু পড়িয়াছেন মহাবিপদে। কাতর কণ্ঠে তিনি অনুনয় করিতে লাগিলেন, "দোহাই আপুনার হামার চটির লিয়ে আপুনাকে এমন ঢুঁড়তে হবে না। হামার এতে পাপ হোবে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নন। ঝোপঝাড়গুলি দেখিতেছেন

আর সখেদে বলিতেছেন; "তাই তো রে, নতুন জুতো জোড়া। মোটেই তোর ভোগে এলো না।"

লাটু মহারাজ অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "রাম রাম, হামার জুতোর জন্যে আপুনি এত্তো কষ্ট কেনো করছেন। হামার দিনটাই আজ একেবারে খারাপ যাবে .

ঠাকুর উত্তরে শুধু কহিলেন, "ওরে, দিন কি এতে খারাপ যায়? সেই দিনই খারাপ যাবে যেদিন ভগবানের নাম নিবিনে।"

ভোরে তো এই জুতো-উদ্ধার পর্ব। পুত্রপ্রতিম লাটুর জন্য কোমলহৃদয় ঠাকুরের খেদের অন্ত নাই। আবার সন্ধ্যায় দেখি মুমুক্ষু সাধক শিষ্যের উদ্ধার পর্ব। সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুর এক শক্তিধর মহিমোজ্জ্বল রূপ!

সে-দিন সায়াহ্নে লাটু মহারাজ ধ্যানে বসার পর চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। চোখ দুইটি শিবনেত্র, মুখ দিয়া কেবলি বাহির হইতে থাকে গোঁ-গোঁ শব্দ। সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর ছুটিয়া আসিলেন, নিজের হাঁটু দিয়া লাটুর বুকে ঘষিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। লাটু ইতিউতি চাহিতেছেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "তুই আজ মা কালীকে দেখেছিস, তাই না? চুপ কর শালা, চুপ কর! নইলে এখনি চারদিকে সোরগোল পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের অপার করুণা আশ্রিত ভক্তদের উপর। কত আশা ও আশ্বাসের বাণীই না এই দেবমানবের কণ্ঠে সদাই উদ্‌গত হয়।

ভক্ত যোগীন সে-বার বিবাহ করিয়াছেন। মনে মনে তাঁহার মহা ভয়, ঠাকুর হয়তো এ দোষে তাঁহাকে ত্যাগই করিবেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যিনি সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান, শিষ্যের এ ত্রুটি কি তিনি সহজে ক্ষমা করিবেন?

যোগীন ভয়ে ভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ঢুকিতে যাইতেছেন। দূর হইতে সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঠাকুর পরনের কাপড়টি বগলে চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারই জন্য তিনি অপেক্ষমান। ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "ওরে, আয় আর ভয় কি? এখানকার আশীর্বাদ থাকলে ওরকম একলাখ্ বিয়ে করলেও ক্ষতি হয় না।"

যোগীনের অন্তর হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়া গেল।

গিরিশ ঘোষ ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নাট্যকার ও নটের অসামান্য প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও ক্ষুরধার বুদ্ধির দিক দিয়া তিনি অতুলনীয়, কখনো কাহারো কাছে মাথা নোয়ান না। কিন্তু ঘোর মাতাল ও দুরন্ত তিনি।

এই গিরিশ দক্ষিণেশ্বর বাগানে গিয়া ঠাকুরের কাছে মাতলামি করিয়াছেন, এক এক সময়ে বেসামাল হইয়া তাঁহার পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ করিতেও ছাড়েন নাই। ঠাকুর কিন্তু করুণার মূর্ত বিগ্রহ। অসামান্য ধৈর্য নিয়া এই দুর্দান্ত ভক্তের পরিবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নটবৃত্তি, মদ্যপান, কোনো কিছুতেই বাধা দেন নাই। অপার করুণারাশি তাঁহার নয়ন হইতে সতত ঝরিয়া পড়িয়াছে। কেহ কখনো গিরিশের মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ জানাইলে তিনি শুধু কহিয়াছেন, "থাক্ না শালা, ক'দিন খাবে!"

এ করুণা, এ হৃদয়বত্তার তুলনা কই? গিরিশের কাছে ইহাই হইল ঠাকুরের ভগবত্তার প্রমাণ। ঠাকুরকে তিনি বিশ্বাস করিলেন ভগবান্ বলিয়া। তারপর একদিন ঠাকুরের প্রেরণায় তাঁহাকে বকল্‌মা দিলেন, চরণে করিলেন আত্মসমর্পণ।

কিন্তু গিরিশের এ ভক্তি বিশ্বাস সব সময়ে তো স্থির থাকে না। যুক্তিবাদী মনে মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগিয়া উঠে, ঠাকুরকে বাজাইয়া নিতে উৎসুক হন।

সেদিন এক অভিনেত্রীর বাড়িতে গিরিশের নিমন্ত্রণ। পান-ভোজনে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। অভিনেত্রীটি সে রাত্রির জন্য তাঁহাকে সেখানেই থাকিয়া যাইতে বলিল। গিরিশ সাধারণত অন্যত্র রাত্রিবাস করেন না। এই দিন এক দুষ্টবুদ্ধি তাঁহার মাথায় জাগিল। ভাবিলেন, দেখাই যাক্‌না, এ প্রলোভনের স্থানে ঠাকুর তাঁহাকে রক্ষা করেন কিনা। গৃহকর্ত্রীর অনুরোধে রাজী হইয়া পড়িলেন।

এদিকে রাত্রি যত গভীর হইতেছে, গিরিশ ততই তাঁহার শরীরে বোধ করিতেছেন এক তীব্র জ্বালা। এ জ্বালা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। এ গৃহে তিনি আর এক মুহূর্ত যে টিকিতে পারিতেছেন না। অভিনেত্রীটিকে কহিলেন, "ওগো, বাড়িতে যে চাবির গোছাটা ফেলে এসেছি। হারিয়ে গেলে মহাবিপদ হবে। আর তো তোমার এখানে থাকতে পাচ্ছিনে।"

বাড়িতে ফিরিয়া ঘুম আর হয় নাই। প্রত্যূষে উঠিয়াই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। কাতরকণ্ঠে রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, "ঠাকুর, কেন কাল আমি এমন সঙ্কটে পড়লাম? বলুন, তবে কি আপনি আমার বকলমা নেন নি—আমায় গ্রহণ করেন নি? আবার কি আমায় সেই অধঃপতনের পথেই নেমে যেতে হবে "

ঠাকুর এতক্ষণ গিরিশের কথা শুনিতেছেন আর মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। এবার দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "সেটি আর কখনো হবে না। শালা, তুই কি ভেবেছিস, তোকে ঢ্যামনা সাপে ধরেছে যে পালিয়ে যাবি? তা নয় রে তা নয়। এ যে জাত সাপের ধরা। তিন ডাকেই চুপ করতে হবে। কোনো রকমে পালিয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে থাকতে হবে।"

সত্যই তাই। ঠাকুরের সর্ববিস্তারী কৃপার কবল হইতে গিরিশ সারা জীবন আর ছাড়া পান নাই। জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে। মনের নেশা ও অহঙ্কারের স্থান আর সেখানে হয় নাই।

বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুর বড় প্রচ্ছন্ন থাকেন, যেন নিতান্ত এক সাধারণ ভক্ত সাধক তিনি। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দেখা যায় তাঁহার শক্তির প্রকাশ।

সে-বার পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। এদিকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তির কথা শুনিয়া বালকস্বভাব ঠাকুর তো ভয়েই অস্থির। এদিনকার দৃশ্যটি বড় কৌতুকাবহ! ঠাকুর নিজেই ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "দেখছোই তো, এখানে ওসব লেখাপড়া-টড়া কিছু নেই। মুখ্য-শুখ্যু মানুষ। পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হ'লো। এই তো দেখছো, পরনের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না। কি বলতে কি বলবো, ভেবে একেবারে জড়োসড়ো হলুম।"

"মাকে বললুম, দেখিস মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর-মাস্তর কিছুই জানিনে। দেখিস।

"তারপর একে বলি—'তুই তখন থাকিস্'। ওকে বলি—'তুই আসিস, তোদের সব দেখলে তবু ভরসা হবে'।

"পণ্ডিত যখন এসে বসলো, তখনো ভয় রয়েছে। চুপ ক'রে বসে তার দিকেই

দেখছি, তার কথাই শুনছি। এমন সময় দেখছি কি যেন তার ভেতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে —শাস্তর-মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্য না হ'লে ওসব কিছুই নয়! তার পরেই সড়সড় ক'রে একটা কি এই শরীরের ওপরের দিকে, মাথায় উঠে গেল। ভয়-ডর সব কোথায় চলে গেল। একেবারে বিব্ভুল হয়ে গেলুম! মনে হতে লাগল, মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন কথার ফোয়ারা বেরুচ্ছে। আর যত বেরুচ্ছে, তত ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্ছে। কামারপুকুরে ধান মাপবার সময় যেমন রামে রাম, দুইয়ে দুই ব'লে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে ধানের রাশ ঠেলে দেয়, সেই রকম। কিন্তু কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জানিনে। যখন একটু হুঁশ হ'লো, তখন দেখছি কি, পণ্ডিত কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে। ঐ রকম একটা অবস্থা মাঝে মাঝে হয়।"

আর একদিনের অনুরূপ ঘটনার কথাও তাঁহার নিজের মুখে মাঝে মাঝে শুনা যাইত—

"কেশব সেদিন খবর পাঠাল, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন সাহেবকে (ভারত ভ্রমণে আগত পাদ্রী কুক্ সাহেব) সঙ্গে নিয়ে আসছে। সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাউতলার দিকে শৌচে যাচ্ছি! তারপর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিয়ে ছিল! আর কত কি বলেছিলুম। পরে সবাই বলতে লাগলো খুব উপদেশ নাকি দিয়েছিলুম। আমি কিন্তু বাবু কিছুই জানি নি।"

নরেন হইতেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্ব, বৈরাগ্যবান্ শিষ্যদের মধ্যমণি। প্রথম হইতেই ঠাকুর তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া নিয়াছেন তাঁহার প্রধান পরিকররূপে। নরেনের ত্যাগ বৈরাগ্য আর সহজাত জ্ঞানের প্রশংসায় তিনি একেবারে পঞ্চমুখ। একদিন সোৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন, "দেখলাম, কেশবের ভেতর একটা শক্তি, যার ফলে সে জগৎবিখ্যাত হয়েছে, আর আমাদের নরেনের ভেতর রয়েছে সে রকম আঠারোটা শক্তি।

আবার কখনো বা সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া ঠাকুর নরেন সম্বন্ধে কহেন, "ও জ্ঞান খড়্গ সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে ফেলেছে। মহামায়া তাই তো ওকে নিজের আয়ত্তে সহজে আর আনতে পারছে না।"

একদিন ঠাকুর বলিয়া বসেন, "নরেন খাপ্খোলা তলোয়ার। ও অখণ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ ঋষি।"

শক্তিমান্ সাধক নরেনকে ঠাকুর তাঁহার ভালবাসার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলেন। আবার ঠাকুরের মধ্যে যে ঐশ্বরীয় ভাব, ভাবগত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া নিতে নরেনেরও বেশী দেরি হয় নাই।

দিনের পর দিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বামুনের অলৌকিকত্ব। উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার মাহাত্ম্য। তাঁহার হাতেই যে রহিয়াছে অধ্যাত্মশক্তির স্পর্শমণি! সামান্যতম কৃপাসম্পাতে এই মহামানব মানুষের পরমপ্রাপ্তি ঘটাইয়া দিতে পারেন।

ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া নরেন তাঁহার সাধননির্দেশ গ্রহণ করিতেছেন, উচ্চতর অনুভূতি ও উপলব্ধির দ্বার উন্মোচিত হইতেছে দিনের পর দিন। অধ্যাত্মজীবন হইয়া উঠিতেছে পূর্ণতর।

কঠোরতপা নরেনকে ঠাকুর একদিন ডাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল্ দেখি, তুই কি চাস্।"

উত্তর হইল. "আমার ইচ্ছে হয়, শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে, আবার সমাধিতে চলে যাই।"

"ছি! ছি! তুই এত বড় আধার। তোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলাম, তুই বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে তা না হয়ে তুই কিনা নিজে মুক্তি চাস? এ তো তুচ্ছ কথা, অতি হীন কথা রে! না না, অত ছোট নজর করিস নি।"

আর একদিন নরেনের সমাধি ও উচ্চতম অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শেষে ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া আনেন। বলেন, "কেমন রে। মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার এই কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার চাবি খুলে দেব।"

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতৃত্বে আর ঐশ্বরীয় কর্মের দায়িত্বভার নিবার যোগ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে গড়িয়া তোলেন, কর্মময় মহাজীবনের শেষ অঙ্কে সেদিনকার কথিত চাবিটিও তিনি খুলিয়া দেন।

১৮৮৫ সাল। রামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনদীপ এবার নির্বাণোন্মুখ হইয়া উঠে। মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তিনি আক্রান্ত হন। ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রথমে কলকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা করানো হয়। তারপর তাঁহাকে আনা হয় কাশীপুরে। আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোকচ্ছায়ায় ভক্তদের মধ্যে গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধন। উত্তরকালে রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সূচনা হয় সেদিনকার এই যোগসূত্রের মধ্য দিয়া।

ঠাকুর এখন যেন হইয়া উঠিয়াছেন এক স্পর্শমণি। কৃপাভরে যাহাকেই কাছে টানিতেছেন সেই-ই হইতেছে নূতন মানুষ।

এ সময়ে রোগশয্যায় থাকার কালে তাঁহার দেহে এক অপূর্ব, অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। এ সম্পর্কে নিজেই ভক্তদের তিনি বলিতেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছে—এ শরীরের ভেতর এখন এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাউকে ছুঁয়ে দিতেও হবে না। তোদের বলবো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাতেই অপরের চৈতন্য হবে।"

দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে দেখা যায়, ঠাকুর দিনের পর দিন কত গল্প করিতেছেন, তত্ত্বোপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অমৃতময় বাণী শুনিয়া ভক্ত দর্শনার্থীদের মন অপার তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। জটিল দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা তিনি অবলীলায় করিয়া দেন. সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন হইতে তুলিয়া ধরেন কত উদাহরণ। সত্যের সহজ সরল ব্যাখ্যানে লোকে অনুপ্রাণিত হয়। কল্যাণ ও আনন্দের সঞ্চয় নিয়া দর্শনার্থীরা ঘরে ফিরে।

ঠাকুরের এক ভক্ত সেদিন জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ঠাকুর, ভগবান্ সাকার না নিরাকার?"

উত্তর হয়, "ওরে, তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে ; আবার তাছাড়া আরো কি, তা কে জানে ? সাকার কেমন জানিস ? —যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়, আবার এই বরফের ভেতর বাইরে জল। বরফ জল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দ্যাখ্, জলের রূপ নেই—অর্থাৎ তার একটা বিশেষ কোনো আকার নেই। কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তি হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে সাগরের জল জমে বরফের মতো নানা আকার ধারণ করে।"

সাকার আর নিরাকার এর বহু বিতর্কিত প্রশ্নের এ এক সহজ মীমাংসা, অপরূপ ব্যাখ্যান।

ভক্তদের কাছে পরমতত্ত্বের আভাস দিতে গিয়া এক এক দিন ঠাকুর বলিতেন, "ওরে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কি সহজ কথা ? রাম, কৃষ্ণ এ সব অবতার তাতে কত থরে থরে ফুটে রয়েছে।"

সেদিন ভক্তপরিবৃত হইয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'সর্বজীবে দয়া' এই কথাটি তাঁহার কানে গেল, অমনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে অর্ধবাহ্যাবস্থা ফিরিয়া আসিল। তখন আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া ? দূর শালা ! কীটাণুকীট তুই। জীবকে আবার দয়া কি করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না না. জীবে দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা।"

নরেন্দ্রনাথ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের এ কথা কয়টি শুনিতে শুনিতে অভিভূত হইয়া গেলেন। এ যে বেদান্তের প্রজ্ঞানময় ভাষ্য !

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় পেলাম। বেদান্তজ্ঞান শুষ্ক, কঠোর বলেই আমরা জানি। ভক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এ বেদান্তকে কি সরস, কি মধুর ক'রে তুললেন। ঠাকুর যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারের সব কাজে তা অবলম্বন করা যায়।"

সত্যোপলব্ধির পথে মহাসাধক রামকৃষ্ণ ভক্তি, শক্তি ও জ্ঞানের ঘটনার এক অপরূপ মিশ্রণ, আশ্রিত ভক্তদের হৃদয়ে তিনি গাঁথিয়া দেন তাঁহার পরমতত্ত্ব। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের ভিন্নপন্থী সাধনা যে একই পরমপ্রাপ্তির সাগরে গিয়া বিলীন হয়—এ সত্য তাঁহার নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। যুগাচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ধ্বনিত করেন আধুনিক যুগের মহাসমন্বয় বাণী— যত মত তত পথ'।

শিষ্যদের সাধনা ও সিদ্ধির স্তরগুলিতে অহংবোধ যাহাতে মাথা উঁচাইয়া না দাঁড়ায় সেদিকে সদাই ঠাকুরের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ সম্পর্কে একদিন তাহাদিগকে সাবধান করিয়া কহিলেন—

"অনেকের ইচ্ছে হয়—গুরুগিরি করি, পাঁচজনে গণে মানে, শিষ্যসেবক হয়, লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়, কত লোক আসছে যাচ্ছে, শিষ্য-সেবক অনেক হয়েছে, ঘরে জিনিসপত্র কত থৈ থৈ কচ্ছে। এ গুরুগিরিও কিন্তু বেশ্যাগিরির মত ! ছার টাকাকড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা. এই সবের জন্যে আপনাকে বিক্রি করা ! যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়. এখন তার বেশ হয়েছে, একখানা ঘরভাড়া নিয়েছে, ঘুঁটেতে গোবরে, তক্তপোশ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা মাদুর তাকিয়া. কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে, অর্থাৎ,

সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই তার সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ি দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে। সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ!"

এই ধরনের তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক কথা শোনার পর ভক্ত শ্রোতাদের অন্তর হইতে গুরুগিরির ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

শুধু নানা উপদেশ ও তত্ত্বের ব্যাখ্যাই ভক্তেরা ঠাকুরের মুখে শুনে নাই, সেই তত্ত্বকে তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে দেখিয়াছে। তত্ত্বের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তৎ-এর মহনীয় রূপের আভা তাঁহার ভাগবতী তনুতে বিলসিত হইতে দেখিয়া দিনের পর দিন সকলে ধন্য হইয়াছে।

এ সময়ে প্রায়ই নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলিতে গিয়া ঠাকুর শিষ্যদের কহিতেন, "দ্যাখ্ এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই ঊর্ধ্বদিকে। সমাধি হলে আর তা নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর ক'রে নামিয়ে আনি। নামাতে নামাতে হয়তো আবার সেই ওপরের দিকে চোঁচা দৌড়ল।"

গলরোগের চিকিৎসা করার জন্য ঠাকুরকে তখন শ্যামপুকুরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসময়ে একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। কিছুদিন পূর্বে ঢাকায় থাকিতে ঠাকুর সম্পর্কে গোঁসাইজীর এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। ঠাকুর ও ভক্তদের কাছে বসিয়া সেই কাহিনীটিই তিনি বলিলেন—

কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া গোঁসাইজী ভগবৎ-চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছেন। একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! কলিকাতা হইতে ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিনি কি করিয়া এভাবে এখানে উপস্থিত হইলেন? দৃষ্টিভ্রম নয় তো?

ঠাকুর কি সূক্ষ্মদেহে আসিয়াছেন, না—একেবারে স্থূল দেহেই আবির্ভূত? পরখ করা দরকার। সম্মুখস্থ মূর্তির হাত পা গোঁসাইজী বহুক্ষণ টিপিয়া দেখিলেন। সত্যই যে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের সজীব দেহ। ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কেবল মিটিমিটি হাসিতেছেন।

ক্ষণপরেই এ মূর্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঠাকুরকে দেখাইয়া বিজয়কৃষ্ণ ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "দেশ বিদেশ, পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখেছি কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, কোথাও তার দু আনা, কোথাও এক এক আনা, কোথাও এক পাই আধ পাই মাত্র। চার আনাও কোনো জায়গায় দেখলুম না।"

ভক্তদের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর স্মিতহাসি হাসিতেছেন। হঠাৎ বালকের মতো বলিয়া উঠিলেন, "বিজয় এসব বলে কি গো!"

গোঁসাইজী ছাড়িবার পাত্র নন। যে বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্পর্শদ্বারা অনুভব করিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাহা উড়াইয়া দিতে চাহিলে তিনি মানিবেন কেন?

আবার কহিলেন, "দেখুন, সেদিন ঢাকাতে আমি যেমনটি দেখেছি, তাতে আপনি 'না' বললে আমি আর শুনছিনে। অতি সহজ হয়েই তো আপনি যত গোল বাধিয়েছেন। কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর। যখনই ইচ্ছে, এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি। আসতে কোনো কষ্টও নেই—নৌকা, গাড়ি সবই পাওয়া যায়। ঘরের পাশে এভাবে আপনাকে এত সহজে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝলাম না। যদি কোনো

পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে, গাছের শিকড় ধরে উঠে, আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তা হলে আমরা আপনার কদর করতাম। এখন মনে করি ঘরের পাশেই যখন এই রকম, তখন না জানি বাইরে দূর-দূরান্তে আরো কত ভাল ভাল সব রয়েছে। এ জন্যেই আপনাকে ফেলে আমরা ছুটোছুটি ক'রে মরি।”

অলৌকিক ভাব ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে বার বার দেখা গিয়াছে। কিন্তু সাধনজীবনের এ বৈশিষ্ট্য, এ পরিচয় এ মহামানবের জীবনে কখনো মুখ্য হইয়া উঠে নাই। তাঁহার সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনি লোকগুরু, সার্থক সাধকজীবন গঠনের এক অসামান্য অধ্যাত্মশিল্পী।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন, “মনের বাইরের জড় শক্তিগুলোকে কোনো উপায়ে আয়ত্ত ক'রে কোনো একটা অলৌকিক ব্যাপার সকলকে দেখানো বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগ্‌লা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙতো পিটতো, গড়তো, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করতো, এর চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখিনে।”

ভক্ত বুড়োগোপাল সে বার নানা তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা, এ উপলক্ষে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভোজন করান, বস্ত্রাদি দান করেন।

ঠাকুর তাঁহকে কহিলেন, “ওরে, কোথায় আবার সাধু খুঁজে বেড়াবি। এখানকার ছেলেরা সব বৈরাগ্যবান্। এদের খাইয়ে দে, তাতেই তোর কাজ হবে।”

ভোজন ও দানের ব্যবস্থাদি সব কিছু ঠাকুরের নির্দেশমতো সম্পন্ন হইল। নিজেই তিনি তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন গৈরিক বস্ত্র, একগাছা করিয়া মালা আর কমণ্ডলু।

শিষ্যদের জীবনে আন্তর সন্ন্যাসেরই এক ধারাস্রোত ঠাকুর হয়তো সেদিন উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

১৮৮৬ সালের পহেলা জানুয়ারী অপরাহ্ন কাল। কয়েকদিন ঘরে আবদ্ধ থাকার পর ঠাকুর সেদিন বাগানে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। পরক্ষণেই গিরিশ ঘোষের সঙ্গে দেখা। প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা গিরিশ, তুমি কি এখানে দেখেছ যে, অত কথা যাকে তাকে এমন ক'রে বলে বেড়াও?”

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই গিরিশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন, বলেন—তিনি অবতার। তাই ঠাকুরের এই প্রশ্ন।

গিরিশ তখনই ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন, কর-জোড়ে শুরু করিলেন তাঁহার স্তবস্তুতি।

ঠাকুরও তখন ভগবৎ-ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন। মুখমণ্ডল হইয়াছে দিব্য-ভাবে প্রদীপ্ত। আর আবেগোচ্ছল গিরিশ 'জয়-রামকৃষ্ণ' বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেছেন।

সেদিন অনেক গৃহীভক্ত কাশীপুরে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ঘিরিয়া তাঁহারা বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও ভাবে মাতোয়ারা। সকলকে কহিলেন, "তোমাদের আর কি বলবো তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।" সেদিন তিনি হইয়াছেন কল্পতরু। এক একটি ভক্তের বক্ষ স্পর্শ করিতেছেন আর দিব্য ভাবাবেশে সে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। লীলাময় ঠাকুরের স্পর্শে সেদিন এই গৃহী ভক্তদের সকলেরই প্রাণে আসে উদ্দীপনা, অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি লাভে সবাই বিহ্বল হয়।

ঠাকুরের ব্যাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভক্ত ও শিষ্যদের মনে তাই দুশ্চিন্তার অবধি নাই। আপ্রাণ চেষ্টায় সকলে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সেদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রোগযন্ত্রণায় ভুগিতে দেখিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "আপনার মতো লোক তো ইচ্ছেমাত্রই এ ব্যাধি দূর ক'রে দিতে পারে। তা'হলে একবার তা করলে হয় না?"

ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, "সে কি গো! তুমি পণ্ডিত হয়ে এ কথা কি ক'রে বলছো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাংসের খাঁচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয়?"

শশধর পণ্ডিত বিস্ফারিত নয়নে এ দেবমানবের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনো কথা সরিল না।

কিন্তু ভক্তদের এড়ানো দায়। নরেন ও অন্যান্য গুরুভাইরা দিনের পর দিন চাপ দিতে লাগিলেন, অন্তত ভক্তদের জন্য ঠাকুরকে তাঁহার এ রোগ সারাইতে হইবে। তিনি নিজে কিছু না করিতে চান মাকে তো বলতে পারেন!

অগত্যা ঠাকুরকে রাজী হইতে হইল। শিষ্যেরা সবাই ফলাফল জানিতে ব্যগ্র। নরেন্দ্র আসিয়া চাপিয়া ধরিলেন, "মাকে বলেছেন তো? কি জবাব পেলেন, বলুন।"

"ওরে, মাকে বললাম,—'মা, গলার এ ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে, যাতে দুটি খেতে পারি, তাই ক'রে দে।' তা মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'কেন, এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্!"

দেহাত্মবোধের ঊর্ধ্বে, অদ্বৈতজ্ঞানে যে মহাসাধক সদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন একথা ছাড়া জগন্মাতা আর তাঁহাকে কি-ই বা বলিবেন? ঠাকুরকে ভক্তগণ আর ব্যতিব্যস্ত করেন নাই।

অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি অপরূপ সৃষ্টি এই তরুণ ভক্তেরা। ইহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছেন, এবার প্রয়োজন প্রাণশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তোলা। এজন্য ঠাকুরের তৎপরতার অবধি নাই। সুযোগ পাইলেই নিবিড় করিয়া তাহাদিগের কাছে টানেন, একাগ্র করিয়া তুলিতে যত্নবান হন। মাঝে মাঝে নিজ স্বরূপের আভাস ইঙ্গিতও প্রদান করেন।

সেদিন রোগশয্যায় শায়িত নিজের দেহটি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া বলেন, "ওরে, যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সে-ই ইদানীং এই খোল্‌টার ভেতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেইরকম!"

মহাপ্রস্থানের দিনটির আর বেশী দেরি নাই। ঠাকুর সেদিন নরেন্দ্রনাথকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আর কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়তম

শিষ্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথও হইলেন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। নিস্পন্দ হইয়া তিনি উপবিষ্ট।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলাম। এই শক্তিতে তুই অনেক কাজ করবি। তারপর ফিরে যাবি।"

চিহ্নিত প্রতিনিধির মধ্যে ঘটিল শক্তি সঞ্চালন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। ঠাকুরের নরলীলা সেদিন শেষ দৃশ্যে আসিয়া পড়ে। মধ্যাহ্নের কিছু আগে যোগারূঢ় অবস্থায় চিরনিদ্রায় তিনি নিদ্রিত হন। যুগাচার্যের ভূমিকার শেষে মহাজীবনের উত্তরণ ঘটে জগন্মাতার অমৃতময় অঙ্কে।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ

বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবনের এক সন্ধিক্ষণে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। আপন সাধনা, সিদ্ধি ও আত্মিক আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়া সমকালীন সমাজ-বিবর্তনকে তিনি প্রভাবিত করেন, বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ভক্তি-আন্দোলনে জাগাইয়া তোলেন নূতন প্রাণ-স্পন্দন। এই শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয় সহস্র সহস্র মুমুক্ষু মানুষ।

অদ্বৈতবংশের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের গৃহে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। তরুণ বয়স হইতেই জীবনে জাগে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা—ঈশ্বরলাভ তাঁহাকে করিতেই হইবে, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে পরমসত্যকে ; এজন্য কোনো ত্যাগ, কোনো দুঃখেই তিনি পরাঙ্মুখ হইবেন না ; সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানিবেন, অর্জন করিবেন ব্রহ্মজ্ঞান।

সত্য সাক্ষাতের এই মহান্ ব্রত বিজয়কৃষ্ণকে ঠেলিয়া দেয় চরম ত্যাগ-তিতিক্ষাময় জীবনের পথে।

গোড়ার দিকে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন ব্রাহ্মসমাজের আবর্তে—পদে পদে চলিতে থাকে সত্যধৃত জীবনের নির্ভীক সংগ্রাম। তারপর আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে সদ্‌গুরুর সহিত মিলন ঘটে। কঠোর তপস্যার বলে অপরিমেয় যোগৈশ্বর্য তিনি আহরণ করেন, গুরুর আদেশে অবতীর্ণ হন আচার্যের ভূমিকায়। অকৃপণ করে বিতরণ করিয়া যান অধ্যাত্মসম্পদ।

জীবনের এই বিচিত্র গতিপথে বিধাতা তাঁহাকে নিয়া কত খেলাই না খেলিয়াছেন! কত স্রোতাবর্ত রচিত হইয়াছে। জীবনধারায় সৃষ্ট হইয়াছে কত আলো-আঁধারের মায়া। তারপর দিব্য চেতনায় উদ্‌ভাসিত হইয়া এই জীবনধারা মিশিয়াছে মুক্তির মহা পারাবারে।

সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গোঁসাইজী গ্রহণ করেন যোগীবর পরমহংসজীর প্রদত্ত সাধনা ; সিদ্ধিলাভের পর উত্তরজীবনে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন মহাপ্রেমিক বৈষ্ণবাচার্যরূপে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের এক প্রধান ধারক ও বাহকরূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

এই মহাজীবনের তাৎপর্যের কথা বলিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, "এদেশের সমাজ-চেতনায় বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রভাব সুদূর প্রসারী—এ প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মতো সময় আজিও আসে নাই।"

ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২রা আগস্ট তারিখে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন।

পিতা আনন্দচন্দ্র গোস্বামী বৈষ্ণবীয় দৈন্যের প্রতিমূর্তি এক পরম ভাগবত। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজা না করিয়া কখনো জলগ্রহণ করেন না। একবার শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে রক্তাক্ত বক্ষে তিনি পুরীধামে পৌঁছেন। এভাবে পরম দৈন্যভরে জগন্নাথ দর্শন করিয়া তবে তাঁহার মনে শান্তি আসে। আনন্দচন্দ্রের শেষের দিনটিও বড় চমৎকার। ভক্তিভরে ভাগবত পাঠ করিতে করিতে, ভাবাবিষ্ট অবস্থায়, তিনি দেহরক্ষা করেন।

বিজয়ের মাতা স্বর্ণময়ী ছিলেন এক অসামান্য নারী। বিপন্ন ও আর্ত মানুষের কাছে তিনি যেন মূর্তিমতী করুণা। দিনদুঃখীরা কোনো কিছু চাহিলে উজাড় করিয়া সব ঢালিয়া দিতেন।

গ্রামের হাটে দরিদ্র নারীরা শাকপাতা বিক্রয় করিতে আসে। বেচা-কেনার কাজ সারিতে বেলা গড়াইয়া যায়। স্বর্ণময়ী সস্নেহে তাহাদিগকে বাড়িতে ডাকিয়া আনেন, স্বহস্তে মাথায় তেল মাখাইয়া দেন। স্নান করিয়া আসিলে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করান।

সে-বার এক শীতের সন্ধ্যায় কলিকাতার এক পথ দিয়া তিনি চলিয়াছেন। দেখিলেন, একটি তরুণী গণিকা রাস্তার ধারে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে সেই পথেই ফিরিলেন। তখনো মেয়েটি দুরন্ত মাঘের শীতে তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। স্বর্ণময়ীর অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া হাতের সমস্ত টাকাকড়ি পতিতাটিকে বিলাইয়া দিলেন। সস্নেহে বার বার বলিতে লাগিলেন, "বাছা, আর এমন ক'রে শীত ভোগ ক'রো না—এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও।" এমনি করুণাময়ী ছিলেন তিনি।

অল্প বয়সে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়। তাই জননীর প্রভাব তাঁহার জীবনে বেশী পড়িতে দেখা যায়। বংশের ঐতিহ্যের সাথে নিজের সহজাত ভক্তি ও বৈরাগ্য তাঁহার রহিয়াছে, পুণ্যময়ী জননীর সান্নিধ্যে এ সম্পদ আরো বাড়াইয়া তোলে।

শান্তিপুরের সহজ সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পরমানন্দে সেখানে বিজয়ের দিন কাটে। বাল্যকাল হইতেই চরিত্রে ফুটিয়া উঠে ঋজুতা ও অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে জুটিয়া মাঠে ঘাটে বালক ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিবেশীদের উপর উপদ্রবও কম করে না। যে কেহ অভিযোগ করিলে সত্য কথা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দেয়। চোখের সামনে অন্যায় অবিচার কিছু দেখিলে বিজয় কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসে।

সে-বার শান্তিপুরের জমিদার এক প্রজাকে কাছারী বাড়িতে আনিয়াছেন। অপরাধ যাহাই হোক, শাস্তির ব্যবস্থা উঠিয়াছে চরমে। বাঁশ-ডলা দিবার ফলে লোকটির শ্বাস-রোধ হওয়ার উপক্রম।

এ নৃশংস দৃশ্য দেখিয়া বিজয়ের আর ধৈর্য রহিল না, ক্ষিপ্তবৎ সেখানে ছুটিয়া গেলেন। জমিদারকে 'রাক্ষস' 'ডাকাত' বলিয়া গালি দিতে দিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোঁসাইদের বালকের এ দুরন্ত সাহস দেখিয়া জমিদার ও তাহার লোকজন বিস্মিত হইয়া যায়।

বিজয়ের এ সৎসাহসের ফলে নির্যাতিত লোকটি কিন্তু মুক্তি পায়, ঘরে ফিরিয়া আসে।

একবার জ্ঞাতি গোঁসাইরা এক শিষ্যকে সমাজচ্যুত করেন। তাহার অর্থদণ্ড হয় তিন শত টাকা। কিশোর বিজয় কিছুদিন পরে ঐ শিষ্যের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছেন, লোকটি সাশ্রুনয়নে তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিল। বিজয়ের হৃদয় গলিতে দেরি হইল না। সমস্ত দণ্ড নিজ দায়িত্বে তিনি মার্জনা করিয়া দিলেন। এজন্য জ্ঞাতিদের কাছে তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

শান্তিপুরে পাঠশালা ও টোলের পড়া শেষ হইলে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় গিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলেন। উৎসাহী শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন বিদ্যাচর্চায় ডুবিয়া রহিলেন।

বিজয়ের বয়স তখন মাত্র আঠারো বৎসর। জননী ইহারই মধ্যে তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অচিরে সুলক্ষণা পাত্রী যোগমায়াকে বধূরূপে বরণ করিয়া তুলিলেন

সে-বার রংপুর জেলায় কোনো এক শিষ্যবাড়িতে বিজয়কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ সেদিন পথ চলিতে চলিতে কানে আসিল গম্ভীর কণ্ঠে দৈববাণী। কে যেন তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বার বার বলিতেছে, 'পরলোক চিন্তা কর'।

এ কি বিস্ময়কর অলৌকিক কণ্ঠ! নেপথ্য হইতে কে তাঁহাকে ডাকে? এমন করিয়া কল্যাণ চায় তাঁহার? কে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চায় নবজীবনের পথে? বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে এই অলৌকিক বাণী আলোড়ন তুলিয়া দেয়। কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অন্তরের ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে থাকে।

আবার একদিন আসে চেতনার দুয়ারে নূতন করাঘাত। এক বৃদ্ধ শিষ্যের জীবনে আসিয়াছে প্রবল বিষয়-বিরক্তি। বিজয়কৃষ্ণের পায়ে সে লুটাইয়া পড়ে, কাঁদিয়া বলে, "প্রভু, আমি ত্রিতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি, আপনি কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।"

এই অশ্রুজল, এই আর্তি, সত্যাশ্রয়ী যুবকের মর্মমূলে গিয়া সেদিন বিদ্ধ হয়।

বিজয় চমকিয়া উঠেন। ভাবেন, 'আমি উদ্ধার করবো একে? সে কি কথা। আমি নিজেই যে মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছি। আশ্রয় নেই, সহায় নেই, আমি কার জন্য কি করতে পারি? যদি না-ই পারি, তবে কেনই বা এই গুরুগিরির কপটাচার?'

সিদ্ধান্ত স্থির হইতে দেরি হইল না। সেই দিন হইতেই গুরুগিরি তিনি ত্যাগ করিলেন।

বাংলার সমাজ-জীবনে এ সময়ে প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার আক্রমণে সমাজ-বন্ধন শিথিল, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপন্ন। ডিরোজিও, ডাফ্, মেকলের প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর একদল হইয়াছে নিরীশ্বরবাদী, কতক হইতেছে খ্রীষ্টান। সেদিনকার এই ভাঙন রোধের জন্য, ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের জন্য, শক্তিধর পুরুষ রাজা রামমোহন আসিয়া দাঁড়ান জাতির পুরোভাগে।

ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁচাইতে গিয়া রামমোহন সেদিন রচনা করেন এক আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ। নূতন ধর্মান্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম দেন, 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম।' তারপর ইহাতে আসিয়া মিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগঠন প্রতিভা। আন্দোলন হইয়া উঠে ব্যাপকতর, নাম দেওয়া হয় ব্রাহ্মধর্ম। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের প্রেরণায় শিক্ষিত বাঙালী ঘরের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইতে শুরু করে।

হিন্দুসমাজ তখন বিপর্যয়ের মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইযাছে। এবার চলিয়াছে তাহার আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তরুণ বিজয়কৃষ্ণ এই আন্দোলনে নামিয়া পড়িলেন।

শিষ্য-ব্যবসায় আগে হইতেই ত্যাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজও এবার ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সংসার নির্বাহের কি উপায়? অর্থকরী কাজ তো কিছু করা প্রয়োজন। স্থির করিলেন, তিনি মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়িবেন। পাস করার পর সংসার পালনের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ করাও চলিবে।

এ সময়ে এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি চরম অর্থকষ্টে পড়েন। এক একদিন কলের জল পান করিয়াও তাঁহার দিন কাটে।

অন্তরে আগে হইতেই চলিতেছে এক ভাব-বিপ্লব। তার উপর দারিদ্র্যের এই কশাঘাত। একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।

এ সময়ে ঘুরিতে ঘুরিতে বিজয়কৃষ্ণ একদিন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদীতে উপবিষ্ট, ওজস্বিনী ধর্মোপদেশ তিনি দিতেছেন। এ উপদেশ বিজয়ের অন্তরে শান্তির প্রলেপ মাখাইয়া দিল। ব্রাহ্মধর্মে তিনি দীক্ষা নিলেন।

অল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের এক শ্রেষ্ঠ কর্মীরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় তাঁহার সমকক্ষ লোক তখন সে সমাজে খুব বেশী দেখা যায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে বিজয় ব্রাহ্মসমাজের কর্মব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু উত্তরকালে দেখা যায়, নিজ আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠা রক্ষার জন্য এই দুই ধর্মনেতাকেই বর্জন করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই।

বিজয় সবেমাত্র ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়াছেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার সত্যসন্ধ ও বিপ্লবী রূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেই একদিন প্রশ্ন করিয়া বসেন, "আচ্ছা, বলুন তো, জাতিভেদই যদি আমরা না মানি, তবে আর এ উপবীত রাখা কেন? এ কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এক কপটাচার।"

দেবেন্দ্রনাথ উদার হইলেও এতটা অগ্রসর হইতে চাহেন নাই। বিজয় কিন্তু তাঁহার উপবীত সেদিন হইতেই ত্যাগ করেন।

উপবীত ত্যাগের জন্য শান্তিপুর ও কলিকাতায় তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের লোকদের লাঞ্ছনার অবধি রহিল না। কিন্তু কোনোমতেই অকুতোভয় তরুণকে সেদিন টলানো যায় নাই।

আরেক বারের কথা। বিজয়কৃষ্ণ অল্প কিছুদিন হয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "একটা কথা স্মরণ রেখো, প্রচারের জন্য আমি তোমায় যখন যেখানে যেতে বলবো, সেইখানেই তোমায় যেতে হবে।"

তেজস্বী বিজয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "মার্জনা করবেন, আমি আমার জীবনে ভগবানের আদেশ ও ধর্মবুদ্ধিকেই শুধু অনুসরণ ক'রে যাবো—মানুষের আদেশে চলা তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

দেবেন্দ্রনাথ গুণগ্রাহী ধর্মনেতা। এ কথা শুনিয়া সেদিন একটুও তিনি বিরক্ত হন নাই, বরং বিজয়ের নির্ভীকতা ও ভগবৎ-প্রেমের এই পরিচয় তাঁহাকে মুগ্ধ করে। অতঃপর স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার করিতেই তাঁহাকে অনুমতি দেন।

যশোহরের এক গ্রামে সে সময়ে অবিলম্বে একজন দক্ষ ব্রাহ্ম প্রচারকের দরকার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উপযুক্ত লোক কিরূপে পাওয়া যাইবে? কর্তৃপক্ষ বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন।

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা হইতে আর কয়েক মাস বাকী, বিজয়কৃষ্ণ এজন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন ও সে প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা

শুনিয়া বিনা দ্বিধায় তিনি আগাইয়া আসিলেন। চিকিৎসক জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করিয়া গ্রহণ করিলেন ঐ প্রচারকের পদ।

হিতকামীদের অনেকে ইহা পছন্দ করেন নাই। জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করেন, "পড়া ছেড়ে তো প্রচারক হ'লে, কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণ কি ক'রে চলবে, তা কি ভেবেছো?"

ত্যাগব্রতী বিজয় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, সেজন্য মোটেই ভাবিনে। যিনি মরুভূমিতে বনগুল্ম বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তিনিই নেবেন আমার আর আমার পরিবারের ভার।"

প্রচারকের কাজ নিবার পর যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করেন, যে কোনো সংগঠনে তাহা দুর্লভ।

প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজ অতঃপর দুই ভাগ হইয়া গেল। রক্ষণশীল নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্মসমাজকে আঁকড়াইয়া রহিলেন, আর নব্যদল, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে স্থাপন করিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতার ভেদ-বিসম্বাদে ক্লান্ত হইয়া গোস্বামীজী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য শান্তিপুরে গিয়া বাস করিতে থাকেন

শান্তিপুরের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে নিয়া নানা অলৌকিক কাণ্ড এ সময়ে ঘটিত। স্বপ্নযোগে বা জাগ্রতাবস্থায় শ্যামসুন্দর বিজয়ের কাছে বহু আব্দার করিতেন। অদ্ভুত ধরনের নির্দেশও মাঝে মাঝে আসিত। যুক্তিবাদী ব্রাহ্মনেতা গোস্বামীপাদের হইত মহাবিপদ। এসব অলৌকিক দর্শন ও প্রত্যাদেশ নিজের বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে গিয়া তাঁহার খেই হারাইয়া যাইত।

শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সহিত বিজয়ের অন্তরঙ্গতা কিন্তু ক্রমেই বাড়িয়া চলে। ঠাকুরের আচরণ বড় বিচিত্র। আব্দার আর মান অভিমানের যেন তাঁহার অন্ত নাই। সুযোগ পাইলেই চিন্ময় রূপ ধরিয়া বিজয়ের নিকট তিনি আবির্ভূত হইতেন। বিজয় যেন তাঁহার মনের মানুষটি। নিজের যত কিছু ছোটখাটো অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁহাকে জানাইতেন, তারপর হইতেন অন্তর্হিত। শ্যামসুন্দরের এই প্রণয়লীলার কথা বিজয়কৃষ্ণ উত্তরকালে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে শিষ্যদের কাছে বিবৃত করিতেন—

একবার শ্যামসুন্দর এসে আমায় বললেন,—ওরে, আমি সোনার চুড়ো পরবো; আমাকে একটা চুড়ো গড়িয়ে দে না।

'আমি বললাম,—আমি তোমায় বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না। যারা করে তাদের গিয়ে বল। আমি টাকা কোথায় পাব?

'শ্যামসুন্দর বললেন,—দ্যাখ্ তোর খুড়ীমাকে বল্‌গে, তার ঝাঁপির ভেতর টাকা আছে। তাই নিয়ে নে না।

'পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে খুড়ীমাও বললেন,—ওরে কাল যে শ্যামসুন্দর এসে আমায় স্বপ্নে বললেন,—হ্যাঁরে, আমায় চুড়ো গড়িয়ে দে না। আমি বললাম—আমি এত টাকা কোথায় পাবো? আমার তো কিছু নেই। শ্যামসুন্দর বললেন—সে কি, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কি তুই দিতে পারিস না? দ্যাখ্ না, না পারিস তো বিজয়কে বল্‌গে, সে দেবে।

'খুড়ীমা এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন, আর বললেন—সাতষট্টিটা টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলাম, তা কেউ জানে না।

'ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হতে সোনার চুড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চুড়ো পরেছেন।

'সন্ধ্যার একটু পূর্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে আমাকে বললেন,—ওরে একবার দেখে যা না, চুড়ো পরে আমি কেমন সেজেছি।

'আমি বললাম—আমি আর এ সব কি দেখবো, আমি তো আর তোমায় মানি নে।

'শ্যামসুন্দর বললেন,—তাতে আর কি, না-ই বা মানলি, একবার দেখতেও কি দোষ ?

'আজ আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়লাম।

'শ্যামসুন্দর একটু হেসে বললেন,—এ কি, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস না ?

'আমি বললাম,—ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন ? সমস্ত ভাণ্ডিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন ?

'শ্যামসুন্দর বললেন,—তাতে আর তোর কি ? ভেঙেছিলাম আমি, আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি ; তোর তাতে কী আর হয়েছে ? ভেঙে গড়লে আরও কত সুন্দর হয়, জানিস্ ?

'প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মা'ঠাকুরাণীকে দেখতে আমি বাড়ি আসতাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বললেন,—দ্যাখ্—আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি।

'আমি অমনিই খুড়ীমাকে ডেকে বললাম,—খুড়ীমা, তোমাদের শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নি।

'খুড়ীমা আমায় বললেন,—হাঁ, শ্যামসুন্দর আর লোক খুঁজে পেলেন না ; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন,—জল দেয় নি।

'আমি বললাম,—আচ্ছা অনুসন্ধান করে দেখ না।

'খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জানলেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই।

'এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বলতেন। পূজারী কোনোপ্রকার অনাচার বা ত্রুটি করলে, শ্যামসুন্দর এসে বলে যেতেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য কৃপা দেখে আসছি। আমি না মানলেও তিনি কখনও আমাকে ছাড়েন নি।'

ঈশ্বর নির্দিষ্ট যে প্রেম-মধুর লীলা অভিনয় সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবনমঞ্চে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রস্তুতি সেদিন ভিতরে ভিতরে শুরু হইয়াছে। তাহা দেখার জনাই কি আড়াল হইতে চতুর শ্যামসুন্দর এইভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলেন ?

শ্যামসুন্দরের মুরলীধ্বনি বিজয়কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে শুধু উচ্চকিত করিতেছেন, তখনো মন কাড়িতে পারে নাই।

কোথায় আলো কোথায় অমৃত ? কে দিবে পথসন্ধান ? অতৃপ্তি ও মানসিক অশান্তি নিয়া বিজয়কৃষ্ণ দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া এক বৈষ্ণব বন্ধু কহিলেন,

"তুমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করো।" এ মহাগ্রন্থটি পাঠের পর পাইলেন তিনি অমৃত-পথের সন্ধান।

গোঁসাইজী নিজে লিখিয়াছেন, "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে, জন্মনি জন্ম নীশ্বরে ভবতাস্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ী— এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অহৈতুকী ভক্তি লাভের জন্য আমার মনে এসময়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল।"

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির রসধারা ধীরে ধীরে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনে নামিয়া আসে। এবার শুরু হয় অদ্বৈত সন্তানের সাধনায় আপন প্রভুকে চিনিয়া নিবার পালা।

সে-বার বিজয়কৃষ্ণ নবদ্বীপের সিদ্ধ মহাপুরুষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, ভক্তি কিসে হয় ?"

'ভক্তি' শব্দটি কানে পশিবামাত্র বাবাজীর সারা শরীর কদম্বের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগকম্পিত দেহে, হুঙ্কার দিয়া তিনি কহিলেন, তোমার মুখে তো এ প্রশ্ন সাজে না। গোঁসাই। ভক্তি যে তোমাদেরই ঘরের বস্তু। এ যে আমার অদ্বৈতেরই ভাণ্ডারের ধন! তবে গোঁসাই, একথা সত্যিই দীনহীন কাঙাল না সাজলে, অভিমান উৎপাটিত না হলে ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ হয় না।"

শক্তিধর মহাপুরুষ চৈতন্যদাস কিছুক্ষণ গোঁসাইজীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, আমি যে তোমার ললাটে তিলক ও গলায় কণ্ঠি দেখলাম। কালে এ দু'টি বস্তু যে তোমায় ধারণ করতেই হবে।"

বাবাজী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই গোস্বামীপাদের চমক ভাঙিল, দ্রুতপদে সেখান হইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

ইহার পর কালনার ভগবানদাস বাবাজীর সহিত বিজয়কৃষ্ণ একবার সাক্ষাৎ করিতে যান। অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হওয়ায় বড় পিপাসা পাইয়াছে। জল পান করিতে চাহিতেই বাবাজী কিছু মিষ্টি ও জলভরা কমণ্ডলুটি আগাইয়া দিলেন।

গোঁসাই সঙ্কোচে বলিলেন, "বাবাজী, আমি যার-তার হাতে খাই—জাত মানিনে। আপনি একি কচ্ছেন ? আপনার নিজের ব্যবহারের কমণ্ডলুটি আমায় যেন দেবেন না।"

বাবাজী করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আমার জাতবিচার না গেলে, খণ্ডবুদ্ধি নাশ না হলে, ভক্তিদেবীর কৃপা হবে কেন ? আমায় আর পরীক্ষা করবেন না। আপনি কৃপা ক'রে জল পান করুন।"

গোস্বামী-প্রভু জল পান করার পর ভগবানদাস বাবাজী ভক্তিভরে ঐ কমণ্ডলু তাঁহার নিজের মাথায় ঠেকাইলেন, প্রসাদ হিসাবে অবশিষ্ট জলটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

একটি ভক্ত এসময়ে বাবাজীকে স্মরণ করাইয়া দেয়, "বাবাজী, গোঁসাইপ্রভু কিন্তু গলার পৈতেটাও বর্জন ক'রেছেন।"

ভগবানদাস উত্তরে কহিলেন, "জান তো আমার শ্রীঅদ্বৈতেরও পৈতে গলায় থাকতো না। আর মজা দেখ অদ্বৈত সন্তানের নেতৃত্বটি কিন্তু বজায় আছে। আমার গোঁসাইপ্রভু ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন বটে, কিন্তু সেখানকার আচার্য হয়েই বসে আছেন।"

এক ব্যক্তি তখ বিদ্রূপ করিয়া বলে, "তা বটে, তবে ইনি হচ্ছেন জামা-জুতো পরা আধুনিক আচার্য।"

কথাটি শুনিয়াই বাবাজীর চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ভাই, প্রভুকে

মনোহর বেশে সাজিয়ে রাখা, সে যে আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব। আমরা দুর্ভাগা বলে, এ দায়িত্ব পালন করতে পারি নি। তাই তো, প্রভুকে নিজের সজ্জা নিজেকেই ক'রে নিতে হয়েছে।"

বাবাজীর এ করুণ খেদোক্তি সকলেরই মর্ম স্পর্শ করে, মন্তব্যকারী মাথা নীচু করিয়া থাকে।

চৈতন্যদাস ও ভগবানদাস বাবাজী সংবেদন অদ্বৈতবংশের সন্তান গোঁসাইজীর হৃদয়ে তুলিয়া দেয় আলোড়ন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-ব্রত বিজয়কৃষ্ণ গ্রহণ করেন, আর এ ব্রত সাধনে প্রদর্শন করেন চরম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রের আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম প্রচারকদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিতে চান, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ইহার বিরোধিতা করিয়া বসিলেন। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি যুঝিতেছেন, সর্বদিক দিয়া সহায় সম্বলহীন, তবুও ভাগবৎ-জীবনের আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া অর্থ নিতে চান নাই, মন তাঁহার সায় দেয় নাই। ফলে তখনকার মতো মহর্ষিকে এ প্রস্তাব ত্যাগ করিতে হয়।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের ধর্মপ্রচার কার্যে বিজয় নামিয়াছেন। এ যে তাঁহার এক পবিত্র দায়িত্ব। এ কাজে পারিশ্রমিক নেওয়া কেন? নিজে চিকিৎসা জানেন সামান্য, কিছু উপার্জনও হয়। ইহা দিয়াই সংসার চালাতে থাকেন। কিন্তু সত্য-নিষ্ঠ সাধকের মনে একদিন প্রশ্ন উঠে, এভাবে টাকাকড়ি উপার্জন করা কি ঠিক? এই অর্থকরী কাজে লিপ্ত থাকিলে ধর্মপ্রচারের ক্ষতি তো কিছুটা হইবেই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এ চিকিৎসা-ব্যবসাও ত্যাগ করিলেন। আকাশ বৃত্তির উপরই রহিল এক মাত্র ভরসা।

এসময়ে সপরিবারে দিনের পর দিন তাঁহার অর্ধাশন ও অনশনে কাটিয়াছে। যেদিন অন্ন জুটিত, উপকরণ জুটিত না। উপকরণ যদি বা মিলিল অন্নের সাথে দেখা নাই। প্রায়ই উঠানের কাঁটানটে শাক অথবা হলুদ ও তেঁতুলের জল গ্রহণ করিত ব্যঞ্জনের স্থান। পত্নী যোগমায়া দেবীকেও দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা কম সহ্য করিতে হয় নাই। স্বামীর আদর্শ-নিষ্ঠ জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সানন্দে তিনি বরণ করিয়া নেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্য দিয়া হাসিমুখে আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়ান। যোগমায়া ছিলেন সত্যকার সহধর্মিণী, তাই তাঁহার সাহায্যে গোঁসাইজীর ব্রত উদ্‌যাপন সহজ হইয়া উঠে।

প্রচার-কার্যে বিজয়কৃষ্ণকে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়. বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু স্থানে এ সময়ে তিনি পর্যটন করিতে থাকেন। ফলে শরীর তাঁহার ভাঙিয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডে জন্মে দুরারোগ্য ব্যাধি। তাছাড়া, প্রচারে রত থাকার সময় তখনকার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কত বিদ্রূপ, কত অত্যাচার ও লাঞ্ছনাই যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্মালোচনা, ধ্যানধারণা প্রভৃতি গোঁসাইজী একান্ত নিষ্ঠায় করিয়া চলিয়াছেন। রাত্রির পর রাত্রি কাটিতেছে সাধন-ভজন ও উপাসনায়। কিন্তু তৃষ্ণা তাঁহার মিটে কই?

কেশব সেনের মতো তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপবেশন

করেন। অধীর মন সাময়িকভাবে কিছুটা শান্ত হইয়া আসে। আবার বাড়ে চিত্তের অস্থিরতা। অধ্যাত্ম-জীবনের যে পরম প্রাপ্তির জন্য সর্বস্বপণ করিয়াছেন, তপস্যা করিতেছেন, তাহা তো মিলিতেছে না ?

বিজয়ের শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা বড় চমৎকার কীর্তন গান করেন। সে অপূর্ব গান শুনিয়া নয়নে তাঁহার প্রেমাশ্রুর ধারা বহিয়া যায়, হৃদয় দ্রব হইয়া আসে। এক একদিন খেদ জাগে, এমন প্রাণ-গলানো কীর্তন কী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করা যায় না ? নেতা কেশব-চন্দ্রকে সে-বার ভ্রাতার সুমধুর কীর্তন শোনাইয়া তিনি মুগ্ধ করেন, অনুমতি নেন সমাজে মৃদঙ্গ-করতাল সহ কীর্তন প্রবর্তনের জন্য।

এই কীর্তন গানে, আর মহাভক্ত বিজয়কৃষ্ণের আকুতি ও ক্রন্দনে ব্রাহ্মসমাজের সভায় ভক্তিরসের তরঙ্গ উঠিত।

বিজয়কৃষ্ণের এসময়কার ঈশ্বর-পাগল রূপের আকর্ষণ ছিল বিস্ময়কর। শিবনাথ শাস্ত্রী বলিতেন, "আমাদের গোঁসাইকে সকলের সামনে দেখিয়ে বেড়ালে, তাঁর এই ভক্তি-সমৃদ্ধ মূর্তি দেখালেই ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাপক প্রচার হবে, আর কিছুর দরকার হবে না।"

কেশবচন্দ্রকেও এ সময়ে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "গোঁসাই ভক্তিসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

সত্যনিষ্ঠ সাধক বিজয়কৃষ্ণের মন কিন্তু এ কথায় শান্তি পায় না। যে আনন্দ ও অনুভূতির দোলা হৃদয়ে আসিয়া লাগে তাহা তো স্থায়ী হয় না! ভাবিয়া আকুল হন, ভগবৎ দর্শনের জন্য মনেপ্রাণে ভিখারী সাজিয়াছেন, কিন্তু কই পরম প্রভুর সন্ধান তো মিলিল না ? কবে আসিবে মিলনের লগ্ন ? কে বলিবে, এই দুঃসহ বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি হইবে কোন্ পথে ?

মনে কোনো শান্তি নাই। গোঁসাইজী দিনের পর দিন সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়ান। ব্যাকুলভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করেন, সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ হইয়া উঠেন। একদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথায় তিনি বলিতেছেন,—

"মেছোবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতো ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে, একটি চামারকে দেখে, তাকে এই জুতো সেলাই করতে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি করলে না। জুতো সেলাই হয়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলাম। সেই পয়সা হতে, সে আমাকে দু'টি পয়সা ফিরিয়ে দিল এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চলল।

"আমার একটু আশ্চর্য বোধ হ'লো। আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। সে গঙ্গাতীরে, বাবু-ঘাটে যেয়ে, তল্পি-তল্পা রাস্তার নিচে একটা ভাঙা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে গঙ্গা স্নান করল ; পরে তিলক ক'রে, সন্ধ্যা-তর্পণাদি ক'রে খিদিরপুরের দিকে চলল। আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগলাম।

"সে একটি বাড়িতে প্রবেশ করল। আমিও ঐ বাড়ির দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই একটি লোক এসে, আমাকে অতিথি মনে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

"যেয়ে দেখি, ঐ চামারটি একজন মহান্ত। তাঁহার বিস্তর শিষ্য সেবক আছেন। আখড়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম।

"মহান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার এত শিষ্য সেবক, নিজে মহান্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিছুরই তো অভাব নাই, তবে আপনি জুতো সেলাই করেন কেন ?

"মহান্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললেন, এবং হাত জোড় করে তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে পুনঃপুনঃ নমস্কার করতে করতে বললেন—গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্বেই আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি আমাকে শাসন ক'রে বললেন—আরে তু কাহে সাধু হুয়া, তু চামার হ্যায়। আমার গুরুদেবের সেই বাক্য আমা হ'তে অন্যথা হবে? এই জন্য আমি, সেইদিন থেকেই চামারী ক'রে আমার জীবিকা নির্বাহ করছি। সারাদিন চামারী ক'রে নিজের আহারোপযোগী চার আনা পয়সা মাত্র পেলেই আমি চ'লে আসি। গুরুদেব শেষকালে তাঁর গদিতে আমাকে দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও, সাধ্যমতো চামারীবৃত্তি দ্বারাই সেবা ক'রে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্বাদ করবেন, যেন শেষ দিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা ক'রে যেতে পারি।

"ইহাকে দেখার পর, আমার মনে হ'লো, এ প্রকার ছদ্মবেশে তো মহাত্মারা সর্বত্র থাকতে পারেন! বাইরের আকার, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার দেখে যখন তাঁদের চেনবার যো নেই, তখন কার কি অবস্থা কি প্রকারে বুঝবো? সেই হতে আমি রাস্তায় বার হলেই, দু'দিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাকেই রাস্তার সম্মুখে দু'পাশে দেখতে পাই, মনে মনে নমস্কার ক'রে চলি।"

অধ্যাত্মজীবনে নূতনতর অধ্যায় এবার উন্মোচিত হইতেছে, তাই গোঁসাইজীর ব্যাকুলতাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে গুরু খুঁজিয়া বেড়ানোই এখন তাঁহার প্রধান কাজ। এ সম্বন্ধে নিজের এক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতেছেন—

"একদিন আমি মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পেলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি কাঙালবেশ সাধু দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে ছুটে আসছেন। দূর হতে দেখতে পেয়ে আমি তাঁকে নমস্কার করব মনে ক'রে ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম।

"চলতি মুখে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তখন মনে হ'লো যেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেউ চাপিয়ে দিলে। সমস্ত শরীরটা আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

"আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্র, সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে বললেন—'চলো বাচ্চা, চলো'। এই ব'লে, খুব দ্রুত পদে যেতে লাগলেন। আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। কি ভাবে, কোন্ দিক্ দিয়ে, কোথায় যে গেলাম, কিছুই জানি না। একেবারে যেন মেস্‌মেরাইজ্‌ড হয়ে পড়লাম।

"কতক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হয়েছি। সাধু আমাকে একটা গাছের নিচে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন।

"আমি তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে, তিনি আমাকে বললেন—'না, তা হবে না; তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন। সময়ে তিনিই তোমাকে খুঁজে নেবেন, ব্যস্ত হতে হবে না।'

"তার পর আমি, তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। হাওড়ার পোলের উপরে চলতে চলতে দেখলাম হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়লেন। এ ঘটনার পরে সাধুদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।"

গোঁসাইজীর সাধনজীবনে আত্মতুষ্টির স্থান নাই। প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে করেন পরীক্ষা আর করেন কঠোর নিয়ন্ত্রণ। সে-বার তিনি লাহোরে গিয়াছেন। নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভাবিয়া একদিন বড় হতাশ হন, নদীতে জীবন বিসর্জন দিতে যান। হঠাৎ আবির্ভূত হন এক শক্তিমান্ মুসলমান ফকীর, তাঁহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া ফিরান। বলেন, "বেটা দুনিয়ার মালিকই সব খেলা খেলছেন—তোমায় নিয়েও চলেছে তাঁরই খেলা। অন্তরে খেদ রেখো না, প্রার্থিত ধন মিলবে। নির্দিষ্ট গুরুর কাছেই তা তুমি পাবে।"

প্রাণের পিপাসা বিজয়কৃষ্ণকে চঞ্চল করিয়া তোলে। এই সময় অঘোরপন্থী, কর্তাভজা, রামাইৎ, শক্তি, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, বৌদ্ধযোগী প্রভৃতি কত সাধকের কাছেই না তিনি ছুটাছুটি করিয়াছেন! কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান কোথাও পান নাই।

কলিকাতার ঠনঠনিয়ার মোড়ে সেদিন এক শান্ত, সৌম্যদর্শন উচ্চকোটির সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোঁসাইজী আকৃষ্ট হইলেন। এ সময়ে তিনি ভগবদ্ দর্শনের জন্য একেবারে অস্থির। সন্ন্যাসী তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিলেন। বলিলেন, "দেখো, আকাশমে কোই ইমারৎ বনানে সক্তা নহী'। তুমকো তো গুরু করনে হোগা। মগর্ ঘাবড়াও মৎ বাচ্চা। তুম্হারা গুরু বখত্‌কে মিল্ জায়েগা।" এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য শান্ত হন। পরে আবার জাগে তীব্র চঞ্চলতা।

সেবার গোঁসাইজী শুনিলেন, দার্জিলিং-এর কাছে, অরণ্যে এক শক্তিমান্ বৌদ্ধযোগী রহিয়াছেন। তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারী এই মহাত্মা। দেখা গেল, ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার শিরোদেশ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে। বিস্মিত বিজয়কৃষ্ণ নির্নিমেষে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। ধ্যান-ভঙ্গের পর মহাপুরুষের কাছে চাহিলেন দীক্ষা।

যোগী উত্তর দিলেন, 'বাবা, আমি তো আদিষ্ট না হয়ে কাউকে দীক্ষা দিই না। তা ছাড়া, তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন। তার সন্ধান পাবে নর্মদাতীরে। সেখানে যাও নির্দেশ ঠিক মিলবে।"

এই যোগী নর্মদাতীরের এক মহাত্মার ঠিকানা তাঁহাকে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ সেখানে গিয়া হাজির। মহাত্মার চরণে পতিত হইয়া জানাইলেন আকুতি। তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার সৎগুরু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে আছেন। নিজেই এসে কৃপা করবেন, তুমি অধীর হয়ো না।"

ব্যাকুল প্রাণে একবার কাশীতে গিয়া গোঁসাইজী তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই মহাযোগীর আন্তরিক স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভ করিয়া হন কৃতার্থ।

অদ্ভুত আকর্ষণ এই যোগীরাজের। প্রায় সারাদিনই বিজয়কৃষ্ণ তাহার সঙ্গ করিয়া বেড়ান। বেলা গড়াইয়া যায়, ক্ষুৎপিপাসার দিকে লক্ষ্যই নাই। তাঁহার শ্রান্ত দেহ শুকনো মুখ, দেখিয়া স্বামীজী এক-একদিন ব্যস্ত হইয়া পড়েন, ভক্তদের দিয়া আহার্য আনিয়া দেন।

স্বামীজী ইচ্ছাময়, খেয়াল-খুশীমতো গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া বেড়ান, প্রায়ই অসিঘাটে ডুব দিয়া ভাসিয়া উঠেন মণি কর্ণিকার শ্মশানে। এই খেয়ালী ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের সঙ্গনেশা বিজয়-কৃষ্ণকে পাইয়া বসিয়াছে। গঙ্গার তীরে তীরে হাঁটিয়া তিনিও চলেন তাঁহার পিছু পিছু। কখনো দেখা যায়, স্বামীজী নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মতো বসিয়া থাকেন, আর ভক্তগণ দলে

দলে আসিয়া এই উলঙ্গ যোগীরাজের শিরে বিল্বপত্র ও গঙ্গাবারি ঢালিয়া দেয়। বলিতে থাকে, "নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।"

বড় অপরূপ, বড় প্রাণস্পর্শী এই দৃশ্য। এই দৃশ্যের দিকে চাহিয়া গোঁসাইজী মন্ত্র-মুগ্ধের মতো বসিয়া থাকেন।

সেদিন গঙ্গাতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বিজয়কৃষ্ণ খুব শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্রামের জন্য মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ দেখিলেন গঙ্গাগর্ভ হইতে স্বামীজী উঠিয়া আসিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "ওহে, স্নান ক'রে এসো, তোমায় আজ একটা মন্ত্র দেবো।"

বিজয়কৃষ্ণ থতমত খাইয়া গেলেন। কহিলেন, 'স্বামীজী, আমার মায়ের নিকট যে আমার প্রাথমিক দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।"

স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন, বিজয়কৃষ্ণকেও তখনি এক ধমক দিয়া উঠিলেন।

বিজয় জোড়হস্তে যোগীবরকে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আমার কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্রে তেমন বিশ্বাস এখনো হয় নি। তাছাড়া, আমি এখনো ব্রাহ্মসমাজের লোক।

কিন্তু এসব কথায় কান দেয় কে? ত্রৈলঙ্গ মহারাজের মাথায় আর এক ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছে। বিজয়কে সবলে আকর্ষণ করিয়া যোগীরাজ তাঁহাকে স্নান করাইলেন। তারপর স্মিতহাস্যে কহিলেন, "শোন বাচ্চা, তোমায় এ মন্ত্র দেবার বিশেষ কারণ রয়েছে। তোমার শরীর শুদ্ধির জন্যই এখন এর প্রয়োজন। আমি তোমার দীক্ষা-গুরু নই। তিনি রয়েছেন অন্যত্র। তাঁর সঙ্গে এক শুভ লগ্নে শিগ্‌গীর তোমার দেখা হবে।"

ত্রৈলঙ্গ মহারাজের প্রদত্ত এই মন্ত্রটি গোস্বামীজী শ্রদ্ধাভরে বহুদিন জপ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে বিজয়কৃষ্ণ সে-বার গয়ায় আসিয়াছেন। নিকটেই আকাশ-গঙ্গা পাহাড়। সিদ্ধ রামাইৎ সাধু রঘুবরদাসজীর আশ্রম সেখানে। গোঁসাইজী তাঁহাকে দেখিতে ছুটিলেন।

বাবাজীর পদতলে পড়িয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমি বড় অজ্ঞান, আমায় দয়া করুন। পরাভক্তির উদয় যাতে হয়, সেই আশীর্বাদই আমি আপনার কাছে চাই।"

রঘুবরদাস স্নেহভরে বলিলেন, "বাবা, তোমার মতো আর্তি যার, ভক্তিদেবী কি তাঁকে কৃপা না ক'রে পারেন? স্থির হও। অচিরেই মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হবে।"

বিজয়কৃষ্ণের প্রতি বাবাজীর স্নেহের অন্ত নাই। নিজ হস্তে তাঁহার আহার্য প্রস্তুত করেন, সযত্নে তাঁহাকে ভোজন করান। এই ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মার বিভূতি দর্শনে গোঁসাইজী অবাক্ হইয়া যান।

আকাশচারী পাখির দল বাবাজীর আহ্বানে ছুটিয়া আসে। অনুগত পোষ্যের মতো তাঁহার দেহে আসিয়া বসে, ঠোঁট দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া জটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বন্য পশুরাও বাবাজীর কম বশ নয়। আশ্রমের আশেপাশে ঘন বন। সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই একটি বাঘও আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংস্র বাঘ বাবাজীর সস্নেহ তিরস্কারে মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আবার তাঁহার আদেশে প্রস্থান করে।

এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে, আকাশগঙ্গা পাহাড়ের শান্ত মনোরম পরিবেশে গোস্বামীপাদ কিছুদিন সাধন ভজন করেন।

ব্রহ্মযোনী পহাড়ে এক মহাপুরুষ অবস্থান করেন, গোস্বামীজী সেদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। অবতরণের সময় পর্বতের সানুদেশে গোড়ধোয়া নামক স্থানে তিনি উপস্থিত হন। শুনিলেন, এই সেই পবিত্র ক্ষেত্র যেখানে শ্রীচৈতন্য তাঁহার শ্যামসুন্দরকে দর্শন করেন, অন্তরে জাগে তাঁহার দিব্য উন্মাদনা।

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের মানসপটে ভাসিয়া উঠে মহাপ্রভুর সেই প্রেমবিহ্বল ছবি 'কৃষ্ণরে বাপরে' বলিয়া যে কান্না তিনি কাঁদিযাছিলেন আজিও যেন গোড়ধোয়ার আকাশ বাতাসকে তাহা মন্থর করিয়া রাখিয়াছে। অলৌকিক ভাবময়তায় এস্থান পূর্ণ। গোঁসাইজী একেবারে আত্মহারা হইয়া যান।

হৃদয়ে তাঁহার জাগে অলৌকিক প্রেম-বন্যার উচ্ছ্বাস। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি আর মনের প্রাকার যেন ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইতে চায়।

ইষ্ট দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে আরো তীব্র হয়, দিন গুনিতে থাকেন সদ্‌গুরুর আশায়।

১২৯০ সালের আষাঢ় মাস। সেদিন ভোরবেলায় বিজয়কৃষ্ণ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবরদাসের আশ্রমে বসিয়া আছেন। শুনিলেন পর্বতশীর্ষে এক শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

সেবার জন্য কিছু ফলমূল হাতে নিয়া তখনি উপরে উঠিলেন। দর্শন পাইলেন এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের।

নির্নিমেষে গোঁসাইজী তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে ঘটিল আত্ম-বিস্মৃতি। কি এক অমোঘ আকর্ষণ রহিযাছে এই লোকোত্তর পুরুষের মধ্যে। দর্শন-মাত্র সারা অস্তিত্ব যেন দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইতে চায়। তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মাটি বিজয়কে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁহার মন-প্রাণ ভরপুর হইয়া উঠিল। মহাপুরুষের চরণ ধরিয়া কাতরভাবে তিনি দীক্ষা চাহিলেন।

প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দীক্ষা নিবার অব্যবহিত পরেই গুরুর চরণে গোঁসাইজী নিপতিত হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল।

চেতনা পাইয়া দেখেন, গুরু অন্তর্হিত হইয়াছেন।

এতদিনে যদিই বা দেখা দিলেন, জীবনতরীর কাণ্ডারী আবার কোথায় হইলেন অদৃশ্য? গোঁসাইজী দিশাহারা, উন্মত্তপ্রায়। সদ্‌গুরুকে আবার পাইতেই হইবে, নতুবা জীবনে তাঁহার শান্তি নাই। গয়া অঞ্চলের পাহাড়ে পাহাড়ে তিনি ঘুরিতে লাগিলেন।

অবশেষে রামশিলা পাহাড়ের এক নির্জন অরণ্যে গুরু মহারাজ আবার তাঁহার সম্মুখে হঠাৎ হন আবির্ভূত। সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "বাচ্চা, ঘাবড়াও মৎ। জোর্‌সে সাধন অওর ভজন করতে রহো। বখত্‌মে তুমহারি পুরি সিদ্ধি মিল জায়গা।"

অতর্কিতে মহাপুরুষ আবার অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোস্বামীপাদের গুরুদেবের নাম ব্রহ্মানন্দস্বামী। পরমহংসজী নামেই তিনি সাধুমহলে পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার পূর্বাশ্রমের দেশ পাঞ্জাব। গোড়ার দিকে তিনি বাস করেন নানকপন্থী এক উদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারপর ভক্তিসাধক নানকপন্থী মতে সাধনা করেন। উত্তর-কালে এক মহাযোগীর আশ্রয় লাভ করিয়া পরিণত হন এক ব্রহ্মবিদ্‌ মহাসাধকে।

পরমহংসজীর আসন ছিল হিমালয়ে, মানস-সরোবরের তীরে। ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কাছে নিজ সাধনস্থলীর বর্ণনা তিনি মাঝে মাঝে দিতেন। কহিতেন, সাধারণের পরিচিত মানস-সরোবর হইতেছে ভৌগোলিক মানতালাও কিন্তু যোগীদের সাধনক্ষেত্র, আসল মানস-সরোবর, এই মানতালাও হইতে পৃথক। তাঁহার মতে, সদ্‌গুরুর কৃপা ও যোগশক্তি ছাড়া এই আসল মানস-সরোবরে যাওয়া কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এই পরমহংসজীর কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন, হন আপ্তকাম। অলৌকিক বিভূতির খেলা তাঁহার জীবনে বহু দেখা গিয়াছে, কিন্তু বরাবরই শক্তিধর গুরু অন্তরাল হইতে তাঁহার সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। যখনি প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহাকে নিগূঢ় সাধন নির্দেশাদি দিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের জীবনে স্তরে স্তরে এই গুরুকৃপা ছড়ানো রহিয়াছে।

দীক্ষার পরে হঠাৎ একদিন গোঁসাইজীর গত জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। সেদিন তিনি ফল্গুর অপর তীরে রামগয়ায় গিয়াছেন। সেখানে নৃসিংহ মন্দিরে বসিতে গিয়াই তাঁহার চেতনার পর্দাটি সরিয়া গেল। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল পূর্বজন্মের সন্ন্যাস-জীবনের দৃশ্য।

—এই মন্দিরে আরো তিনজন সাধুর সঙ্গে তিনি সাধনভজন করিতেন। সে জন্মে এখানকার এক বটবৃক্ষে তিনি 'ওঁ রাম' এই মন্ত্রটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খোঁজ করিয়া দেখা গেল, বৃক্ষের গায়ে খোদাই করা লেখাটি তখনো রহিয়াছে, একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

এই অঞ্চলের বরাবর পাহাড় বহু শক্তিমান্ সাধু-সন্ন্যাসীর তপোক্ষেত্র। এইখানেই যোগী গম্ভীরনাথবাবার সহিত বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। যোগীবরের কৃপা ও নানা সাধন নির্দেশ পাইয়া তিনি এ সময়ে উপকৃত হন।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় গোস্বামী তাঁহার আসন পাতিয়া বসিলেন। বরাবরই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—যে কাজে ব্রতী হন, তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়েন না। আহার-নিদ্রার কথা ভুলিয়া সাধনার গভীরে তিনি ডুবিয়া যান, গুরুর নির্দেশিত পন্থায় ধীরে ধীরে হন অগ্রসর।

রঘুবরদাস বাবাজী বলিয়াছেন, শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ এক আসনে এগারো দিন একাদিক্রমে ধ্যানমগ্ন থাকেন। বাবাজীর যত্নেই এ সময়ে কঠোরতপা সাধকের প্রাণ রক্ষা হয়।

পরমহংসজী অতঃপর গোঁসাইকে কাশী যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়া হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নব নামকরণ হয় অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

এই আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণ ঠিক করিলেন, তিনি অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করিবেন। কিন্তু সংকল্প সাধনে বাধা দিলেন তাঁহার গুরুদেব, পরমহংসজী।

কাশীধামে হঠাৎ সেদিন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা, তুমি সংসার ত্যাগ করো না। আগের মতোই গৃহস্থাশ্রমে থাক, যে সাধন পেয়েছ, তা নিয়ে এগিয়ে চলো। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমায় সংসারে থাকতে হবে। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়বার কথা ভেবে ব্যস্ত হ'য়ো না, সময় মতো তা সাপের খোলসের মতো খসে পড়ে যাবে।"

কাশী হইতে গোঁসাইজী আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। আবার শুরু হইল তাঁহার কঠোর তপস্যা। গুরু পরমহংসজীকে এসময়ে প্রায়ই আবির্ভূত হইতে দেখা যাইত, উত্তম অধিকারী শিষ্যকে যোগের দুরূহ সাধনাদি তিনি শিক্ষা দিয়া যাইতেন।

গোঁসাইজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তি ও যোগবিভূতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পরমহংসজী বুঝিলেন, যুক্তিবাদী শিষ্যের প্রত্যয় সহজে আসিবে না, কিছুটা যোগৈশ্বর্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করানো দরকার।

গুরুজী সেদিন তাঁহাকে অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধির নানা ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। যোগশক্তির এক একটি প্রকাশ সাধক বিজয়কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করেন, আর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। সর্ব বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিমানের ভিত্তি একেবারে শিথিল হইয়া উঠে।

গুরুমহারাজের একদিনকার যোগবিভূতির লীলা কিন্তু তাঁহাকে হতবাক্ করিয়া দেয়।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে, গহনবনের এক প্রান্তে সেদিন একটি লোক মরিয়া পড়িয়া আছে। পরমহংসজী যোগবলে সূক্ষ্মদেহে সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। শবটি ধীরে ধীরে নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তারপর একেবারে জীবন্ত হইয়া উপবেশন করিল গোঁসাইজীর সম্মুখে। তিনি তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্। নির্নিমেষে এই জীবন্ত শবের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পুনরায় ঐ দেহ হইতে বাহিরে আসিয়া পরমহংসজী নিজ দেহে ঢুকিয়া পড়িলেন। এবার সহাস্যে শিষ্যকে বলিলেন, "ক্যা ? অব্ তুম্হারা বিশ্বাস হুয়া ?"

এসময়ে অল্পদিনের ভিতর গুরুর কৃপায় কঠোরতপা গোস্বামীজী অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলেন।

এই সময়ে গয়ায় এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন ঘটে। গুরুর নির্দেশে এই শক্তিমান্ তান্ত্রিকের ভৈরবীচক্রে গোঁসাইজী একদিন যোগদান করেন। তন্ত্রসাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা সেদিন তাঁহার অর্জিত হয়। শিষ্যের নিজস্ব সাধনপথ রহিয়াছে, তবুও গুরু তাঁহাকে নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এ সময়ে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোঁসাইজী দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। তদুপরি রহিয়াছে গৈরিক ধারণ, আর তীব্র বৈরাগ্য। আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহারা জোর করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় নিয়া আসিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ভক্তিভরে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র দেবেন্দ্রনাথের বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। দেখিলেন দিব্য আনন্দে নবীন সাধকের আননখানি ঝলমল করিতেছে। ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "গোঁসাই, তোমায় যে নতুন মানুষ দেখছি। নিশ্চয় কোনো অমূল্য বস্তু তুমি পেয়েছ। কোথায় পেলে ?"

গোস্বামীজী উত্তর দিলেন, "গয়ার পাহাড়ে। এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কৃপা ক'রে কিছু দিয়েছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ আবার কহিলেন, "বুঝতে পারছি, যে বস্তু পেয়েছ, তাতে তুমি ধন্য

হবে, উদ্ধার হবে। এ দেবদুর্লভ ধন কখনো ত্যাগ ক'রো না। ব্রাহ্মসমাজে তুমি থাকো বা না থাকো, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু এ যেন কখনো ত্যাগ ক'রো না।"

কেশবচন্দ্রের কন্যার কোচবিহারে বিবাহের পর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দলগত বিরোধ উপস্থিত হয়। এসময়ে বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য নেতারা মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর পূর্ববঙ্গে গিয়া গোঁসাইজী সমাজের প্রচারকরূপে কাজ করিতে থাকেন। আন্তর সাধনাও চলিত এই সাথে। দিনের নির্দিষ্ট কাজের পর তিনি সাধনার গভীরে ডুবিয়া যাইতেন।

সাধনপথে অতঃপর আসিতে থাকে বাধার পর বাধা। কিন্তু সমর্থ গুরু প্রতিবারই উপস্থিত হন তাঁহার সাহায্যের জন্য। উচ্চতর সাধনার স্তরে শিষ্যকে আগাইয়া দিয়া যান।

সেবার বিজয়কৃষ্ণের সর্বদেহে এক দুঃসহ দহন-জ্বলা শুরু হয়, অন্তরেও দেখা দেয় শুষ্কতা। এ সময়ে পরমহংসজী হঠাৎ একদিন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। কহেন, "বাবা, তুমি এবার জ্বালামুখীতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে তপস্যা করো, তোমার দেহের এ দাহ-বোধ অচিরে সেরে যাবে।" গুরুর নির্দেশমতো সাধনা অনুসরণ করিয়া গোস্বামীজী শান্তিলাভ করেন।

সদ্‌গুরু কৃপা ও কঠোর তপস্যার ফল অতঃপর ফলিয়া উঠে। সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবনে স্ফুরিত হয় দিব্য জীবনের পরম জ্যোতি। ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বসিয়া তিনি সিদ্ধকাম হন, ভগবৎ দর্শন লাভ করেন। তাঁহার সিদ্ধ দেহে এসময়ে অপূর্ব দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠে। যে কেহ তাঁহার দর্শনে আসিত, সে-ই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইত।

সাধনজীবনের শেষে এইবার শুরু হয় আচার্যজীবনের পালা। পরমহংসজী এখন হইতে বিজয়কৃষ্ণকে দীক্ষাদানের অনুমতি দেন।

বরাবরই গোস্বামীর দীক্ষাদানের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। কেহ কখনো তাঁহার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি নেপথ্যস্থিত তাঁহার গুরুদেবকে নিবেদন করিতেন। অনুমতি মিলিলে তবেই প্রার্থীকে দিতেন নাম বা দীক্ষাবীজ।

ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এক অলৌকিক দর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। গোস্বামীজী নিভৃতে বসিয়া সেদিন নগেন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিতেছেন। হঠাৎ নগেন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখিলেন, গোস্বামীপ্রভুর পিছনে এক দীর্ঘকায় শুভ্রশ্মশ্রু, জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গোঁসাইজী হাসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব পরমহংসজীকে আপনি দেখেছেন। তাঁর অপার কৃপাতেই আপনার এ দর্শন ঘটেছে। প্রত্যেকটি দীক্ষাদানের সময়ে তিনিই আমার এই দেহকে আশ্রয় ক'রে কাজ করেন। তিনি যন্ত্রী, আর আমি যন্ত্র মাত্র।"

গোস্বামীজীর সাধনদানের প্রণালী ছিল সরল ও সহজসাধ্য। প্রতি শ্বাসে গুরুর দেওয়া নাম সাধন করিতে হইত। এ সঙ্গে প্রাণায়ামের প্রক্রিয়াও থাকিত। তাছাড়া, আহার-বিহার সদাচার ও ধর্মনিষ্ঠা বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ তিনি সবাইকে দিতেন।

তাঁহার এই সাধন দ্বারা কিন্তু কাহারো নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইত না। প্রকৃত-

পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বহু মুমুক্ষু লোক তাঁহার কাছে আশ্রয় ও সাধন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

দীক্ষাকালে গোস্বামীজীর শক্তি সঞ্চারণ ভক্তদের প্রায়ই বিস্মিত করিত। স্পর্শ ও মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিতের অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিত, অলৌকিক ভাবাবেশে তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন।

এই দীক্ষাদান সম্পর্কে কখনো কাহারো অনুরোধ উপরোধের ধার গোঁসাইজী ধারিতেন না। সেবার একটি গৃহ পরিচারিকাকে তিনি সাধন দিলেন। ঠিক সেই সময়েই কোন অভিজাত পরিবারের এক সচ্চরিত্র যুবক তাঁহার কাছে আশ্রয় চায়। তিনি কিন্তু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনাটি ভক্তমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে কহিলেন, "দ্যাখো. এ সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী, এ বস্তু নিতান্তই ভগবানের দান। যাঁর উপর কৃপা রয়েছে-- তিনিই পাবেন। এর তালিকাও রচিত হয়ে রয়েছে। সদ্‌গুরু মাধ্যমেই এটা বিজ্ঞাপিত হয়। অনুযোগ ক'রে কোনো লাভ নেই।"

মহাযোগী ভোলাগিরি মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে সাধক ও আচার্য হিসাবে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন; একবার কোনো বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক গিরিজীর নিকট সাধনপ্রার্থী হন।

"আরে হামারে পাস কেওঁ আয়া? ওঁহা তো আশুতোষ হ্যায়, উন্‌সে লে লেও"—গিরি মহারাজ উত্তর দিলেন।

বিজয়কৃষ্ণকে তিনি স্নেহ করিয়া বলিতেন, আশুতোষ। বিজয়কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি বাঙালীদের দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও গোস্বামী প্রভুর মধ্যে বরাবরই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান ছিল। লোকনাথ সে সময়ে বাস করিতেন বারদী গ্রামে। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর। কঠোরস্বভাব শক্তিধর এই মহাপুরুষ বিজয়কে বড় স্নেহ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণও প্রায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। দুই মহাপুরুষের মিলনে দেখা দিত গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, উৎসারিত দিব্য আনন্দের ধারা!

ব্রহ্মচারীজী স্বভাবত দুর্মুখ ও রুক্ষ প্রকৃতির হইলে কি হয়, বিজয়কৃষ্ণকে দেখিলেই তাঁহার আনন্দ উথলিয়া উঠিত। একবার গোস্বামীজী তাঁহার দর্শনে গিয়াছেন, তিনি রসিকতা করিয়া এক বৈষ্ণবকে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের গৌরাঙ্গ হচ্ছে মাটির, পাথরের। আর এই দ্যাখো, আমার গৌরাঙ্গ—এ জীবন্ত।"

গোস্বামীপাদের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতেই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শিক্ষিতসমাজে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

সাধনজীবনে গোঁসাইজী এ সময়ে এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যেখানে ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের যত কিছু গণ্ডী ও ভেদরেখা স্বতই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবার গুরু পরমহংসজীর কথা ফলিয়া উঠিল। সাপের খোলসের মতো ব্রাহ্মসমাজের আবরণটি হঠাৎ একদিন স্খলিত হইয়া পড়িল। ১৯০৮ সালে চিরতরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন।

শিষ্যদের উৎসাহে ও সমবেত চেষ্টায় গেণ্ডারিয়ার আশ্রমটি এবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। সিদ্ধপুরুষ গোঁসাইজীকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত হয় দিব্য আনন্দের তরঙ্গ। যোগ, তপ ও ভজনের সাথে বহিয়া চলে শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা ও নামকীর্তনের ধারা।

সে-বার দ্বারভাঙ্গায় গিয়া গোঁসাইজী শূলবেদনায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ডাক্তার-দের চিকিৎসায় কোনোই ফল হইতেছে না। স্পষ্টই বুঝা গেল, রোগীর বাঁচার কোনো আশা নাই।

বন্ধুবান্ধব ও ভক্তেরা হাল ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময়ে সেদিন দেখা গেল, বাড়ির বারান্দায় এক গৌরতনু দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী চুপচাপ বসিয়া রহিয়াছেন। সকলেরই মন চঞ্চল ও বিষাদগ্রস্ত, কেহই এ সাধুটিকে লক্ষ্য করেন নাই। অপরাহ্ণ হ তে কিন্তু দেখা গেল, গোস্বামীজী দ্রুত আরোগ্যের পথে যাইতেছেন।

সঙ্কট কাটিয়া গেল, এবং রোগী অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া বসিলেন। শুধু তাহাই নয়, সকলকে বিস্মিত করিয়া গোঁসাইজী সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তুমুল বিক্রমে উদ্দণ্ড কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন। ডাক্তার ও ভক্তেরা তো এ দৃশ্য দেখিয়া হতবাক্।

গোস্বামীজী পরে ভক্তদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "তোমরা সেদিন লক্ষ্য করো নি। বারান্দায় যে সাধুটি নিভৃতে বসেছিলেন, তিনিই গুরুদেব পরমহংসজী। স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেদিন আমার মৃত্যুযোগ কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। আর একথাও আমায় তিনি বলে দিয়ে গেলেন, "বহুজনের হিতের জন্য তোমার আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার।"

আপৎকালে শিষ্যদের আশ্রয়দান ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে গোস্বামীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একবার মহেন্দ্রনাথ মিত্র নামক তাঁহার জনৈক শিষ্যকে তিনি ঢাকা হইতে কোনো কাজে কলিকাতায় পাঠান। মহেন্দ্রবাবু কার্যোপলক্ষে বড়বাজার দিয়া যাইতেছেন। ক্ষুধার উদ্রেক খুব হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে আছে মাত্র চারটি পয়সা। স্থির করিলেন উহা দিয়া দুধ কিনিয়া খাইবেন।

ঠিক এমনি সময়ে এক সাধু আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বসিলেন। কি আর করা যায়? তখনি পয়সা কয়টি তাঁহাকে দান করিতে হইল।

ঢাকায় ফিরিবামাত্র গোস্বামীজী স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "সেদিন বড়বাজারের সাধুকে পয়সা ক'টা দিয়ে ভালই করেছেন।"

মহেন্দ্রবাবু তো অবাক্! সুদূর ঢাকায় বসিয়া গোঁসাইজী কি করিয়া এ কথা জানিলেন? তিনি কি সর্বজ্ঞ?

বিজয়কৃষ্ণ পরে সব কথা তাঁহাকে ভাঙিয়া বলেন। ঐ দুধ পান করিলে মহেন্দ্র-বাবুর তৎক্ষণাৎ কলেরা হইত, তাই ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণেরই নির্দেশে তাঁহার পরিচিত এক সাধু ঐ পয়সা ক'টি হস্তগত করেন, সেদিন তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন।

এ সময়কার সিদ্ধাবস্থায়, গোস্বামীপাদের জীবনে ও তাঁহার আশে-পাশে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে দেখা যাইত। শিষ্য কুলদানন্দজী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ইহার কিছু কিছু বর্ণনা তাহার দিনলিপিতে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত শ্রবণান্তে বেলা প্রায় দুইটার সময়ে ঠাকুর বলিলেন —আমগাছ হতে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো? আমি হেঁট মস্তকে থাকি বলিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। ঠাকুর বলিবামাত্র একটু মাথা তুলিয়া দেখি, গাছ হইতে অবিশ্রান্ত শিশিরবিন্দুর মতো কি যেন পড়িতেছে। আম-তলায় শুষ্ক তৃণপত্র ও তুলসী গাছগুলি তেলপনা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব ও

উত্তরদিকের রোয়াকে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মতো মধু পড়িয়া ভিজিয়া রহিয়াছে। আর তাতে বিস্তর ডেঁয়ে পিঁপড়া প্রভৃতি আসিয়া জড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিকা গুন্‌গুন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। এক প্রকার সদ্‌গন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে।

"ঠাকুর আবার বলিলেন—কি, মধু ব'লে বুঝতে পারছো? এসময়ে শ্রীধর ও অশ্বিনী আসিয়া পড়িলেন; তাঁহারা দু-তিনটি শুষ্কপত্র চাটিতে চাটিতে বলিলেন,—বাঃ, এ তো বেশ মিষ্টি; মধুই বটে।

"আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। আমি বৃক্ষের নিম্ন শাখার দুটি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, ঠাকুর শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—উঃ, কি করছো? ওভাবে পাতা ছিঁড়তে আছে?

"পাতা দুইটি হাতে লইয়া দেখিলাম—ঠিক যেন তরল আঠা মাখানো রহিয়াছে। চাটিয়া দেখিলাম খুব মিষ্টি। তখন আশ্রমস্থ দশ-বারজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম, সকলেই আমপাতার মধুর স্বাদ পাইয়া আশ্চর্য হইলেন।

"ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমগাছে আবার এরূপ মধু পড়ে নাকি? ঠাকুর বলিলেন—শুধু আমগাছ কেন? যে সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার সহিত হোম, যাগ-যজ্ঞ, সাধন-ভজন তপস্যা হয়, অথবা যে সকল বৃক্ষের নিচে মহাত্মা মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায়। সময়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধুক্ষরণ হয়। খুব ভক্তির সঙ্গে পূজা করলে জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধু পোকা পড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হ'লো। জল একটু খেয়ে দেখলাম মিষ্টি মধুর গন্ধ। বহু প্রাচীন নিমগাছ, তেঁতুলগাছ দেখেছি, তা থেকে ঝরণার মতো মধু পড়ে। কমণ্ডলু ভরে খেয়েছি, পরে অনুসন্ধান করে জেনেছি—ওসব বৃক্ষের তলায় কোনো সিদ্ধপুরুষ বা মহাপুরুষের আসন ছিল।"

গোঁসাইজী সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর আরও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যায়—

"কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের শরীরে সর্বদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মতো দেখিয়া আসিতেছি। বেগে বাতাস করাতেও তাহা শুকায় না দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহ জমিয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই না। ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজা গামছা লইয়া নিজেই গা পুঁছিয়া থাকেন, পিঠে হাত চলে না বলিয়া আমি পিঠ পুঁছিয়া দিই। প্রচুর পরিমাণে তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া উঠিলে যে রূপ দেখায়, ঠাকুরকে কয়দিন যাবৎ সেইরূপ দেখিতেছি। মানুষের শরীরে ঘর্মাকারে মধু বাহির হয়—কোথাও শুনি নাই, কোনো পুস্তকেও পড়ি নাই। ঠাকুরের এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখিতেছি।

"স্নিগ্ধ সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সর্বদাই ঘরটি আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। বোলতা, প্রজাপতি ও মধুমাছি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাথার উপর দুই চারি পাক ঘুরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। হাতপাখার ঝাপ্‌টা হাওয়াতে ঠাকুরের শরীরে বা মস্তকে বসিবার অবসর পাইতেছে না। অসংখ্য পিঁপড়াও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া পড়িতেছে। দেখলেই আমরা উহা ঝাড়িয়া সরাইয়া দিতেছি।

'ঠাকুর নত মস্তকে মুদ্রিত নয়নে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তৈলধারার মতো অবিরল অশ্রু বর্ষণে ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া কৌপীন এবং বহির্বাস ভিজিয়া যাইতেছে। ধ্যানমগ্নাবস্থায় ঠাকুরের মস্তক প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া বামদিকের হাঁটুর উপরে

আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় ৮-১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বসেন। পুনঃপুনঃ এইভাবে পড়িয়া উঠিয়া অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ঠাকুরের দেহে যে সব অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা আমার ব্যক্ত করিবার উপায় নাই; ঠাকুরের অসীম কৃপাতে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছি।" (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গ)

কুলদানন্দ সে সময়ে প্রায়ই বিজয়কৃষ্ণের কক্ষে শয়ন করেন। সেদিন শেষ রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার দিনালিপিতে রহিয়াছে—

"দেখিলাম একটি কৃষ্ণবর্ণ সাপ ঠাকুরের বাম অঙ্গ বাহিয়া মস্তকে একটু ফণা বিস্তার করিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া আবার নামিয়া গেল। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—ইনি আসনের জাত-সাপ। সুবিধা পেলেই আসেন, জটা বেয়ে মাথায় উঠে কপালের উপরে কিছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান।

"সুষুম্নাতে প্রাণায়াম স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকলে তাতে বড় সুন্দর একটি শব্দ হয়। সাপ সেই সুর শুনতে বড় ভালবাসে। বাড়ির যেখানেই সাপ থাক্ না কেন, দূর হতে উহা শুনতে পায়, আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে ঐ সুর ধরতে গিয়ে, গায়ে, ঘাড়ে, মাথায় উঠে পড়ে। নাকের পাশে কপালের উপর ফণা বিস্তার করে, স্থির হয়ে ঐ সুর শুনতে থাকে। সময়ে সময়ে নিজের শিস্ ওতে মিশিয়ে দিয়ে বড়ই আনন্দ পায়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছুই অস্বাভাবিক নয়, সাধন চললে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে। এই সাপ কখনও অনিষ্ট করে না, এদের দ্বারা বিস্তর সাহায্যই পাওয়া যায়। এরা ছোঁ মারে না,—শিস্ ফেলে আবার প্রাণায়াম হলেই চলে যায়।"

সে বার ঢাকার শিষ্যদের নিয়া গোঁসাইজী বৈষ্ণবদের পবিত্র ধূলট উৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী-নিষ্ক্রান্ত গোঁসাইজীর জীবনে ভক্তির প্রবাহ এবার উপচিয়া পড়িতেছে। সমগ্র নগরীর জীবনকে তাহা আনন্দে উদ্বেল করিয়া তুলিল। শত শত মৃদঙ্গ-করতাল বাজিতেছে, আর বিপুল জনতা প্রভুপাদকে ঘিরিয়া গাহিয়া চলিয়াছে—

"হরি ব'লব মুখে যাব সুখে ব্রহ্মধামে,
কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম।
এ নাম শিব জপিছেন পঞ্চমুখে,
নারদ করেন বীণায় গান।
এবার গুরু নামে দিয়ে ডঙ্কা,
রাধা নামে দাও বাদাম।

এই নামসুধা পান করিয়া সহস্র সহস্র লোক সেদিন উন্মত্তপ্রায়—মহাভাবে মাতোয়ারা। এই ধূলট উৎসবে বিজয়কৃষ্ণের উদ্দণ্ড নৃত্য প্রেমভক্তির বন্যা বহাইয়া দেয়। অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার তাঁহার ভক্তিসিক্ত দেহে প্রকটিত হয়। এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া জনতা অভিভূত হইয়া পড়ে। কীর্তন-উৎসবে অনেকের উপর গোঁসাইজীর অলৌকিক শক্তি সঞ্চারণের কথা ঢাকাবাসী দীর্ঘকাল বিস্মৃত হয় নাই।

সে-বার গোস্বামীজী কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর ধর্মসভার বাৎসরিক

অধিবেশন এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণানন্দ স্বামী এই সভার প্রধান কর্মকর্তা, স্বামীজী গোস্বামী প্রভুকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতেছেন, এ সময়ে কয়েকটি লোক বক্রোক্তি করিয়া বলে, "ইনি তো গৃহী সন্ন্যাসী ! গার্হস্থ্য ধর্মটি ঠিকই বজায় রেখেছেন।"

অন্তর্যামী গোঁসাইজীর দিব্য দৃষ্টিতে এসব এড়ায় নাই। তিনি সদলবলে এই ধর্মসভায় উপস্থিত হইলেন। সভার পর কীর্তন শুরু হইল এবং বিজয়কৃষ্ণের নাচগান ও উদ্দণ্ড নৃত্যে সেদিন জাগিয়া উঠিল প্রচণ্ড উদ্দীপনা ! পরম ভাগবতের দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি এক ভাবের বিকাশ ! দেখিয়া সকলে হতবাক্ হন, শ্লেষোক্তি যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন।

কাশীর মঠ ও মন্দিরে গোস্বামীজী এ সময়ে প্রায়ই বিগ্রহ দর্শনে যান। ঢুকিবামাত্রই 'বম্ ভোলা—বম্ ভোলা' হুঙ্কারে চারিদিক কাঁপাইয়া তোলেন। নয়নকোণ হইতে ফোয়ারার মতো অশ্রুজল উৎসারিত হইতে থাকে। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য ! আরতি শেষ হইলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণের ভিড় লাগিয়া যায়, প্রায় সময়েই মন্দিরে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সহিত গোঁসাইজীর এই সময়ে একবার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে পরম আদরে গ্রহণ করিয়া স্বামীজী মহারাজ নানা শাস্ত্রালাপ করেন। বিশুদ্ধানন্দজী অনেককে ইহার পর বলিতেন, "বহুৎ সাধু ম্যায় দর্শন কিয়া, লেকিন ইয়ে বাঙ্গালী সাধুকা মাফিক অওর কোঈ সাধু নহী দেখা।"

কাশীধামে তখন ভাস্করানন্দজীর যোগবিভূতির খুব খ্যাতি। গোঁসাইজী একদিন শিষ্যগণসহ তাঁহার সাহত দেখা করিতে যান। আশ্রমে পৌঁছিয়া শুনিলেন, স্বামীজী মহারাজ ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, এখন ভেট হইবে না।

দর্শন না করিয়া গোস্বামীপাদও নড়িবেন না। শিষ্যদের নিয়া তিনি আশ্রমের বাহিরে এক বৃক্ষমূলে বাসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাস্করানন্দ নয়ন উন্মীলন করিলেন।

বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের কহিলেন, "বাগানের বৃক্ষতলে এক শক্তিমান্ মহাপুরুষ উপবিষ্ট রয়েছেন। চল, এখনি আমরা সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হই।"

উভয়ের সাক্ষাৎকারে দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল।

প্রসিদ্ধ সাধক দ্বারকাদাস বাবাজীর সহিত গোস্বামীপ্রভুর দেখা করার খুব অভিলাষ হয়। বাবাজী মহারাজ দিনের বেলায় কাশীর সন্নিহিত এক বনে প্রবেশ করিয়া সাধনভজনে রত হন, তারপর রাত্রে স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। আশ্রমে সেদিন তাঁহার দেখা না পাইয়া গোস্বামীজী নিজের নাম ঠিকানা রাখিয়া আসিলেন। পরদিন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখেন, দ্বারকাদাস বাবাজী নিজেই বিজয়কৃষ্ণের আবাসে আসিয়া উপস্থিত। সসম্ভ্রমে বহুক্ষণ তাঁহার সহিত নানা কথাবার্তা বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এ সময়ে গুরু পরমহংসজীর নির্দেশে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেন। গুরু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও বাচ্চা, ব্রজভূমিতে গিয়া কিছুদিন ভজন সাধন করো। বড় জাগ্রত সে স্থান। সেখানে এ সময়ে থাকলে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ যেন পরমহংসজীর এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি ! শক্তিধর গুরুর

কৃপায় তাঁহার জীবনে উদ্‌গত হইয়াছে অলৌকিক বিভূতি আর প্রেমভক্তির মধুরস। যোগ-সিদ্ধ দেহের আধারে ভক্তির রস টলমল করিয়া উঠিয়াছে। অসামান্য যোগবিভূতির সাথে আসিয়া মিলিয়াছে বিরল প্রেমভক্ত!

শান্তিপুরের কাছে বাব্‌লায় অদ্বৈতপ্রভুর এক ভজনস্থান আছে। বাল্যকাল হইতে বিজয়কৃষ্ণের এখানে খুব যাওয়া আসা ছিল। ধর্মজীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ পবিত্র ভূমির আকর্ষণ তাহার নিকট আরও বাড়িয়া যায়। শান্তিপুরে আসিলেই এখানে কিছুকাল তিনি ধ্যান-ভজন-জপে কাটাইয়া যাইতেন।

সে-বার শিষ্যগণসহ তিনি বাব্‌লায় উপস্থিত হইয়াছেন। সকলকে বলিলেন, "দ্যাখো, এখানকার আবহাওয়া অপূর্ব, একটু স্থির হয়ে বসলে বা অন্তর্মুখীন হ'লে তা টের পাওয়া যায়।" কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী সেদিনকার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন—

"আমরা সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনিসহ একটি মহাসংকীর্তন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। ভাবিলাম, ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানিয়াই বুঝি আশপাশের লোক সংকীর্তন লইয়া এস্থানে আসিতেছেন। আমরা খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। সংকীর্তনের ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল।

"দুই এক মিনিট অন্তরেই, সংকীর্তন আসিয়া পড়িয়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সংকীর্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম এবং অদূরেই সংকীর্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের খেলা। ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সংকীর্তনে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় চলিতে লাগিলাম, ততই সংকীর্তনের ধ্বনি ক্রমশ হ্রাস পাইয়া, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

"আমরা আসিয়া ঠাকুরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—সংকীর্তনের মহাকোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানি না অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সংকীর্তন মুহূর্ত-মধ্যে কোন দিকে চলিয়া গেল।

"ঠাকুর বলিলেন, ছেলেবেলায় প্রায়ই আমি বাব্‌লায় আসতাম—এই সংকীর্তন শুনতাম, তখন একবার এদিক্‌ একবার ওদিক্‌ ছুটাছুটি করতাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম করলেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পারতে। এই সংকীর্তন সাধারণ কীর্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান্—মহাপ্রভুর সংকীর্তনধ্বনি শুনেছ।"

আর একদিন গোসাইজীকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে। কুলদানন্দের দিনলিপিতে এ তথ্যটিরও উল্লেখ রহিয়াছে—"এক দিবস ঠাকুর চৌদ্দ দল লইয়া বহুলোক সমেত নিজ বাড়ি হইতে সংকীর্তন করিতে করিতে বাব্‌লায় চলিলেন। গৃহপালিত কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

"এ কুকুর সাধারণ কুকুর নয়। শুনিলাম, জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস বা উচ্ছিষ্ট

খায় নাই। কুকুর 'কেলে' প্রত্যহ শ্যামসুন্দরের মন্দির পরিক্রমা করিত। খোল-করতালের শব্দ পাইলে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং নিবিষ্টচিত্তে একস্থানে বসিয়া সংকীর্তন শ্রবণ করিত। কখনো কখনো উহার অশ্রুধারা নির্গত হইত। ঠাকুর কেলেকে 'ভক্তরাজ' বলিয়া ডাকিতেন। কেলে নাকি মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছে।

"সংকীর্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযাত্রীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কেলেকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কেলে তখন নিরুপায় হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন।

"অচিরেই হরিসংকীর্তন মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তখন ভাবাবেশে মত্ত হইয়া সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে অপ্রাকৃত মহাসংকীর্তনের মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সংকীর্তন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাতে যোগ দিবার মানসে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা মন্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন, ততই সেই সংকীর্তনের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না।

"এই সময় 'ভক্তরাজ' কেলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পঞ্চবটীর নিকটে একটি স্থানে দৌড়াইয়া গিয়া সজোরে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকট আসিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরের বহির্বাস কামড়াইয়া ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

"ক্রমাগত তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া ঠাকুর কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহা খুঁড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। নিকটবর্তী কৃষকদের গৃহ হইতে দু'খানি কোদাল আনিয়া ঐ স্থান খনন করা হইল। খানিক দূর খনন করিয়া কিছুই না পাওয়াতে খননকারীরা নিবৃত্ত হইল।

"এই সময় 'ভক্তরাজ' ঠাকুরের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং আপন নখদ্বারা মৃত্তিকা আবার ব্যস্ততার সহিত আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল।

"ইহা দেখিয়া ঠাকুর আরও মৃত্তিকা খনন করিতে বলিলেন। এইবার কিছুক্ষণ খুঁড়িতেই একটি পিতলের হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। উহার ভিতরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামাঙ্কিত এক জোড়া কাষ্ঠ-পাদুকা, একটি মাটির করোয়া এবং হস্তলিখিত ছিন্নপুঁথি একটি বাক্সের ভিতর রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঠাকুর পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"সংকীর্তন আবার আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তারপর সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন 'ভক্তরাজ' কেলেও অচৈতন্য। ঠাকুর তাহার কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কেলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 'যে কার্যের জন্য তুমি এসেছিলে, আজ তা সম্পন্ন হ'লো, এখন তুমি গঙ্গালাভ করো'—বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

"প্রহরার্ধক রাত্রির পর সংকীর্তন করিতে করিতে সকলে গৃহে আসিল। পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়া সকলে দেখিল একহাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। ঠাকুর নিজহস্তে গঙ্গাতীরের বালুকা খনন করিয়া 'ভক্তরাজ' কেলের দেহ সমাধিস্থ করিলেন।"

বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর পরম ভাগবত গৌরকিশোর দাসের সহিত গোস্বামীপাদের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব হয়। দুজনে মিলিয়া মহানন্দে এই সময়ে কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন।

বৃন্দাবনে কয়েকটি প্রভাবশালী গোস্বামী গোড়ার দিকে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন তাঁহার উপর বেশ কিছুটা অত্যাচারও হয়। একবার একদল দুষ্ট গোঁসাই তো অলক্ষ্যে তাঁহার শিরে দুর্গন্ধময় গোবর জলই ঢালিয়া দেয়! এই দুষ্কৃতকারীদের একজন স্বপ্নে আদেশ পায় যে, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ এক মহাপুরুষ—পুষ্পমাল্য দিয়া তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা না করিলে তাহারা সকলে বিনষ্ট হইবে। এ স্বপ্নাদেশের কথা শুনিয়া দুষ্কৃতেরা ভীত হয়, বিজয়কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মাল্য দিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা জানায়।

সেদিন বৃন্দাবনের রাধাবাগে বসিয়া গোস্বামীপ্রভু গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। এ সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জ্যোতির্ময় মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। এই অলৌকিক দর্শন জাগাইয়া তোলে এক মহাভাবের প্রবাহ। গোঁসাইজী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

উত্তরকালে গোঁসাইজীকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, বৃন্দাবনের বনাঞ্চলে বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। এই পুণ্যক্ষেত্রের অপ্রাকৃত লীলা দর্শনের জন্যই তাঁহারা আসেন। তিনি ভক্ত ও শিষ্যদের বলিতেন,—এই সকল বৈষ্ণব মহাপুরুষদের সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

পরিকরবৃন্দসহ গোস্বামীজী সেদিন যমুনাপুলিনে বেড়াইতেছেন, বালুর মধ্যে হঠাৎ মৃতদেহের একটি অস্থি পাওয়া গেল। এই অস্থি হাতে তুলিয়া নিয়া প্রভুপাদ সঙ্গীদিগকে কহিলেন, "চেয়ে দ্যাখো, এই পবিত্র হাড়গুলোতে 'হরেকৃষ্ণ' নাম চিহ্নিত রয়েছে। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের নামসাধনার কি প্রভাব। নিরন্তর নাম করার ফলে তাঁদের অস্থি-মজ্জা এইরূপ নামাঙ্কিত হয়ে যায়।"

এক বাঙালী ভদ্রলোক এ সময়ে বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোঁসাইজীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করেন। প্রভু এখানে আছেন জানিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, "প্রভু, বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের কথা কেবল কানে শুনেই গেলাম, কিন্তু কিছুই অনুভূত হ'লো না। এ স্থানের বিশেষত্বও কিছু জানতে পারলাম না।"

গোস্বামীজী বলিলেন, 'আপনি একি কথা বলছেন? এ যে অপ্রাকৃত ধাম! ব্রজরজের মহিমা নিশ্চয়ই আছে! একবার নাম ক'রে এই পবিত্র ভূমিতে আপনি লুটিয়ে পড়ুন দেখি।"

আগন্তুক একথা শুনিয়া ধুলোয় গড়াগড়ি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল তাঁহার অদ্ভুত ভাবোন্মত্ততা। অঝোর ধারে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। দুই চোখে অবিরল ধারায় কেবলি অশ্রু ঝরিতেছে আর ব্রজের পবিত্র ধূলি তিনি বার বার শরীরে লেপন করিতেছেন। বহু কষ্টে সেদিন তাঁহাকে শান্ত করা গেল।

যোগমায়া দেবী এই সময়ে কিছুকালের জন্য বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন।

গোসাইজী পত্নীসহ বাস করিতেছেন, এজন্য বৃন্দাবনের কোনো কোনো সাধুকে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করিতে দেখা যায়।

ব্রজবিদেহী মোহান্ত রামদাস কাঠিয়া-বাবাজীর কানে একথা পৌঁছে। বাবাজী মহারাজ বিজয়কৃষ্ণের মর্ম জানিতেন। তিনি বিদ্রূপকারীদের তীব্রস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমরা চুপ করো। এই মহাত্মা এক মহাসমর্থী পুরুষ। তেজস্বী সাধক ব্যক্তি হচ্ছেন ঠিক আগুনের মতো, সব কিছু তাঁর তেজে দগ্ধ হয়ে যায়। গৃহে বাস করলেও এর মতো সাধুর কোনো ক্ষতি হয় না।"

বৃন্দাবনে থাকাকালে গোসাইজীর পত্নী যোগমায়া দেবী বলিয়াছিলেন—রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাস্থান এ ব্রজধাম, এখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। হইলও তাহাই। শুদ্ধাত্মা সাধিকা অল্পদিন পরেই নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো সময়ে নামকীর্তন শুনিলে গোস্বামী-প্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—সারা সত্তায় মহাভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। বৃন্দাবনে সেদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে।

গোস্বামীজীর আবাসের নিকট দিয়া এক সংকীর্তন চলিয়াছে। তিনি তখন শৌচাগারে। শৌচক্রিয়া শেষ না করিয়াই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং কীর্তনে গিয়া যোগ দিলেন। ভাবাবেশে একেবারে মাতোয়ারা। নামকীর্তন ও হরিলুট শেষে যখনি বাড়ি ফিরিলেন তখনই স্মরণ হইল—তাই তো। শৌচকার্য তো করা হয় নাই! এমনি ছিল তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের আবেশ, এমনি প্রগাঢ় ছিল নামে রতি!

খণ্ডবুদ্ধির পরপারে ছিল এই মহাসাধকের নিরন্তর অবস্থিতি। পাপ-পুণ্য ও শৌচাশৌচবোধের প্রয়োজন তাই তাঁহার কাছে অর্থহীন হইয়া গিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের এ সময়কার সাক্ষাৎটি বড় মর্মস্পর্শী। কুলদানন্দজী তাঁহার দিনলিপিতে ইহার এক অপূর্ব বিবরণ দিয়াছেন—

"ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া, মহর্ষি'র চরণদ্বয় তাঁহার মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে পবিত্রমূর্তি বৃদ্ধ মহর্ষি'র শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্বক, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া, গদ্‌গদ স্বরে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ।' পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। গণ্ডস্থল ভাসাইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহর্ষি'র বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষি'কে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীমহাশয় মহর্ষি'র দক্ষিণদিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া, মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, 'ইঁহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইঁহারা কে?' শাস্ত্রীমহাশয় মহর্ষি'র কানের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—ইঁহারা সকলে গোসাইর শিষ্য।

"মহর্ষি বলিলেন, 'মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খেয়ে

অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে যাহা ভোগ করেছেন, শিষ্য-দিগকেও তাহা দিচ্ছেন ; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তাপহারক। ইহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।'

'তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—ভগবানকে যেমনভাবে পেতে আকাঙ্ক্ষা, তেমন ভাবে পাচ্ছি না। সময় সময় তিনি দয়া ক'রে দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়ে যান, যতক্ষণ বার সেই প্রেমময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মতো থাকি, প্রাণ আমার ধড়ফড় করে—সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়া ক'রে দর্শন না দিলে, কি আর করবো। জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁকে লাভ করা যায় না, জ্ঞান তো একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেমভক্তিই তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। তা তো আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয় ; পুরুষকার—অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া ক'রে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন বলেছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা ক'রে, তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে আছি।'

"এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মতো ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর 'জয়গুরু জয়গুরু', বলিতে লাগিলেন। একটু পরে, চোখ মুখ মুছিয়া মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, 'যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব হ'তেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসঙ্গে না থাকলে প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোল আনা ধর্মলাভ হয় না। তোমাতে এই চারটি উপযুক্তরূপে রয়েছে। অদ্বৈত প্রভুর বিশুদ্ধ বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করেছ, তাঁর কৃপায় প্রকৃত সংশিক্ষা ও সদুপদেশ পেয়েছ। তারপর, মনুষ্যচেষ্টায় সাধনভজনও যতটা সম্ভব, তাও পূর্ণমাত্রায় তুমি করেছ, সর্বোপরি ভগবানের কৃপা, তাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রয়েছে। তুমি ধন্য।' এই বলিয়া মহর্ষি একটি শ্লোক পড়িলেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়ঃ ॥

"তুমি যাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান্ তাই অতি সুন্দর দেখেছেন।"

"ঠাকুর বলিলেন—আপনিই তো আমাকে হাত ধরে মানুষ করেছেন। আমার সবই তো হয়েছে আপনার থেকে। আপনিই আমার গুরু।

"ঠাকুরের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছ, গুরু তো বটেই। তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মতো। ক, খ শিখতে হলে প্রথমে যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকট শিখতে হয়, পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বললে যেমন হয়—তোমার বেলাও ঠিক সেইরূপই হচ্ছে, গো।' ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন—আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

"মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন,—আমি তোমায় আশীর্বাদ করতে পারি না, আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হোক।

"আমরাও সকলে একে একে মহর্ষি'র চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহর্ষি' খুব হৃষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমাদের মঙ্গল হবে, গোঁসাইকে তোমরা কখনো ছেড়ো না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।"

সে-বার প্রয়াগধামে মহাসমারোহে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এখানে শিষ্যগণসহ উপস্থিত। বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া তিনি আসন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁবুর মধ্যস্থলে রহিয়াছে এক পূজাবেদী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর দুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিষ্যদের মধ্যে কাজের ভার বাঁটিয়া দিয়া গোস্বামীজী বলিলেন "আমার কি কাজ হবে জানো ?—ভিক্ষা। তোমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর।"

সঞ্চিত কোনো টাকাকড়ি তাঁবুতে নাই, কিন্তু দৈনিক শত শত টাকা ব্যয় হইতেছে। আটা, চিনি, ঘি আসিতেছে, ভারে ভারে।

মেলায় আগত শত শত লোককে নিয়মিতভাবে ভোজন করাইয়াও গোস্বামীজীর চিরাচরিত দানকার্য অবাধে চলিত। তাঁহার অতিথি বৎসলতার কথা সেখানে জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গৃহস্থের মতো জীবনযাপন করেন। বৈষ্ণব হইয়া রুদ্রাক্ষ ও গৈরিক বসন ধারণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়। শুধু তাহাই নয়, গৌরনিতাই বিগ্রহের পূজাও তাঁহার তাঁবুতে চলিয়াছে। এসব নিয়া মেলার বৈষ্ণবমণ্ডলীতে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠিতে থাকে।

এসময়ে ভোলাগিরি মহারাজ, কাঠিয়াবাবাজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ গোঁসাইজীর সমর্থনে আগাইয়া আসেন। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষ ও সাধনশক্তির মাহাত্ম্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। বৈষ্ণব সাধুরা এবার শান্ত হন।

উচ্চকোটির সাধুসন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যেই গোঁসাইজীর মর্ম অবগত হইয়াছিলেন। মৌনীবাবা, অমরেশ্বরানন্দ পুরী, নরসিংহদাস বাবাজী, গম্ভীরনাথজী, দয়ালদাস বাবা, অর্জুনদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিজয়কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎমাত্রই তাঁহাকে আন্তরিক সমাদর ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।

একদিন মহাত্মা অর্জুনদাস গোস্বামীজীর তাঁবুতে বসিয়া আছেন। রঙ্গিয়াবাবা নামক এক সিদ্ধযোগীও এসময়ে সেখানে উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে যোগক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার জানা কিছু কিছু নিগূঢ় তথ্য তিনি সাধকদের শুনাইতে থাকেন। কিছুক্ষণ তাঁহার কথাবার্তা শুনার পর অর্জুনদাসজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। গোস্বামীকে দেখাইয়া তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে রঙ্গিয়াবাবাকে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, দেখতে নেহী, ইয়ে সাক্ষাৎ যোগীরাজ হ্যায়! হরবখৎ সমাধিমে রহতে হ্যাঁয়। ইন্‌কো সামনেমে তুম্ ক্যা বাৎলাতে হো ?" যোগীটি এ তিরস্কারের পর একেবারে চুপ হইয়া যান।

যোগশক্তির সাথে ভক্তি, ঐশ্বর্যের সাথে দৈন্য, গোস্বামীজীর মধ্যে বিস্ময়কররূপে মিলিত হয়, লাভ করে এক সুসমঞ্জস পরিণতি।

অতি স্বাভাবিকভাবে গোঁসাইজী নিজের এই যোগৈশ্বর্যকে বহন করিতেন। তাঁহার এ যোগসিদ্ধি প্রকটিত হইয়া উঠিত শুধু কৃপার ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে। হাজার হাজার ভক্ত লোকগুরুরূপে দেখিত তাঁহার প্রেমভক্তি-উজ্জ্বল ভাবময় রূপ। এ রূপ, এ ভাব নিয়া

বাংলার অধ্যাত্মজীবনে যে প্রেমতরঙ্গ তিনি তোলেন, চৈতন্যযুগের পরে কম বৈষ্ণব নেতাই তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বোলপুরের উকিল শ্রীহরিদাস বসু প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন—পরে তিনি বিজয়-কৃষ্ণের কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হন। হরিদাসবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, "আহা, হনুমানের কি অপূর্ব ভক্তি! বুক চিরে ইষ্টদেবতা, রাম-সীতা দেখিয়েছিলেন।"

ভক্তের ভাবময় কথা কয়টি শুনিবামাত্র গোস্বামীপাদ স্মিতহাস্যে কহিলেন, "সে কিগো! বুক কি আবার চিরতে হয়!"

গুরুদেবের কথার অর্থ কি, হরিদাসবাবু তাই ভাবিতেছিলেন। ক্ষণপরেই চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, গোস্বামীজীর আসনে 'হরেকৃষ্ণ' এই মন্ত্রটি ধীরে ধীরে আপনা হতেই অঙ্কিত হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, সেখানে আত্মপ্রকাশ করিল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া হরিদাসবাবুর মুখে কথা সরিল না।

সে-বার বৃন্দাবনে থাকিতে এক অভূতপূর্ব ধ্যানাবেশের মধ্য দিয়া গোস্বামীজীর দিন কাটিতে থাকে। একদিনকার প্রগাঢ় ধ্যানে আসন্ন যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত তিনি প্রাপ্ত হন। সেদিন ধ্যানকুটিরের দ্বার কিছুতেই খুলিতেছেন না, সেবকগণ ভীত হইয়া ডাকাডাকি শুরু করিলেন।

গোস্বামীপাদ বাহিরে আসিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে সবাইকে কহিলেন, 'হিমাচলের কয়েকটি ঋষি আজ কৃপা ক'রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন—ভারতের অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন হবে। আজকের দিনে যে ধর্মজীবন দেখছি, তা আরও অবনত হবে, তারপর ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। মানবজাতির ঘটবে পুনর্জীবন, আসবে এক যুগান্তর।"

দীর্ঘ সাধনার শেষে পরম ভাগবত বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এবার আসিয়াছে দারুব্রহ্ম নীলাচলনাথের আহ্বান। পুরীধামে তাঁহাকে এবার পৌঁছিতে হইবে। গুরু পরমহংসজীর আজ্ঞাও এ সম্পর্কে মিলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ কৃচ্ছ্রব্রতের ফলে স্বাস্থ্য প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাই কয়েকটি সেবক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে চলিল।

যাত্রাকালে গোস্বামীজী বলিলেন, "তোমরা আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আমি যেন আমার প্রাণের নীলাচলপথকে দর্শন করতে পারি। আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি ঘটে।"

কলিকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করে। প্রেমাবেশে বিভোর গোঁসাইজী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। কহিলেন, "ভাই, আশীর্বাদ করো, আমি যেন দারুব্রহ্মের কৃপা পাই।"

নীলাচলে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দ ধরে না। তখনি ছুটেন নীলমাধবের অঙ্গনে। প্রেমের পাথার তরঙ্গিয়া উঠে, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়াই কীর্তন শুরু করিয়া দেন। বহুদিন পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তির ভাববন্যা আবার পুরীধামে বহিয়া যায়।

এক বৎসরের কিছু বেশী সময় গোস্বামীজী এখানে বাস করেন। এই সময়ের মধ্যেই ভক্তসমাজের মধ্যমণিরূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন। জটাজূটসমন্বিত দিব্যকান্তি এই মহাপুরুষকে উৎকলবাসীরা নাম দেয়, জটিয়াবাবা।

কৌপীনধারী, কপর্দকহীন জটিয়াবাবার যোগৈশ্বর্য ও নিত্যকার দান-অনুষ্ঠানের খ্যাতি চারিদিকে রটিয়া যায়।

মহাধামের মিলন-ক্ষেত্রে প্রভুপাদ তাঁহার জীবননাথের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া দারুব্রহ্মের নানা লীলা-উৎসব তিনি উদ্‌যাপন করিতেছেন। চন্দ্রযাত্রা, রথযাত্রা, পদ্মবেশ, দোলযাত্রা একের পর এক আবর্তিত হইয়া আসে। প্রভুপাদের অন্তরে ডাকিয়া উঠে দিব্য আনন্দের বান। প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথের সেবা করেন, আর নামধ্যানে হন কম্পতনু।

সেদিন ঝুলন দোলের আনন্দ উৎসব। মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত নীল-মাধবের শোভা যেন অনির্বচনীয়। প্রভুর নামকীর্তনে আর উদ্দণ্ড নৃত্যে গোস্বামীজী সেদিন প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিলেন। এ নৃত্যকীর্তনে পুরীবাসী ভক্তেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মহাভাবে মাতোয়ারা গোঁসাইজীর অঙ্গে দেখা যাইতেছে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। আর চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভা। এই দেবোপম মূর্তি দর্শনে জগন্নাথের ছত্রধরও আত্মহারা হইয়া পড়ে, গোস্বামীপাদের শিরে ছত্র ধারণ করিয়া সে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে। চারিদিক স্বর্গীয় ভাবরসে টলমল করিতে থাকে।

শরীর ক্রমে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল গোঁসাইজী প্রায়ই সমুদ্রে যাইতে পারেন না। কিন্তু বড় বিস্ময়ের কথা, তাঁহার সমুদ্র-স্নান একদিনের জন্যও বন্ধ হয় না। একদিন ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া আসিলে সেবকগণ দেখেন জটাজাল হইতে টপ্‌টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রশ্ন করিলে গোঁসাইজী সংক্ষেপে উত্তর দেন, "আমি যে এইমাত্র সমুদ্রে স্নান করলাম।"

পরম বিস্ময়ে ভক্তগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে। কারণ, সবাই জানে, তিনি এত অসুস্থ যে, গৃহের বাহিরে যাইতে পারেন না।

সেদিন এক বিশেষ পুণ্যযোগে প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার পর তাঁহার অন্তরে অলৌকিক ভাবের স্ফুরণ হইল। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, সাধারণ মানুষ এই বিগ্রহকে বলে, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা। আসলে এঁরা দারুব্রহ্মের অখণ্ড রূপ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই দারুরূপে ত্রিমূর্তিতে প্রকটিত হয়েছেন। এঁদের দেখলে ব্রহ্মদর্শন হয়।"

পুরীধামের ভক্তসমাজে এসময়ে গোস্বামীপাদের বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা কোনো বৈষ্ণব মঠের মোহান্ত এবং স্থানীয় কয়েকটি প্রভাবশালী ব্যক্তির ঈর্ষা জাগাইয়া তোলে। বিজয়কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য তাহারা তৎপর হয়।

সেদিন ভোরবেলায় প্রভুপাদ সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভক্ত নীলমণি বর্মনের বাড়িতে বসিয়া আছেন। সাধুবেশধারী একটি লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটি গোঁসাইজী বা তাহার সেবকদের কাহারো পরিচিত নয়। দেখা গেল, তাহার হাতে রহিয়াছে জগন্নাথের প্রসাদী নাড়ুর একটি ঝাঁপি।

আগন্তুক তাড়াতাড়ি প্রসাদী নাড়ু গোঁসাইজীর দিকে আগাইয়া দেয়। বলে, "বাবা, প্রাপ্তিমাত্রেই প্রসাদ খেতে হয়, নিন।"

সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ গোঁসাইজীর কাছে এ নাড়ুর গোপন তথ্য অজানা নাই। মুহূর্তেই তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, ইহাতে মিশ্রিত রহিয়াছে প্রাণঘাতী বিষ।

আরো বুঝিয়াছেন, এই বিষ ভক্ষণের মাধ্যমে ঘটাইতে হইবে তাঁহার নরজীবনের অবসান—করিতে হইবে লীলা সংবরণ। ইহাই বিধিলিপি।

সর্বোপরি কথা—এ যে প্রভুর মহাপ্রসাদ। কোনোমতেই তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।

এ বিষাক্ত নাড়ু প্রসাদ গলাধঃকরণ করার পর ধীরে ধীরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকের চেষ্টায় যদিই বা জ্ঞানসঞ্চার হইল, শরীর তাঁহার একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আর তাহা সারিয়া উঠে নাই। এক মাসকাল রোগভোগের পর নিত্যলীলায় প্রবেশের চিহ্নিত দিনটি আসিয়া পড়ে। ১৩০৬ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠের রাত্রি ভক্তদের কাছে হইয়া উঠে মর্মান্তিক।

ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে এক মহাজ্যোতিষ্ক সেদিন চিরতরে অপসৃত হইয়া যায়।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে আনিয়া দেয় ক্ষয়-ক্ষতি, আগত হয় অভিশাপ-রূপে। কচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, এ দুর্ঘটনা আশীর্বাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্ধমানের বণ্ডুল গ্রামের ভোলানাথের জীবনে সেদিন দেখা গেল এমনি এক ব্যতিক্রম।

চঞ্চল বালক ভোলানাথের বয়স বার বৎসরের বেশী নয়। গ্রামের পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ এক ক্ষিপ্ত কুকুর তাহাকে দংশন করিয়া বসে। এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই জীবনে তাহার নামিয়া আসে ঐ করুণা ও আশীর্বাদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কথা। কুকুর দংশ'নর আধুনিক চিকিৎসা তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। ভোলানাথের ক্ষতস্থানে দেশীয় ঔষধপত্র প্রয়োগ করিয়া তেমন ফল হইল না। আরো ভালো চিকিৎসার জন্য তাহাকে চুঁচুড়ায় এক আত্মীয়ের গৃহে পাঠানো হইল।

ঘায়ের বড় দুঃসহ যন্ত্রণা। এক এক দিন এ যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। সেদিন গভীর রাতে চুপি চুপি ঘর ছাড়িয়া নদীতীরে আসিয়া দাঁড়ায়। জলে ডুবিয়াই সে আত্মহত্যা করিবে।

নদীতে নামিতে যাইবে, এমন সময়ে চোখে পড়ে এক অদ্ভুতদৃশ্য! অদূরে গঙ্গাগর্ভে দাঁড়ানো জটাজূটসমন্বিত এক সন্ন্যাসী। গম্ভীর স্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া তিনি ডুব দিতেছেন, আর মস্তক উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে জলরাশি স্তম্ভাকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে। এক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড। স্তব্ধ বিস্ময়ে, নির্নিমেষে বালক এই যোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া আছে।

সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও বালক ভোলানাথের উপর পড়িল। স্নানের পর তিনি তীরে উঠিয়া আসিলেন। ভোলানাথকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছিলে? আত্মহত্যা যে মহাপাপ।" সাশ্রুনয়নে বালক অসহ্য রোগযন্ত্রণার কথা নিবেদন করিল।

মহাপুরুষ সহজ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কি একটা রোগ! ও কিছুই নয়। এক্ষুনি তোমার সমস্ত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। এজন্য ভেবো না।"

কৃপাময় সন্ন্যাসী ভোলানাথের ক্ষতস্থানে নিজের হস্ত বুলাইয়া দিলেন। তীব্র ব্যথা-বেদনা নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী অতঃপর গঙ্গাতীরে আর বেশীক্ষণ অবস্থান করেন নাই। ভোলানাথের আনন্দ আর ধরে না! মহাত্মার কৃপায় সম্পূর্ণরূপেই সে যে রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে! গভীর রাত্রে সানন্দে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, এই অলৌকিক ঘটনার কথা সবাইকে বলিতে থাকে।

ভোলানাথ বার বৎসরের বালক, কিন্তু এ বয়সেই সে যেন অনন্যসাধারণ। গঙ্গাতীরের

মহাপুরুষের স্মৃতি সেদিন হইতে সে আর ভুলিতে পারে নাই। বার বারই তাঁহার দিব্য মূর্তি, তাঁহার কণ্ঠস্বর অন্তরে দোলা দিয়া যাইতেছে!

কে এই শক্তিধর পুরুষ, অবলীলায় যিনি তাঁহার এ দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দিলেন? তাঁহার কাছে তবে তো আরো অনেক দুর্লভ বস্তুই রহিয়াছে! সে বস্তু কি তাহার ভাগ্যে মিলিবে না?

দুজ্ঞের আকর্ষণ এই সন্ন্যাসীর। ভোলানাথ পরের দিনই আবার তাঁহার সন্ধানে গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত।

এইদিন দেখা যায় আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। মহাপুরুষ নদীতীরে বসিয়া পূজা ও তর্পণ সারিতেছেন। মাঝে মাঝে হস্ত দ্বারা করিতেছেন জলস্পর্শ। প্রতিবারই ঘটিতেছে সেখানে অবিশ্বাস্য কাণ্ড। যখনি তিনি নিচের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন, তখন গঙ্গাবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। আর হাতের ছোঁয়া লাগিলেই জলরাশি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যায়।

ভোলানাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অদূরে দণ্ডায়মান। এ দৃশ্য হইতে সে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছে না।

মহাপুরুষের পূজা-বন্দনাদি শেষ হইয়া যায়। বালক ছুটিয়া গিয়া পতিত হয় তাঁহার চরণতলে। কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহিতে থাকে, "প্রভু, কাল আমার জীবন দান করেছেন। আমার একান্ত মিনতি, সেই জীবনের সব ভার আপনিই গ্রহণ করুন। আপনার চরণতলে বসে এই জীবন আমি কাটিয়ে দিতে চাই। কৃপা ক'রে আজই আপনি আমায় মন্ত্রশিষ্য ক'রে নিন্।"

সান্ত্বনা দিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "বাবা, সময়ে সবই হবে, সদ্গুরু তোমার মিলে যাবে, তুমি অধীর হয়ো না। আচ্ছা, আজ তোমায় সামান্য কিছু আমি দিচ্ছি।"

ভোলানাথকে একটি বিশেষ যোগাসন তিনি শিক্ষা দিলেন, আর কানে দিলেন জপের মন্ত্র। নির্দেশ রহিল, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এ মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

মহাপুরুষ আশীর্বাদ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। বালকের জীবনে উন্মোচিত হইল এক নূতন অধ্যায়।

কুকুর-দংশনের ক্ষত উপলক্ষ করিয়াই ভোলানাথের জীবনে ঘটিল মহাপুরুষের আবির্ভাব, আর সে আবির্ভাব অচিরে আনিয়া দিল ঐশ্বরীয় কৃপার সৌভাগ্যোদয়।

বালক ভোলানাথের জীবনে আত্মিক সাধনার যে বীজ রোপিত হয়, তাহার মর্ম সেদিন কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। উত্তরকালে এই বীজই পরিণত হয় এক মহীরুহে। আচার্য বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসরূপে উত্তরভারতে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

বারাণসীর অধ্যাত্মকেন্দ্রে এই মহাপুরুষকে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়— এ অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন 'গন্ধবাবা' নামে। যে অলৌকিক বিভূতিলীলা এই শক্তিধর মহাসাধক দিনের পর দিন দেখাইয়া যান, প্রকাশ্যে জনসমাজের সম্মুখে খুব কম সাধকই আজ অবধি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

১৮৫৬ সালের ১১ই মার্চ বিশুদ্ধানন্দ ভূমিষ্ঠ হন। ছয় মাস পরেই পিতা অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মা রাজরাজেশ্বরী এবং কাকা চন্দ্রনাথের আদরযত্নে শিশু বাড়িয়া উঠিতে থাকে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পরিবেশে তাঁহার জীবন বিকাশ লাভ করে।

অল্প বয়সেই ভোলানাথের মধ্যে দেখা যায় নানা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। চঞ্চল বালক-গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের ধীর গম্ভীর ভাবটি সে বজায় রাখিয়া চলে। সকলের মধ্যে থাকিয়াও সে থাকে অনন্য।

গ্রামের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, শ্মশান ও বটতলায়, বালক ভোলানাথ সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়া বেড়ায়। বড় অদ্ভুত খেয়াল এই গম্ভীর বালকের। লোকে তাহার কথা নিয়া কত বলাবলি করে।

দেহের দুরারোগ্য ব্যাধি সন্ন্যাসীর কৃপায় সারিয়া গিয়াছে। বালক ভোলানাথ এবার ফিরিয়া আসল স্বগ্রামে। জননী রাজরাজেশ্বরী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিছু দিনের মধ্যে হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার পর তাহাকে বর্ধমানে পাঠানো হইল সংস্কৃত পড়িবার জন্য।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বালকের অন্তরে মহাপুরুষের রোপিত বীজটি দিন দিন হইয়া উঠিতেছে রূপায়িত। এই সময়ের মধ্যে একদিনের জন্যও কিন্তু তাহাকে তাহার জপ এবং আসন প্রাণায়াম বাদ দিতে দেখা যায় নাই।

ইতিমধ্যে হঠাৎ এক পর্বের সূচনা দেখা দিল। ভোলানাথ সেদিন বর্ধমান শহরের রাজপথ দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। কানে হঠাৎ পশিল এক পথচারী মুসলমান ভদ্রলোকের কথাবার্তা। এক যোগীপুরুষের অলৌকিক কাহিনী তিনি বলিতেছেন; এই মহাত্মাটি নাকি কিছুদিন হয় ঢাকায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বড় বিস্ময়কর তাঁহার যোগ-বিভূতি, শহরের সর্বত্র শোনা যায় এই কথা। বুড়িগঙ্গার জলে প্রত্যূষে মহাত্মা স্নান করিতে যান, আর রোজই সেখানে ঘটে এক বিস্ময়কর কাণ্ড। তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিয়া নদীগর্ভ হইতে একটি জলস্তম্ভ উত্থিত হয়। কেহ কেহ এই অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

যোগবিভূতির ধরনটি শুনিয়াই ভোলানাথ চমকিয়া উঠিলেন তবে তো ইনিই তাঁহার সেই প্রাণদাতা মহাতপস্বী! অন্তরের মধ্যে ইঁহাকে যে তিনি জীবনকাণ্ডারীরূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

যে ভদ্রলোকটি এই কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন তাঁহার নিকট হইতে ভোলানাথ ঐ মহাপুরুষের ঢাকার ঠিকানা জানিয়া নিলেন। আরও শুনিলেন, সংবাদদাতা ভদ্রলোক ঢাকা শহরেরই লোক, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সেখানে ফিরিয়া যাইতেছেন।

মহাপুরুষ দর্শনের জন্য ভোলানাথ তখন অত্যন্ত ব্যাকুল। স্থির করিলেন, ঐ ভদ্রলোকটির সহিতই কয়েকদিন পর তিনি ঢাকায় রওনা হইবেন। চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মহাত্মার চরণে আশ্রয় নিবেন, এ সংকল্প ঠিক হইয়া গেল।

কিন্তু জননীর অনুমতি তো নেওয়া চাই। তাই তাড়াতাড়ি তিনি বণ্ডুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া সকলে তো অবাক্। এ আবার কি কথা। এই অল্প বয়সে ঘর ছাড়িয়া, সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া, সে কোথায় যাইবে? আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে বাধা দিলেন।

ভোলানাথের জননী রাজরাজেশ্বরী দেবীর আচরণ কিন্তু বড় অদ্ভুত, বড় অপ্রত্যাশিত। মুহূর্তে তিনি মন স্থির করিয়া ফেলিলেন, এবং বালক-পুত্রের সংকল্পে কোনো বাধা দিতে চাহিলেন না।

আত্মীয়-স্বজনদের ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "ভোলানাথের কোষ্ঠীতে তার পরমায়ু রয়েছে মাত্র বাইশ বৎসর। এটা আমি নিজে বিশ্বাস করেছি, নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছি। যদি এরকম শক্তিধর যোগীর চেলা হয়ে ওর আয়ু বাড়ে, তবে সেইটেই তো হবে আমাদের পরম লাভ। তাছাড়া, ও যখন চলে যাবার জন্য এমন ব্যাকুল তখন ওকে যেতে দেওয়াই তো সঙ্গত!"

মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ মিলিল। ভোলানাথ তাই আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার গুরুজনদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, চলিলেন তাঁহার নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

রওনা হইবার সময় পথের সাথীও একটি জুটিয়া গেল। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমবয়সী বন্ধু, মহাত্মার যোগৈশ্বর্যের কাহিনী শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। গৃহত্যাগ করিয়া সেও সঙ্গে গেল।

ঢাকার উপকণ্ঠস্থিত রমণা। আজিকার দিনের রমণীয় উদ্যান ও সৌধমালা তখন এ পল্লীতে কিছুই ছিল না। চারিদিকে ছিল দুর্গম গহন অরণ্য—সাপ বাঘের আবাস-স্থান। তাহারই মধ্যে দেখা যাইত দুই-একটি প্রাচীন শক্তিসাধনার পীঠ এবং মন্দির। সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে আসিয়া কিছুদিন তান্ত্রিক ক্রিয়াদি করিয়া যাইতেন।

ভোলানাথ ও তাঁহার বন্ধুটি অনেক খোঁজাখুঁজির পর রমণার এক প্রান্তে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন।

প্রথমটায় মহাপুরুষ বালক দুটিকে এড়াতেই চাহিলেন। কেন এই অল্প বয়সে, সুকুমার দেহে দুশ্চর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন? সংসারাশ্রমে থাকিয়া কি ধর্মলাভ হয় না?

ভোলানাথ ও তাঁহার সঙ্গীকে এড়ানো বড় কঠিন, উভয়ে এবার যোগীবরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার কৃপা হইল, বালক দুইটিকে তিনি গ্রহণ করিলেন।

গভীর রজনী। রমণার গহন বনের চারিদিকে ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। মহাপুরুষ নবাগত বালক ভক্ত দুইটিকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন। তারপর দুই হস্তে ধারণ করিলেন তাঁহাদের দুজনের বাহু। অন্ধকারময় বনপথ দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন। কিছুদূর গিয়াই মহাপুরুষ বালকদ্বয়ের দুই চোখ কাপড় দিয়া সজোরে বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহাদের তখন মোহাচ্ছন্নের মতো অবস্থা। কিভাবে তাঁহারা পথ চলিতেছেন হুঁশ নাই, কোনো স্মৃতিই মনে জাগরূক থাকিতেছে না। অথচ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে শৃগাল ও হিংস্র বাঘের রব।

পরদিন প্রাতে এই যাত্রার বিরাম ঘটে। এবার উভয়ের চক্ষুর আচ্ছাদন খুলিয়া দেওয়া হয়। পাহাড়ের উপরে এক মন্দির সন্নিহিত আশ্রমে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন।

স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করিয়া ভোলানাথ জানিলেন, এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল। ঢাকার রমণা হইতে বিন্ধ্যাচল প্রায় ছয়শত মাইল। শুধু যোগীবরের হাত দুইটিকে ধরিয়া থাকিয়া কিরূপে তাহারা এই দূরত্ব একরাত্রে অতিক্রম করিলেন? কোন্ যোগবিভূতির ফলে ইহা সম্ভব হইল? উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

গন্তব্যস্থল এখনও রহিয়াছে বহু দূরে। কিন্তু মহাত্মার সে অপূর্ব যোগসামর্থ্যের

পরিচয় সে রাত্রিতে পাওয়া গেল তাহাতে কোনো দূরত্ব, কোনো দুরধিগম্যতার প্রশ্নই আর উঠে না।

এই একই অলৌকিক পন্থায়, যোগশক্তি বলে মহাত্মা তাঁহার বালক ভক্তদের হিমালয় অতিক্রম করান, তিব্বতের দুর্গম এক মালভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করেন।

এবার ভোলানাথের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিসমক্ষে দেখা দিল এক অদ্ভুত সাধনরাজ্য। শক্তিধর দণ্ডী সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতির ইহা এক অপূর্ব মিলনকেন্দ্র। উত্তরকালে বিশুদ্ধানন্দজী এই স্থানকে অভিমত করিতেন জ্ঞানগঞ্জ নামে।

যে মহাপুরুষের কৃপা ও আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ভোলানাথ এই গিরিমালা বেষ্টিত পবিত্র অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার নাম—নীমানন্দ পরমহংস। বাঙালী দেহ। বয়স তৎকালে প্রায় পাঁচশত হইয়াছিল বলিয়া বিশুদ্ধানন্দজী বলিতেন।

স্বামী নীমানন্দ পরমহংস অতঃপর ভোলানাথ ও তাঁহার সঙ্গীকে মনোহরতীর্থ নামক এক রমণীয় গিরিশীর্ষে নিয়া যান। এখানে তাঁহার গুরুদেব স্বামী মহাতপার পদপ্রান্তে নবীন সাধনার্থীদের তিনি উপস্থিত করেন। এই মহাত্মার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া ভোলানাথ ধন্য হন। নূতন নামকরণ হয়—বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।

ইহার পর প্রায় বার বৎসর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিয়া বিশুদ্ধানন্দকে উচ্চতর যোগশিক্ষা আয়ত্ত করিতে হয়। একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর কৃচ্ছ্রব্রতের মধ্য দিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবন অগ্রসর হইতে থাকে।

শক্তিধর আচার্য ভৃগুরামস্বামী এবং শ্যামানন্দস্বামী এসময়ে বৃত হন তাঁহার শিক্ষাগুরু-রূপে। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনে, তন্ত্র ও যোগসাধনার পথে, ইঁহারা হন প্রধান সহায়ক। দণ্ডী ও পরিব্রাজক অবস্থা অতিক্রম করিয়া তীর্থস্বামীর পর্যায়ে উন্নীত হইতে সাধক বিশুদ্ধানন্দজীর প্রায় আট বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

অতঃপর ধীরে ধ'রে এক অসামান্য সাধকরূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন। সাধনার অগ্রগতির সাথে বহু বিস্ময়কর যোগবিভূতিও তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়।

এই সময়ে গুরুদেব হঠাৎ একদিন বলিয়া বসেন, বাবা, তোমার এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এবার তোমায় দেশে ফিরে যেতে হবে, বিবাহ ক'রে প্রবেশ করতে হবে গৃহস্থাশ্রমে।

একি অদ্ভুত আদেশ! বড় অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব! তরুণ সাধকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সাধনরাজ্যের অমৃতলোকে তিনি পৌঁছিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া আজ আবার কোথায় গিয়া দাঁড়াবেন? চৌদ্দ বৎসর বয়সে এই পবিত্র অধ্যাত্ম কেন্দ্রে তিনি আগমন করেন, বর্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর। কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা ইতিমধ্যে তাঁহাকে যোগ ও তন্ত্রের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছে। গৃহস্থাশ্রমে ঢুকিলে ভাগ্যে কি ঘটিবে, কোন অতল গহ্বরে নামিতে হইবে, কে জানে? উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষে সে পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়। অর্জিত যোগসামর্থ্য যে ক্রমে হ্রাস পাইবে না তাহারই বা স্থিরতা কি? তাই বিশুদ্ধানন্দ বড় মুষড়িয়া পড়িলেন।

অন্তর্যামী গুরু মহারাজ শিষ্যের এ মনোভাব লক্ষ্য করিলেন। আশ্বাস দিয়া সস্নেহে

কহিলেন, "বাবা, কোনো ভয় নেই গার্হস্থ্যাশ্রমে গেলেও তোমাদের ক্ষতি কিছু হবে না। সাধনার ধারা অব্যাহতই থাকবে। আমাদের সাহায্য তুমি ঠিকই পাবে। তাছাড়া, এই নূতন পরিবেশের মধ্য দিয়েই ঘটবে তোমার সিদ্ধিলাভ।"

বিশুদ্ধানন্দ জানেন, মহাতপার বাণী অভ্রান্ত। অন্তরের আলোড়ন এবার তাই কিছুটা শান্ত হইল।

তবুও বহু প্রশ্ন মনের কোণে ভিড় করিতে থাকে। বালককাল হইতেই সমাজ-জীবন হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন। যে ব্রহ্মচর্যব্রত জীবনে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, জনবিরল হিমালয়ের ক্রোড়ের যোগীসঙ্ঘের মধ্যে তাহা লালিত। সংঘাত-সঙ্কুল সাংসারিক জীবনে কি করিয়া তাহা আত্মরক্ষা করিবে? তাছাড়া, আরও ভাবিবার কথা আছে। পৈতৃক বিষয়-আশয় কিছুই নাই, লৌকিক কোনো শিক্ষাও এযাবৎ তিনি গ্রহণ করেন নাই। পরিবারের ভরণ-পোষণের উপায়ই বা কি হইবে?

গুরুদেব তাঁহার চিন্তার ধারাটি বুঝিয়া নিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মোটেই ভেবো না। চিকিৎসাবৃত্তি ও যোগজ্যোতিষ দ্বারা তোমার জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হবে। এরপর যা যা করতে হবে, সে নির্দেশ আমি তোমায় যথাসময়ে দেব।"

হিমালয়ে অবস্থিত এই পবিত্র গুরুকুল, আর এই সব উচ্চকোটির সাধকদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে বিশুদ্ধানন্দের হৃদয় যেন ভাঙিয়া যায়। এই সাধনভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই যে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তিটি এ যাবৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে তিনি বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন।

গুরুদেব ও শিক্ষকদের স্নেহের স্মৃতি কোনোদিনই ভুলিবার নয়। ব্রহ্মচারীজীবনের কত কাহিনীর স্মৃতিই না আজ তাঁহার মনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়—

সে-বার ব্রহ্মচারী বিশুদ্ধানন্দ সতীর্থদের সাথে বিন্ধ্যাচল ভ্রমণে গিয়াছেন। পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান একটি বড় আমগাছ, অজস্র আম উহার শাখায় পাকিয়া রহিয়াছে। অনেকেরই ঝোঁক হইল, এই রসালো ফল পাড়িতে হইবে। উৎসাহের বশে বিশুদ্ধানন্দও আমগাছের ডাল লক্ষ্য করিয়া বেগে এক লাফ দিয়া বসিলেন। কিন্তু ডাল অবধি তাহাকে পৌঁছিতে হইল না, লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে। সঙ্গে সঙ্গে হইলেন জ্ঞানহারা। জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন, দাদা গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস তাহাকে কোলে করিয়া শূন্যপথে পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিতেছেন।

উপরে উঠিয়া পরমহংসজী তাঁহাকে কোল হইতে নামাইলেন। এবার একটি সুপক্ক আম তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া সহাস্যে কহিলেন, "নাও, হ'লো তো? আমটি এখন খেতে পারো। এর জন্যই এত সব কাণ্ড।"

চঞ্চল কিশোরকে সতর্ক করিয়া ভৃগুরাম স্বামী কহিলেন, "এবার প্রতিজ্ঞা করো, এমন কাজ আর কখনো করবে না।"

বিশুদ্ধানন্দ ততক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছেন। উত্তর দিলেন, "খুব করবো। স্বচক্ষে দেখলাম তো, আপনি থাকতে আমার আবার ভয় কি?" এই সহজ সরল মন্তব্যে খুশী হইয়া দাদা-গুরুদেব হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

অকপটতা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল বিশুদ্ধানন্দের বড় বৈশিষ্ট্য। সাধনজীবনের গোড়ার দিক হইতেই এটি তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। তিনি তাঁহার ব্রহ্মচারী

জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "একদিন স্নান করতে গিয়ে একটি কুমারীকে স্নান করতে দেখি, তাতে আমার কামভাবের উদয় হয়। আমি স্নান না করেই তৎক্ষণাৎ দাদা-গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে একটু হাস্য করলেন মাত্র। আমি তখন অকপটে তাঁকে আমার মনের কথা ব্যক্ত ক'রে বললাম, "হয় আমার একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে দিন, না হয় আমায় এখান থেকে তাড়িয়ে দিন। আমার মতো লোক এখানে থাকবার উপযুক্ত নয়।"

শিষ্য যেমন সত্যসন্ধ, তেমনিই পরম কারুণিক তাঁহার শিক্ষাগুরু। ভৃগুরাম পরমহংস নির্বিকারভাবে উত্তর দেন, "তোমার কোনো অনুশোচনায় প্রয়োজন নেই। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার এই ধরনের কামভাব আর হবে না।" সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সাধককে সেদিন তিনি বিশেষ একটি মন্ত্র ও আসন দিয়া দিলেন।

এমন শক্তিধর মহাপুরুষদের সান্নিধ্য, এমন কল্যাণকর পরিবেশ, এমন স্নেহবন্ধন ছাড়িয়া বিশুদ্ধানন্দ আজ গৃহে ফিরিতে চাহিবেন কেন? সংসারাশ্রম গ্রহণের কথায় তিনি বিচলিত হইবেন, তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে?

গুরুর আদেশে তাঁহাকে কিন্তু গৃহে ফিরিতেই হইল।

রাজরাজেশ্বরী দেবী নয়নের মণি পুত্রকে এতদিন পরে ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাই তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। অচিরেই তোড়জোড় করিয়া ভোলানাথের তিনি বিবাহ দিলেন। শুভক্ষণে সুলক্ষণা বধূ কৃষ্ণভামিনী দেবীকে ঘরে আনা হইল।

বিশুদ্ধানন্দজীর জীবনে এ এক প্রকাণ্ড পটপরিবর্তন। গুরুদেবের আদেশে জনজীবনের মধ্যে নিজেকে এবার তিনি স্থাপন করিলেন। বর্ধমানের কাছেই গুস্করা গ্রাম। এখানে আসিয়া শুরু করিলেন চিকিৎসা ব্যবসায়। স্থানীয় জমিদারের বাহির্বাটীর একাংশে বসিয়া তাঁহার কাজ চলিতে লাগিল।

নিজে তিনি কেবলই প্রচ্ছন্ন থাকিতে চান, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় কই? চিকিৎসকের খ্যাতির চেয়ে তাঁহার যোগী জীবনের খ্যাতিই বেশী প্রচারিত হইতে থাকে। আধিব্যাধি-ক্লিষ্ট জনসাধারণ প্রায়ই তাঁহার কাছে ভিড় জমায়।

বিশুদ্ধানন্দের নিজস্ব সাধনার ধারাটি কিন্তু বরাবরই পূর্বের মতো বহিয়া চলিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজকর্ম শেষ হইয়া যায়, তারপর গভীর রাত্রে নিজের সাধন-আসনে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হন। গুরু প্রদত্ত সাধন ও নিগূঢ় যোগক্রিয়া পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করেন। মাঝে মাঝে অমানিশাযোগে গুস্করার শ্মশানে গিয়াও শক্তি সাধনার নানা রকমের ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসেন। তাঁহার যোগবিভূতির কথা ধীরে ধীরে সে অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এ সময়ে গুরুদেবের আদেশে তিনি শিষ্য গ্রহণও শুরু করিয়া দেন। দলে দলে তাঁহার কাছে আসিতে থাকে আর্ত ও মুমুক্ষু আশ্রয়ার্থী।

বহুতর অলৌকিক সিদ্ধি এ সময়ে বিশুদ্ধানন্দজীর করতলগত হইতেছে। ঘটিতেছে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

এ সময়ে তাঁহার কক্ষে দুইটি বিষধর সাপ সর্বদা বাস করিত, স্বচ্ছন্দে সেখানে তাহারা বিচরণও করিত। স্বামীজী তাহাদের খুব আদর-যত্ন করিতেন। উত্তরকালে তিনি শিষ্যদের বলিতেন, "গুস্করাতে আমার ঘরে দুটো বিষাক্ত সাপ ছিল, আমি তাদের নাম দিয়েছিলাম—শিবদাস আর শিবদাসী। ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সময় এ দুটো এসে আমায় জড়িয়ে থাকতো।"

বাল্যকাল হইতেই সাপের সহিত তাঁহার নিবিড় অন্তরঙ্গতা। গ্রামের বাড়িতে ছিল একটি শিলাময় শিবলিঙ্গ। একটি বিষাক্ত সাপ নিশাকালে প্রায়ই এ লিঙ্গটি জড়াইয়া শুইয়া থাকিত। বলা বাহুল, বাড়ির লোকে রাত্রে কখনো এ মন্দিরে যাইতে সাহসী হইত না। বালক ভোলানাথ কিন্তু এ সাপ সম্বন্ধে ছিলেন অকুতোভয়। এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার কিন্তু মোটেই ভয় ছিল না। আমি দুধ নিয়ে যেতাম ; সাপটা ফোঁসফোঁস ক'রে উঠলে বলতাম—চুপ! শিবকে দুধ দেবো না? তখন সাপটি আর ফেঁস্ করত না। আমি কতকটা দুধ শিবের গায়ে ঢেলে, বাকিটার কিছু প্রসাদ বলে নিজে খেয়ে কতকটা সাপকে দিয়ে আসতাম।"

বিশুদ্ধানন্দজীর খ্যাতি শুনিয়া মনীষী রমেশ দত্তমহাশয় একদিন গুস্করায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দত্তমহাশয় তখন বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট। আসিবার আগে তিনি কয়েকটি গিনি গোপনে তাঁহার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান, যোগবিভূতিসম্পন্ন সাধু উহা জানিতে পারেন কিনা।

দত্তমহাশয় আসিতেছেন, গুস্করার জমিদারদের মধ্যে তাই সেদিন খুব চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। শশব্যস্ত বার বার আসিয়া বিশুদ্ধানন্দকে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আপনি শিগ্‌গীর প্রস্তুত হোন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে এসে পড়লেন।"

তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আসছেন তাতে আমার কিরে বাবা। তোমাদের তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, আমার কি?"

দত্তমহাশয় আসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ শুরু করিয়া দিলেন। তারপর কথা-প্রসঙ্গে কহিলেন, "আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই। আপনার নাকি যোগ-বিভূতি প্রচুর।"

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তা কিছুটা রয়েছে বই কি। তুমি তো দেখছি পাঁচখানা গিনি তোমার গিন্নির কাছে গোপন রেখে এসেছো আর তারপর ভাবছো আমার অলৌকিক শক্তি কতটা তা পরখ করবে, দরকার হলে এ সাধুর ভণ্ডামিটাও ভাঙবে। তা, সেটা ভাঙতে পারবে কি?"

রমেশচন্দ্র তৎক্ষণে বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার পর সশ্রদ্ধভাবে তিনি বিশুদ্ধানন্দজীর সূর্যবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্র অতঃপর সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি বেদের কিছুটা অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। শুনিয়া বিশুদ্ধানন্দজী তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে তিরস্কার করিলেন। মুখের উপর সোজা বলিয়া দিলেন, "শূদ্রের পক্ষে নিতান্ত এটা অনধিকার চর্চাই হয়েছে।"

রমেশ দত্তমহাশয় কিন্তু খেয়ালী সাধকের এই কঠোর বাক্য সেদিন সহজভাবেই গ্রহণ করেন। অপ্রসন্নতার কোনো চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা যায় নাই।

সাধক বিশুদ্ধানন্দের জীবনে এবার শুরু হয় এক নতুন পর্যায়। আচার্যরূপে, গুরুরূপে মুমুক্ষু নরনারীকে তিনি আশ্রয় দিতে থাকেন।

রায়বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুলিশের একজন বড় কর্মচারী। অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির জন্য এক সময়ে তিনি খুব ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিছুদিন আগে স্বপ্নে এক গুহ্য মন্ত্র পাইয়াছেন, আর দেখিয়াছেন এক অপূর্ব দেবমূর্তি। কর্মকার দ্বারা এই দেব-মূর্তির অনুরূপ এক ধাতুবিগ্রহ তিনি গঠন করাইয়াছেন। গিরীনবাবুর সংকল্প, যে মহাপুরুষ এ স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বরণ

করিবেন গুরুরূপে। বহু সাধুসন্ত এযাবৎ দেখিয়া বেড়াইয়াছেন, এবার আসিলেন বিশুদ্ধানন্দের কাছে।

স্বামীজী প্রথম সাক্ষাতেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো দেখছি স্বপ্নেই মন্ত্র পেয়েছো।"

. গিরীনবাবু সহসা কোনো কথা স্বীকার করিতেছেন না। স্বামীজী এবার ধাতুমূর্তি'র কথা বলিয়া দিলেন। শুধু তাই নয় অতঃপর তাঁহার বাড়িতে গিয়া যে বাক্সে উহা লুকানো রহিয়াছে তাহাও দেখাইয়া দিলেন। গিরীনবাবুর লজ্জা ও অনুতাপের সীমা রহিল না। মহাপুরুষের চরণে এবার করিলেন আত্মসমর্পণ।

বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার গুস্করায় গিয়া বিশুদ্ধানন্দকে দর্শন করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "মানবদেহের সাধারণ কয়টি দ্বার ছাড়া আরও অগণিত দ্বার রয়েছে। এমন কি প্রত্যেকটি লোমকূপই এক একটি দ্বার; লৌকিক চোখ দিয়ে এগুলো আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যোগীরা কিন্তু অবলীলায় দেখিয়ে দিতে পারেন।"

ডাঃ সরকার স্বামীজীকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ইহা দেখাইতে হইবে। কৌতূহলী ভক্তেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের সম্মুখে শুরু হয় যোগবিভূতি প্রদর্শন।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ডাঃ সরকার দেখেন, স্বামীজীর নিজ দেহের লোমকূপ দিয়া বড় বড় স্ফটিকের দানা প্রবিষ্ট করিতেছেন। হাত দিয়া ঘষিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা বাহির হইয়া আসিতেছে।

সবাইর সম্মুখে আরও এক অদ্ভুত কাণ্ড তিনি করেন। দীর্ঘ একখণ্ড ঘৃতসিক্ত বস্ত্র নিজের মুখ-বিবরে প্রবেশ করান, তারপর সর্বসমক্ষে নাভিদেশ দিয়া উহা টানিয়া বাহির করিতে থাকেন। ডাঃ সরকার নিজেও এই বস্ত্রখণ্ড কিছুটা টানিয়া দেখিয়াছিলেন।

বড় অদ্ভুত সাধক বিশুদ্ধানন্দের এই কাণ্ড। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারতপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সেদিন বলেন, "স্বামীজী আমাদের বৈজ্ঞানিকদের দেহতত্ত্ব কত যে অসম্পূর্ণ, আজ তা আপনি ভালোভাবে আমায় দেখিয়ে দিলেন।"

ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ও অক্ষয়কুমার দত্ত সেবার বিশুদ্ধানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন, স্বামীজী পরমাণুর রূপান্তর ঘটাইয়া হীরা, প্রবাল প্রভৃতি তৈরি করেন। তাঁহাদের অনুরোধে স্বামীজী একটি লেন্স নিয়া বসিলেন, উহাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত করিয়া একটি প্রবাল তৈরি করিবেন।

ক্রিয়াটি দেখানো হইতেছে, শ্রীযুক্ত দত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিলেন স্বামীজীর হাতের কোনো কৌশল ইহাতে নাই তো? তখনি হঠাৎ তিনি বিশুদ্ধানন্দজীর হাত ধরিয়া ফেলেন।

এ সংশয় আর চপলতায় স্বামীজী খুব চটিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের গালে করেন এক চপেটাঘাত। বলেন, "বেশ তো, এবার দ্যাখো, আমার হাতে কি রয়েছে।"

অতঃপর স্বামীজী নিজের কম্বলাসন হইতে কিছু পশম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অল্প কিছুক্ষণ ইহা নিজের মুঠোর মধ্যে রাখার পর, যোগবলে পরিণত করিলেন এক উজ্জ্বল প্রবালে।

শ্রীযুক্ত দত্ত তখনো ভাবিতেছেন, কোথাও হয়তো হাতের কৌশল কিছু রহিয়া গিয়াছে।

সংশয়বাদী এই বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বামীজী তখন এক অমানুষিক কাণ্ড করেন। নিজ দেহের নাভিদেশ স্ফীত ও বিস্ফারিত করিয়া উহার মধ্যে তিনি একটি বালিশের অর্ধাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই অমানুষিক কর্মের দৃশ্য দেখিয়া দত্তমহাশয় সেদিন ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় হন।

অতঃপর গুস্করা হইতে স্বামীজী বর্ধমানে স্থান পরিবর্তন করেন। এসময়ে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ও রামেশ্বর প্রভৃতি বিশিষ্ট তীর্থ তিনি পর্যটন করিয়া আসেন।

উত্তরজীবনে বিশুদ্ধানন্দ বাস করেন কাশীধামে হনুমান ঘাট ও মালদহিয়ায়। এ সময় হইতে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নূতনতর আধ্যাত্মিক প্রকাশ। গুরু-জীবনের লীলা-নাট্য অভিনীত হইতে থাকে বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে। তাঁহার বারাণসী জীবনের এ অধ্যায় ঋদ্ধি-সিদ্ধির চমৎকারিতায়, শক্তিসাধনার ঐশ্বর্যে ভরিয়া উঠে।

অলৌকিক শক্তিধর এই মহাপুরুষ বারাণসীর আচার্যের মধ্যে অচিরে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসেন। দলে দলে তাই আসিতে থাকে ভক্ত আর কৌতূহলী দর্শনার্থী। স্বামীজীও তাঁহার যোগবিভূতি ঐশ্বর্য চারিদিকে বিস্তারিত করিয়া দেন। তাঁহার এসময়কার সাধনজীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের রচিত 'বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। ভক্তদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবৃত কাহিনী লোকের বিস্ময় জাগাইয়া তোলে।

বিশুদ্ধানন্দের দেহ হইতে মাঝে মাঝে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। অনেক সময় দূর-দূরান্তে থাকিয়াও আশ্রিত ভক্ত শিষ্যেরা এই অলৌকিক পুষ্পসৌরভ টের পাইতেন। তাঁহাদের কাছে এই গন্ধ ছিল সূক্ষ্মদেহে গুরুদেবের এক বিশেষ প্রকাশ। কত সমস্যায় ও সঙ্কটে এই দিব্য গন্ধ আশা ও আশ্বাস নিয়া উপস্থিত হইত, মুমূর্ষু আর মুমুক্ষু উভয়েরই জীবনে আনিয়া দিত নূতন প্রেরণা।

এক একদিন খেয়ালখুশীমতো বিশুদ্ধানন্দজী আপন বিভূতি প্রদর্শন করেন, ভক্ত ও কৌতূহলী দর্শকেরা সোৎসাহে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসে, খানিকটা তুলা ও লেন্‌স নিয়া শুরু করেন ক্রিয়া, তারপর সৌরকর সাহায্যে তৈরি করেন বহুমূল্য হীরক ও প্রবাল। কখনো বা ভক্তদের আব্দার ও অনুরোধে এগুলি তৈরি হয়, আবার তুচ্ছ বস্তুর মতো স্বেচ্ছায় এই রত্ন নদীতে ফেলিয়া দেন। এ বিষয়ে কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে সহাস্যে বলেন, "সাধুর আবার রত্ন দিয়ে কি প্রয়োজন ? তাঁর কাছে এর মূল্যই বা কি ?"

মহাপুরুষের এই যোগবিভূতির লীলা বিচিত্র ধারায় বহিয়া চলে। কখনো কাহাকেও কাছে ডাকিয়া সানন্দে তাঁহার রুমালে বা পোশাক-পরিচ্ছদে পুষ্পগন্ধের সৃষ্টি করেন। কখনো বা একটি খালি পাত্র কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখেন, তারপর ভিতর হইতে বাহির করেন একগাদা সুস্বাদু সন্দেশ। কাগজ হইতে বিভূতিবলে তৈরি হয় সদ্য প্রস্ফুটিত কত মনোহর পুষ্প। কখনো পাথরের শিবলিঙ্গগুলি টপাটপ্ নিজের মুখগহ্বরে ফেলিয়া দেন, মুহূর্তে সেগুলি কোথায় অন্তর্হিত হয়। প্রয়োজন মতো যখন তখন এই শিবলিঙ্গ আবার তিনি উদ্গিরণও করেন।

বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে এ যেন এক কৌতুককর খেলা। ভক্তদের কহিতেন, "আমি বিভূতি দেখাই কেন জানো ? আমি চাই, লোকে যেন সব দেখে অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে প্রেরণা প্রায়।" কিন্তু ক্রিয়া দেখানোর আগে কুমারী ভোজনের টাকাটা উৎসাহী দর্শনার্থীর কাছ হইতে আদায় করিতে কখনো তাঁহার ভুল হইত না।

একবার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, কুমারী ভোজন সম্বন্ধে আপনার এমন কড়াকড়ি কেন?"

বিশুদ্ধানন্দজী উত্তর করিলেন, "বিভূতি দেখানো যে অপরাধ!"

ভক্তটি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আপনার আবার অপরাধ কিসের?"

স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, "যারা বিশুদ্ধ বস্তু দেখবার অধিকারী নয়, তাদের এ বস্তু দেখানো অপরাধ নয় তো কি? হাতীর বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপানো অপরাধ বৈকি!"

বিশুদ্ধানন্দ বলিতেন, কুমারীদের মধ্যে মহাশক্তির ভাবনা করিয়া তিনি তাহাদের ভোজন করান। একবার তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "দ্যাখো, কুমারী ভোজনের প্রয়োজন তোমাদের নয়, এ প্রয়োজন আমার। যখন আমি কিছু দেখাই, তখন সেই প্রক্রিয়ার ফলে আমার শরীরে তাপ জন্মে, সেই তাপ প্রশমনের উপায় হচ্ছে এই কুমারী ভোজন।"

স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "কুমারী ভোজন হইলে কোনও একটি কুমারীর পাত হইতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ তুলিয়া স্বামীজীর ভোজনকালে দেওয়া হইত। কুমারী সেবাটা তাঁহার নিকট একটা আচার মাত্র ছিল না। তাঁহার চক্ষে কুমারী জগদম্বারই প্রতীক। অনেকদিন পরে একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "স্বয়ং জগদম্বার ভিন্ন জগতে আবার কুমারী কে আছে, বাপু?" অর্থাৎ, নিঃসঙ্গা, আদি ও অদ্বিতীয়া শক্তিই প্রকৃত কুমারী।"

এই কুমারীদের মধ্যেই শক্তিসাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাঁহার আরাধ্য মহাশক্তির প্রতিরূপ দর্শন করিতেন।

আত্মম্ভরী ব্যক্তিদের, তা সাধু-সন্ন্যাসী হোক কি গৃহী ভক্তই হোক, স্বামীজী বড় অপছন্দ করিতেন। ইহাদিগকে মাঝে মাঝে তিনি বেশ শিক্ষাও দিয়া দিতেন। সে-বার শান্তিপুরে শিষ্য গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি বসিয়া আছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীর কাছে একটি অদ্ভুত শিবলিঙ্গ রহিয়াছে, কোনো সাধকই নাকি উহার দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে পারেন না।

সন্ন্যাসী এই অলৌকিক গুণসম্পন্ন শিবলিঙ্গটি দিয়া নবপরিচিত সাধকদের শক্তি পরীক্ষা করিতেন। এবার বিশুদ্ধানন্দজীকেও যাচাই করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল—তাই শিবলিঙ্গটি তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসীর মনোভাব বুঝিয়া নিতে স্বামীজীর দেরি হয় নাই। শিবলিঙ্গটিকে দুই তিন বার হাত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উহার দিকে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটিল এক অদ্ভুত কাণ্ড। কি জানি কেন শিলা নির্মিত শিবলিঙ্গটি ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল।

এভাবে এই বস্তুটি ফাটিয়া যাওয়ায় সন্ন্যাসী বড় মুষড়িয়া পড়েন, তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে থাকে।

বিশুদ্ধানন্দ কহেন, "কেন বাবা, এটা ভেঙে যাওয়ায় কাঁদবার কি আছে? আর একটা শিবলিঙ্গ যোগাড় করা যায় না?"

সখেদে সন্ন্যাসী জানাইলেন, "বাবা, এই শিবলিঙ্গ আসলে আমার নিজের নয়, আর

একজনের কাছ থেকে এনে কাজে লাগাচ্ছিলুম। এটা ভেঙে যাওয়ায় আমি মহা বিপদে পড়লাম।"

"বাপুহে, তুমি এত অধীর হয়ো না। যে এ বস্তু ভাঙতে পারে, আবার গড়ে দিতেও সে পারে। কিন্তু এমন কাজ তুমি কেন এখানে করতে এলে, বল তো? মনে রেখো, যে সাধককে পরীক্ষা করতে চাও, তাঁর হৃদয়ে ক্ষমার পরিমাণ কম থাকলে তোমার ঘোরতর অনিষ্ট হতে পারে। এ কাজ আর কক্ষনো ক'রো না।"

অতঃপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টুকরাগুলি করপুটে রাখিয়া বিশুদ্ধানন্দ কয়েকবার তাহা শূন্যে আন্দোলিত করিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, খণ্ডবিখণ্ড শিবলিঙ্গ একেবারে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। কখনো ভাঙিয়াছিল বলিয়া আর মনে হয় না।

কিন্তু কোনো নিরভিমান, খাঁটি সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে স্বামীজীর আদর-যত্নের আর সীমা থাকে না। ঐ গিরীনবাবুর বাড়িতেই আর একদিন কয়েকটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ইঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু ও ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক। আন্তরিক সম্ভাষণের পর স্বামীজী তাঁহাদের কাছে আনিয়া বসাইলেন।

শিষ্য গিরীনবাবু কয়েকদিন আগে গুরুজীকে একটি মূল্যবান্ শাল উপহার দিয়াছেন। এটি মাটিতে বিছাইয়া স্বামীজী সাধুদের জন্য আসন রচনা করিয়া দেন। তাঁহারাও পরমানন্দে এই শালের উপর বসিয়া গাঁজার ছাই ঢালিতে থাকেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা হইয়াছে, এই সৎ সাধুদের ভালো করিয়া সংবর্ধনা করিবেন। তাছাড়া, এ সূত্রে আর একটি কল্যাণকর কাজও করা যাইবে। বহুমূল্য শালটি গুরুকে দান করিয়া শিষ্যের অন্তরে কিছুটা অহঙ্কার জাগিয়াছিল। এবার তাহা স্তিমিত হইয়া আসিল।

সত্যকার নিরভিমানতা ও গ্রহণেচ্ছু মন দিয়া স্বামীজীর কাছে না আসিলে দর্শনার্থীরা অনেক সময় বিপদে পড়িতেন।

দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একবার বিশুদ্ধানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। স্বামীজী মহারাজকে ঘিরিয়া তখন গৃহমধ্যে বহু সাধক ও বিদ্বান লোক বসিয়া আছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সভায় প্রায়ই আসিয়া থাকেন। আজিও আসিয়াছেন। ডক্টর দাশগুপ্তকে বিশুদ্ধানন্দজীর সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। স্বভাবতই এই মনীষী অধ্যাপকের রচিত গ্রন্থের কথাও এ সময়ে উঠিল।

ডঃ দাশগুপ্ত প্রশ্ন করিলেন, "যোগসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ আমার তেমন বোধগম্য হচ্ছে না কেন, বলুন-তো!"

স্বামীজী বলিলেন, "তুমি যা লিখেছ, সেটুকু বুঝেছ তো?"

অধ্যাপক সখেদে উত্তর দিলেন, "বুঝেছি যে, তা-ই বা কি ক'রে বলা যায়? তাছাড়া, এত লিখেই বা কি হলো?"

কক্ষস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে বিশুদ্ধানন্দ বলিয়া বসিলেন, "হবে না কেন? সত্যি সত্যি যা চেয়েছ, তা তো যথেষ্টই পাচ্ছো। অর্থ আসছে, নাম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও আসছে।"

সকলেই মর্মে মর্মে বুঝেছেন, শক্তিধর মহাপুরুষ কাহারো মনরাখা কথা বলিতে অভ্যস্ত নন।

ডঃ দাশগুপ্ত নিবেদন করিলেন, স্বামীজীর কিছু যোগবিভূতি তিনি দর্শন করিতে চান। স্বামীজী কিন্তু একথায় কানই দিলেন না। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অধ্যাপককে সেদিন ফিরিয়া আসিতে হইল।

ডঃ দাশগুপ্ত যাহা পারেন নাই, পরদিন কিন্তু তাঁহার বালিকা কন্যাটী তাহা করিতে সমর্থ হয়। স্বামীজী তাঁহার সহিত নানা কৌতুক করিতেছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে খুশী হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা দ্যাখ্, তোকে আমি এখনি চমৎকার সন্দেশ খাইয়ে দিচ্ছি।"

একটি খালি কৌটা নিয়া সর্বসমক্ষে উহা একখণ্ড চাদর দিয়া তিনি ঢাকিয়া দিলেন। তারপর কৌটাটি খুলিয়া দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য। কোথা হইতে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ সেখানে আসিয়া গিয়াছে। বালিকা তো এ সন্দেশ পাইয়া খুশী।

প্রয়োজন হইলেই শিষ্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা প্রকটিত হইত। অপরিচিত ভক্তজনের উপর তাঁহার কৃপা বর্ষণের নজীর আছে।

বর্ধমান জেলার শোভারাণী দাসী নামে এক ক্ষুদ্র বালিকা বড় অদ্ভুতভাবে সে-বার বিশুদ্ধানন্দজীর কৃপা লাভ করে। ইহার পর কাশীধামে স্বামীজীর কাছে সে যে পত্র দেয়, তাহা বড় বিস্ময়কর। মেয়েটি লেখে, "বাবা, আমি আপনাকে চিনি না, কিন্তু মনে হয়, প্রায়ই আপনাকে আমাদের ঠাকুরঘরে দেখতে পাই। সেদিন রাত্রিতে স্বপ্নেও আপনাকে দেখলাম। আপনি বলিলেন, 'আমার নাম ভোলানাথ, উপস্থিত প্রকাশ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসরূপে, আমি কাশীতে থাকি'।"

স্বামীজী এই ভক্তিমতী বালিকাটিকে আশ্রয় দেন, সাধন নির্দেশ দিয়া পত্রাদি লেখেন।

গুরুর দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশুদ্ধানন্দজী বলিতেন, "গুরুর কাজ শিষ্যদলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের শোষণ করা নয়—শিষ্যদের গুরু ভার গ্রহণ করেন, তাই তিনি গুরু।"

আশ্রিতদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে তাই তাঁহার ছিল এমন সদা সতর্ক দৃষ্টি। সুদূর অঞ্চলে অবস্থান করিয়াও সজাগ প্রহরায় তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতেন। কি সাংসারিক জীবনে আপদে বিপদে, কি সাধন-স্তর অতিক্রম করার সময়ে, সর্বদা শিষ্যেরা এই শক্তিধর গুরুর সাহায্য লাভে ধন্য হইত। সূক্ষ্ম-দেহে, দিব্য পদ্মসৌরভ বিস্তার করিয়া, 'গন্ধবাবা' বিশুদ্ধানন্দ দূর-দূরান্তের ভক্তদের সম্মুখে অনায়াসে আবির্ভূত হইতেন।

স্বামীজী তখন বর্ধমানে। সেদিন-দুপুরে তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, একটি ভক্ত বিষণ্ণ-মনে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাঁহাকে দেখিয়াই রুক্ষস্বরে স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "বাপুহে, সাধনার আসন কি মেয়েমানুষের মুখ ভাব্‌বার জন্য?"

শিষ্যটি এক নূতন সাধক। কাতরকণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, "বাবা, এরকম আর কখনো হবে না।"

শিষ্যটি অতঃপর গুরুভ্রাতাদের কাছে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করেন। আগের দিন

তিনি এক সরকারী তদন্তের ভার নিয়া মফঃস্বলে যান। সে সময়ে পথে একটি তরুণীকে দেখিয়া তাঁর মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠে। সন্ধ্যার সময় আসন করিয়া বসিয়াছেন, তখনো বার বার মেয়েটির কথা মনে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। ফলে সাধনক্রিয়ায় সেদিন বড় ব্যাঘাত ঘটে। শিষ্য কিন্তু তখনি বুঝিয়াছিলেন, গুরুদেবের সদা-সজাগ দৃষ্টিকে কখনো এড়ানো যাইবে না। স্বামীজী কাছে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল।

চরিত্রহীন একটি লোক সে-বার স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কৃপা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষাও সে লাভ করে। লোকটি বিবাহিত। এখন হইতে দাম্পত্য জীবনের সততা রক্ষায় সে উদ্বুদ্ধ হয়।

এক ভ্রষ্টা নারীর সহিত এতকাল তাহার অবৈধ প্রণয় চলিয়া আসিতেছিল। সেই নারী কিন্তু এত সহজে তাহাকে ছাড়িতে চায় না, বার বারই উত্ত্যক্ত করিতে থাকে। অবশেষে একদিন শিষ্যটি স্থির করে, গোপনে সেই তরুণীর কাছে সে যাইবে, তাহাকে ভালোভাবে বুঝাইয়া আসিবে—তাহাদের প্রণয় সম্পর্ক চিরতরে শেষ হইয়াছে।

একদিন মধ্যরাত্রে সুযোগ মিলিল। স্ত্রী শয্যার একপাশে শুইয়া আছে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই সুযোগে লোকটি সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া বাহির হয়। ক্ষণপরেই পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া ফেলে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'ছিঃ, তোমার কি লজ্জা নেই! আবার সেই মেয়েটার কাছে যাচ্ছো।"

বিস্মিত হইয়া স্বামী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, সত্যি সত্যি বল তো, আমি সেখানে যাচ্ছি, তা তুমি জানলে কি ক'রে? আর এমন গভীর ঘুমই বা তোমার কি ক'রে ভাঙলো?"

"তা হলে শোন এক অদ্ভুত কথা। বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে এইমাত্র এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। বলে গেলেন—ওরে ওঠ্, ওঠ্, তুই তো বেশ ঘুমিয়ে আছিস, আর দ্যাখ্, তোর স্বামী আবার সেই ভ্রষ্টা মেয়েটার কাছে চললো।"

বিশুদ্ধানন্দ এ ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে আছেন। শত শত মাইলের ব্যবধানে, এই গভীর নিশীথে কোন্ শিষ্য কি করিতেছে, কে কোথায় অধঃপাতে যাইতেছে, কোনো কিছুই এই শক্তিধর মহাত্মার জানার বাহিরে নয়। এমনি সদা সজাগ, কল্যাণময় দৃষ্টি দিয়া শিষ্যদের তিনি ঘিরিয়া রাখেন, বহন করেন তাহাদের গুরুভার।

শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করিতে, সাধন ও ক্রিয়ার দিকে সজাগ করিয়া তুলিতে, স্বামীজীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। মুমুক্ষু শিষ্যেরা অনেক সময় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বাবা, ঈশ্বরের কৃপা, গুরুর কৃপা কি ক'রে পাবো, তা বলে দিন।"

স্বামীজী উত্তরে বলিতেন, "ক্রিয়া করো, ক্রিয়া করো, তা থেকেই নির্ভরতা আসবে, সকল বুঝতে পারবে, আর বিচলিত হবে না।—ক্রিয়া করিলেই ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায়। আরে বাবা, কৃপা তো অনবরতই মাথার উপর ঝরছে, কিন্তু তা বুঝতে পারছো কি? স্ত্রীর পেছনে, অর্থের পেছনে, ভালো আহারের পেছনে যখন ছুটছো—তখন তোমরা কর্তা। আর শুধু সাধন ভজনের বেলায়—বাবা, কৃপা করুন।"

ক্রিয়ানিষ্ঠা সম্বন্ধে শক্তিধর মহাপুরুষের এ ধরনের উক্তি বহু শিষ্যের জীবনে কল্যাণ আনিয়া দেয়।

সাধারণভাবে শিষ্যদের সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব ও আচরণ ছিল অত্যন্ত ক্ষমাশীল

ও স্নেহপূর্ণ। এক এক দিন তাই তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, "আমি এখনও ঠিক গুরু হইনি, যেদিন হবো, সেদিন সাজা দিয়ে, ক্লেশ দিয়ে সকলকে টেনে তুলবো।"

যে কোনো ছোটোখাটো উপকার কাহারো কাছে একবার পাইলে, স্বামীজী তাহা কখনো বিস্মৃত হইতেন না। উপযুক্ত সময়ে ইহার বহু গুণ প্রত্যুপকার করাই ছিল তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম।

সে-বার তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। অনেক খোঁজখবর নিয়া নেপালের এক রাণা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কক্ষে ঢুকিয়াই রাণাসাহেব তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন জটাজুটমণ্ডিত এক সাধুর পুরাতন ছবি।

সেদিকে তাকাইয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমার স্মরণ হয়েছে। তা আমার কাছে কি প্রয়োজন, বল।"

সঙ্গিনী কন্যাটিকে দেখাইয়া রাণাসাহেব বলিলেন, "আমার এ কন্যাটি সবচেয়ে আদরের। দীর্ঘদিন যাবৎ সে মস্তিষ্কের রোগে ভুগছে। ডাক্তারেরা বলছেন এ রোগ দুরারোগ্য। চিকিৎসা অনেক করা হয়েছে, কোনো ফল হয় নি। আমার মেয়ের জীবন কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে? কৃপা ক'রে আপনি তার প্রাণরক্ষা করুন।"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে নেপালী মেয়েটির দিকে চাহিয়া স্বামীজী তাহাকে কাছে ডাকিয়া নিলেন। খানিকক্ষণ তাহার মস্তকটি নিজের হস্ত দ্বারা তিনি স্পর্শ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "মা, তোমার রোগ একেবারে সেরে গেছে। দেখবে, এ অসুখ আর কখনো হবে না।"

মেয়েটির ঐ মারাত্মক ব্যাধি চিরতরে দূর হইয়া যায়।

ইহারা চলিয়া গেলে স্বামীজী পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিলেন। বহু বৎসর আগে পরিব্রাজক অবস্থায়, একবার তিনি নেপাল যান। এক গহন অরণ্যে সাধন-আসন স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ভক্তিমান্ রাণা অনুচরবৃন্দসহ সেখান দিয়া যাইতেছেন। ইনিই সেই রাণা। স্বামীজীর বনমধ্যস্থিত আসনের সম্মুখে আসিয়া সেদিন তিনি করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি, কৃপা ক'রে আদেশ করুন।"

স্বামীজী উত্তরে বলেন, "বেটা, তোমার তেমন ইচ্ছে হলে, এখানে কিছু ধুনির কাঠ যোগাড় ক'রে দিতে পারো।"

রাণাসাহেব তখনি সোৎসাহে তাঁর লোকজন দিয়া প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করিয়া দেন। বহু বৎসর পরে বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ আজ সেই উপকারটুকুর প্রতিদান দিলেন।

সাধারণভাবে স্বামীজী ভক্তসাধক অপেক্ষা শক্তিধর যোগীর বেশী মর্যাদা দিতেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামদাস কাঠিয়াবাবা, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গম্ভীরনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষকেই তিনি সার্থকনামা যোগী বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন।

সে-বার মা আনন্দময়ী ভক্তদের নিয়া বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সেদিনকার এই সাক্ষাতের দৃশ্যটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক।

আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। কিছুক্ষণ কুশলবার্তা ও

নানা হাস্যকৌতুকের পর আগন্তুক ভক্তদের কেহ কেহ ধরিয়া বসিলেন, বাবাকে বিভূতি-লীলা দেখাইতে হইবে।

বিশুদ্ধানন্দকে শেষটায় রাজী হইতে হইল। এবার সানন্দে সকল দর্শনার্থীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। একটি ফুল হাতে নিয়া বড় একটি স্ফটিকের দানা তৈরি করিতেছেন, এমন সময় আনন্দময়ী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বাবা, তুমি যা করছো মেয়ে কিন্তু তা সব কিছুই বুঝতে পারছে।"

শিষ্যদের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও মা-আনন্দময়ী কিন্তু এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন না। হাসিতে হাসিতে শুধু কহিলেন, "না গো, খুলে বললে যে, বাবা আমায় ডাণ্ডা মারবে।"

বিশুদ্ধানন্দজী এতক্ষণ মুচকি হাসিতেছিলেন। এবার স্নেহের সুরে আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "বেটি, তোকে দিয়েই তো এসব কচ্ছি।"

লঘু ও কৌতুকপূর্ণ এই সব হাস্যালাপের পর আনন্দময়ী হঠাৎ অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এসব কি দেখাও? এর চাইতে তোমার ভেতরে যে দুর্লভ বস্তু আছে, তা এদের তুমি দাও না কেন?"

স্বামীজী এবার অন্তর্মুখীন হইয়া উঠিলেন। শান্ত অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "নেয় কে?" -অর্থাৎ এ সাধনার উপযুক্ত অধিকারী কোথায়? আর, কোথায়ই বা তাহা গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা?

আনন্দময়ী কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নন। স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, তোমরা এ দেখে ভুলে থেকো না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বস্তু আছে তা শিগ্‌গীর তোমরা আদায় ক'রে নাও।"

বিশুদ্ধানন্দজী প্রায়ই ভক্তদের বলিতেন, "দ্যাখো, এ সব অলৌকিক বিভূতিলীলা দেখার ফলে কিছুটা কাজ হয়, নূতন সাধকের চিত্তে উৎসাহ জাগে। এই উৎসাহ জাগানো, আর নাস্তিকদের মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানোই যে আমি চাই।"

উত্তরকালে কিন্তু স্বামীজীর এই বিভূতি প্রদর্শনের উৎসাহে ভাটা পড়ে—ধীরে ধীরে কেবলি তিনি অন্তর্মুখীন হইতে থাকেন। এসময়ে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, আগে আগে অনেক বিভূতিই দর্শনার্থীদের আমি দেখিয়েছি। তখন এ সব দেখানোর দিকে একটা ঝোঁক ছিল। জ্ঞানগঞ্জে যাবার আগে শাস্ত্রের অনেক কথাই গালগল্প বলে মনে হত। জ্ঞানগঞ্জে গিয়ে দেখি, সে যেন একটা মায়াপুরী। সেখানে যে কত কি হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। সেখান থেকে যোগশক্তি লাভ ক'রে এসে সকলকে এসব এই অভিপ্রায়ে দেখাতাম যে, সকলে বুঝুক—শাস্ত্র ও সাধন মিথ্যে নয়! আজকাল সে ইচ্ছে হয় না। বরং মনে হয়, এতে লাভ কি হচ্ছে?"

বিশুদ্ধানন্দজীর নরদেহের বিচিত্র লীলা এবার ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে আসিয়া পড়িতেছে।

১৩৪৪ সাল আষাঢ় মাস। স্বামীজী তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। দুরারোগ্য রোগে তিনি আক্রান্ত, তাই চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আনা হইয়াছে।

২৭শে তারিখের বর্ষণরাত প্রভাত। মহানগরীর আকাশে বাতাসে জড়ানো রহিয়াছে মৌন মন্থরতা। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ভক্ত সেবকদের কাছে ডাকিলেন।

বলিলেন, "সবাই ভালো ক'রে গাও গো,—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

ভক্তদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে, ভক্তি-রসাত্মক পদের মধুর ঝঙ্কার, সারা ঘর ভরিয়া উঠিল। স্বামীজী নিজেও তাহাতে যোগ দিয়া ধীর স্বরে গাহিতে লাগিলেন।

শিষ্যদের বিস্ময়ের অবধি নাই। তাই তো, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার? এরূপ কীর্তন করিতে স্বামীজীকে তো তাহারা কখনো দেখে নাই! যোগ ও তন্ত্র সাধনার শক্তিতে তিনি শক্তিমান্, ঋদ্ধি সিদ্ধির তিনি মূর্ত বিগ্রহ। তাই ভক্তিসঙ্গীতের ভাবালুতা, রসমাধুর্য ও লালিত্যের ধার কোনোদিন ধারেন নাই! আজ কেন এ ব্যতিক্রম?

মর্ত্যলীলার শেষের দিনটিতে স্বামীজীর সারা সত্তায় জাগিয়া উঠিল প্রেমের অপূর্ব আকুতি। তারকব্রহ্ম মহানাম উচ্চারণ করিতে করিতে, আষাঢ়ের মেঘলা সন্ধ্যায় চিরতরে তিনি নয়ন মুদিলেন।

নরদেহটি বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে ভক্তজনদেরও কি চিরতরে করিলেন পরিত্যাগ? স্বামীজীর একটি গুজরাটী ভক্ত ছিলেন, নাম—হীরালাল ভোগীলাল ত্রিবেদী। তাঁহার বর্ণিত এক ঘটনা হইতে এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা মিলিবে?

বিশুদ্ধানন্দজীর তিরোধানের পর প্রায় ছয় বৎসর গত হইয়াছে। এ সময়ে একবার ত্রিবেদীজীর বালিকা কন্যাটি মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেলেন। বাঁচিবার যখন আর কোনো আশাই নাই, অসহায় পিতা তখন অবলম্বন করিলেন তাঁহার শেষ আশ্রয়। গৃহে টাঙানো বিশুদ্ধানন্দজীর ছবিটি জল দিয়া ধুইয়া সেই জল তিনি কন্যার মুখে ঢালিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেহী স্বামীজীর নিকট নিবেদিত হইল আকুল প্রার্থনা—এই মৃত্যু-পথযাত্রিণী কন্যার যেন সদ্‌গতি হয়।

উপস্থিত সবাই হঠাৎ চমকিয়া উঠলেন, রোগীর কক্ষটি মধুর পদ্মগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ত ত্রিবেদীজী বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক্! এ কি! এ যে গুরুজী বিশুদ্ধানন্দের বহু পরিচিত অলৌকিক দেহ-গন্ধ!

ইহার পর হইতেই মরণাপন্না বালিকার বিকারের ঘোর কাটিয়া যায়। ধীরে ধীরে সে আরোগ্য লাভ করে।

মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ত্রিবেদীজী যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্ময় চরমে উঠিল। সে বলিল, "বাপুজী, আমাদের এখানে আজ যে গুরুজী এসেছিলেন। আমার কাছে বিছানার ওপর বসে আমায় কত আশ্বাস দিয়ে গেলেন—'বাপ থাকতে মেয়ের আবার ভয় কি গো? তোমাদের সকলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি আর আজকের? এ যে বহুকালের'।"

দেহধারী বিশুদ্ধানন্দ ভক্ত ও শিষ্যদের অনেক গুরুভারই বহন করিয়া চলিতেন। বহুবার অনেকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সেদিন কিন্তু মর্ত্যলীলার অবসানেও দেখা গেল, বিদেহী বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার সে দায়িত্বভার ত্যাগ করেন নাই।

মহর্ষি রমণ

'অরুণাচল—অরুণাচল!' কে জানে কি ইন্দ্রজাল রহিয়াছে এই নামে? বালক বেঙ্কটরমণের কানে হঠাৎ সেদিন পশে এই শব্দের ঝঙ্কার, হৃদয়ে তুলিয়া দেয় অদ্ভুত অনুরণন।

কোথায় ইহার অবস্থান, কি ইহার মাহাত্ম্য, কিছুই তাহার জানা নাই, একবারও জানিতে সে চাহে নাই। 'অরুণাচলে'র সেই ছন্দোময় বাণী আজ তাহার ঘুমন্ত জীবনে আনিয়াছে জাগরণের আলো, সর্বসত্তার মূলে দিয়াছে নাড়া! তাই তো সর্বত্যাগী হইয়া আজ সে তিরুভান্না-মালাই-এ উপস্থিত হইয়াছে।

ভোর হইতে না হইতে তীর্থযাত্রিবাহী গাড়িটি স্টেশনে আসিয়া পৌঁছে। বেঙ্কটরমণ তাড়াতাড়ি কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

সম্মুখেই পবিত্র অরুণগিরি, প্রভাত সূর্যের রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সানুদেশে দণ্ডায়মান অরুণাচলেশ্বরের সহস্রস্তম্ভ মন্দির। প্রকৃতির আর মানুষের দুই মহান্ সৃষ্টি—পাশাপাশি।

মুগ্ধ বিস্ময়ে বালক বার বার তাকায় অরুণাচলের এই মায়াপুরীর দিকে। সারা অন্তর আজ তাহার অপার তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই ভূমিতেই যে তাহার জীবনপ্রভুর অধিষ্ঠান!

১৮৯৬ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর সংসারত্যাগী বেঙ্কটরমণের জীবনে এ দিনটি রচনা করে এক নূতন অধ্যায়।

জীবন আজ তাহার সফল, আনন্দের তাই অবধি নাই। দ্রুতপদে সে মন্দিরে ঢুকিয়া পড়ে। বাহিরের দুয়ার, গর্ভগৃহের দুয়ার, সবই আজ রহিয়াছে উন্মুক্ত। বিরাট মণ্ডপের কোথাও একটি জনপ্রাণীও নাই। অরুণাচলেশ্বর নিজেই কি কৃপা করিয়া প্রিয় পুত্রের সাথে এই নিভৃত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন?

যুক্তকরে, সাশ্রুনয়নে বেঙ্কটরমণ প্রভুর চরণে প্রণতি জানায়, আর চিরতরে করে আত্মসমর্পণ।

উত্তরজীবনে সেদিনকার এই ঘরছাড়া বালকই রূপান্তরিত হয় এক মহাজ্ঞানী তাপসরূপে। নাম হয় মহর্ষি রমণ। আপন তপস্যার বলে যে আলোক তিনি প্রজ্বলিত করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মুমুক্ষুর জীবনে তাহা আনিয়া দেয় পরম কল্যাণ।

আগের দিন ছিল গোকুলাষ্টমী। পথে আসার সময় কিছু প্রসাদ ও মিঠাই জুটিয়াছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর খাবারের মোড়কটি নিয়া বালক আইয়ানকুলাম সরোবরের তীরে উপস্থিত হয়। অন্তরে সহসা চিন্তা খেলিয়া যায়। তুচ্ছ এই দেহ, ইহার জন্য এত সব উপাদেয় খাবারের কি দরকার? কেনই বা এসব সঞ্চয় করিয়া রাখা?

মোড়কটি তখনি সে জলে নিক্ষেপ করে।

পাথেয় হইতে তিনটি টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা সঙ্গেই আছে। কিন্তু এ-টাকায় কোন্ প্রয়োজন? অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরের কোণে চমৎকার আশ্রয় পাওয়া যাইবে। তাছাড়া,

ভোজন চলিবে ভিখারীদের মতো যত্রতত্র। উপাধানের কাজ করিবে এই বাহুদ্বয়। তবে টাকাকড়ি কোন্ কাজে আসিবে? সঙ্গের তিনটি টাকাও সে জলে ফেলিয়া দেয়।

গলায় আছে পবিত্র উপবীত। বৈরাগী বেঙ্কটরমণের কাছে তাহাও আজ তুচ্ছ। সরোবরের জলে অবলীলায় এবার উহা ভাসাইয়া দেয়। পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া তৈরি করে কৌপীন। বাকী অংশটুকু রাস্তায় পড়িয়া থাকে। একেবারে নিষ্কিঞ্চন সাধুর বেশ!

বেঙ্কটরমণ মন্দিরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁহার মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়ান। কহেন, "বাবা, তুমি কি মস্তক মুণ্ডন ক'রে ফেলতে চাও? তা'হলে, আমার সঙ্গে এসো।"

চকিতে বালকের মনে ভাবনা খেলিয়া যায়—সত্যিই তে, তাহার এই সুন্দর কোঁকড়ানো ও ঝাঁকড়ানো চুলের তো আর প্রয়োজন নাই। এবার এসব কাটিয়া ফেলিলেই জঞ্জাল দূর হয়। তখনই এ প্রস্তাবে সে রাজী হইয়া পড়ে।

কিন্তু বড় অদ্ভুত এই অপরিচিত ভদ্রলোক। বেঙ্কটরমণের মাথার চুল নিয়া তাঁহার এমন মাথাব্যথা কেন? কি মনে করিয়া হঠাৎ নিজ ব্যয়ে তিনি উহা কাটাইয়া দিলেন, তাহা কে বলিবে।

সুন্দর সুঠামতনু. মুণ্ডিতমস্তক বালকের চেহারায় এবার দণ্ডী সন্ন্যাসীর ছাপ পড়িয়াছে।

তীর্থে মস্তক মুণ্ডনের পর স্নান করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধি। কিন্তু বেঙ্কটরমণের মনে তখন তীব্র বৈরাগ্যের ভাব। সব কিছুই তাহার কাছে অবান্তর হইয়া উঠিয়াছে। সে ভাবিতে থাকে, নশ্বর দেহের জন্যে আবার স্নানের বিলাস কেন?

অরুণাচলেশ্বর নিজেই যেন উদ্যোগী হইয়া স্নানশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পথের মধ্যে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গেল। বেঙ্কটরমণ মন্দিরের মণ্টপম্-এ আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল, তাহার সারা দেহ সিক্ত, অজস্র ধারায় জল ঝরিতেছে।

মণ্টপমের মাঝখানে অবস্থিত প্রস্তরবেদীর উপর নবীন সাধক তাহার ধ্যানের আসন বিছাইয়া দেয়। মূল মন্দিরে না ঢুকিয়া এখন হইতে এই মণ্টপম্‌কেই করে তাহার আশ্রয়স্থল।

তিন বৎসর পরে আর একবার মাত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া সে দেববিগ্রহটি দর্শন করিয়াছিল।

আসনে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্কটরমণ ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে। দিনরাতের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। সংসারের কোনো আলোড়নই আর পৌঁছে না তাহার কাছে। পরম প্রশান্তি নিয়া ধ্যানের গভীরে দিনের পর দিন সে ডুবিয়া যাইতে থাকে।

মৌন, আত্মসমাহিত, কে এই কিশোর সাধক? তাহাকে ঘিরিয়া মন্দিরের দর্শনার্থীদের কৌতূহলের সীমা নাই। এ সময়ে সাধারণের কাছে সে পরিচিত হইয়া উঠে ব্রহ্মণস্বামী নামে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহ কাছে নাই। সদা ধ্যানাবিষ্ট সাধকের দেখাশুনা কে করিবে? কে-ই বা করিবে রক্ষণাবেক্ষণ?

এ কাজে আগাইয়া আসেন শেষাদ্রিস্বামী। তিরুভান্নামালাইর পথে পথে এই খেয়ালী সন্ন্যাসী ঘুরিয়া বেড়ান। সেদিন হঠাৎ এই বালক সাধককে দেখিয়া তাঁহার মমতা জাগে। তখন হইতে তাঁহার সেবা-পরিচর্যা শেষাদ্রি নিজেই কিছুটা করিতে থাকেন।

বেঙ্কটরমণের সাধনজীবনে এইবার দেখা দেয় নানা বাধা-বিঘ্ন। দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, এ অপরিচিত স্থানে সহায় বা বন্ধুবান্ধব কেহ নাই। সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট বালকেরা নির্যাতন শুরু করে। ঢিল ছুঁড়িয়া গণ্ডগোল করিয়া নানা উপদ্রব করিতে থাকে।

মণ্ডপ -এর প্রান্তে রহিয়াছে এক অন্ধকারময় ভূগর্ভ। স্থানটির নাম পাতাল-লিঙ্গম। দুর্বৃত্ত বালকদের হাত এড়ানোর জন্য বেঙ্কটরমণ এইখানেই গিয়া ধ্যানস্থ হন। নোংরা, আলো-বাতাসহীন, এই ভূগর্ভে কেবল উই, ইঁদুর আর পোকামাকড়ের রাজত্ব। বেঙ্কটরমণের দেহে চলে ইহাদের অবাধ আক্রমণ।

এজন্য তাঁহার কিন্তু এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নাই। বিষাক্ত পোকার কামড়ে পিঠে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, দরদর ধারে রক্ত ঝরিতে থাকে। কিন্তু ধ্যানের গভীরে তলাইয়া গিয়া সব কিছু তিনি বিস্মৃত হন।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়া অনুরোধ উপরোধ করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে এই ভূগর্ভ-আসন হইতে সরানো যায় না।

অবশেষে এখানেও দুষ্ট বালকের দল ধাওয়া করে। একদিন দৌরাত্ম্য চরমে উঠে এবং বাধ্য হইয়া বেঙ্কটরমণকে অন্যত্র সরাইয়া নিতে হয়। দুষ্টেরা সেদিন শেষাদ্রি ও বেঙ্কটরমণকে লক্ষ্য করিয়া বড় বড় ইঁট ছুঁড়িয়া মারিতেছে। মহা সোরগোল। এমন সময় বেঙ্কটাচল মুদালি নামে এক ভদ্রলোক দেবদর্শনে আসিয়াছেন। ছেলেদের উৎপাত দমনের জন্য তিনি তৎপর হইলেন।

সম্মুখে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভিতরে এক দিব্যকান্তি নবীন সাধক নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। পোকা-মাকড়ের তীব্র দংশন, বালকদের নির্যাতন, কোনো কিছুই তাঁহার ধ্যান ভাঙাইতে পারে নাই। বাহ্যজ্ঞান নাই, সারা দেহ একেবারে নিস্পন্দ।

মুদালি কয়েকজনের সাহায্যে বেঙ্কটরমণের দেহটি ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিলেন। কাছেই রহিয়াছে সুব্রহ্মণ্য মন্দির। তাঁহাকে সেখানে নামানো হইল। কীটের দংশনে পদদ্বয় ও জানুতে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। রক্ত ও পুঁজে একেবারে মাখামাখি। আশ্চর্যের বিষয়, এত কিছুতেও কিশোর সাধকের ধ্যান টুটে নাই। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকের ভিড় জমিয়া গেল।

মন্দিরগর্ভ হইতে বেঙ্কটরমণের সেদিনকার এই নিষ্ক্রমণ উন্মোচিত করে তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায়। লোকলোচনের সম্মুখে তিনি আসিয়া দাঁড়ান। শুরু হয় রমণ-মহর্ষির অভ্যুদয়।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া বিতরণ করেন তাঁহার অধ্যাত্ম সম্পদ, বহু মুমুক্ষুর জীবনে আনেন রূপান্তর।

যে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মহর্ষি রমণের জীবনভিত্তি রচিত হয়, সে কাহিনী বড় কৌতূহলোদ্দীপক। তিরুচুঝির বালক বেঙ্কটরমণের জীবনে যে আলোকের ঝিলিক সেদিন দেখা দেয়, পরিণত বয়সে তাহারই ঘটে জ্যোতির্ময় প্রকাশ।

মাদুরা শহরের ত্রিশ মাইল দূরের এক গণ্ডগ্রাম তিরুচুঝি। সুন্দরম্ আইয়ার এই গ্রামেরই এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে তিনি আইনব্যবসা

করেন, ব্যবসায়ে পসার-প্রতিপত্তিও মন্দ নয়। ভক্ত ও অতিথিবৎসল বলিয়া সুন্দরম্ আইয়ার ও তাঁহার পত্নী আলাগাম্মলের সুনাম এ অঞ্চলে রহিয়াছে। এই দম্পতিরই পুত্র বেঙ্কটরমণ—উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত রমণ মহর্ষি।

সেদিন ছিল আরুদ্র দর্শনের উৎসব। তিরুচুঝিতে তাই বড় আনন্দ সমারোহ। প্রতি বৎসরই এ সময়ে ভক্তের দল আড়ম্বর সহকারে শিববিগ্রহ নিয়া শোভাযাত্রা করেন। ঘন ঘন শোনা যায় শঙ্খ ঘণ্টা আর ঝাঁঝের মঙ্গলধ্বনি, চারিদিক আলোকসজ্জা ও পুষ্পমাল্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। প্রচুর আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়া দেবাদিদেবের পূজা এ দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

এমনি এক পুণ্যময় উৎসব-দিনে, ১৮৭৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্ররূপে বেঙ্কটরমণ ভূমিষ্ঠ হন।

সেদিন সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করার পর রাত্রি একটার সময় শিব-বিগ্রহ মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সুন্দরম্ আইয়ারের গৃহে মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠে। শিবের উৎসব-দিনে আবির্ভূত হন শিবাংশসম্ভূত এই দিব্যকান্তি শিশু। উত্তরকালে শিবেরই জ্ঞানময় সত্তার অপরূপ রূপায়ণ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে।

বালক বেঙ্কটরমণকে শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। তারপর ডিণ্ডিগলের স্কুলে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল পড়াশুনা করেন। বারো বৎসর বয়সের কালে, তাঁহার জীবনে আসে নিয়তির নির্মম আঘাত। পিতা সুন্দরম্ আইয়ার হঠাৎ একদিন পরলোকে চলিয়া যান। তিরুচুঝির সুখনীড়ও ভাঙিয়া পড়ে।

এবার বড় ভাই নাগস্বামী'র সহিত বেঙ্কটরমণকে পাঠানো হয় পিতৃব্য সুব্বিয়ারের কাছে, মাদুরায়। এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর তিনি পড়িতে থাকেন। কিন্তু বই-খাতার বোঝা নিয়া যাতায়াত করিলে কি হইবে, স্কুলের পড়ায় বেঙ্কটরমণের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। অসাধারণ মেধার অধিকারী হইলেও এ মেধার সদ্ব্যবহার বড় একটা করিতে দেখা যায় না। নেহাত যেটুকু পড়াশুনা না করিলে নয়, তাহা করিয়াই থাকেন সন্তুষ্ট। দেহটি দৃঢ় ও সুগঠিত, খেলাধুলায়ও দেখা যায় তাঁহার প্রচুর উৎসাহ।

সুন্দরম্ আইয়ারের পরিবারের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। স্থানীয় লোকেরা সবাই জানে যে, বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর এই পরিবার হইতে একজন করিয়া গৃহত্যাগী হন, সন্ন্যাসজীবন বরণ করেন। সুন্দরমের এক কাকা গৈরিকের আহ্বানে ঘর ছাড়িয়াছেন, পরবর্তীকালে তাঁহার বড় ভাইও নিয়াছেন সন্ন্যাস। এবার সুন্দরমের পুত্রদের মধ্যে কে কখন সংসারবিরাগী হইয়া উঠে তাহা কে জানে? জননী আলাগাম্মলের মনে তাই মাঝে মাঝে হয় দুশ্চিন্তার ছায়াপাত।

আশঙ্কা শেষকালে একদিন সত্য হইয়াই দাঁড়ায়, আর ইহা ঘটে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রেরই জীবনে।

হাসি আনন্দে বেঙ্কটরমণের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে অন্তরে আসে বৈরাগ্যের তীব্র আলোড়ন।

মাদুরায় তাঁহার পিতৃব্যের বাড়িতে সেদিন এক নিকট-আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে কৌতূহলী বেঙ্কটরমণ প্রশ্ন করেন,—কোথা হইতে তিনি আসিতেছেন? নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন। তেমনি সাধারণ এক জবাব শোনা যায়—"অরুণাচল।"

কিন্তু কি আশ্চর্য! মুহূর্ত মধ্যে এই নামের ঝঙ্কার তাঁহার সারা অন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। কে জানে কোন্ দিব্যলোকের স্পর্শ, কোন্ মন্ত্রচৈতন্য রহিয়াছে এ শব্দে?

অজানা, অব্যক্ত ভাবরসে মনপ্রাণ ভরপুর হয়, উদ্‌গত হয় সাত্ত্বিক সংস্কার। উপলব্ধিতে ফুটিয়া উঠে অরুণাচল-এর স্বরূপ। একি! এ যে তেজোলিঙ্গম মহাদেবেরই স্থূল রূপ! তাঁহারই পবিত্র প্রতীক!

উৎফুল্ল হইয়া আবার প্রশ্ন করেন, "অরুণাচল?—কোথায় রয়েছে এই অরুণাচল?"

আত্মীয়টি উত্তর দেন, "সে কি কথা! তিরুভান্নামালাই-এর নাম জানো না তুমি? সেখানেই তো—অরুণাচল।"

কিশোর মনের উদ্দীপনা পরে কিন্তু আর থাকে নাই। এক ঝলক্ স্বর্গীয় আলোকের মতো দেখা দিয়া 'অরুণাচল' আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ তামিল ধর্মগ্রন্থ পেরিয়া পুরাণম্ হঠাৎ সেদিন বেঙ্কটরমণের হাতে পড়ে। এ গ্রন্থ তাঁহার জীবনে সর্বপ্রথমে আনিয়া দেয় আত্মিক জীবনের তথ্যসম্ভার।

বহু সিদ্ধপুরুষের অমৃতময় জীবনকথা ইহাতে রহিয়াছে। একাগ্র মনে এগুলির পাঠ তিনি শেষ করেন। অলৌকিক জীবনের গোপন রহস্য হাতছানি দেয় বার বার। কোথায় সিদ্ধপুরুষদের অতীন্দ্রিয় রাজ্য? ভাববিহ্বল হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবেন, আর শঙ্খচিলের মতো ডানা মেলিয়া মন কেবলি সেখানে উড়িয়া যাইতে চায়।

প্রেম, বৈরাগ্য ও আত্মনিবেদনের পথে এইসব মহাপুরুষের আনাগোনা; ভগবানের সহিত সদাই ইহারা মধুর যোগবন্ধনে বাঁধা। বালক বেঙ্কটরমণের মানসপটে বার বার জাগিয়া উঠে এই মহাত্মাদের ছবি। মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠে।

কিছুদিন পরের কথা। এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনে ঘটে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ, আসে এক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনই বৈপ্লবিক।

মৃত্যুর করাল ছায়া যেন সেদিন তাঁহার সর্বসত্তায় নামিয়া আসে, আর ইহারই মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয় অখণ্ড জীবনের পরমতত্ত্ব।

মাদুরায় গৃহের এক নির্জন দ্বিতল কক্ষে বালক বেঙ্কটরমণ সেদিন বসিয়া রহিয়াছেন। অকস্মাৎ তিনি উপলব্ধি করিলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাঁহার দেহ, মন ও সমগ্র সত্তার উপর দ্রুত নামিয়া আসিতেছে—এখনি তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিবে। মুহূর্তমধ্যে মনে চিন্তার বিদ্যুৎ-ঝলক্ খেলিয়া গেল—ডাক্তার আত্মীয়স্বজন ইহাদের ডাকিয়া আর কি হইবে?

সঙ্কট হইতে ত্রাণের উপায় নিজেই বাহির করিলেন।

মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করামাত্রই বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাস্রোতটি অন্তর্মুখী হইয়া গেল। শ্বাস-কুম্ভক করিয়া বেঙ্কটরমণ তাঁহার সমগ্র চিন্তাধারাকে সত্যানুসন্ধানের পথে চালিত করিলেন। অনুভূতি হইয়া উঠিল স্বচ্ছ ও আলোকোজ্জ্বল। ভিতর হইতে স্ফুরিত হইল তত্ত্ব—মৃত্যুর কবলিত হইতে যাইতেছে কোন্ বস্তু? ইহা তো তাঁহার এ নশ্বর

দেহটিই, যাহা প্রাণহীন, নীরব, নিস্পন্দ। শ্মশানে নিয়া গিয়া এখনি তো এটি পোড়াইয়া ফেলা হইবে।

সত্তার গভীরে নিজের চেতনাকে তিনি ঠেলিয়া নিয়া যান। তারপর বিচার করিতে থাকেন—"এই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে দেহমধ্যস্থ 'আমি'রও কি ঘটবে বিনাশ ? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে আমি আমার আত্মসত্তার শক্তি ও স্পন্দন উপলব্ধি করছি। সুতরাং এই 'আমি' হচ্ছে একটি অধ্যাত্মকর্তা—যা দেহকে অতিক্রম ক'রেই বর্তমান। বস্তুগত দেহটি অবশ্যই বিনষ্ট হতে পারে—কিন্তু দেহোত্তর 'আত্মা' যে মৃত্যুর স্পর্শ সীমার একেবারে বাইরে! তাহলে এই প্রকৃত 'আমি' হচ্ছে এক মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তা!" (সেল্‌ফ রিয়েলিজেশন : নরসিংহস্বামী)

মৃত্যুভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বালকের সত্যানুসন্ধান। এই অনুসন্ধানকে কিন্তু মনোবিশ্লেষণ বা বিচার মনে করিলে ভুল করা হইবে। উত্তরকালে মহর্ষি তাঁহার কৈশোরের এ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতেন, "এই তত্ত্ব আমার চৈতন্যের সম্মুখে এক জীবন্ত সত্তারূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—একে আমি সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম, কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজনই আর রইল না। এই প্রকৃত 'আমি' তখন এক বাস্তব সত্য—আমার দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম ও আচরণ তখন এই প্রকৃত আত্মসত্তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে। এরপর জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ এই 'আত্মার' ওপরই নিবদ্ধ হল। মৃত্যুভয়ের চিহ্নমাত্র রইল না। এই নবজাগ্রত আত্ম চৈতন্যের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত কিছু তখন থেকে বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে, আজও তার বিরাম নেই। অপর চিন্তা বা তত্ত্ব বার বার আমার অন্তরে উদিত হয়েছে, আবার দূরীভূতও হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' বা আত্মবোধ রয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে আমার জীবনে বর্তমান। এ যেন সংগীতের নানা ধ্বনি ও মূর্ছনার মধ্যস্থিত অচঞ্চল এক মূল সুর! অতঃপর এই দেহ যা কিছু কাজ করুক না কেন, প্রকৃত 'আমিটি' সেই অন্তর্নিহিত মূল আত্মবোধের কেন্দ্রেই রয়েছে অধিষ্ঠিত।" (রমণ মহর্ষি : এ ওসবোর্ন)

কিশোর বেঙ্কটরমণের জীবনে সেদিনকার এ অনুভূতির ফল সুদূর-প্রসারী হইয়া উঠে। চিন্তাধারা বার বারই খুঁজিয়া ফিরে জীবনের উৎসমুখ। দেখা যায় নূতনতর চেতনার উন্মেষ।

সেদিনকার ঐ মৃত্যু-বোধ এ সংকটের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কোনো ব্যাধি বা ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া ইহা নয়। বেঙ্কটরমণ খেলাধুলায় দক্ষ। সুস্থ, প্রাণবন্ত দেহে তাঁহার নিটোল স্বাস্থ্য টলমল করিতেছে। অন্তর পৌরুষে ভরপুর। মৃত্যুর ছায়া তাঁহার দেহে ও মনে স্বাভাবিকভাবে কি করিয়া আসিবে ? কেনই বা আসিবে ?

এই মানস-সঙ্কটের মধ্য দিয়াই বেঙ্কটরমণের জীবনে সেদিন আত্মতত্ত্বের চকিত স্ফুরণ ঘটে। এজন্য কোনো চেষ্টা, কোনো অনুসন্ধান বা প্রস্তুতিরই প্রয়োজন হয় নাই। প্রারব্ধের বেগ হইয়াছে অনিবার্য, জন্মান্তরের সঞ্চিত সাত্ত্বিক সংস্কাররাশি তাই মাথা ঠেলিয়া উঠিতেছে, আনিয়াছে মুক্তির প্রেরণা।

বেঙ্কটরমণের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই। আচার-আচরণ নিতান্ত স্বাভাবিক, আর পাঁচটি কিশোরেরই মতো। ধ্যান ও আত্মবিচারের কোনো প্রবণতাও কখনো দেখা যায় নাই। তবে তাঁহার গাঢ় নিদ্রালুতার মধ্যেই হয়তো ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট্য।

বালককালে তাঁহার নিদ্রার গাঢ়ত্ব কিরূপ অস্বাভাবিক ছিল, উত্তরজীবনে ভক্তদের কাছে তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় নিদ্রাকালীন প্রচ্ছন্ন ধ্যানাবেশের ইঙ্গিত পাই :

"আমার নিদ্রা সাধারণত খুব গাঢ় ছিল। তখন আমি ডিণ্ডিগলে থেকে পড়াশুনা করি। একদিন খুব নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে, কিছুতেই জাগছি না। বহু লোক আমার শয়ন কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে। তুমুল চিৎকার, দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত, সব কিছুই ব্যর্থ হয়। জোর ক'রে ঘরে প্রবেশ ক'রে, আমার দেহকে তীব্র ঝাঁকুনি দিলে তবে আমার বাহ্যজ্ঞান আসে। মধ্যরাতে অনেক সময় এক রকমের অদ্ভুত নিদ্রাবেশ হত—এটা ছিল অর্ধ-বাহ্যজ্ঞানের অবস্থা। দুষ্ট খেলার সাথীরা দিনের বেলায় আমার ঘাঁটাতে সাহস করতো না। রাতে ঐ অবস্থায় তারা আমার ওপর যতকিছু উপদ্রব করতো। অনেক সময়ে আমার ঘুমন্ত অবস্থায়ই তারা খেলার মাঠে ধরে নিয়ে যেত। তারপর আমায় প্রহার ক'রে নানা ভাবে নির্যাতন ক'রে, আবার তারা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যেত। এত কিছুতেও কিন্তু সে সময়ে আমার বাহ্যজ্ঞান সহজে ফিরে আসতো না।"

সেদিনকার মৃত্যু-সঙ্কটের অনুভূতি বেঙ্কটরমণের সমগ্র জীবনে এক অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন আনিয়া দেয়। পাঠে আর তাহার মন নাই, আহারের রুচি ও উৎসাহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের আকর্ষণও একেবারে শিথিল। ব্যক্তিসত্তার মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ক্রীড়াচঞ্চল, পৌরুষদৃপ্ত, কিশোরের জীবন সেদিন বিনয় ও নম্রতার ভারে আনত। নূতনতর লাবণ্যশ্রী এ সময়ে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে!

এখন হইতে যেটুকু সময় বেঙ্কটরমণ নির্জনে থাকেন, ধ্যানাবেশেই প্রায় তাঁহার কাটে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাগস্বামী বিদ্রূপ করিয়া কখনো কখনো বলেন, "ওহে জ্ঞানীপুরুষ, যে রকম দেখছি, তাতে তোমার পক্ষে উচিত হবে প্রাচীন ঋষিদের মতো বনে চলে যাওয়া।"

বেঙ্কটরমণের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। নিজের ভাবের ঘোরেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়।

কাছেই মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের মন্দির। এখন হইতে এ মন্দিরই হয় তাঁহার বড় আশ্রয়স্থল। ইতিপূর্বে মাদুরার এই বিখ্যাত মন্দিরে খুব কমই গিয়াছেন, এবার এখানকার আকর্ষণ তাঁহাকে যেন পাইয়া বসিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভক্তি-আনত শিরে মন্দির-অঙ্গনে গিয়া দাঁড়ান। মীনাক্ষী, নটরাজ ও শৈব শিদ্ধাচার্যদের মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে জাগে অপূর্ব ভাবাবেশ। কেন যে দু'নয়নে কেবলি অশ্রু ঝরিতে থাকে, তাহা বুঝিতে পারেন না।

এ সময়কার ভাবানুভূতি ও মনোভাবের বর্ণনায় রমণ বলেন—"ভাবাবেগের তরঙ্গ এ সময়ে আমায় ধীরে ধীরে তলিয়ে ফেলছিল। দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, তাই আত্মসত্তা এতকাল দেহের যে অবলম্বন বা আশ্রয় নিয়ে চলে আসছিল, তাও পরিত্যাগ করতে চায়! সে এখন খুঁজে বেড়ায় এক নূতনতর আশ্রয়কে। তাই তো মন্দিরে এই আনাগোনা। আত্মার বন্ধনমুক্ত প্রবাহ তাই তো এই অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে তখন এমন উপচে পড়েছে। জীবের সাথে ঈশ্বরের খেলা বা লীলার প্রকৃত স্বরূপই তো এই! ঈশ্বর—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অদৃষ্টচক্রের নিয়ামক, যিনি সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ, তাঁর সম্মুখে

তাই তো গিয়ে দাঁড়াতুম, আর মাঝে মাঝে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতুম, যেন শৈব সিদ্ধাচার্যদের মতোই আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা বেড়ে ওঠে। তবে প্রায়ই আমি কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থনা সেখানে করতাম না। শুধু ভেতরের গভীরতম সত্তাকে বাইরের মহাসত্তার সঙ্গে এক ক'রে দিতাম, নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতাম।"

ভিতরকার মানুষটি সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ সময়ে কোনো তীব্র দুঃখ বা সুখ বোধ তাঁহার নাই। বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি কথা যেমন তাঁহার কাছে কোনো অর্থজ্ঞাপন করে না—সংসার, ব্রহ্ম প্রভৃতির মর্মও তেমনি রহিয়াছে অজানা। কিন্তু মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের অঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেই দুই চোখে ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

সকল কিছু দুঃখ ও আনন্দের ঊর্ধ্বে অন্তরাত্মার কোন্ অব্যক্ত বাণীকে এই অশ্রু প্রকাশ করিতে চায়?

প্রতিদিনই বেঙ্কটরমণ ঐ দেব-দেউলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। অন্তরের প্রার্থনা বার বার নিবেদন করেন।

এক জ্ঞানপন্থী সাধক উত্তরকালে রমণকে প্রশ্ন করেন "মহর্ষি, মৃত্যুর অনুভূতির ভেতর দিয়ে আগে থেকেই তো আত্মস্বরূপকে আপনি উপলব্ধি করেছিলেন, তবে আর ঐ বিগ্রহের কাছে আপনার প্রার্থনা জানানোর কি দরকার ছিল?"

রমণ উত্তর দেন, "সেদিনকার মৃত্যু অনুভূতি থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম, আমি দেহ নই। শুদ্ধ মনের সাহায্যেই এ জ্ঞান আহরিত হয়েছিল, কিন্তু এই শুদ্ধ মন তো সেদিন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। তাই একটি নূতনতর অবলম্বন বা আশ্রয়ের দরকার ছিল। এই জন্যই মন্দির-বিগ্রহের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।"

বেঙ্কটরমণের উদাসীনতা ক্রমে গৃহজীবনে তিক্ততার সৃষ্টি করিতে থাকে। পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আসে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কঠোর শাসন। তাঁহারা ভাবেন—এ ছেলে এমন মেধাবী, এমন প্রাণবন্ত, ভবিষ্যৎ তাহার কত সম্ভাবনাপূর্ণ। অথচ নিতান্ত নির্বোধের মতো সব কিছু সে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। শুভানুধ্যায়ীদের গঞ্জনা ও ধিক্কার দিন দিন বাড়িয়াই চলে।

বেঙ্কটরমণের কাছে ঘর-সংসার আজ একেবারে অর্থহীন, বাড়ির লোকেরা কিন্তু ভাবে, অন্যরূপ। ছেলে লেখাপড়া শিখুক, উপার্জন করুক, ইহাই তাহারা চান। ফলে সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

রমণ সেদিন নিজ কক্ষে বসিয়া স্কুলের পাঠ লিখিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা তাঁহার মনে হইল, কেন শুধু শুধু এই অর্থহীন গতানুগতিক কাজের ভিড়ে বসিয়া থাকা? পুঁথিপত্র একদিকে সরাইয়া রাখিয়া চোখ বুজিয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন।

দাদা নাগস্বামীর চোখে পড়িল এই দৃশ্য। শ্লেষের সুরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভাবভঙ্গি, আচরণ যার এরকম, ঘর-সংসারে থেকে তার আর কি দরকার?"

কথা কয়টি নূতন নয়, অনেকবারই রমণ এমন মন্তব্য শুনিয়াছেন। কিন্তু দাদার এ শ্লেষ আজ মর্মমূলে গিয়া বিদ্ধ হইল। সত্যই তো! সংসারে সার বস্তু কিছু আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না, সারা দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। তবে আর গৃহকোণে এমন করিয়া বসিয়া থাকা কেন?

এই চিন্তাস্রোতের মধ্যে হঠাৎ মনে জাগিল অরুণাচলের কথা। প্রথম শোনার সঙ্গে

সঙ্গে এ নামের ধ্বনি সর্বসত্তায় ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়াছিল। আজ আবার উহা তাঁহার চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। সর্বশক্তির আধার, সর্বজ্ঞানের উৎস যিনি, সেই ভগবানের আহ্বান যে এ নামের ভিতর নিহিত! ইহারই মধ্যে বেঙ্কটরমণ খুঁজিয়া পাইলেন পরম পিতার নির্দেশ।

সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইবেন অরুণাচলের পথে। মনে হয়, বাড়ির লোকেরা পাছে তাঁহাকে অনুসরণ করে, তাই গোপনে, সবার অলক্ষ্যে সেদিন বাহির হইতে হইল।

প্রথমে এক ছলনার আশ্রয়ই নিলেন। দাদাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এক্ষুনি একবার আমায় স্কুলে যেতে হবে।"

উত্তর হইল, "বেশ তো, চলে যা। হ্যাঁ, ভালো কথা। যাবার সময় পাঁচটা টাকা নিয়ে যাস্। আমার কলেজের মাইনে আজ দিতে হবে, তুই-ই ওটা দিয়ে আসিস্।"

এ যে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ! পথের খরচও বুঝি কৃপালু ভগবান্ এভাবে যোগাইয়া দিলেন। অরুণাচলে, তিরুভান্নামালাই-এ, সেইদিনই তিনি যাত্রা করিলেন। দাদার বেতনের পাঁচ টাকা হইতে তিনটি টাকা পাথেয় স্বরূপ নিলেন সঙ্গে।

রওনা হওয়ার আগে বেঙ্কটরমণ তাঁহার দাদার নামে পত্র রাখিয়া গেলেন—"আমার 'পিতারই' উদ্দেশে আমি এই যাত্রা শুরু করলাম, এ কাজে তাঁর আদেশও মিলেছে। পুণ্যকর্ম সাধনের জন্যই আমি চলেছি। কাজেই এতে কারুর দুঃখ করার কিছু নেই। এর খোঁজখবরের জন্য কোনো টাকাকড়ি যেন অনর্থক খরচ করা না হয়। তোমার বেতন দেওয়া হয় নি। তা থেকে দুটো টাকা এখানে রেখে গেলাম।"

পত্রে কোনো স্বাক্ষর নাই— কিন্তু লেখকের মনের স্বাক্ষরটি ঠিকই রহিয়াছে। 'আমি', 'আমার' এসব দিয়া পত্র শুরু করিয়া পরবর্তী ছত্রেই নিজেকে 'এ' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

নিচে নাম লেখা নাই। ভাবখানা এই—দেহাত্মবুদ্ধি যে ছাড়িতে চলিয়াছে, নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য সে কেন আজ আর উৎসুক হইবে? পত্র লেখার বা স্বাক্ষর করার প্রয়োজন যে তাহার চিরতরেই ফুরাইয়াছে।

মাদুরা স্টেশনে আসিয়া বেঙ্কটরমণ খোঁজখবর নিলেন। ট্রেন পৌঁছানোর সময় বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। কি কারণে যেন পথে বিলম্ব ঘটিয়াছিল তাই কোনোমতে উহা ধরিতে পারিলেন। এই বৈরাগী বালকের জন্য পাথেয় ও পরিবহণের ব্যবস্থা কে যেন আগে হইতেই করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৯৬ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখটি বেঙ্কটরমণের জীবনে উন্মোচিত করে নূতনতর অধ্যায়, তিনি হন এক নূতন মানুষ। এ রূপান্তর আসে প্রভু অরুণাচলেশ্বরের করুণায়।

জনবহুল গাড়ির সোরগোল বালকের মনে দাগ কাটিতেছে না, আগামী দিনের চিন্তা নাই, গন্তব্য স্থানের কথা নিয়াও তেমনি নাই কোনো মাথাব্যথা। চলমান ট্রেনের এক কোণে ধ্যানাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন।

ট্রেনের কামরায় উঠিয়া বসার পর বেঙ্কটরমণ শুনিয়াছেন, তাঁহার গন্তব্যস্থলে যাইতে

হইলে ভেলুপুরম জংশনে নামিয়া গাড়ি বদল করিতে হইবে। শেষ রাত্রে তাই ভেলু-পুরমে নামিয়া পড়িলেন। এবার আর এক গাড়িতে চড়িতে হইবে।

ভোর হওয়ামাত্র তিনি স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। ক্ষুধার জ্বালায় পেট চোঁ চোঁ করিতেছে, অথচ সঙ্গে আছে মাত্রাদশটি পয়সা। কাছেই একটা ছোট হোটেলে আহার করিতে গেলেন।

সুদর্শন কিশোরের চোখে কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ রহিয়াছে। হোটেলের মালিক বার বার তাঁহার দিকে তাকায়, উদাস আচরণ লক্ষ্য করিতে থাকে। বেঙ্কটরমণ খাবারের দাম দিলে কি জানি কেন সে উহা ফেরত দেয়।

উদ্বৃত্ত পয়সা দশটি দিয়া তখনি বেঙ্কটরমণ এক টিকিট কিনিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, ট্রেনে যতটা আগাইয়া যাওয়া যায় ততই ভালো। এ টিকিট ছিল মাম্বলপট্টু অবধি। সেখানে পৌঁছনোর পর পদব্রজেই চলিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি আরিয়ানি নেলুরে পৌঁছিলেন সম্মুখে পাহাড়ের গায়ে অতুল্যনাথের মন্দির। সেখান হইতে দূরে দিক্‌চক্রবালে দেখা যায় তাঁহার মানসবিগ্রহ অরুণাচলেশ্বরের দেউল চূড়া।

শ্রদ্ধানতশিরে বেঙ্কটরমণ প্রবেশ করেন অতুল্যনাথের মন্দিরে, বিগ্রহের সম্মুখে বসামাত্র ধ্যানাবিষ্ট হইয়া পড়েন।

তরুণ সাধকের অন্তরসত্তায় জাগিয়া উঠে অলৌকিক, আনন্দময় অনুভূতি। চাহিয়া দেখেন, এক অপরূপ দিব্য জ্যোতির ধারায় সারা মন্দির প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় এই স্বর্গীয় জ্যোতির উৎস, কি ইহার তাৎপর্য, এসব কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। শুধু উপলব্ধি করিলেন, এক অপার আনন্দের ঢেউ তাঁহার সারা দেহ-মন ভাসাইয়া নিয়া চলিয়াছে।

প্রভু অরুণাচলেশ্বর সেদিন এ অপার্থিব আলোকধারার মধ্য দিয়াই পাঠান তাঁহার স্নেহের পরশ!

এই অলৌকিক আলোকরাশি এবার মন্দিরের চারিদিকেও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বেঙ্কটরমণ ভাবেন. তবে কি এ আলো বিগ্রহ হইতেই নিঃসৃত হইতেছে?

ব্যগ্রভাবে তখনি মন্দিরের গর্ভগৃহে ছুটিয়া যান. দণ্ডায়মান হন বিগ্রহের সম্মুখে। কিন্তু আলোক-বিচ্ছুরণ ততক্ষণে থামিয়া গিয়াছে, উৎসস্থলটি তাই নির্ণয় করা গেল না। এবার মন্দিরের এক কোণে বসিয়া গভীর ধ্যানে তিনি ডুবিয়া গেলেন।

বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। কানে প্রবেশ করে পূজারীর কণ্ঠস্বর, "মন্দিরের কোণে, কেগো অমন ক রে বসে আছো? বেরিয়ে এসো, দরজায় তালা দিতে হবে।"

এতক্ষণে বেঙ্কটরমণের হুঁশ হইল। তাই তো! সমস্ত দিন যে তাঁহার কোনো আহার জুটে নাই। ক্ষুৎ-পিপাসায় দেহ অবসন্ন। মুখ ফুটিয়া পূজারীর কাছে কিছু খাবার চাহিলেন।

এই মন্দিরে ভোগপ্রসাদের কোনো ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া, রাত্রে কাহাকেও এখানে

শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। পূজারী কহিলেন, "ওহে, ঐ তো কাছেই রয়েছে বিরাটে-শ্বরের মন্দির, সেখানে যাও—আহার, আশ্রয় দুই-ই মিলবে।"

বিরাটেশ্বরের পূজা ও আরতি চলিতেছে, কিশোর সাধক মন্দিরের এক কোণে গিয়া বসিলেন। আবার তলাইয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে, কোনো হুঁশ রহিল না।

রাত্রি নয়টায় আরতি শেষ হইয়া যায়। এবার ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। ক্ষীণস্বরে দুই-একজনের কাছে কিছু খাবার চাহিলেন। মন্দিরের বাদ্যকর দূরে দাঁড়াইয়া নবাগত এই কিশোরকে লক্ষ্য করিতেছিল। এত অল্প বয়সে এই ধ্যান, তন্ময়তা! এমনটি তো কখনো দেখে নাই! নিজের ভাগের প্রসাদান্ন তখনি তাঁহাকে সে দিয়া দিল।

আহার্য জুটিয়া গেল, কিন্তু ভোজন তো শুরু করা যায় না। কারণ, পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা এখানে নাই। কাছেই এক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীর বাড়ি, সেখানে না গেলে জল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু রমণ তখন ক্লান্তি আর অবসাদে মৃতপ্রায়, নড়িবার কোনো সামর্থ্য নাই। অল্প কিছুদূর হাঁটিয়া গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া তিনি ভূতলে পড়িলেন। চারিদিকে বেশ ভিড় জমিয়া গেল।

চেতনা ফিরিয়া আসিলে রমণ চাহিয়া দেখিলেন, থালাটি মাটিতে গড়াইতেছে। অন্নরাশি চারিদিকে ছড়ানো। ক্ষুধার জ্বালায় কি আর করেন, তাহাই কুড়াইয়া নিয়া খাইতে বসিলেন।

প্রভু অরুণাচলেশ্বরের হাতছানি তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়াছে—পরিণত করিয়াছে এক দীন হীন ভিক্ষুকে। তারপর রাস্তায় ছড়ানো ভাত খুঁটিয়া খাওয়াইয়া তবে প্রভু নিরস্ত হইলেন।

ভোর হইতে না হইতেই আবার যাত্রা শুরু হয়। গন্তব্যস্থল তিরুভান্নামালাই। এখান হইতে বিশ মাইল দূরে। এবার হাতে একটি পয়সাও নাই, সারা পথ পদব্রজেই যাইতে হইবে। দৃঢ় পদক্ষেপে বেঙ্কটরমণ আগাইয়া চলিলেন।

পথঘাট কিছুই জানা নাই, তদুপরি দেহে নামিয়াছে অবসাদ। বার বার মনে হইতে থাকে, এই পথটুকু ট্রেনে যাইতে পারিলেই বাঁচা যাইত। তাছাড়া, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না জুটিলে পথ চলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। কিন্তু তিনি যে কপর্দকহীন!

সহসা মনে পড়িয়া গেল,—তাই তো তাঁহার কানে যে দুই গাছা সরু সোনার কুণ্ডল রহিয়াছে! এই দুইটি বন্ধক দিয়া কয়েকটা টাকা হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা তাঁহাকে দিবে কে? এ অঞ্চলে কেহই তো জানাশোনা নাই।

ক্ষুধার জ্বালা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে। অগ্রসর হইতেই চোখে পড়ে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ি। বাড়ির কর্তার নাম মুথুকৃষ্ণ ভাগবতার। দ্বারে দাঁড়াইয়া বেঙ্কটরমণ কিছু খাবার চাহিলেন।

সেদিন গোকুলাষ্টমী। এই পবিত্র দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ভক্তেরা পালন করে, আর আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়। এ গৃহেও আজ তাই মহা সমারোহ। ভোজের প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। এমনি দিনে অতিথিরূপে দুয়ারে আসিয়াছেন সুন্দর সুঠাম ব্রাহ্মণ কিশোর। বাড়ির বর্ষীয়সী ভাগবতারের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। পরম যত্নে বেঙ্কট-

রমণকে ভোজন করাইতে বসিলেন। শুধু তাহাই নয়, পরমাত্মীয়ার মতো স্নেহভরে কিছু মিষ্টিও পুঁটুলিতে বাঁধিয়া দিলেন।

এই নূতন পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে রমণ ছাড়েন নাই। ট্রেনভাড়া সংগ্রহ করা চাই, এজন্য এক ছলনার আশ্রয় নিলেন।

ভাগবতারকে কহিলেন, রাস্তায় মালপত্র সব হারাইয়া যাওয়ায় তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাই কানের কুণ্ডল দুইটি বাঁধা দিয়া চারটি টাকা সংগ্রহ করিতে চান। এ দুটির দাম নিশ্চয়ই বিশ টাকার কম হইবে না।

ভাগবতার তৎক্ষণাৎ চারটি টাকা দিয়া দিলেন। একখণ্ড চিরকুটে স্বর্ণকুণ্ডলের রসিদও দেওয়া হল রমণকে, যাহাতে এই টাকা শোধ করিয়া নিজের অলঙ্কার তিনি ফেরত নিতে পারেন।

বেঙ্কটরমণ এবার দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে ছুটিলেন। ভাগবতারের দেওয়া রসিদ ইতিমধ্যেই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কে আবার আসিবে এই সোনার কুণ্ডল ফিরাইয়া নিতে?

তিরুভান্নামালাই-এর গাড়ি কিশোর সাধককে সেদিন তাঁহার স্বপ্নলোক অরুণাচল-গিরির পাদমূলে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। এই দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। শুধু বেঙ্কটরমণের জীবনেই নয়, অগণিত মানুষের অধ্যাত্মজীবনেও এ দিন চিরস্মরণীয় হইয়া উঠে। তেবট্টি বৎসরের বিরামহীন তপস্যার মধ্য দিয়া সেদিনকার নবীন সাধক রূপান্তরিত হন রমণ-মহর্ষিরূপে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নরনারী জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এই মহাপুরুষের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হন।

প্রায় দুইমাস কাল বেঙ্কটরমণ সুব্রহ্মণ্যম মন্দিরে অবস্থান করেন। অন্তর্মুখীন ভাব কেবলি বাড়িতে থাকে। সেই সঙ্গে ধ্যান-তন্ময়তা চলিতে থাকে দিনের পর দিন। কখনো থাকেন অর্ধবাহ্য অবস্থায়, কখনো বা নিস্পন্দ চৈতন্যরহিত।

পান, ভোজন প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজনের দিকে কোনো হুঁশই নাই। মন্দিরের উমা-বিগ্রহের অভিষেক-স্নানে দুধ-কলা, হলুদ, চিনি মিশাইয়া তৈরি করা হয় এক তরল বস্তু। গোড়ার দিকে ইহাই অর্ধ-অচেতন কিশোর সাধকের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও রুচি-অভিরুচির সমস্ত প্রশ্নই তাঁহার কাছে সেদিন একেবারে অবান্তর হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর আরও দুটি একটি স্থানে বেঙ্কটরমণ আসন পাতিয়া বসেন, স্থানীয় লোকদের মধ্যে ব্রহ্মণস্বামী নামে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিয়া ভক্ত ও আর্তের দল তাঁহার কাছে সমবেত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া কার্তিকেঈ উৎসবের দিনেই এই তরুণ সাধকের সম্মুখে দর্শনার্থীর ভিড় লাগিয়া যায়। 'তেজোলিঙ্গম' অরুণাচলকে সকলে পরিক্রমা করিতে আসে, আর সেই সুযোগে মৌনী তাপসকেও করে প্রণাম নিবেদন।

অরুণাচলের এমনি এক উৎসবমুখর দিনে, এক ইলুপ্পাই গাছের নিচে কিশোর সাধক বসিয়া আছেন। দূর-দূরান্ত হইতে আগত তীর্থযাত্রীরা দলে দলে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া যাইতেছে। এমন সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন উদ্দণ্ডী নাইনার, ব্রহ্মণস্বামীর—রমণ-মহর্ষির—প্রথম সেবক ও শিষ্য।

বন্দীবাসের কাছাকাছি এক গ্রামে ত্যাগী সাধক নাইনারের জন্ম। অল্প বয়সেই

একটি ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিয়া একান্তে তিনি সাধনা করিয়া আসিতেছেন। সে সাধনায় আজো তাঁহার সিদ্ধি আসে নাই। অন্তরের অতৃপ্তি অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়াছেন, আর ব্যাকুল হইয়া দিকে দিকে করিতেছেন সদগুরুর সন্ধান।

রমণের প্রশান্ত আননের দিকে তাকাইয়াই নাইনার আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। জাগিয়া উঠে বিচিত্র অনুভূতি।

অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন, "প্রভু, এ কি অপূর্ব বিস্ময়! এমন মানুষই যে এতকাল আমি খুঁজে এসেছি। এই তাপসের মধ্যেই যে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তিকে আজ রূপায়িত হতে দেখছি। দেখছি, আত্ম-স্বরূপের সত্যকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই মহাজীবনে।

নাইনার এখানেই থাকিয়া গেলেন। রমণ কিন্তু আগের মতোই রহিলেন মৌনী, নির্বিকার। তত্ত্বের উপদেশ, সাধনার নির্দেশ, কোনো কিছুই তিনি ভক্তকে দেন না। প্রশান্ত গম্ভীর নয়ন হইতে নিরন্তর ঝরে শুধু শান্তির অমৃতধারা। এমন শান্তি, এমন আনন্দ, নাইনার কখনো লাভ করেন নাই। জীবন তাঁহার ধন্য হইয়া গেল।

ইহার পর উপস্থিত হন আন্নামালাই তম্বীরণ। ধ্যানে বিভোর তরুণ সাধক রমণের মধ্যে কোন্ দিব্য বস্তুর সাক্ষাৎ তিনি পাইলেন তাহা তিনিই জানেন।

তম্বীরণ নিজে বিষয়বিরক্ত ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। পথেপ্রান্তরে দিন-রাত ভক্তি-রসাপ্লুত তেবরম্ সংগীত গাহিয়া তাঁহার দিন কাটে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া যাহা পান, দরিদ্রের সেবাতেই প্রায় সবটা সানন্দে বিলাইয়া দেন। তারপর দিনের শেষে শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসেন অরুণাচলে। ইলুপ্পাই গাছের ছায়ায়, কিশোর গুরুর চরণতলে বসিয়া নিবেদন করেন নিজের যত কিছু প্রশ্ন। রমণের আয়ত নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়াইয়া পড়ে তাঁহার দেহে মনে। অধ্যাত্মজীবনের পরম আশ্রয় খুঁজিয়া পান।

তিরুভান্নামালাই-এর উপকণ্ঠে, গুরুমূর্তমে তম্বীরণের নিজ বাড়ি। আগ্রহভরে রমণকে সেখানে তিনি টানিয়া নিয়া গেলেন। লোকের ভিড় এড়ানোর জন্য রমণও ব্যস্ত। তাই কয়েকমাস গুরুমূর্তমে অবস্থান করিতে তিনি আপত্তি করেন নাই। এখানেও আগের মতো চলিত তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত ও ধ্যানতন্ময়তা।

গুরুমূর্তমের মন্দিরেও দুর্ভোগ কম ভুগিতে হয় না। পিপীলিকা ও পোকার অত্যাচার অবিরত চলিতে থাকে। দর্শনার্থীরা ক্ষণেকের তরেও সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, অতিষ্ঠ হইয়া স্থান ত্যাগ করে। আত্মসমাহিত রমণ কিন্তু থাকেন নির্বিকার, দিবারাত্র একই আসনে তিনি উপবিষ্ট থাকেন।

ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাই তো, পোকার কামড় হইতে তাঁহাকে বাঁচানোর উপায় কি?

মন্দিরের কোণে একটা উঁচু কাষ্ঠাসন স্থাপন করিয়া তাহার পায়ার নিচে রাখা হয় জলাধার। এবার সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত, পিঁপড়ে বা পোকার উপদ্রব আর 'স্বামীকে' সহ্য করিতে হইবে না।

কিন্তু আত্মবিস্মৃত সাধক নিজেই নিজের বিপদ বাধাইয়া বসেন। ধ্যানতন্ময় হওয়ার ফলে মন্দিরের দেওয়ালে দেহ হেলিয়া যায়, আর পিঁপড়ের দল তাঁহাকে ছাইয়া ফেলে। তাছাড়া, পোকার কামড়ে ঝরে রক্তধারা, দেওয়ালে দাগ লাগিয়া যায়। এ দাগ বহু বৎসরেও মোছে নাই।

উত্তরকালে মহর্ষির ভক্তেরা এ স্থানটি দেখিতে আসিতেন।

কিশোর সাধকের এই আত্মসমাহিত ভাব দেখিয়া সবাই অবাক। দেহাত্মবুদ্ধি তাঁহার বিলুপ্ত প্রায়, স্নান করার কোনো ধার ধারেন না, শরীরে জমিয়াছে ময়লার পুরু আস্তরণ। আঙুলের দীর্ঘ নখ ও মস্তকের রুক্ষ কেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রাচীন যুগের কোনো তাপস! অচিরে এ অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া যায়। গুরুমূর্তমে অজস্র ভক্ত ও দর্শনার্থী ভিড় করিতে থাকে।

ভক্তেরা লক্ষ্য করিলেন, এখানে আসার পর হইতেই রমণের তপস্যার তীব্রতা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ধ্যানাবেশেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, দিন বা রাত্রির কোনো বোধ তাঁহার নাই।

প্রাণধারণের জন্য পান করেন সামান্য একটু তরল বস্তু। কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে শরীর এত শীর্ণ ও দুর্বল হইয়াছে, অপরের সাহায্য ছাড়া উঠিয়া দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়।

আহারের সংযম ও মৌনব্রত সম্বন্ধে কঠোর হইলেও রমণ কখনো এ সবকে ধর্মাচারণের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন নাই। উত্তরকালে এ সম্বন্ধে বলিতেন, "মৌন অবলম্বনে আমার কোনো সংকল্প ছিল না। আহার সম্বন্ধে এ দেহের প্রয়োজন কম, তাই আমার এ সংযম। তাছাড়া, কারুর সঙ্গে কথা বলার দরকার এ দেহ সে সময়ে অনুভব করেনি, মৌন অবলম্বন করেছিলাম সেজন্যই।"

এ মৌনব্রত আনুষ্ঠানিক কিছু নয়, কিন্তু তবুও এ ধরনের সংযমের উপর তিনি কম গুরুত্ব দিতেন না। তখনকার একটি ঘটনায় ইহার পরিচয় মিলে।

গুরুমূর্তমের এক নির্জন বাগানে সেদিন একলাটি তিনি ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন। আশেপাশে অনেকগুলি তেঁতুল গাছ। তেঁতুল চুরির উদ্দেশ্যে একদল চোর সেদিন বাগানে ঢুকিয়াছে।

কিশোর সাধক এক কোণে ধ্যান করিতেছেন। চোরদের একজন বলিয়া উঠিল, "আরে, এ বালক-সাধু দেখছি ঢঙ্ ক'রে মৌনী হয়ে বসে আছে। কথা বলে কিনা তা দেখতে হবে। চোখের ভেতর বিষ খানিকটা ঢেলে দে, চোখ এখনি যাবে অন্ধ হয়ে। জ্বালার চোটে বাছাধনের মুখে তখন কথাও ফুটবে।"

বলা বাহুল্য, এ কাজ তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়—অবলীলায় যে কোনো ঘৃণ্য অপরাধই তাহারা করিতে পারে। আশ্চর্যের কথা রমণ কিন্তু নির্বিকার হইয়াই বসিয়া আছেন। এ সঙ্কটকালে মুখ দিয়া তাঁহার একটি শব্দও বাহির হইতেছে না।

তস্করের দল কি ভাবিল তাহা কে জানে? অতঃপর কিশোর সাধুর দিকে আর তাহারা তেমন মনোযোগ দেয় নাই। তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজে লাগিয়া পড়ে।

রমণ কিন্তু নীরব, নিস্পন্দ, ধ্যানস্থ। বাগানের সমস্ত গাছ উজাড় করিয়া তেঁতুল পাড়িয়া নিলে যেমন তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তেমনি চোখ দুইটি একেবারে নষ্ট করিয়া দিলেও কিছু যায় আসে না। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য কেন এত ব্যস্ত হওয়া? শুধু শুধু মৌন ভঙ্গ করিতে যাওয়াই বা কেন?

মন হইয়া পড়িয়াছে একেবারে অন্তর্মুখীন। ধ্যানের গভীরে যত ডুবিতেছেন, বাহিরের জীবনের চলাফেরা বাক্যালাপ ততই হইয়া উঠিতেছে নিরর্থক, অপ্রয়োজন। তাই তো সেদিন চক্ষু দুইটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়ও একটিবারের মতো মুখ খুলিলেন না।

সুখের বিষয় বিপদ সেদিন কিছু ঘটে নাই। নিজেদের কুকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া চোরেরা বাগান ত্যাগ করে।

গুরুমূর্তমে অপর যে শিষ্যটি আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহার নাম পলনীস্বামী। জাতিতে মলয়ালী, ভক্তি-নিষ্ঠা অসাধারণ। বিনায়ক বিগ্রহের সেবায় দিনরাত মত্ত হইয়া থাকেন।

সেদিন এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাঁহাকে ডাকিয়া কহেন, "ওহে, সারাজীবন তো এই পাথরের স্বামী নিয়ে কাটিয়ে দিলে। তাতে আর কি লাভ হ'লো? বরং যাও, গুরু-মূর্তমের ঐ জীবন্ত স্বামী'কে দেখে এসো। পুরাণের ধ্রুবের মতোই তাঁর অদ্ভুত তপস্যা! তাঁরই সেবায় প্রাণমন ঢেলে দাও, জীবন সফল হয়ে যাবে।"

সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু তির্যকৃভাবে উহা পলনীস্বামীর মর্মে গিয়া বিঁধিল। দীর্ঘকাল পাষণমূর্তি'র সেবায় দিন কাটিয়াছে, আজ মন চাহিতেছে এক জীবন্ত বিগ্রহের আশ্রয়—পুরাতন নোঙর এবার ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। তরুণ সাধকের কাছে সেইদিনই ছুটিয়া গেলেন। দর্শন করামাত্র হৃদয়ে খেলিয়া গেল এক অপূর্ব ভাবতরঙ্গ। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'ওরে, এই তোর জীবন্ত বিনায়ক'।

এই কিশোর সাধকের পদেই নিজেকে তিনি বিকাইয়া দিলেন, ক্রমাগত একুশ বৎসর তাঁহার সেবায় করিলেন অতিবাহিত।

ভক্তেরা সবাই সেবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু এ সেবা গ্রহণে রমণের সতর্কতার অন্ত নাই। বৈরাগ্যের যে কঠোর রূপ এ জ্ঞানতপস্বীর মধ্যে রূপায়িত, শিষ্যদের সম্মুখে দেখা গেল তাহারই আত্মপ্রকাশ।

শিষ্য তম্বীরণ ছিলেন এক ভাবুক ভক্ত, রমণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। গুরুমূর্তমে থাকিতে একবার তিনি সংকল্প স্থির করেন, রোজ গুরুকে শাস্ত্রানুযায়ী অর্চনা করিবেন। ভোগরাগ, আরতি প্রভৃতি কোনো অঙ্গই এই পূজায় বাদ দেওয়া হইবে না। তম্বীরণ সব উদ্যোগ আয়োজন ঠিক করিয়া ফেলিলেন। কিশোর সাধক রমণের জীবনে আসিল এক নূতন পরীক্ষা।

তম্বীরণের ভাব-কল্পনা ও ভক্তির উচ্ছ্বাস আজ ভুল পথে যাইতেছে, ভক্তপ্রবর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তির স্থলে বাহ্য পূজা অনুষ্ঠানকেই বড় করিয়া তুলিতেছেন। এ ভ্রম হইতে যে তাঁহাকে রক্ষা করা দরকার। রমণ তাই তাঁহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন।

তম্বীরণ সেদিন গুরুর জন্য ভোগান্ন নিয়া আসিয়াছেন। মন্দিরে ঢুকিতেই দেওয়ালের দিকে চোখ পড়িল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

কয়লার কালি দিয়া রমণ লিখিয়া রাখিয়াছেন, "এ দেহের জন্য দরকার শুধু এই খাবারটুকুই।

তামিল ভাষায় কথা কয়টি লেখা। লেখকের সংকল্প ও দৃঢ়চিত্ততা ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা গেল, দেহধারণের জন্য যেটুকু সামান্য আহার্য প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কিছু এই কিশোর তাপস গ্রহণ করিতে রাজী নন। বলা বাহুল্য, তম্বীরণের চৈতন্যোদয় হইল। সেদিন হইতে রমণকে পূজা করার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।

ঐ কয়েক ছত্র লেখার মধ্য দিয়া সেদিন কিন্তু একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ হইয়া

পড়ে। এই প্রথম ভক্তগণ জানিলেন, রমণ ভাল তামিল লিখিতে পারেন। তবে কি তাঁহার মাতৃভাষা তামিল? তাই যদি হয়, পূর্বাশ্রমের গৃহ কোথায়?

ভক্ত বেঙ্কটরমণ নাইনার কিন্তু এ রহস্য ভেদ করিতে সেদিন বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। সোজাসুজি তিনি জানাইয়া দিলেন, "স্বামী, আপনার প্রকৃত পরিচয় আজ আমায় জানতেই হবে, নইলে এখান থেকে এক পা'ও আমি নড়ছিনে, কেউ আমায় আহার গ্রহণ করাতেও আর পারবে না। হ্যাঁ, এই আমার দৃঢ় পণ।"

নাইনার এক প্রবীণ ভক্ত। তাঁহার এ পণ রমণকে সেদিন টলাইয়া ছাড়িল। নিজের পরিচয় জানাইয়া ইংরেজী অক্ষরে সংক্ষেপে লিখিয়া দিলেন, "বেঙ্কটরমণ, তিরুচুঝি।"

এই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্রটি ধরিয়াই অতঃপর তাঁহার সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কিশোর সাধুর কাছে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়ায় যে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁহার চারিদিকে বাঁশের এক দৃঢ় বেষ্টনী বাঁধিয়া দিতে হয়।

ভক্তদের দুশ্চিন্তা বাড়িতে থাকে। কি করিয়া ভিড় এড়ানো যায়? 'স্বামী' কঠোর তপস্যাপরায়ণ, কোনো একটা নিভৃত জায়গায় তাঁহাকে না সরাইলে বিপদ। ভক্ত বেঙ্কটরমণ নাইনার প্রস্তাব করিলেন, 'স্বামী'কে তাঁহার আম্রকাননে নিলে কেমন হয়? রমণ সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, নাইনারের ঐ বাগানে, দুইটি ক্ষুদ্র কুঠরীতে, রমণ ও তাঁহার সেবক-শিষ্য পলনীস্বামী বাস করিবেন। মালীর প্রতি নির্দেশ থাকিবে, সেবকের অনুমতি ছাড়া 'স্বামী'র সহিত কাহাকেও দেখা করিতে দেওয়া হইবে না।

প্রায় ছয়মাস এই আম্রকাননেই রমণ অবস্থান করেন। বড় নিভৃত এ বাগানটি। একান্তে সাধন-ভজন করা ছাড়া আরও একটি সুযোগ এখানে তিনি প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রপাঠের উপযুক্ত অবসর মিলিয়া যায়। দেশ বিদেশের অগণিত জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু লোকের সংস্পর্শে উত্তর-জীবনে তাঁহাকে আসিতে হইবে, সেই আচার্য জীবনের প্রস্তুতি সেদিন শুরু হইয়া যায়।

পলনীস্বামীর জ্ঞানস্পৃহা বড় প্রবল। প্রায়ই এই নিভৃত স্থানে তিনি ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের নানা গ্রন্থ আনয়ন করেন। এগুলির অধিকাংশই তামিলে রচিত, অথচ সে ভাষা তাঁহার তেমন জানা নাই। বড় কষ্ট করিয়া এ সব গ্রন্থ তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হয়।

রমণের মন ভিজিয়া যায়, নিজেই তিনি ভক্তকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। জীবনে কখনো শাস্ত্র অধ্যয়নের ধার ধারেন নাই। তাই তামিল ভাষায় লিখিত বইগুলি তাঁহার কাছে পড়িয়া শোনানো হয়, আর তিনি এগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকেন নিজের সাধনোজ্জ্বল বুদ্ধির সাহায্যে।

এদিকে কিশোর সাধক রমণের সংবাদ তাঁহার আত্মপরিজনের কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

বড় কাকা সুব্বিয়ার ইতিমধ্যে পরলোকে গিয়াছেন। ছোটকাকা নেলিয়াপ্পীয়ের সংবাদ পাইয়াই তিরুভান্নামালাই-এ উপনীত হইলেন। নাইনারের বাগানে প্রবেশ করিয়া বেঙ্কটরমণের যে চেহারা তিনি দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কুন্তলরাশি,

মৌনী সাধকের পরনে কৌপীন, মাথার সবটা চুলে জট পাকাইয়া গিয়াছে। প্রস্তর-মূর্তি'র মতো নিস্পন্দ হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। নয়নের দৃষ্টি আশেপাশে কোথাও পড়ে না, কোন্ দুজ্ঞে'র লোকে উধাও হইয়া গিয়াছে?

নেল্লায়াপ্পায়ের নিজে উকিল। কিন্তু এই মৌনী ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তাঁহার সমস্ত কিছু যুক্তিতর্ক সেদিন ব্যর্থ হইয়া গেল। স্পষ্টরূপে বুঝিলেন, তাঁহাদের বেঙ্কটরমণের জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আর তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। দেশে গিয়া তাঁহার মাকে সব কথা নিবেদন করিলেন।

নাইনারের নিভৃত আম্রকানন রমণ এবার ত্যাগ করিলেন। অপরের সেবা গ্রহণে চিরকালই তাঁহার বিতৃষ্ণা, এইবার তাহা চরমে উঠিল। স্থির করিলেন, নিজেই দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবেন। শিষ্য পলনীস্বামীকে জানাইয়া দিলেন, আর তাঁহাদের একত্র থাকা চলিবে না। ভিক্ষা সংগ্রহের জন্যে উভয়ে স্বেচ্ছা-মতো ঘুরিয়া বেড়াইবেন।

এ কি নিষ্ঠুর কথা! ভক্ত পলনীস্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এই তরুণ তাপসের মধ্যে যে তিনি তাঁহার একমাত্র আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এবার কি নিয়া তিনি বাঁচিবেন?

সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর রাত্রিতে পলনীস্বামী রমণের কাছেই ফিরিয়া আসিল। নয়নে তাঁহার অশ্রুধারা!

ভক্তের করুণ ক্রন্দনে রমণের সংকল্পের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়ে। পলনীস্বামী পূর্ববৎ তাঁহার সাথেই রহিয়া যান, কিন্তু রমণ তাঁহার নিজের ভিক্ষাব্রত রাখেন অব্যাহত।

তাঁহার ভিক্ষা করার ধরনটি বড় অদ্ভুত; গৃহস্থবাড়ির সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সদাই মৌন থাকেন, তাই মুখে কোনো কথা না বলিয়া করতালির শব্দে নিজের আগমন ঘোষণা করেন। ভিক্ষা নিয়া কেহ সম্মুখে আসিলে, উহা গ্রহণ করেন অঞ্জলি পাতিয়া। অনুরোধ বা অনুনয়-বিনয় করিয়া এই বৈরাগী যুবককে গৃহের ভিতরে নেওয়া যায় না। রাস্তায় দাঁড়াইয়াই তিনি ভিক্ষান্ন মুখে পুরিয়া দেন, তারপর তাড়াতাড়ি নিজ আসনে গিয়া হন ধ্যানস্থ।

পুত্রের সংবাদ শুনার পর জননী আলাগাম্মল স্থির থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া নিবার জন্য পাগলিনীর মতো আসিয়া উপস্থিত হন। রমণ তখন অরুণাচলের পার্শ্বস্থিত গিরিচূড়া পাবাঝাকুন্নুতে সাধনার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। সাধুবেশী কিশোর বেঙ্কটরমণকে চিনিয়া ফেলিতে সেদিন কিন্তু মায়ের এক মুহূর্তও দেরি হয় নাই।

এবার শুরু হয় ক্রন্দন আর অশ্রুবর্ষণের পালা। জননী বার বার কহিতে থাকেন, সন্ন্যাসজীবনের এ কঠোরতায় কি তাঁহার প্রয়োজন? কোমল দেহে এ কষ্ট সহিবেই বা কেন? না—প্রাণ থাকিতে তিনি তাঁহার নয়নমণিকে এখানে ফেলিয়া যাইবেন না।

জননী কিন্তু বৃথাই কাঁদাকাটি করিতেছেন। তাঁহার কথার এতটুকুও কি ধ্যান-পরায়ণ পুত্রের কানে পশিতেছে? প্রস্তরমূর্তি'র মতো রমণ নির্বাক নিশ্চল হইয়া আছেন। মায়ের এত আর্তি ও অশ্রুজল তাঁহার মৌন ও প্রশান্তি ভাঙিতে পারিল না।

আলাগাম্মলও সহজে পুত্রকে ছাড়িবেন না। দিনের পর দিন তাঁহাকে বুঝাইতে

থাকেন। নানা রুচিকর খাদ্য রাঁধিয়া আনিয়া স্নেহের পুত্তলীকে ভোজন করান। কিন্তু রমণ পূর্ববৎ নির্বিকার।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন আলাগাম্মলের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। পুত্রের একি অদ্ভুত নিস্পৃহ, উদাসীন ভাব ? এ যে অসহ্য ! ক্ষোভে দুঃখে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। ভক্তদের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওগো, তোমরা কি আমায় সাহায্য করবে না ? আমার অঞ্চলের নিধিকে কি আমার ঘরে ফিরিয়ে নিতে দেবে না ?"

বড় মর্মস্পর্শী জননীর এ ক্রন্দন! জনৈক ভক্তের হৃদয় গলিয়া গেল। রমণকে অনুনয় করিয়া কহিলেন, "মা এমন করে কাঁদছেন, এত অনুরোধ করছেন। হ্যাঁ বা না একটা উত্তর তো ওঁকে দেওয়া উচিত ? এই যে কাগজ পেন্সিল রয়েছে। 'স্বামী' দয়া ক'রে তাঁর মতটা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিন না।"

লেখা হইতে যে বক্তব্য জানা গেল, তাহা যেন কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়। রমণ লিখিলেন, "প্রারব্ধ বা পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মফল অনুযায়ীই বিশ্বনিয়ন্তা নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন জীবের ভাগ্য। যা ঘটবার নয়, তা কিছুতেই ঘটবে না—শত চেষ্টাতেও না। আর যা ঘটবার তা শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও ঘটতে বাধ্য। এ একেবারে নিশ্চিত। কাজেই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে মৌন হয়ে থাকা !"

ঘরে তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন কিনা, সে সম্বন্ধে হ্যাঁ বা না—কোনো কিছুরই উল্লেখ নাই।

আলাগাম্মল ও নাগস্বামী বুঝিলেন, তাঁহাদের বেঙ্কটরমণ আজ রূপান্তরিত হইয়াছে এক নূতন মানুষে। ঘরের দিকে তাঁহাকে আর ফিরানো যাইবে না। ক্ষুন্নমনে উভয়ে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিরুভান্নামালাইতে আসার পর প্রায় আড়াই বৎসর গত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসর রমণের জীবনে রচনা করিয়াছে এক বিশিষ্ট অধ্যায়। কৃচ্ছ্র, ত্যাগনিষ্ঠা ও ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়াই বেশীর ভাগ সময় তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে। ধ্যানের গভীরে, আত্মার গভীরে, ধীরে ধীরে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন। কখনো বৃক্ষতলে, কখনো বা মন্দিরের নিভৃত কোণে চলিয়াছে তাঁহার নিগূঢ় সাধনা।

উত্তরকালে এ সময়কার কথাপ্রসঙ্গে রমণ ভক্তদের বলিতেন, "দিন রাতের সংবাদ এ সময়ে এটা (দেহ) প্রায়ই রাখতো না। এক একদিন ধ্যানাবেশের পর চোখ মেলে দেখতাম—প্রভাত হয়েছে। কোনো কোনোদিন দেখা যেত, সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। সূর্য কখন ওঠে, কখনই বা অস্ত যায়, তার সংবাদ রাখবার মতো মনের অবস্থা এর (দেহের) তখন একেবারেই ছিল না।"

এই কঠোর সাধনার ফলও অচিরে ফলিয়া যায়। রমণের জীবনে আসে সিদ্ধি, আসে অপরূপ আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এবার কৃচ্ছ্রসাধন ও নিভৃত তপস্যা তিনি ত্যাগ করেন, আসিয়া দাঁড়ান জীবনের প্রকাশ্য রাজপথে। জন-সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা এখন আর নাই। দর্শনার্থী ও ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টির সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন। অনশন ও অর্ধাশনের দিকে আজকাল আর ঝোঁক

নাই। নিয়মিতভাবেই তাঁহাকে আহার করিতে দেখা যায়। তপস্যাযুগের শেষে এবার শুরু হইয়াছে তাঁহার আচার্য জীবন।

জননী চলিয়া যাওয়ার কিছুকাল পরেই রমণ অরুণাচল পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিলেন। এই পবিত্র গিরির বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজিত রহিয়াছেন বহু সাধনগুহা, এখন হইতে এইসব গুহায় এক এক সময়ে তিনি অবস্থান করেন। সঙ্গে থাকে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদল।

দেবতাত্মা অরুণগিরি! অনির্বচনীয় ইহার মহিমা! অপরূপ মৌনের মধ্য দিয়া এ পর্বতের আশীর্বাণী যুগে যুগে বিস্তারিত হইতেছে, ভক্ত সাধকদের জীবনে আনিয়াছেন পরম কল্যাণ।

আচার্য শঙ্কর অরুণাচলকে আখ্যা দিয়াছে—মেরুপর্বত। স্কন্দপুরাণ ইঁহাকে চিহ্নিত করিয়াছেন মহাদেবের হৃদ্‌ক্ষেত্ররূপে।

বহু ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ও শৈব সিদ্ধের তপস্যার আলোকে এই পর্বত পবিত্রীকৃত। রমণ মহর্ষি অরুণাচল সম্পর্কে উত্তরকালে শিষ্যদের বলিতেন,—"যুগ-যুগান্তের ধারা বেয়ে এঁর কন্দরে কন্দরে সিদ্ধগণ বাস করেছেন, আজিকার দিনেও তাঁরা রয়েছেন।"

দাক্ষিণাত্যের পুরাণে অরুণাচলের মহিমার নানা বর্ণনা আছে।—সাধকদের হিতের জন্য এক সময়ে মহেশ্বর এই পবিত্র তীর্থে আবির্ভূত হন। জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা স্তম্ভরূপে তাঁহার প্রকাশ ঘটে। আদি-অন্তহীন এই জ্যোতিস্তম্ভ। আয়তন মাপতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মাও নাকি হার মানিয়া যান। এ লিঙ্গের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় নয়ন ধাঁধিয়া যায়, দেব বা মানব কেহই এদিকে তাকাইতে পারেন না। অবশেষে মহেশ্বরের করুণা জাগিয়া উঠে। সর্বলোকের কল্যাণের জন্য, নয়নগ্রাহ্যরূপে অরুণাচলের আকার তিনি ধারণ করেন।

দেবাদিদেব বলেন, "এই মহাতীর্থে আমি এই আকার গ্রহণ করেছি আমার ভজনকারী সাধক ও সিদ্ধদের সুবিধার জন্য। এই অরুণাচল মরজগতের প্রণবস্বরূপ। প্রতি কার্তিকেই উৎসবে আমি এ পর্বতের চূড়ায় আবির্ভূত হবো পরাশান্তির উৎসরূপে।"

অদ্বৈতবাদী সাধকদের প্রিয় তীর্থ এই পবিত্র গিরি। শৈবাচার্যদের সাধনস্থল হিসাবেও ইহার প্রসিদ্ধি কম নয়।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক রমণ তাঁহার ধ্যানের ধন, অরুণাচলের স্তবগাথা রচনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"হে প্রভু, একান্ত মনে আমি যে তোমারই অনুধ্যান করছিলাম, তাই তো তোমার কৃপার জালে আমি পড়েছি ধরা। ঠিক যেমন ক'রে মাকড়সা যায় জড়িয়ে, তেমনি তোমার মধ্যে রেখেছ আমায় বন্দী ক'রে তোমার পরম ক্ষণটিতে আমায় তুলে নেবার জন্যে।··

"আমায় মিলিয়ে নাও তোমার মহাসত্তায়। নইলে যে অশ্রুর নদীতে ডুবে ঘটবে আমার মরণ, তারপর এ দেহ গলে মিশে যাবে তার জলধারায়!"

১৮৯৬ সালের প্রথম ভাগ। অরুণাচলের বিরূপাক্ষ গুহায় রমণ তাঁহার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। প্রণব অক্ষরের মতো এই গুহাটির আকৃতি; ঐতিহ্যও এখানকার

কম নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সিদ্ধ সাধক বিরূপাক্ষদেবের দেহাবশেষ এখানে রক্ষিত আছে, এজন্যও সাধকেরা এই শৈলগুহাকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন।

শুধু শিবরাত্রি ও কার্তিকেয়ী উৎসবেই যে এখানে দর্শনার্থীদের ভিড় হয় তাই নয়, সারা বৎসরই তরুণ 'স্বামী'র এই গুহায় বহিয়া যায় জনস্রোত।

এই গুহাটি ছিল স্থানীয় বিরূপাক্ষ মঠের পরিচালনাধীনে। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে এখানে লোকের ভিড় জমিয়া যায়, কিশোর স্বামীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অরুণাচল যাত্রীরা দলে দলে আসিয়া জুটে। মঠের কর্তৃপক্ষ ভাবিলেন, আয় বাড়ানোর এ সুযোগ তো ছাড়া ঠিক নয়। যাত্রীদের উপর তাঁহারা দর্শনী-কর বসাইয়া দিলেন।

রমণের কানে উঠিল এই কর আদায়ের কথা। গরীব লোকের উপর এই অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে রাজি নন, প্রতিবাদ জানাইয়া তখনি বিরূপাক্ষ গুহা ত্যাগ করিলেন। এবার মঠাধ্যক্ষদের চৈতন্য হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তরুণ 'স্বামী' স্থানত্যাগ করায় সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। তাই দর্শনী-প্রথা তাড়াতাড়ি উঠাইয়া দিয়া রমণকে তাঁহারা ফিরাইয়া আনিলেন।

দর্শনার্থী ও ভক্তেরা যে ফলমূল ও দুধ আনয়ন করে, তাহাই হয় 'স্বামী' ও তাঁহার সেবক-শিষ্যদের দৈনিক আহার্য। যেদিন যাহা জুটে, সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া খান।

ভক্ত সমাগম প্রতিদিন সমান হয় না। লোকজন কম আসিলে ভেটও তেমনি আসে সামান্য পরিমাণ। অথচ গুহাস্থিত আশ্রমে সাঙ্গোপাঙ্গদের সংখ্যা সে সময়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এতগুলি লোকের আহারের ব্যবস্থা করা কম দায়িত্বের কথা নয়। পলনীস্বামী প্রভৃতি তাই ভিক্ষার জন্য পাহাড়ের নিচে চলিয়া যান, শঙ্খ বাজাইয়া শহরের পথে পথে খাদ্য সংগ্রহ করেন।

এক ভক্ত সেদিন রমণের কাছে আব্দার ধরিলেন, নগর ভিক্ষার জন্য একটি শক্তি-সংগীত রচনা করিয়া দিতে হইবে। রমণ রাজী হইলেন, রচিত হইল তাঁহার প্রসিদ্ধ স্তবমালা—অক্ষর-মনমালাই। এ স্তবের মধ্য দিয়া প্রভু অরুণাচলেশ্বরের চরণে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণের আকুতি। ভাবকল্পনা ও ভক্তিরসের দিক দিয়া এ রচনা অপূর্ব।

অরুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে একদিন ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে। সেই অরুণাচলেরই কোলে বসিয়া চলে তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের ত্যাগ বৈরাগ্যময় তপস্যা।

মৌনী মহাশিব, দক্ষিণামূর্তির এক তেজোময় রূপ এই অরুণাচল। সাধক রমণের দৃষ্টিতে এই দিব্য রূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। দিনের পর দিন। তাই তো এই পবিত্র পাহাড়ের পরিক্রমাকে তিনি মনে করেন এক পবিত্র ব্রত স্বরূপ।

পরিক্রমণ প্রসঙ্গে এক অলৌকিক কাহিনী মহর্ষি রমণ উত্তরকালে বিবৃত করিতেন—

সেবার এক বর্ষীয়ান্ ভক্ত অরুণাচল পর্বত পরিক্রমা করিতে আসিয়াছে। পা দুইটি তাহার দীর্ঘদিন যাবৎ রহিয়াছে পঙ্গু। পর্বত সানুদেশের সমতল রাস্তা ধরিয়া কোনো-মতে সে লাঠিতে ভর দিয়া চলিয়াছে। খঞ্জ বলিয়া অনেক কষ্ট, অনেক গঞ্জনা তাহাকে সহিতে হয়। আজ ঠিক করিয়া আসিয়াছে, গিরি-প্রদক্ষিণ শেষ হইলেই চিরতরে সে দেশত্যাগী হইবে। আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকা আর নয়।

পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সুন্দর সুঠাম মূর্তি। অঙ্গে দিব্যকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিলেই মন সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠে।

কাছে আসিতেই ব্রাহ্মণ অদ্ভুত আচরণ করিয়া বসিলেন। খঞ্জ লোকটির হাতের দণ্ডটি করিলেন দূরে নিক্ষেপ। কহিলেন, "ওহে, এবার এসব ফেলে দাও, আর এ দিয়ে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

খঞ্জ চমকিয়া উঠিল। এ কি অদ্ভুত আচরণ এই ব্রাহ্মণের কিন্তু পরক্ষণে বিস্ময় তাহার চরমে পৌঁছিল। কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় ইন্দ্রজাল বলে দেখিতে দেখিতে পঙ্গু পা দুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়া দিল, 'ওরে, অরুণাচলেশ্বরের কৃপায় যে তোর খঞ্জত্ব মোচন হয়েছে। এবার দৈহিক বিকলতা থেকে চিরতরে পেলি মুক্তি।'

তিরুভান্নামালাই এ জীবনে আর সে ত্যাগ করে নাই।

প্রাচীন পুরাণগাথায় আছে এই জাগ্রত শৈলের অধিষ্ঠাতৃপুরুষ অরুণগিরি যোগীর উল্লেখ। পর্বতের কোলে এক বিশাল বটবৃক্ষের মূলে এই সূক্ষ্মদেহী করুণাঘন মহাযোগী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন। আর ইঁহার প্রদত্ত অলৌকিক 'মৌন দীক্ষা' যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অরুণাচলের সাধকেরা প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ হয় তাঁহাদের আত্মজ্ঞানের সাধনা। পুরাণশাস্ত্র ও জনশ্রুতি চিরকাল এ কাহিনীই প্রচার করিয়া আসিতেছে।

সাধক রমণের জীবনেও পুরাণের এ কাহিনী একদিন সত্য হইয়া দাঁড়ায়, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। অরুণগিরি-যোগীর করুণাধারায় তিনি অভিষিক্ত হন।

১৯০৬ সালের কথা। রমণ মহর্ষি একদিন পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।[১] হঠাৎ দেখিলেন, অদূরে প্রকাণ্ড একটি বটের পাতা পড়িয়া আছে। খুব বিস্মিত হইয়া গেলেন। একি অদ্ভুত ব্যাপার? বটগাছ তো অরুণাচলের কোথাও নাই। তবে এই পাতা কোথা হইতে আসিল?

কৌতূহলভরে আরো অগ্রসর হইলেন। পথ দুর্গম, প্রস্তরাকীর্ণ। কিছুটা দূরে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সত্যই দূরে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ। আরো আশ্চর্যের কথা, কঠিন প্রস্তরের উপরই এটি গজাইয়া উঠিয়াছে। এখানে এমনভাবে বনস্পতির আবির্ভাব! এ কেমন রহস্য?

রমণ সাগ্রহে এই বৃক্ষটিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক ঝাঁক বোলতা তাঁহার পায়ে কামড়াইয়া ধরে। পাষাণ স্তূপের আড়ালে এই বোলতার চাক লুকানো ছিল, অজ্ঞাতে তিনি উহা পা দিয়া মাড়াইয়া ফেলিলেন। মনে মনে বুঝিয়া নিলেন ঐ অলৌকিক বটবৃক্ষের সান্নিধ্যে কেহ যাক্, ইহা অরুণাচলেশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যদের নিকট এই অদ্ভুত বৃক্ষের কাহিনী তিনি বিবৃত করেন। বলা বাহুল্য, এ কথা শোনামাত্র অনেকেই উহা দেখার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও এই বটবৃক্ষের সন্ধান আশ্রমবাসী ভক্তেরা পান নাই। হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তেমনি উহা অন্তর্হিত হয়।

১ মহর্ষি রমণ: অসবোর্ন

অরুণগিরির 'মহাযোগী'-ই কি ঐ অলৌকিক বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া ছিলেন? রমণকে সেদিন কি মৌন দীক্ষা দিয়া গেলেন?

অরুণাচল পরিক্রমায় রমণের বরাবরই মহা উৎসাহ। নির্জন আঁকা-বাঁকা পথ পাহাড়ের কোলে কোলে উঠিয়া গিয়াছে। প্রায়ই তিনি লাঠি হাতে নিয়া পরমানন্দে এ পথে পদচারণা করিয়া ফিরেন। এখানকার প্রতিটি গুহা, গিরিচূড়া ও পাষাণস্তূপের সহিত যে তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তা।

রমণ সেদিন পার্বত্য পথে ভ্রমণ করিতেছেন। চারিদিকে বনজঙ্গল। পথের বাঁকে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, অদূরে এক বৃদ্ধা নারী শুক্‌নো কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিতেছে। পরনে তাহার জীর্ণ, ময়লা, একখানা শাড়ি। নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক বলিয়াই মনে হয়।

কাছে যাইতেই বৃদ্ধা তাঁহাকে তীক্ষ্ণস্বরে গালাগালি দিতে থাকে। খ্যাতনামা মহাপুরুষ হইলে কি হয়, রমণ যেন এই রমণীরই এক সমশ্রেণীর লোক। আচরণে তাহার ভয় বা সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তিরস্কারের পর যে কথা কয়টি সে বলিল তাহা শুনিয়া রমণ হতবাক্ হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধা তাঁহাকে শাসাইয়া বলিতে থাকে, "কেনরে, যম কি তোকে ছোঁয় না? শ্মশানে গিয়ে পুড়ে মরতে পারিস না? বল্ দেখি, কেন তুই রোদ্রে এমন করে শুধু শুধু ঘুরে মরছিস? আচ্ছা, চুপচাপ একটা জায়গায় তুই বসে যেতে পারিস না?"

কে এই রহস্যময়ী বৃদ্ধা নারী? পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণীর অধিকার নিয়া অবলীলায় সে গালিগালাজ করিতেছে, তপস্বী রমণকে তাঁহার ঘোরাফেরা কমাইতে বলিতেছে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষকে কড়া কথা বলিতে একটুও তাহার বাধিল না? বড় অদ্ভুত এ আচরণ!

রমণের মুখে এ কাহিনী শুনিয়া ভক্ত ও শিষ্যগণ বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। বার বার সকলে প্রশ্ন করিতে থাকেন, কে এই বৃদ্ধা?

উত্তর হয়, "ইনি সাধারণ নারী নন, এমন কি মানবীও নন। কে ইনি, তা কে বলতে পারে?"

শিষ্যগণ কিন্তু ধরিয়া নেন, এটি অরুণাচলেশ্বরেরই অলৌকিক লীলা। আরো আশ্চর্যের কথা, এই ঘটনার পর হইতে রমণ তাঁহার পর্বতে বেড়ানোর অভ্যাস ছাড়িয়া দেন। বৃদ্ধার সেদিনকার ঐ নির্দেশ তিনি অরুণাচলের কল্যাণময় বাণীরূপেই গ্রহণ করেন।

বালক বয়সে মৃত্যুর অনুভূতি রমণের জীবনে একদিন অধ্যাত্ম-সাধনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অনুরূপ অনুভূতি তাঁহার জীবনে কিন্তু আরও কয়েকবার আসিয়াছে, আত্মসত্তার গভীরতর স্তরে তাঁহার সমগ্র চেতনাকে ঠেলিয়া নিয়া গিয়াছে।

১৯১৮ সালের এক স্নিগ্ধ প্রভাত। রমণ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ পাচায়াম্মান-কয়েল নামক স্থান হইতে গুহায় ফিরিতেছেন হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার সমস্ত শরীর শিথিল, অবসন্ন হইয়া পড়ে। রমণ বলিয়াছেন—

"সারা বহির্জগতের দৃশ্য অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর চোখের সামনে নেমে এলো একটি সাদা পর্দা, যা আমার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে দিল। যে ক্রমিক পর্যায়ে ব্যাপারটা

এগিয়ে আসছিল, তা আমি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। গোড়ার দিকে ঐ পর্দা এগিয়ে এলো সামনের দৃশ্যগুলোকে কিছুটা ঢেকে। আমি থমকে গেলাম। আছাড় খাবো—এই ভয়ে পথচলা বন্ধ করে দিলাম। তারপর এ ধাক্কাটা চলে গেল। আমি আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম। এরপর আমার চোখের সামনে অন্ধকার এলো ঘনিয়ে। বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে তখন চলে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা কেটে না যাওয়া অবধি একটা বড়ো প্রস্তরখণ্ডের উপর আমি হেলান দিয়ে বসে রইলাম।

"আবার তৃতীয়বার এলো চৈতন্য অবলুপ্তির পালা। পাথরটির সামনে আমি বসে পড়লাম। ঐ সাদা পর্দাটি আমার দৃষ্টিকে একেবারে ঢেকে দিল। রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া দুই ই তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শরীরের বর্ণ হয়ে গেছে কৃষ্ণাভ নীল। সঙ্গী বাসুদেব শাস্ত্রী তো ভেবে নিয়েছে, আমি আর বেঁচে নেই। দু হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে সে তখন শুরু করেছে শোকের কান্না।

"এই অবস্থায়ও কিন্তু আমার চেতনার ধারাটি ছিল অব্যাহত। দেহের শেষ অবস্থা দেখে ভয় বা দুঃখের মনোভাব আমার হয় নি। আমি আমার অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই আসন ক'রে বসেছিলাম, প্রস্তরখণ্ডের ওপরে হেলান দিয়ে বসবার প্রয়োজন হয় নি। রক্তস্রোত, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ! অথচ সে সময়ে উপবেশনের ভঙ্গীতে অবস্থান করতে এ দেহের কোনো অসুবিধা হয় নি।

"এ অবস্থায় পনের মিনিট কেটে যায়। তারপর সারা দেহের ওপর এক আকস্মিক তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সবেগে রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাস। প্রতি রোমকূপ হতে প্রবলভাবে ঘাম বেরুতে থাকে। এরপর শরীরের রং সজীব দেহের মতোই আবার হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। একসঙ্গে রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসরুদ্ধ হবার অভিজ্ঞতা আমার দেহে এই প্রথম।"

এ অনুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা সহজ নয়, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া যে রমণের জীবনে সুদূর প্রসারী হয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই মৃত্যু-অনুভূতি সম্বন্ধে শিষ্য মহলে নানা জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয়। সে সময়ে তাহাদের সকল কিছু কূটতর্কের অবসান ঘটাইয়া রমণ বলেন, "দ্যাখো, এই অনুভূতি আমার নিজের ইচ্ছায় উদ্ভূত হয় নি। মৃত্যু ঘটলে এই দেহের কি অবস্থা হবে, তা বুঝবার জন্যও নিজে থেকে আমি এর অবতারণা করি নি। এরূপ অভিজ্ঞতা আগেও আমার মাঝে মাঝে হয়েছে। কিন্তু এবারে এর তীব্রতা ও গুরুত্ব ছিল অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশী।"

অতঃপর তপস্বী রমণের জীবনে জ্বলিয়া উঠে পরম সত্যের আলোক, আত্মজ্ঞানের সাধনায় হন তিনি সিদ্ধকাম। ধীরে ধীরে মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আসিয়া জুটে একদল মুক্তিকামী সাধক। এই সাধকদের কৃপা বিতরণ করিতে গিয়া উত্তরকালে মহর্ষি রমণের জীবনে প্রকটিত হয় বহুতর লীলা।

শেষিয়ার এই ভাগ্যবান্ সাধকের অন্যতম। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা মিটানোর জন্য রমণকে অনেক সময় নানা তত্ত্বোপদেশ দিতে হইত। এ সময়ে আচার্য শঙ্করের বিবেক চূড়ামণির কিছুটা অংশ নিজেই তিনি তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

শিবপ্রকাশম পিল্লেই ছিলেন এক নিরভিমান, পবিত্রচেতা সাধক। তাঁহার জীবনে সে সময়ে আসে এক জটিল সমস্যা। স্ত্রী হঠাৎ মারা যাওয়ায় পিল্লেই মহা ফাঁপরে

দাঁড়াইয়াছেন। বরাবরই সন্ন্যাস জীবনের উপর তাঁহার ঝোঁক। এবার এ সুযোগে কি ঘর ছাড়িবেন, না আবার বিবাহ করিয়া ঘর সংসার ও ধর্মকর্ম এক সঙ্গে করিবেন, কোনো কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তাই রমণের নিকট তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রশ্নটি উত্থাপন করার সুযোগ আর হইতেছে না।

পিলেই একদিন নিজেই ঠিক করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ করার সত্যসত্যই কোনো প্রয়োজন তাঁহার নাই। সংসারের বন্ধন যখন খসিয়াই পড়িয়াছে আর তাহাতে জড়ানো কেন? তাছাড়া, রমণ-স্বামীর জীবন্ত উদাহরণ তো তাঁহার সম্মুখেই রহিয়াছে।

অনর্থক দেরি করিয়া লাভ নাই, এবার দেশে ফিরিয়া যাওয়া দরকার। সেদিন অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রমণের সম্মুখে পিলেই বসিয়া আছেন, সহসা চোখে ভাসিয়া উঠিল এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখিলেন, মহর্ষির মুখমণ্ডলের চতুর্দিক দিব্যজ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত। আরও এক দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইলেন—রমণের শিরোদেশ হইতে এক স্বর্ণকান্তি শিশু বাহির হইয়া আসিতেছে, আর ভিতরে ঢুকিতেছে। দুই-তিন বার এ দৃশ্য তাঁহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল।

কেন এ অলৌকিক দর্শন, কি ইহার তাৎপর্য, পিলেই কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু অন্তস্তলে একটা নাড়া পড়িয়া গেল। বুঝিলেন সত্যকার এক শক্তিধর মহাপুরুষের আশ্রয়েই তিনি আছেন, তাঁহার সকল সমস্যার ভারও রহিয়াছে তাঁহারই উপর। তবে শুধু শুধু এ দুশ্চিন্তা কেন? সত্যিই তো। তাঁহার মতো এমন সৌভাগ্য কয়জনের? ভাবাবেগে অধীর হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

আরও দুইদিন পিলেই রমণস্বামীর দিব্যমূর্তি দর্শন করেন। একদিন ফুটিয়া উঠে ভস্মমাখা এক তাপসের করুণাঘন মূর্তি, আর একদিন তাঁহাকে দেখা যায় রজতগিরি-সন্নিভ এক দেববিগ্রহরূপে। পিলেইর জীবনধারা এই দর্শনের পর হইতে বদলাইয়া যায়। ত্যাগ তিতিক্ষা ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়া তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন।

লক্ষ্মী য়াম্মল রমণের এক পুরাতন শিষ্যা। ভক্তদের মধ্যে এচাম্মল নামেই তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। পরম সুখে এই তরুণী ঘর-সংসার করিতেছিলেন, হঠাৎ সেদিন জীবনে তাঁহার নামিয়া আসে নিয়তির চরম আঘাত। একে একে স্বামী পুত্র কন্যা সব হারাইয়া শোকে দুঃখে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

নানা তীর্থে ছুটাছুটি করিয়াও এচাম্মলের শোকের জ্বালা দূর হইল না। এবার অরুণাচলে রমণকে দর্শন করিতে আসিলেন। কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত মহাপুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপার স্নেহ আর করুণা। অদ্ভুত তাঁহার শক্তি। নয়ন দুইটির দিকে চাহিবামাত্র শোকবিধুরা নারীর দুঃখ-জ্বালা অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণস্বামীর চরণ সেবায় করিলেন আত্মসমর্পণ।

রমণের সেবার জন্য এই ভক্তিমতী মহিলার উৎসাহের অবধি নাই। রোজই নানা উপাদেয় আহার্য নিয়া পাহাড়ে চলিয়া আসেন। রমণকে ভোজন করানো হয় তাঁহার নিত্যকার ব্রত। কিন্তু রমণ কোনো কিছু একাকী খান না, ভক্ত অভ্যাগত সবাইকে সঙ্গে নিয়া আহারে বসাই তাঁহার অভ্যাস। এচাম্মল তাই সবার জন্যই খাবার তৈরি করিয়া আনেন। বহুদিন এ দায়িত্ব সানন্দে তিনি বহন করেন।

মহর্ষির অনুমতি নিয়া এচাম্মল একটি মেয়েকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। বেশ

ধুমধাম করিয়া তাহার বিবাহও দিয়া দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসর পরে এই পালিতা কন্যাটির মৃত্যু হয়। ডাকযোগে এই দুঃসংবাদ এচাম্মলের কাছে সেদিন পৌঁছে।

মহর্ষি ছাড়া আর তাঁহার আশ্রয় কোথায়? কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রমে গেলেন, খবরটা দিলেন তাঁহার হাতে।

এই শোকবার্তা পাঠ করিয়াই মহর্ষির নয়ন দুইটি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। পালিতা কন্যার ছেলেটি বাস করিত এচাম্মলেরই গৃহে, তাহাকে মহর্ষির কোলে তুলিয়া দিয়া অভাগিনী নারী অঝোর ধারে কাঁদিতে লাগিলেন। দেখা গেল, রমণস্বামীর গণ্ডেও অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়াছে। সর্বপাশমুক্ত আত্মজ্ঞানী তাপস দুঃখিনী এচাম্মলের শোকের অংশ নিতে আগাইয়া আসিয়াছেন।

একে একে স্বামী পুত্র হারাইয়া এচাম্মল পাগলের মতো হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রমণের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া বসার পর সে শোক-দুঃখ অনেকটা সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু এবারকার আঘাত হৃদয়ে বড় বেশী বাজিয়াছে।

চিরদুঃখিনী শিষ্যার কান্নার সহিত গুরুও আজ তাঁহার অশ্রুধারা মিশাইয়া দিলেন। শিষ্যার শোক-তাপ কিছুক্ষণের মধ্যেই কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল।

শক্তিধর মহাপুরুষের স্পর্শে এচাম্মলের হৃদয় এবার শান্ত, অন্তর্মুখীন। সকলের নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল রমণ মহর্ষির মানবীয় রূপ, আর সেই সঙ্গে দেখা গেল লোকগুরুর লৌকিক জীবনের এক করুণাঘন প্রকাশ।

খাবার নিয়া রোজই এচাম্মলকে বিরূপাক্ষ গুহায় যাইতে হয়। সেদিন তিনি ঝাঁপিটি হাতে নিয়া পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছেন। হঠাৎ চোখে পড়িল—পাহাড়ের পাদদেশে, পথের এক ধারে দাঁড়াইয়া মহর্ষি এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত নিম্নস্বরে কি আলাপ করিতেছেন। তিনি হয়তো জরুরী কথার আলোচনায় ব্যস্ত, এচাম্মল তাই কোনো কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিলেন।

মহর্ষি সহাস্যে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শুধু শুধু পাহাড় বেয়ে কষ্ট ক'রে আর ওপরে যাও কেন, বল তো? আমি তো নিচে এখানে রয়েছি।"

এচাম্মল একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কথাবার্তা বলা আর হইয়া উঠিল না। রমণের কাছে তখনো দাঁড়াইয়া আছেন সেই অপরিচিত ব্যক্তি। এচাম্মল আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। তাছাড়া, এখন কাজের তাড়াও কম নয়, গুহায় পৌঁছিয়াই সকলের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু গুহায় প্রবেশ করামাত্র তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, উত্তর ভারত হইতে আগত এক দর্শনার্থী পণ্ডিতের সঙ্গে মহর্ষি প্রশান্তভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন। একি আশ্চর্য ব্যাপার! এইমাত্র যে পাহাড়ের নিচে মহর্ষিকে তিনি বাক্যালাপে রত দেখিয়া আসিলেন! এচাম্মল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন, দেহ তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

রমণ স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "কি গো, আজ এমনধারা ভাব কেন তোমার? কি হয়েছে খুলে বল তো?"

এচাম্মল কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, "ভগবান্‌, আপনাকে যে এইমাত্র পাহাড়ের নিচে আমি দেখে এলাম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আপনি আলাপ করছিলেন। আমি

পাশ দিয়েই যে চলে এলাম। দেখতে একটুও ভুল আমার হয় নি। কিন্তু একি অবিশ্বাস্য ব্যাপার ? দুই জায়গাতেই কি এক সঙ্গে আপনি রয়েছেন ?"

অভ্যাগত পণ্ডিত অনুযোগ দিয়া কহিলেন, "স্বামী, এখানে এই গুহার ভেতরে বসে এতক্ষণ ধরে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ কচ্ছেন, অথচ দেখছি, এই একই সময়ে শিষ্যকে পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে দেখা দিতে আপনার বাধছে না। আমার ওপরও একটু কৃপা করুন।"

সুকৌশলে মহর্ষি এ প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেলেন। সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "এচাম্মল যে আমার কথাই ভাবে, আমাকেই ধ্যান করে। তাই তো এরকম দেখেছে।"

সে বার এক ইউরোপীয় দর্শনার্থী রমণের আশ্রমে আসিয়াছেন। আহার ও বিশ্রামের পর অরুণাচলের পার্বত্য পথে তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই বিখ্যাত পবিত্র শৈলের নানা অঞ্চলে যাহা কিছু দর্শনীয় আছে তাড়াতাড়ি সব দেখিয়া ফেলিতে চান। বহুক্ষণ ঘোরাফেরার পর সাহেব কিন্তু পথ হারাইয়া ফেলিলেন। আশ্রমে ফিরিবার আর কোনো উপায় রহিল না। রৌদ্রের তাপও সেদিন প্রচণ্ড. শ্রান্তিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

এদিকে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। নূতন লোক, কোথায় পথ হারাইলেন কে জানে ? ফিরিয়া আসিয়া আশ্রমিকদের তিনি এক অদ্ভুত কাহিনী শুনাইলেন। শ্রোতাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তিনি কহিলেন, "পথ ভুলে যাবার পর কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময়ে দেখা হয়ে গেল রমণ মহর্ষিরই সঙ্গে, ঐ পথেই কোথায় নাকি যাচ্ছিলেন। তিনিই তো আমার খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাই তো ফিরতে পারা গেল।"

শিষ্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা সবাই জানেন, মহর্ষি সারা সকাল শিষ্য পরিবৃত হইয়া আশ্রমে বসিয়া আছেন, ক্ষণকালের জন্যও বাহিরে যান নাই।

জ্ঞান তপস্বী রমণ কিন্তু বরাবরই শিষ্যদিগকে অলৌকিক ক্রিয়া বা দর্শনাদি সম্পর্কে আগ্রহশীল হইতে নিষেধ করিতেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ—আত্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান। এই দিকেই শিষ্য ও ভক্তেরা সাধনা কেন্দ্রীভূত করুক ইহাই তিনি চাহিতেন।

আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ আত্মার গভীরে সদা অবস্থিত থাকেন। তাই প্রপঞ্চময় জগতের সব কিছুই তাঁহার নিকট নাট্যাভিনয় ছাড়া কিছু নয়। নিজ জীবনে স্তরে স্তরে এই পরম উপলব্ধিকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই বহিরঙ্গ জীবনের কোনো দুঃখ, কোনো বাধাবিঘ্নই দেহাত্মবোধহীন মহাতাপসকে চঞ্চল করিতে পারে নাই।

অনেকদিন আগের কথা। কিশোর রমণ তখন অরুণাচলের বিশিষ্ট সাধকরূপে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। চারিদিকে তাঁহার সদাই থাকে ভক্ত শিষ্য দর্শনার্থীর ভিড়। বালানন্দ নামে এক দুষ্ট প্রকৃতির 'সাধু' রমণের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাইতে থাকে। ইহাও সে বুঝিয়া নেয়, যত উপদ্রবই সে করুক না কেন, দেহাত্মবোধহীন সাধক রমণ তাহাতে কোনো বাধা দিবেন না।

রমণের কাছে অনেক দর্শনার্থীই আসে। তাহাদের কাছে প্রায়ই ঐ সাধুটি খুব মুরুব্বিয়ানা দেখায়। ঔদ্ধত্য তাহার কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। রমণ প্রায়ই থাকেন মৌন, মুদিত নয়ন বা ধ্যানাবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বালানন্দ দর্শনার্থীদের বলে, "দ্যাখো, এ বাচ্চা আমারই শিষ্য। একে তোমরা খাবার দাও, ভেট দাও।"

ভাবটা এই—সে রমণের এক মস্ত অভিভাবক, আর রমণ তাহারই আজ্ঞাবহ একজন ছোক্‌রা সাধক মাত্র। এমনি ধৃষ্টতা এই লোকটি দিনের পর দিন দেখাইতে থাকে। রমণ কিন্তু সদাই থাকেন মৌনী, নির্বিকার। এ কথার প্রতিবাদে একটিবারও তিনি মুখ খোলেন নাই।

দর্শনার্থীরা চলিয়া যায়, বালানন্দ রমণকে চুপি চুপি বলে, "দ্যাখো, আমি এমনিভাবে রোজ সবাইকে বলবো —আমি তোমার গুরু। ভেট হিসাবে তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায়ও করবো। এতে তোমার তো বাছা ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই। তুমি যেন আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে ব'সো না, সব ফাঁস করে দিয়ো না।"

রমণ কিন্তু কোনো কথাতেই কান দেন না, দিনের পর দিন পরম প্রশান্তি নিয়া এই দুর্বৃত্তের অনাচার সহ্য করিয়া যান।

ভক্তেরা প্রায় খেপিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু এই ভণ্ড সাধুকে শাসন করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। কারণ, তাহার এই দুষ্কৃতির পরেও রমণ নিজে রহিয়াছেন অচঞ্চল।

শেষটায় ভক্ত পলনীস্বামীর আর ধৈর্য রহিল না। অতর্কিতে সেদিন এক ঝগড়া বাধাইয়া বসিলেন। ভণ্ড সাধু বালানন্দ তো ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। সবাইকে সে জঘন্য গালাগালি দিতে থাকে, এমন কি রমণের গায়েই সে থুতু ফেলিয়া বসে। আত্ম-সমাহিত কিশোর সাধকের ইহাতেও কিন্তু কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য সেদিন দেখা যায় নাই।

ভক্তেরা মহা উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তখনি ঐ ভণ্ড সাধুকে তাহারা বাহির করিয়া দেন। গুহায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসে।

আরও পরবর্তীকালের কথা। গুটিকয়েক শিষ্য নিয়া রমণ তখন পর্বতের সানুদেশে, তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেছেন। এক রাত্রিতে একদল দুর্ধর্ষ চোর সেখানে উপস্থিত হয়, ঘরের জানালা-দরজা ভাঙিতে থাকে। শিষ্যেরা লাঠিসোটা নিয়া প্রস্তুত হয়।

রমণ কিন্তু প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "চুপ করো, বাধা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা ওদের কাজ করছে করুক। আমাদের দিক থেকে কর্তব্য হচ্ছে, সহ্য ক'রে যাওয়া—সব কিছু ক্ষমা করা।"

চোরের দলকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে বাপু, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। যা কিছু সামান্য জিনিসপত্র এখানে আছে, নিয়ে যাও। একটি কথাও কেউ তোমাদের বলবে না।"

কিন্তু এমন সহজ সরল কথার মর্ম তস্করেরা বুঝতে চাহিবে কেন? ভাবিল, আসলে এ প্রস্তাব সাধুদের ছলনা মাত্র, ঘরে ঢুকিলেই তাহাদের ফাঁদে ফেলা হইবে। তাই বার বার আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সম্মুখের দরজা দিয়া তাহারা ঢুকিতে আসিল না।

রমণ উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন, শিষ্যদের নিয়া তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন, এবার শূন্য গৃহে তাহারা স্বচ্ছন্দে ঢুকিতে পারে।

সর্বপ্রথমে আশ্রমের পালিত কুকুর কারুপ্পনকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো হইল—তস্করেরা যেন হাতের কাছে পাইয়া তাহাকে না মারিতে পারে।

সাঙ্গোপাঙ্গসহ রমণ বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে চোরেরা তাঁহার পায়ে সজোরে লাঠি মারিয়া বসিল। কিন্তু সেদিক মহাপুরুষের ভ্রূক্ষেপ নাই। শান্তস্বরে কহিলেন "এতেও যদি খুশী না হয়ে থাকো তবে আরেকট পাও জখম করতে পারো।"

শিষ্য রামকৃষ্ণস্বামী এবার সবেগে সম্মুখে আগাইয়া আসেন, দুই হাতে আগলাইয়া তিনি গুরুকে বাঁচান।

নিকটস্থ এক চালাঘরে গিয়া রমণ ও তাঁহার শিষ্যেরা উপবেশন করেন। এদিকে তস্করেরা তন্ন তন্ন করিয়া জিনিসপত্র খুঁজিতেছে, অনেক কিছু লণ্ডভণ্ড করিতেছে। আশ্রমগৃহ অন্ধকার। আলোর অভাবে কাজের বড় অসুবিধা। তস্করদের একজন আসিয়া কহিল, "ওহে, শিগ্‌গীর একটা লণ্ঠন যোগাড় ক'রে দাও তো!"

অদ্ভুত দুঃসাহস ইহাদের। একদল ভক্ত তো একেবারে মারমুখী। কিন্তু রমণের আদেশে তৎক্ষণাৎ একটি লণ্ঠন দিতে হইল।

আশ্রমে বেশী কিছু ছিল না, সামান্য দ্রব্যাদি নিয়াই চোরেরা সেদিন ক্ষুন্নমনে চলিয়া যায়।

লাঠির আঘাতে শিষ্যদের দেহেরও নানা স্থান কাটিয়া গিয়াছে, রমণ তাঁহাদের তাড়াতাড়ি মলম লাগাইতে বলিলেন। কিন্তু শিষ্যেরা গুরুর জনাই বেশী ব্যস্ত। তাঁহারা কহিলেন, "স্বামীর নিজের দেহে যে আঘাত লেগেছে, তার কি ব্যবস্থা হইবে?"

রমণ কৌতুকভরে শুধু কহিলেন, "হ্যাঁ, আমি ওদের 'পুজো' কিছুটা পেয়েছি বৈকি?"

এই 'পুজোর' ফল কিন্তু বড় মর্মান্তিক। আঘাতের চোটে রমণের উরুদেশ কাটিয়া গিয়াছে—রক্ত ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া এক শিষ্যের আর ধৈর্য রহিল না। একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ভগবান্, একবারটি আপনি আদেশ দিন, আমি এই দুষ্টদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আসি।"

ধীরকণ্ঠে রমণ কহিলেন, "দ্যাখো, আমরা সাধু। আমাদের ধর্ম আমরা কোনোমতেই ছাড়বো না। তুমি যদি আজ এই লোহার ডাণ্ডা ওদের মাথায় মারো, হয়তো কেউ না কেউ মারা যাবে। এর জন্য লোকে কিন্তু চোরদের অনুযোগ দেবে না, দেবে আমাদের মতো সাধুদের। ওরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট, অজ্ঞানান্ধ অভাগা মানুষ। ভালমন্দের বিচার এ দুর্ভাগাদের নেই। সে বিচার যে আমাদেরই করতে হবে। নীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আমাদের থাকতে হবে। আর ভেবে দ্যাখো, যদি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তোমার দাঁত তোমার জিভটাকে কামড়ে দেয়, তুমি কি তাহলে দাঁতটাই উৎপাটন ক'রে ফেলবে?"

সৎ অসৎ, ভাল মন্দ সব কিছুই এই মহাজ্ঞানী তাপসের দৃষ্টিতে হইয়া গিয়াছে একাকার। সারা দৃশ্যমান জগতে একই আত্মসত্তাকে তিনি ওতপ্রোত দেখিতেছেন। সাধু ও চোর তাঁহার চোখে আজ একই আত্মার পৃথক রূপ ছাড়া যে আর কিছুই নয়।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী ছিলেন রমণের অন্যতম শিষ্য। ঈশ্বরদত্ত মেধা ও প্রতিভার বলে ইনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বেদ বেদান্ত, পুরাণ এবং কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। এই সঙ্গে ভগবদ্দর্শনের জন্যও শাস্ত্রীজী কম সাধনভজন করেন নাই। দীর্ঘদিন কৃচ্ছ্রসাধনও করিয়া আসিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত কাব্যরচনায় শাস্ত্রীজীর দক্ষতার পরিচয় মিলে। চৌদ্দ

বয়স বয়সে তাঁহার এ প্রতিভা বিদগ্ধসমাজকে চমৎকৃত করে, সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উত্তরকালে নবদ্বীপে সুধী-সমাজ তাঁহার কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া উপাধি দেন কাব্যকণ্ঠ।

এত কালের শাস্ত্রপাঠ, জপতপ ও তীর্থভ্রমণের পরও শাস্ত্রীর জীবনে আসে নাই অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতা। অন্তরে জ্বলিতেছে প্রবল অশান্তির জ্বালা।

সেদিন পবিত্র কার্তিকের উৎসব। গণপতি শাস্ত্রীর অন্তরে বার বারই এক অব্যক্ত ব্যথা গুমরিয়া উঠিতেছে। যে শান্তি যে অমৃত লাভের জন্য সারা জীবন তিনি ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সন্ধান তো পাইলেন না। তবে কি এ জীবন ব্যর্থ হইবে? কোথায় যাইবেন, কাহার কাছে আশ্রয় নিবেন ভাবিয়া কূল পান না।

সহসা মনে পড়িল, অরুণাগিরির কন্দরে উপবিষ্ট কিশোর স্বামী'র কথা। সদাই ধ্যানাবেশে আত্মসমাহিত অবস্থায় তাঁহার দিন কাটে। ইঁহার কাছে কি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যাইবে না? এমন ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধ্যাননিষ্ঠা শাস্ত্রী কোথাও দেখেন নাই। নিশ্চয়ই এ সাধক সিদ্ধকাম। আজ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিবেন, জীবন-তপস্যা তাঁহার সফল হইবে কিনা।

চিন্তাকুল মনে গণপতি শাস্ত্রী বিরূপাক্ষ গুহায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রমণস্বামীর চরণ দুটিকে জড়াইয়া ধরিলেন, সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "প্রভু ধর্মশাস্ত্র এযাবৎ অনেক পাঠ করেছি। জপতপও কম করা হয় নি। কিন্তু অমৃত জ্যোতির এক কণাও লাভ করতে পারি নি। তাই আপনার চরণে আজ আশ্রয় নিলাম।"

রমণ নীরবে নিষ্পলক নেত্রে প্রায় পনের মিনিট কাল পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "একান্তভাবে কেউ যদি অনুসন্ধান করে—কোথা থেকে 'আমি' বোধটি উদ্‌গত হচ্ছে, তাহলে ক্রমে সেখানেই মন বিলীন হয়ে যায় —এই হচ্ছে প্রকৃত তপস্যা। যদি কেউ জপমন্ত্রের উৎসটির খোঁজ করে, তাহলে সেইখানেই মন একেবারে মিলিয়ে যায়—প্রকৃত তপস্যা একেই বলে।

শাস্ত্রবাক্য ও ধর্মোপদেশ গণপতি শাস্ত্রী অনেক শুনিয়াছেন। উপদেশপূর্ণ যে কথা কয়টি এইমাত্র শুনিলেন, তাঁহার মতো সর্বশাস্ত্র বিশারদ প্রতিভাধর পুরুষের কাছে তাহা অজানা নয়। কিন্তু তরুণ তাপসের শ্রীমুখের বাণী যেন চৈতন্যময়। শাস্ত্রীর সর্বসত্তার মূলে উহা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া যায়। অপার্থিব আনন্দধারা তাঁহার দেহে মনে ছড়াইয়া পড়ে, আর এ আনন্দ উৎসারিত হয় রমণের দেহ হইতে।

গণপতি শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। এখন হইতে তাঁহার বহুতর রচনায়, অনবদ্য ভাবে ও ভাষায় রমণের প্রশস্তি-গাথা তিনি গাহিতে থাকেন। রমণের ভাব ও আদর্শের বহু ব্যাখ্যাও তিনি রচনা করেন। 'ভগবান্ শ্রীরমণ' বা 'রমণ মহর্ষি' নাম গণপতি শাস্ত্রীরই দেওয়া। এখন হইতে দেশে ও বিদেশে এই দুইটি নামেই রমণস্বামী পরিচিত হইয়া উঠিতে থাকেন।

এক বৎসর পরের কথা। রমণ মহর্ষির কৃপা গণপতি শাস্ত্রীর জীবনে সেদিন হঠাৎ এক অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। তিরুবোত্তুয়ূর-এর গণপতি মন্দিরে বসিয়া সে রাত্রে শাস্ত্রীজী ধ্যান জপ করিয়া চলিয়াছেন। এ সময়ে হঠাৎ তাঁহার অন্তরে

জাগিয়া উঠে রমণ মহর্ষিকে দর্শনের তীব্র ইচ্ছা। এ ইচ্ছা সেদিন তাঁহার পূর্ণ হয় বড় বিস্ময়কররূপে।

শাস্ত্রীজী দেখেন, মহর্ষি মন্দির মধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার অলৌকিক দেহের স্পর্শও শাস্ত্রীজী অনুভব ক'রে আনন্দে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। শাস্ত্রীজী বলিয়াছেন, মহর্ষি এসময়ে অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সারা দেহে উঠে দিব্য রসের তরঙ্গ।

অথচ রমণ কিন্তু তিরুভান্নামালাই-এ আসার পর হইতে একটি দিনের জন্যও কোথাও বাহিরে যান নাই। জীবনে কোনোদিন তিরুবাত্তিয়ুর নামক স্থানটি দর্শন করেন নাই।

কিছুদিন পরে গণপতি শাস্ত্রী মহর্ষির কাছে তাঁহার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। মহর্ষি ইহার উত্তরে বলেন, "কয়েক বৎসর আগে অরুণাচলের গুহায় একদিন আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার দেহটি কেবলই বহু ঊর্ধ্বে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ক্রমে দৃশ্যমান বস্তু সব অন্তর্হিত হয়ে গেল, আর আমার চারিদিকে রইলো শুধু এক শুভ্র জ্যোতির পরিমণ্ডল।

"কিছুক্ষণ পরে আমার এ দেহ আবার নিচে নামতে শুরু করলো। তারপর চোখের সামনে পেলাম বস্তুজগৎ। নিজের মনে মনেই আমি বললাম, 'এরকম ক'রেই সিদ্ধগণ নিশ্চয়ই আবির্ভূত অন্তর্হিত হয়ে থাকেন। আমার কিন্তু সে সময়ে ধারণা হ'লো, আমি তিরুবাত্তিয়ুরে এসে পড়েছি।' একটা বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। এরই একধারে কিছুদূরে গণপতির মন্দির। সরাসরি ভেতরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে কি বলেছি বা কি করেছি তা স্মরণ নেই। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। দেখলাম, বিরূপাক্ষ গুহায় শুয়ে আছি। সেই দিনই আমি পলনীস্বামীর কাছে এ ঘটনাটা বলেছিলাম—তখন সব সময় সে আমার কাছে থাকতো।"

শিষ্যদের অধ্যাত্ম-সাধনার প্রয়োজনে, কখনো বা তাহাদের আর্ত আহ্বানে রমণ মহর্ষির এরূপ অলৌকিক আবির্ভাব মাঝে মাঝে দেখা যাইত। কিন্তু এ ধরনের বিভূতি দেখাইতে নিজে কখনও তিনি উৎসাহী ছিলেন না। যেটুকু অলৌকিক ঘটনা হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িত, সাধারণত তাহা লোকলোচনের আড়ালে রাখিতেই তিনি চাহিতেন। জানাজানি হওয়ার পর, কৌতূহলী ভক্তেরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে মহর্ষি শুধু কহিতেন, "কে জানে? বোধ হয় অরুণাচলের সিদ্ধগণই এসব কাণ্ড ঘটিয়ে থাকেন।"

সাধনার যে গভীরে শিষ্যদের রমণস্বামী চালিত করিতে চাহিতেন, গণপতি শাস্ত্রীর পক্ষে তাহা কিন্তু অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। স্বদেশের মুক্তি ও ধর্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবন ছিল তাঁহার প্রধান চিন্তা। এ চিন্তা কখনো তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। আত্মিক সাধনার পথে তাই এক দুস্তর বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৯৩৬ সালে রমণের এই প্রতিভাধর শিষ্যের লোকান্তর ঘটে। জীবনে তাঁহার আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল কিনা, রমণকে এ প্রশ্ন করা হয়। অবলীলায় তিনি উত্তর দেন, "কি ক'রে তা সম্ভব হবে? তার মনে সঙ্কল্প যে শেষ পর্যন্ত রয়েই গিয়েছিল।"

ভক্ত রাঘবাচারিয়ার তাঁহার জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি রমণ সেদিন বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। রাঘবাচারিয়ারও সেখানে উপস্থিত।

তাঁহার অন্তরে এ সময়ে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, মহর্ষির লোকোত্তর রূপ তিনি আজ দর্শন করিবেন, তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিবেন।

মহর্ষি রমণ সামনা-সামনি বসিয়া আছেন। তাঁহার পিছনে একটি দেওয়াল, দক্ষিণা-মূর্তির এক চিত্র উহাতে টাঙানো। রাঘবাচারিয়ার দেখিলেন, মহর্ষির জীবন্ত দেহ ও দক্ষিণামূর্তির ঐ চিত্র দুই-ই ধীরে ধীরে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেওয়ালটিও কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে শুধু মহাশূন্যের সীমাহীন বিস্তার।

তারপর দৃশ্যটি বদলাইয়া যায়। রাঘবাচারিয়ার দেখেন, শুভ্রবর্ণ মেঘরাশি ধীরে ধীরে সেখানে জমাট বাঁধিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রমণ মহর্ষির দেহ ও দক্ষিণামূর্তির চিত্রটি পূর্ববৎ বিরাজ করিতে থাকে। মহাপুরুষের চারিদিকে ঘনায় এক দিব্যজ্যোতির পরিমণ্ডল।

এ অলৌকিক দর্শন রাঘবাচারিয়ারকে হতবাক্ করিয়া দেয়। রমণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নীরবে কম্প্রবক্ষে তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

একমাস পরে রমণের সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই দিনকার অলৌকিক দৃশ্যের তাৎপর্য জানার জন্য তিনি খুব ব্যগ্র। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে রমণ কহিলেন, "তুমি যে সেদিন আমার প্রকৃত রূপটি দেখতে চেয়েছিলে। আমার অন্তর্ধানই তুমি দেখেছ, কারণ আমি যে আকারহীন। সঙ্গে সঙ্গে আরও যা কিছু বেশীর ভাগ দেখেছ, তা হয়তো তোমার গীতাপাঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।—গণপতি শাস্ত্রীরও তোমার মতোই এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে তুমি আলাপ ক'রে দেখতে পারো। তবে, এ ধরনের অনুসন্ধিৎসা ছেড়ে দিয়ে 'আমি কে' তা-ই আবিষ্কার করবার চেষ্টা করো। এই পরম তত্ত্বের সন্ধানই হ'লো আসল সাধনা।"

রমণ মহর্ষির প্রথম জীবনের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন এক নাম-না জানা সাধক। মহাপুরুষের অপার স্নেহ ও করুণা তিনি লাভ করেন। বিরূপাক্ষ গুহায় পাঁচ দিনের জন্য ভক্তটির আগমন ঘটে, তারপর আর তাঁহাকে কখনো দেখা যায় নাই; রমণের কৃপার ধারা তাঁহার উপর অকৃপণ করে বর্ষিত হইত। বহু ভক্তের ভিড়েও দেখা যাইত, মহর্ষির অমৃতময় দৃষ্টি নবাগত সাধককে বিশেষভাবে অভিসিঞ্চিত করিতেছে। তিনি তামিল ভাষায় মহর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া এক অপরূপ প্রশস্তি রচনা করিয়া যান।

'রমণ সদ্‌গুরু' নামে এই মনোরম সংগীতমালা তিনি রচনা করেন। সেদিন গুহায় বসিয়া একটি ভক্ত সুন্দর সুর-তান-লয় যোগে ইহা গান করিতেছেন। রমণ মহর্ষিরও সেদিন যেন মন খুলিয়া গিয়াছে। সকলকে বিস্মিত করিয়া নিজেই তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া তিনি স্তবগান শুরু করিয়া দিলেন।

এই কাণ্ড দেখিয়া ভক্তটি কৌতুকী হইয়া উঠে। পরিহাস করিয়া বলে, "ভগবান্, নিজের স্তব নিজে গাইবার দৃষ্টান্ত আমার জীবনে কিন্তু এই প্রথম দেখলাম।'

সদ্‌গুরু তৎক্ষণাৎ উত্তরে কহিলেন, "সে কি কথা? রমণকে এই ছয় ফিট দৈর্ঘ্যের মধ্যে তোমরা সীমিত ক'রে দেখছো কেন? সে যে এক সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক সত্তা!"

শিষ্য না হইলেও শেষাদ্রি স্বামী ছিলেন রমণের এক গুণগ্রাহী ভক্ত। শক্তিমন্ত্রে পূর্বেই তাঁহার দীক্ষা লাভ হইয়াছে, কিছু কিছু অলৌকিক বিভূতির অধিকারীও হইয়াছেন। বহু স্থানে তপস্যাদি করার পর তিরুভান্নামালাই-এ আসিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন। হঠাৎ সেদিন অরুণাচলেশ্বর-মন্দিরে আসিয়া রমণকে দর্শন করেন, আর সেদিন

হইয়েই এক অবিচল শ্রদ্ধা নিয়া তিনি এই সর্বত্যাগী তাপসের জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় বহু লোক রমণের কৃপা লাভ করে।

জনৈক ব্যক্তি শেষাদ্রি স্বামীর স্নেহভাজন, রমণের আশ্রয় সে গ্রহণ করুক ইহাই তিনি চান। কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও লোকটির যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। শেষাদ্রি একদিন বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "সে কি কথা! রমণের নিকট তুমি এখনো যাচ্ছো না! তুমি কি জানো না যে তাঁর কাছে না যাওয়ার তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হচ্ছে।"

তিরস্কৃত ব্যক্তি ভীত হয়, রমণ মহর্ষির কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে। মহর্ষি সহাস্যে এই তিরস্কারের তৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেন। বলেন, "তুমি ব্রহ্মহত্যা করছো, একথা বলবার মানে—তুমি নিজেই যে ব্রহ্ম এ সত্য তোমার উপলব্ধিতে এখনে আসছে না। 'ব্রহ্মহত্যা' কথাটি শেষাদ্রি স্বামী এই হিসেবেই প্রয়োগ করেছেন, তোমার কোন ভয় নেই।"

ইংরেজ তরুণ এফ্. এইচ. হার্মফ্রিজ-এর জীবনে রমণ মহর্ষির প্রভাব সঞ্চারিত হয় এক লোকোত্তর লীলার মধ্য দিয়া। এ কাহিনী বড় বিস্ময়কর। পুলিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে হার্মফ্রিজ ভেলোরে আসেন। অরুণাচল হইতে এ শহরটির দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। তাঁহার অধীনস্থ মুন্সী নরসিংহায়ার কাছে এ সময়ে তিনি তেলুগু শিখিতেছেন।

সহসা একদিন তেলুগু শিক্ষক মুন্সীকে তিনি বলিয়া বসেন, "আচ্ছা, তুমি কি এ অঞ্চলে কোনো সাধু মহাত্মাকে জানো?" বড় অতর্কিত এ প্রশ্ন। মুন্সী চমকিয়া উঠিলেন। এ প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়া দিয়া কহিলেন, "না স্যর, এমন কাউকে তো চিনিনে।"

দুইদিন পরের কথা। ভোরবেলায় নরসিংহায়া ছাত্রকে পড়াইতে আসিয়াছেন, কিন্তু আজ তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। হার্মফ্রিজ কহিলেন, "মুন্সী, তুমি না বলেছিলে কোনো মহাত্মার সাথে তুমি পরিচিত নও? আমি কিন্তু তোমার গুরুদেবকে দেখে ফেলেছি—প্রত্যূষে ঘুম ভাঙবার আগেই স্বপ্নে আমার এ দর্শন হয়েছে। আমার পাশে সেই তিনি কি যেন সব বলে গেলেন, আমি তা বুঝতে পারলুম না।"

এ কি অদ্ভুত কাহিনী। সাহেবের কথা শুনিবার পর নরসিংহায়া চুপ করিয়াই বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ বাদে হার্মফ্রিজ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "জানো মুন্সী? ভেলোর শহরের যে লোকটিকে আমি বম্বেতে থাকতে সর্বপ্রথম দেখেছি, সে তুমি।"

এ যে আরও অবিশ্বাস্য! নরসিংহায়া জীবনে কোনো দিন বম্বেতে যান নাই—সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরের কথা। অতঃপর হার্মফ্রিজ আদ্যোপান্ত তাঁহার কাহিনী বলিলেন।

—ভেলোরে সরকারী কাজে যোগদান করার আগে হার্মফ্রিজ খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। এ সময়ে বম্বের এক হাসপাতালে চিকিৎসার্থ কয়েকদিন থাকিতে হয়। সেদিন চুপচাপ বিছানায় শুইয়া আছেন হঠাৎ কার্যস্থল ভেলোরে যাওয়ার চিন্তা মনে জাগিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা তাঁহার হয়। কোনো এক অদৃশ্য শক্তির কৃপায় সূক্ষ্মদেহে তিনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। এ সময়েই ভেলোরের মুন্সী নরসিংহায়াকে তিনি দেখিতে পান।

এ অলৌকিক দর্শনের কথা শুনিয়া নরসিংহায়া কোনো উত্তর দেন না, সন্দেহের দোলায় তিনি দুলিতে থাকেন।

কিন্তু এ সন্দেহ তাঁহার বেশী দিন টিকে নাই। এই তরুণ ইংরেজ অফিসারটি আর একদিন তাঁহাকে অনেক বেশী অবাক করিয়া দেয়। নরসিংহায়ার হাতে সেদিন রহিয়াছে একগাদা ছবি। হামফ্রিজ এগুলি সোৎসাহে টানিয়া নেন, তারপর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইহার মধ্য হইতে নরসিংহায়ার গুরু রমণ মহর্ষির ছবিটা চট্ করিয়া বাহির করিয়া দেন—এ যেন তাঁহার অতি পরিচিত ব্যক্তির ছবি।

আরও বিস্ময়ের কথা, হামফ্রিজ সেদিন পেন্সিলের রেখায় যে চিত্রটি আঁকিয়া দেখান, তাহাতে রমণ মহর্ষি এবং তাঁহার আশ্রমগুহার সমগ্র দৃশ্যটি ফুটিয়া উঠে। সহাস্যে মুন্সীকে বলেন, "হ্যাঁ, মুন্সী, এই চিত্রটি আমি সেদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম।"

অতঃপর হামফ্রিজ রমণকে দর্শন করিতে আসেন। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "পর্বতগুহায় ঢুকবার পর মহর্ষির সম্মুখে, নীরবে তাঁর চরণতলে গিয়ে বসলাম। দীর্ঘ সময় আমরা বসেছিলাম, আর এ সময়ে কেবলি আমার মনে হ'তে লাগলো, আমি যেন আমার দেহসত্তা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছি। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমি মহর্ষির চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি থেকে ধ্যান-তন্ময়তা একটুকুও অপসৃত হতে দেখি নি। উপলব্ধি করতে লাগলাম, তাঁর দেহটি যেন পবিত্রাত্মা খৃষ্টের এক মন্দির বিশেষ। আরো বোধ হতে লাগলো, ঐ দেহটি যেন সামনে উপবিষ্ট মানুষটির কিছু নয়, তা যেন ভগবানেরই এক যন্ত্র বিশেষ—তা যেন নীরব নিস্পন্দ এক প্রাণহীন দেহ, যা থেকে দিব্যজ্যোতি কেবল চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমার তখনকার মনের ভাব সত্যই অবর্ণনীয়।"

হামফ্রিজ উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণ। মানবকল্যাণের আদর্শে তখন তিনি উদ্বুদ্ধ। ব্যগ্রভাবে মহাপুরুষকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান্ মনে আমার দীর্ঘদিনের সংকল্প রয়েছে আমি জগৎকে সাহায্য করবো। তা কি আমি কখনো পারবো না?"

উত্তর হইল, 'হ্যাঁ, তা পারবে, যদি আগে নিজেকে তুমি প্রকৃত সাহায্য করো। ভুলে গেলে চলবে না, তুমি জগৎ দ্বারা বিধৃত রয়েছো। শুধু তাই নয়, ও জগৎ যে তোমারই আপন সত্তা। তুমি নিজে যেমন এই বিশ্বসৃষ্টি থেকে পৃথক নও, এই বিশ্বও তেমনি তোমাতে রয়েছে ওতপ্রোত।"

অলৌকিক বিভূতির উপর হামফ্রিজের তীব্র আকর্ষণ ছিল। মহর্ষির সান্নিধ্যে থাকিয়া ক্রমে তাঁহার সে আকর্ষণ কমিয়া আসে। হামফ্রিজের জীবনে যে অধ্যাত্মবীজ এ সময়ে রোপিত হয় অচিরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। পরম কল্যাণের পথটিই জীবনে তিনি বাছিয়া নেন এবং উচ্চ চাকুরীর মোহ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তারপর সেখানে এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসী মঠে যোগদান করেন।

১৯১৬ সালের প্রথম ভাগে জননী আলাগাম্মল অরুণাচলে আসেন। মাদুরার বাড়িটি দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা জননী এবার তাই স্থায়িভাবেই প্রিয় পুত্র রমণের সাথে বাস করিতে আসিলেন। সংসারত্যাগীর আশ্রমে মাতার এই আগমন

কিন্তু কোনো আলোড়নই তোলে নাই, একটুও ছন্দঃপতন ঘটায় নাই। অতি স্বাভাবিক-ভাবেই জননীকে রমণ সেদিন গ্রহণ করিলেন।

ইহার পূর্বেও জননী একবার তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। সে সময়ে জ্বরবিকারে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। মায়ের সেবায় রমণকে সেদিন বিন্দুমাত্র উদাসীন হইতে দেখা যায় নাই। নিজ হস্তে পরম যত্নে তিনি তাঁহার শুশ্রূষা করেন। শুধু তাহাই নয়, মাতার রোগমুক্তির জন্য অরুণাচল শিবের কাছে সাধারণ মানুষের মতো প্রার্থনা জানাইতেও তাঁহাকে দেখা যায়।

মাতাকে আশ্রমে রাখিলে কি হয়, প্রতিটি কথাবার্তা ও আচরণে রমণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন, পুত্রের সহিত ব্যবহারিক জীবনের কোনো সম্বন্ধ রাখা আর তাঁহার চলিবে না। মাতৃত্বের দাবি ও অধিকার সম্বন্ধে জননীর বেশী সচেতন হইবার উপায় ছিল না। তাছাড়া, তিনি কোনো কারণে কাহারো উপর রুষ্ট হইলে রমণ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেন, 'জেনে রেখো, সব নারীই আমার জননী—তুমি একাই নও।"

জ্ঞানতপস্বী পুত্রের এই সমদর্শিতার সহিত মা ধীরে ধীরে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নেন। আশ্রমের শান্ত, বৈরাগ্যময় পরিবেশ ও সাত্ত্বিকতা ক্রমে তাঁহাকে রূপান্তরিত করিয়া তোলে।

পুত্রের আধ্যাত্মিক স্বরূপ কিন্তু জননী মাঝে মাঝে উপলব্ধি করিতেন, রমণ যে এক শিবপ্রতিম মহাপুরুষ, এ অনুভূতি তাঁহার জাগিয়া উঠিত। একদিন রমণের সম্মুখে তিনি শান্ত মনে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, পুত্র সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, আর তাঁহার আসনটিতে বিরাজমান রহিয়াছেন এক শিবলিঙ্গ। জননী বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য কিসের ইঙ্গিত জানাইতেছে? পুত্র কি তবে দেহত্যাগ করিবে?

চীৎকার করিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠেন। পরক্ষণেই স্বাভাবিক দৃশ্য আবার তাঁহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। তিনি দেখেন, রমণ পূর্ববৎ সশরীরে সম্মুখে রহিয়াছেন উপবিষ্ট। (রমণ মহর্ষি : এ. ওস্‌বর্ন)

আর একদিনের কথা, ভক্তদল পরিবেষ্টিত হইয়া রমণ গুহার মধ্যে বসিয়া আছেন। জননী সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ তো তাঁহার রমণ নয়—এক শুভ্রকান্তি দেবমূর্তি তাঁহার সম্মুখে, আর তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এক জোড়া বিষধর সর্প।

জননী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও দুটোকে বিদেয় কর শিগ্‌গীর বিদায় কর, ওদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে।"

এ অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়া অরুণাচলেশ্বর সেদিন মহাসাধক রমণের দিব্য স্বরূপটিই কি জননীকে জানাইয়া দিলেন?

রমণ নিজে ছিলেন সর্বত্যাগী। কিন্তু কোনোদিনই গৃহ ও গৃহত্যাগীর পার্থক্য তাঁহাকে করিতে দেখা যায় নাই। নিজে আশ্রমবাসী হইয়াও মাতাকে সঙ্গে রাখিতে তিনি একটুও দ্বিধা করেন নাই। আবার সংসার ত্যাগেচ্ছু বহু ভক্তকে তিনি ঘরে থাকিয়া সাধনা করিতেই বলিতেন। সন্ন্যাসকামী ভক্তদের বলিতেন "জেনে রেখো, পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জন করা বা গৃহত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলে না। প্রকৃত সন্ন্যাস হচ্ছে বাসনা, কামনা ও মোহকে পরিত্যাগ করা। সত্যকার সন্ন্যাস যে গ্রহণ করে, সে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে লীন হয়ে যায়, একাত্মক হয়ে যায়। তার প্রেম সারা বিশ্বকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রসারিত

হয়ে উঠে। কাজেই সন্ন্যাসী সাধকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তার গৈরিক পরিচ্ছদ বা গৃহত্যাগে নয়—প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সর্বাত্মক প্রেমে।"

মহাজ্ঞানী সাধক আরও বলিতেন, "যদি তুমি এই সর্বপরিপ্লাবী প্রেম অনুভব করো, যদি তোমার হৃদয় এই বিরাট জগৎকে বক্ষে ধারণ করার মতো প্রসার লাভ করে তবে আর এই সংসারাশ্রম ত্যাগ করার ইচ্ছাটি তোমার ভেতর থাকবে না। তুমি তখন জীব-জীবনের বৃন্ত থেকে একটি পাকা ফলের মতোই পড়বে খসে। তোমার উপলব্ধিতে তখন এসে পড়বে—এই সারা বিশ্বজগৎই তোমার নিজের ঘর।"

দেবরাজ মুদালিয়র তাঁহার স্মৃতিকথায় রমণের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "নিরাসক্তভাবে জীবনের সমস্ত কিছু কাজকর্ম করে যাওয়া এবং আত্মাকে পরম সত্তারূপে জ্ঞান করা—এই দুইটিই একযোগে করা যায়। কারুর মন প্রাণ যদি আত্মসত্তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে তার পক্ষে বাহ্য জীবনের কাজকর্ম ক'রে ওঠা শক্ত হবে—এ ধারণা মোটেই সত্য নয়।

"আত্মজ্ঞানের সাধক হচ্ছে একটি অভিনেতার মতো। সে সাজ-গোজ করে, কাজকর্ম করে, নিজে অভিনয়ের অংশটুকুর কথাও ভাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান। সে জানে, যে চরিত্র তার দ্বারা অভিনীত হচ্ছে সে নিজে তা মোটেই নয় প্রকৃত জীবনে সে অপর এক ব্যক্তি। সেই রকম, যখন তুমি নিশ্চিতরূপে জানো যে তুমি দেহ নও—তুমি আত্মা তখন এই দেহাত্মবুদ্ধি অথবা 'আমি এই দেহী' এই চিন্তা তোমাকে চঞ্চল ক'রে তুলবে কেন? দেহ যা কিছু করুক না কেন তা তোমাকে 'আত্মা'র ধৃতি থেকে বিচ্যুত করবে না। এই ধৃতি তোমার দেহের যে কোনো কর্তব্য বা আচরণকে ব্যাহত করবে না—যেমন ঐ অভিনেতার চরিত্রাভিনয় তার ব্যক্তিগত জীবনকে কোনোমতেই বিপর্যস্ত করে না।"

মহাজ্ঞানী রমণের জীবনের দ্বৈত সত্তার এই পরিণতিটি অভিনেতার এই অপূর্ব রূপটি আমরা ফুটিয়া উঠিতে দেখি।

জননীর প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্যে তাই সেদিন এই মহাপুরুষের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ও স্খলন আমরা দেখিতে পাই না। পুত্রের আশ্রমে প্রায় ছ বছর বাস করার পর আলাগাম্মলের শেষের দিনটি সেদিন ঘনাইয়া আসে।

মাতার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আর বেশী দেরি নাই। এসময়ে তাঁহার সেবায় ও কল্যাণ কামনায় সংসার বিরাগী রমণ মহর্ষি কিন্তু বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দেন নাই।

শয্যার চারিদিকে বেদপাঠ ও রামনাম কীর্তন চলিতেছে। মুমূর্ষু মাতার শিরে ও বক্ষে নিজের হাত দুইটি স্থাপন করিয়া রমণ পাশে বসিয়া আছেন। জননী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সবাই শোকে অভিভূত। দুশ্চিন্তা ও দৌড় ঝাঁপে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আশ্রমবাসীদের কাহারও আহার হয় নাই। মহর্ষি নির্বিকারভাবে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "এবার তবে আমরা সবাই আহার্য গ্রহণ করতে পারি। তোমরা পাত পেতে ব'সো। জানবে, এ মৃত্যুর ফলে কোনো আহার্যই অশুচি হয় নি।"

জননীর এই মৃত্যুকে রমণ মহর্ষি মৃত্যু বলিয়া মোটেই মনে করেন নাই। চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে জননী আবার প্রবেশ করিতেছেন, এই দৃষ্টিতেই এ মৃত্যুকে তিনি দেখিয়াছেন; সেদিনকার কথায় ও আচরণে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত তিনি দিয়াছিলেন।

কোনো এক ব্যক্তি এ সময়ে অলাগাম্মলের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। মহর্ষি তাহাকে সংশোধন করিয়া বলিলেন, "তাঁর তো মৃত্যু হয় নি। তিনি লীন হয়েছেন মাত্র।"

১৯:০ সালের কথা। রমণ মহার্ষকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বভাবনার এক মূর্ত বিগ্রহরূপে এই জ্ঞানতপস্বী বিশ্বের দিগ্বিদিকে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চরণোপান্তে তাই এখন প্রায় দেখা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুমুক্ষু ও শরণার্থীর ভিড়।

এই ভিড়ের মধ্যে বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক পল ব্রান্টনকেও একদিন দেখা গেল। আধুনিক সমাজে মহর্ষির জীবন ও দর্শন ব্যখ্যায় উত্তরকালে ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রান্টন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছেন। সম্মুখস্থ এক কম্বলাসনে তিনি উপবিষ্ট। বহু ভক্ত ও শিষ্য অর্ধচন্দ্রাকারে রমণ মহর্ষিকে ঘিরিয়া উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন।

শুভ্র শয্যায় মহর্ষি উপবিষ্ট। চরণদ্বয় একটি ব্যাঘ্রচর্মের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। দেহখানি সুগৌর সুঠাম। প্রশস্ত ললাটে অপূর্ব প্রশান্তি। নয়ন দুইটি নিষ্পলক—অতলস্পর্শী গভীরতা মানুষের মনকে টানিয়া নেয়। সারা কক্ষে নিবিড় নীরবতা বিরাজমান। ধূপাধারের সুগন্ধি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

ব্রান্টন মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, অনেক কিছু প্রশ্ন তিনি করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল কই? মহর্ষির নিস্পন্দ দেহ ও নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সমগ্র চেতনার ধারা যেন বদলাইয়া গেল। নীরবতার মধ্য দিয়া দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, একটি বাক্যও মহর্ষি এযাবৎ উচ্চারণ করেন নাই। এই ধ্যান-মৌন পরিবেশে বসিয়া ব্রান্টনের মনের সমস্ত কিছু প্রশ্ন ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরম শান্তি ও আনন্দের রসে তাঁহার হৃদয় আজ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এমনটি তো জীবনে কখনো তিনি অনুভব করেন নাই।

যেসব প্রশ্ন নিয়া এতকাল এত বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আজ সে সব মনে হইতেছে অকিঞ্চিৎকর। বুদ্ধির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সে সব সমস্যাকে এতকাল দেখিয়া আসিয়াছেন, সগর্বে বুঝিয়াছেন, তাহার কোনো গুরুত্বই আজ নাই।

শুধু মহর্ষির সান্নিধ্যে বসিয়া, তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিতে স্নাত হইয়া বুদ্ধির অতীত স্তরে, সত্তার গভীরে তিনি ডুবিয়া গেলেন। এ কি অলৌকিক কাণ্ড! কোন্ শক্তিবলে মৌনী সাধক তাঁহার মধ্যে আজ এই বিপ্লব ঘটাইয়া তুলিলেন?

ব্রান্টন ভাবিতে লাগিলেন, পুষ্প যেমন নিঃশব্দে, স্বাভাবিকভাবে দিকে দিকে তাহার সৌরভ ছড়াইয়া দেয়, মহর্ষিও ঠিক তেমনিভাবে, সবার অলক্ষ্যে অধ্যাত্ম-শক্তির ধারা দিকে দিকে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। এই ক্ষুরধার-বুদ্ধি, সদা-অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক সেদিন একটি প্রশ্নও উত্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই।

আর একদিনের কথা। ব্রান্টন মহর্ষির কক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন, দৃষ্টিটি তাঁহার দিকেই নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে তাঁহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ব্রান্টন এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যেন হঠাৎ এক পাঁচ বৎসরের বালকে রূপান্তরিত হয়েছি, অরুণাচলের উঁচুনীচু প্রস্তরাকীর্ণ পথে মহর্ষি আমার

হাতখানি ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তিনি আমায় নিয়ে পর্বত শিখরে উঠতে লাগলেন। ক্রমে চাঁদের আবছা আলোয় আমি কিছুটা দেখতে পেলাম। প্রস্তর এবং ঝোপঝাড়ের আড়ালে রয়েছে কতো প্রাচীন যোগীদের আশ্রম।

"ধীরে ধীরে আমরা অরুণাচল শিখরের অতি নিকটে উপনীত হলাম। আমার সমগ্র সত্তার তখন এক রূপান্তর ঘটে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। এক পরম শান্তি পারাবারে নিরন্তর অবগাহন করছি।

"মহর্ষি আমায় বললেন—দেশে ফিরে গিয়ে তুমি এই শান্তিই পেতে পারবে, কিন্তু এর জন্য তোমায় মূল্য দিতে হবে, আর সে মূল্য হচ্ছে তোমার দেহবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে চিরতরে পরিত্যাগ করা। তা হলেই বহিরঙ্গ জীবনকে বিস্মৃত হয়ে তুমি ধীরে ধীরে প্রকৃতরূপে আত্মাভিমুখী হতে পারবে।" (এ সার্চ ইন সিক্রেট ইণ্ডিয়া—ব্রাণ্টন)

এই রহস্যময় স্বপ্ন সেদিন পল্ ব্রাণ্টনের সমগ্র চেতনায় এক তীব্র ঝাঁকুনি দিয়া যায়।

ব্রাণ্টন একদিন প্রশ্ন করেন, "ভগবান্, আমাদের মতো আধুনিক মানুষের জীবনে রয়েছে বড় বেশী কর্মচাঞ্চল্য। এর সাথে আপনার সাধনপন্থা কি খাপ খাওয়ানো যাবে? মানুষকে কি তার জীবনধারা বদলে ফেলতে হবে? সে কি কর্ম ত্যাগ করবে?'

মহর্ষি উত্তরে কহেন, "কর্মত্যাগ করার দরকার মোটেই নেই। তুমি ব্যবহারিক কাজকর্ম ক'রেই রোজ দু-এক ঘণ্টা আত্মানুসন্ধান ও উপাসনা ক'রে যাবে। এ পন্থা ঠিকভাবে অনুসরণ করলে তোমার মনোলোকে যে ভাবধারা সঞ্চারিত হবে, তা ক্রমে সব কিছু কর্ম-ব্যস্ততার ভেতরও প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা আধ্যাত্মিক জগতে নূতন প্রবেশ করছে, তাদের জন্য অবশ্যই গোড়ার দিকে উপাসনার জন্য পৃথক একটা সময় নির্ধারিত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকলে তখন সে কোনো কাজ করুক আর না ই করুক, কেবলই অধিকতর আনন্দ লাভ করবে। তখন তার হস্তদ্বয় যতই কর্মরত থাকুক না কেন, মস্তিষ্ক থাকবে বহিরঙ্গ জীবনের বহু ঊর্ধ্বে—তা থাকবে অনাসক্ত, শান্ত ও অচঞ্চল।

"...আমার পন্থা যোগীদের পন্থা থেকে পৃথক। রাখাল বালক যেমন তার লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গরুকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যায়, যোগীও সেইরকম তার চিত্তকে লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। কিন্তু আমি যে পদ্ধতির কথা বলছি, তা অন্যরূপ। এ যেন একমুঠো তৃণ হাতে নিয়ে গাভীকে আহারের জন্য প্রলুব্ধ করা, তারপর ক্রমে তাকে লক্ষ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়া।"

ভক্তদের ভাবকল্পনা ও দার্শনিকতার বিলাসকে মহর্ষি মোটেই প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে চান নাই। তাঁহার নিজস্ব আদর্শ ও সাধন প্রণালীর ব্যাখ্যা যখন যেটুকু তিনি করিতেন, তাহার উদ্দেশ্য থাকিত জিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন মেটানো—নিছক তত্ত্বালোচনায় বা উপদেশ বর্ষণে তাঁহার কোনোদিন আগ্রহ ছিল না।

সেবার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা ভগবান্, মৃত্যুর পর মানুষের কোন্ অবস্থা হয়?"

উত্তর হয়, "জীবন্ত অবস্থাতেই নিজের সত্তার কোনো সন্ধান তুমি পাও নি। তবে, মৃত্যু বা পরপারের খোঁজে তোমার কি প্রয়োজন, বল তো?"

কোনো কৌতূহলী দর্শনার্থী জানিতে চাহেন, এই পৃথিবী ও মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ কি ?

উত্তর হয়, "আগে নিজেকে জানো, জগতের কথা পরে। নিজেকে জানলে জগৎকে জানা যাবে। কারণ, জগৎ আর তুমি এক।"

আত্মবিচারের উপরই রমণ মহর্ষি গুরুত্ব দিতেন বেশী। কহিতেন, "মনের চিন্তা ও সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি না ক'রে, একটি একটি ক'রে এগুলো বিনষ্ট করো, নির্মূল ক'রে ফেলো।"

আত্মানুসন্ধানের কথায় তিনি বলিয়াছেন, "আনন্দই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বভাবধর্ম, আর আত্মার মধ্যেই রয়েছে এই আনন্দের উৎস। অজ্ঞাতসারে, স্বাভাবিক প্রবণতাবশে মানুষ যখন আনন্দ খুঁজে বেড়ায় তখন সে আসলে আত্মা সন্ধান ক'রে ফিরে। আত্মা অখণ্ড ও অবিনাশী। কাজেই, এই আত্মাকে লাভ করলে অফুরন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই মানুষ ভোগ করতে পারে।"

তাঁহার মতে, সর্বপ্রথমে মানুষের মনে 'আমি' চিন্তাটি আবির্ভূত হয়। এই চিন্তা উদ্ভূত হওয়ার পরই অপরাপর চিন্তা আত্মপ্রকাশ করে, নতুবা সেগুলো আসিতেই পারে না। সর্বনামের প্রথম পুরুষ হইতেছে 'আমি'। 'তুমি'র প্রকাশ ইহার পরে আগে কখনো নয়।

মনের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া কেহ যদি 'আমি' উৎসস্থলে পৌছাতে পারে, সে দেখিবে,—'আমি' চিন্তাটি যেমন সকলের আগে উদ্ভূত হয়, তেমনই বিলীনও হয় সর্বশেষে।

মহর্ষি বলিতেন,—এই 'আমি' বোধের উৎপত্তিস্থলে আসিয়া গেলেই মানুষ লাভ করে তাহার মহামুক্তি। ইহাই হইতেছে সচ্চিদানন্দময় পরম অবস্থা।

মনের ভিতর দিয়াই হয় জগৎ-বোধের প্রকাশ। তাই রমণ বলেন,—মনের উৎপত্তি স্থানটিতে উপনীত হয়ে সেখানে যদি মনকে বিনষ্ট করা যায়, তবেই দেখবে, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মনের সত্যকার বিনাস কি করিয়া হইবে ? এ কৌশলও তিনি সাধনার্থী ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন।—নিরন্তর 'আমি কে' ?—এ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়াই মনের বিলয় ঘটানো যায়। অবশ্য এ অনুসন্ধানও একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং ইহার চরম পর্যায়ে মনের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রক্রিয়াটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। চিতাগ্নি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বংশখণ্ড ব্যবহার করা হয়, এ যেন তাই। সৎকার কার্যের শেষে এ যষ্টিও ভস্মীভূত হইয়া যায়।[১]

মহর্ষির মতে, মনের বিনাশ সাধনের সহায়ক হইতেছে বিচার। যে পর্যন্ত না এই মনের ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবে, সে পর্যন্ত এ বিচার চালাইয়া যাওয়া দরকার। শত্রুদুর্গের ভিতরে সৈন্য আছে। বার বারই তোমাকে আক্রমণ করার জন্য তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। প্রতিবারই তাহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া বিনাশ করিতে হইবে নতুবা দুর্গ অধিকার করা অসম্ভব।

মহর্ষির প্রচারিত জ্ঞান সাধনার পথে অনাবশ্যক কোন জটিলতা ছিল না। তাঁহার

১ টক্‌স্ উইথ্ রমণ মহর্ষি রমণ : রমণাশ্রম

আহ্বানও ছিল সর্বজনীন। যে কোনো ধর্মের যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক আচার্যজ্ঞানে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে পারিত, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত। স্বপ্রকাশ অধ্যাত্মসূর্যের মতো তিনি থাকিতেন সদা বিরাজমান, অগণিত মুমুক্ষু মানুষ লাভ করিত তাঁহার করুণাসম্পাত।

অরুণাচলের আশ্রমে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া জড়ো হইত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত দর্শনার্থী। এই মহাপুরুষকে দর্শন করার পর ঘটিত তাঁহাদের রূপান্তর। তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ও সান্নিধ্যের প্রভাব অনেকের উপর কাজ করিত ইন্দ্রজালের মতো।

আত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে রমণের জীবন উদ্ভাসিত। সর্বসত্তায় তাই জাগিয়া উঠিয়াছে অখণ্ড চেতনা। জাতি, ধর্ম ও তাত্ত্বিক মতবাদের গণ্ডী সব কিছু হইয়া গিয়াছে একাকার।

সমদর্শী মহাপুরুষের কাছে মানুষের ভেদবৈষম্য যেমন নাই, তেমনি জীবজন্তুর পার্থক্য হইয়াছে নিশ্চিহ্ন। আশেপাশের জীবজন্তুর সঙ্গে তিনি বোধ করেন নিবিড় আত্মীয়তা, একাত্মকতা। উহারাও তেমনি তাঁহাকে দেখে পরম বান্ধব ও আত্মজনরূপে।

কাঠবিড়ালীরা লাফাইয়া মহর্ষির শয্যায় আসিয়া বসে। হুড়াহুড়ি করিয়া হাত হইতে বাদাম ছিনাইয়া খায়। উহাদের জন্য খাবার রাখিতে মহর্ষির কোনোদিন ভুল হয় না।

আশ্রমের রান্না শেষ হইলে সর্বাগ্রে কুকুরদের খাইতে দিতে হইবে ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। ডাকিবামাত্র ময়ূরগুলি নাচিয়া মহর্ষির সম্মুখে আসিয়া জড়ো হয়, উহাদের জন্যেও উপাদেয় আহার্য রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আশ্রমের পালিতাকন্যা, গাভী লক্ষ্মী, যেন রমণ মহর্ষির আদরের শকুন্তলা। রোজই মাঠে বিচরণের জন্য লক্ষ্মীকে বাহির হইতে হয়, যাত্রার আগে মহর্ষির সভাকক্ষে একবার নিশ্চয় তাহার যাওয়া চাই। মহাপুরুষের আদরের স্পর্শ নিয়া তবে সে রওনা হইবে।

আশ্রমের কুকুর চিন্না কুরুপ্পান ও কমলার সহিত মহর্ষির ব্যবহার যেন গৃহস্থ ঘরেরই পিতা ও পুত্র-কন্যার মতো।

বনের বানর দল তাহাদের সুখে দুঃখে এই মহাপুরুষকেই কেন্দ্র করিয়া আশ্রমে আসা যাওয়া করে। এইসব জীবজন্তুদের ভাষা মহর্ষি জানেন না, কিন্তু ইহাদের প্রতিটি আচরণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় আছে। ইহাদের বিবাহ, সন্তান প্রসব ও মৃত্যুর সময়ে মানুষের করণীয় সবকিছু সংস্কার-অনুষ্ঠান তিনি সম্পন্ন করান, নহিলে তাঁহার স্বস্তি থাকে না।

মহর্ষির কাছে তাঁহার আশ্রমটি ছিল এক রঙ্গমঞ্চ বিশেষ। কাজ-কর্মের ভিড়ে, অতিথি ও দর্শনার্থীদের মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেন নিতান্তই এক অভিনেতারূপে। এই ভূমিকায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কত কৌতুক করিতেও দেখা যাইত।

সেদিন তিনি নিজের কক্ষে বসিয়া আছেন অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এক ভিখারী দুটি অন্নের জন্য মিনতি জানাইতেছে। জীর্ণ মলিন বসন পরিহিত লোকটিকে কেহ আমল দিতেছে না, বিশিষ্ট অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়াই সকলে ব্যস্ত।

জানালার ধারে আসিয়া মহর্ষি ভিখারীটিকে ইসারায় ডাকিলেন, যেন লোকটির সাথে তাঁহার এক গোপন কথা রহিয়াছে। কাছে আসিতেই চুপি চুপি বলিয়া দিলেন ভিক্ষা আদায়ের কৌশল।

কহিলেন, "ওরে, তুই দেখছি একেবারে বোকা। এমনি ক'রে কি ভিক্ষা জোটানো যায়? আমার পরামর্শ শোন্। আজই একছড়া মালা যোগাড় কর্, পরনের কাপড় আর ঝুলিটাকে গৈরিক রঙে রাঙিয়ে নে। তারপর সরাসরি ঐ পাশের গলি দিয়ে আশ্রমের ভেতরে গম্ভীরভাবে ঢুকে পড়্। তোতাপাখির মতো ভগবানের দু'চারটি নাম মুখস্থ ক'রে বলতে থাক্। দেখবি কর্মকর্তারা অমনি ছুটে দৌড়ে আসবে, প্রচুর ভিক্ষা দেবে। নইলে শুধু ও রকম কান্নাকাটি করলে কি এ আশ্রমে কেউ ভালো মনে ভিক্ষা দেয় রে!"

মহাজ্ঞানী তপস্বীকে কেন্দ্র করিয়া অরুণাচলের এ আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছে বটে, নিজে তিনি কিন্তু অরুণাচল পাহাড়ের চূড়ার মতোই রহিয়াছেন সদা সমুন্নত, অনাসক্ত। নিচেকার আলোড়ন ও কর্মচক্রকে অতিক্রম করিয়া একক মহিমায় রহিয়াছেন বিরাজমান।

ভ্রান্তবুদ্ধি সাধকদের চৈতন্যোদয়ের জন্য রমণ মাঝে মাঝে রূঢ়ভাষী হইতেন, শ্লেষাত্মক বাক্যও প্রয়োগ করিতেন।

সেবার এক ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী রমণাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। এখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল তিনি অবস্থান করেন। একটি হাত তাঁহার দিনরাত ঊর্ধ্বে উঠানো থাকে। ইহা তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনার এক অঙ্গ। আশ্রমে আসিয়া তিনি মহর্ষি'র কক্ষে প্রবেশ করেন নাই। বহিরাঙ্গনে বসিয়া থাকেন এবং সেখান হইতে মহর্ষি'কে প্রশ্ন করিয়া পাঠান, "আমার সাধনজীবনের ভবিষ্যৎ কি, কথাটি আজ আপনাকে বলে দিতে হবে।"

"ওকে বলে দাও, ওর ভবিষ্যতের অবস্থা ঠিক বর্তমানের মতোই"—কিছুটা রূঢ়ভাবেই রমণ উত্তর দিলেন।

বলা বাহুল্য, ঊর্ধ্ববাহু থাকিয়া শরীরকে অনর্থক নির্যাতন করাকে তিনি সুচক্ষে দেখেন নাই। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠা লাভের যে প্রচ্ছন্ন কামনা সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, তাহাতেও বিরক্ত হইয়াছেন।

আর একবার এক বিশিষ্ট সাধক মহর্ষি'কে দর্শন করিতে আসেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাঁহার সমান দখল। এখানে পৌঁছানোর পর হইতেই তিনি অনর্গলভাবে নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিতেছেন। দীর্ঘ বক্তৃতার পর সেদিন রমণকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মহর্ষি, শাস্ত্র ও সাধকেরা তো এত বিভিন্ন ধরনের পথ-নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের কোন্ কথা সত্য বলে মানবো? কোন্ নির্দিষ্ট পথেই বা আমি চলবো?"

উত্তর হইল—"যে পথে এসেছ, সেই পথেই ফিরে যাও।"

আগন্তুক বড় ক্ষুণ্ণ হন, বার বার বলিতে থাকেন, মহর্ষি'র এই উত্তর তাঁহার কোনো সাহায্যেই আসিবে না। তবে আর এখানে আসিয়া তাঁহার কি লাভ হইল?

এক ভক্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, "মশাই, মহর্ষি'র কথার গূঢ় অর্থ রয়েছে। চিন্তা ধারার বিবর্তনের পথে যেখানে এসে আপনি উপস্থিত হয়েছেন, সেখান থেকে আগেরই পথ ধরে মনের উৎসস্থলে ফিরে যান, এই ইঙ্গিতই তিনি আপনাকে দিলেন!"

অপর ভক্তেরা কিন্তু মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, মহর্ষি'র এই দ্ব্যর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথার অর্থ অন্যরূপ। তিনি বরং এই বিদ্যাভিমানী আগন্তুককে প্রস্থান করিতেই বলিলেন।

সুন্দরেশ আইয়ার এক পুরাতন ভক্ত। দীর্ঘ দিন রমণের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছে। সে-বার অফিস হইতে নির্দেশ আসিল, সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে আর এক শহরে তাঁহাকে বদ্‌লী হইতে হইবে। তিনি বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। এ বদ্‌লী তাঁহার পক্ষে বড় মর্মান্তিক। মহর্ষিকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও গেলে কি করিয়া বাঁচিবেন?

বিষণ্ণ হৃদয়ে কহিলেন, "চল্লিশ বৎসর ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করার পর আজ আমায় বাইরে—দূরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কি ক'রে থাকবো?"

রমণ তৎক্ষণাৎ সকলকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই শোন আইয়ারের অদ্ভুত কথা! চল্লিশ বৎসর ধরে এখানকার উপদেশ সে পেয়ে আসছে। অথচ আজকে বল্‌ছে, ভগবানের কাছ থেকে নাকি দূরে চলে যাচ্ছে?"

এই শ্লেষের মধ্য দিয়া যে তত্ত্বটি সেদিন তিনি বুঝাইতে চাহিলেন তাহা তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার সাধনার মর্ম, উদ্‌ঘাটন করে। নিত্যবস্তুরূপে, সদ্‌গুরু সত্তারূপে তিনি যে সর্বত্র আছেন বিরাজমান। তাছাড়া, আত্ম-উপলব্ধির সাধনা যে শিষ্যেরা এতকাল পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা মহর্ষির দেহের সান্নিধ্য না পাইলে এমন চঞ্চল হইবে কেন?

১৯৫০ সালে রমণ মহর্ষির দেহে উদ্‌গত হয় এক বিষাক্ত টিউমার। চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি যাহা কিছু দরকার, সবই হইয়া গিয়াছে আর ইহাকে ঠেকানো যাইতেছে না। শিষ্যেরা বুঝিলেন, এই ব্যাধিকে উপলক্ষ করিয়াই মহর্ষি নরদেহ ত্যাগ করিতে চান।

অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। ভক্তেরা গুরুর নিরাময়ের জন্য নিষ্ঠাভরে আশ্রমে শুরু করিয়াছেন নামকীর্তন ও শাস্ত্রপাঠ।

জনৈক ভক্ত রমণকে একান্তে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এসব কি সত্যই কার্যকরী হবে? মহর্ষি কি এর ফলে সেরে উঠবেন?"

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "দ্যাখো ভাল কাজে রত থাকা সব সময়েই ভাল। ওরা এসব করছে, করুক না, ক্ষতি কি?"

রোগপাণ্ডুর রোগীর মুখের হাসিটি কিন্তু তেমনই রহিয়া গিয়াছে। তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যেও ভাবপ্রবণ ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া তিনি রসিকতা করিতে ছাড়িতেছেন না।

গুরুর এই প্রাণঘাতী ক্ষত দর্শনে সেদিন এক মহিলা-ভক্ত শোকে অধীর হইয়া উঠেন। কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া এক স্তম্ভের উপর সজোরে তিনি মাথা ঠুকিতে থাকেন।

সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মহর্ষির চোখ দুইটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। রহস্যভরে বলিয়া বসেন, "তাই বল, আমি, এতক্ষণ ভাবছিলাম ও বুঝি ঠুকে ঠুকে ওখানে নারকেল ভাঙছে।"

অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়। ভক্তেরা শুধু কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর মহর্ষির দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া থাকেন।

সকলকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি সেদিন কহিলেন, "দ্যাখো, এই দেহটি হচ্ছে যেন এক কদলীপত্র। এর ওপর অনেক কিছু মুখরোচক খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোজন শেষ হয়ে গেলে আমরা কি কখনো এই পাতাটিকে সঞ্চয় ক'রে রেখে দিই? কাজ ফুরিয়ে গেছে বলে একে কি পরিত্যাগ করিনে? কাজেই এ দেহের জন্য দুঃখ কি, বল তো?"

সারা আশ্রমে ঘনাইয়া আসে বিষাদের কালো ছায়া। ভক্তদের অন্তস্তল হইতে উঠে মর্মভেদী আর্তি। মহর্ষির অদর্শন কি করিয়া সহ্য করিবেন? কে আর তাঁহাদের দিবে এমন আশ্রয়?

মহর্ষি একদিন সান্ত্বনার সুরে তাহাদের কহিলেন, 'তোমরা কিন্তু এ দেহটার ওপর বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ। সকলে বলছে, আমি নাকি মরতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো সত্যিই যাচ্ছিনে। কোথায় আবার যাবো, বল তো? আমি যে চিরদিনই এইখানে।"

মহাপ্রয়াণের আগের দিন। ব্যথা কমানোর জন্য ডাক্তার এক নূতন ঔষধ দিতে যাইতেছেন। মহর্ষি সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ব্যস্, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন এ দেহের নেই। চিন্তা নেই, দুদিনের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বুঝিতে বাকী নাই—বিদায়ের ক্ষণটি এবার আসন্ন।

১৯৫০ সালে ১৪ই এপ্রিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভক্তদল মহর্ষির শয্যার চারিপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। গভীর স্নেহে, সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহর্ষি আজ যেন তাঁহাদের দীর্ঘ সাহচর্য ও সেবার স্বীকৃতি দিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "ইংরেজ-দের ভাষায় একটা কথা রয়েছে, থ্যাঙ্কস। আমরা বলি, সন্তোষম্।"

ধীরে ধীরে অরুণাচলের আকাশে নামিয়া আসে রাত্রির ঘন অন্ধকার। উদ্গত শোকাশ্রু গোপন করিয়া একদল ভক্ত বারান্দায় গিয়া বসেন, গাহিতে থাকেন স্তবগান—'অরুণাচল-শিব'।

রাত্রি তখন প্রায় পৌনে নয়টা। ক্ষণতরে মহর্ষির অতলস্পর্শী নয়ন দুইটি ঝলকিয়া উঠে। তারপরই নামিয়া আসে তাঁহার জীবন-লীলানাট্যের উপর চিরবিরতির যবনিকা।

প্রাণবায়ু উৎক্রমণের মুহূর্তে দৃষ্টিগোচর হয় এক অলৌকিক দৃশ্য। চকিত উল্লাসনের মধ্য দিয়া একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আশ্রমের উপরিভাগ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়: তারপর উর্ধ্বে উঠিয়া মিলাইয়া যায় নিঃসীম আকাশের দিগন্তে। এক বিশিষ্ট ফরাসী প্রেস-ফটোগ্রাফার রমণ মহর্ষির অন্তিম সময়ের একটি ছবি তোলার জন্য ব্যাকুলভাবে বারান্দায় পদচারণা করিতেছিলেন। ধাবমান নক্ষত্রের এই অদ্ভুত আলোক বিচ্ছুরণ দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, আশ্রমস্থ আরো অনেকেই এ অলৌকিক দৃশ্যটি দর্শন করিয়াছেন। সুদূর মাদ্রাজ শহরেও ঠিক একই সময়ে এ আলোর ঝলক্ অনেকের চোখে পড়িয়াছে।[১]

দীর্ঘ বৎসর আগে অরুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে, স্থান দেয় আপন ক্রোড়ে। সাধনা ও সিদ্ধির শেষে সেই অরুণাচলেরই পরমসত্তায় কি রমণ আজ লীন হইলেন?

'তেজোলিঙ্গম' অরুণাচলের চিরন্তন মাহাত্ম্য রমণ মহর্ষি গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহার অনুপম 'অরুণাচল অষ্টকম'-এ।

—সাগরের বারি সূর্যকর ও বায়ুতে হয় উত্তোলিত; নেমে আসে মেঘ আর বর্ষণের

১ রমণ মহর্ষি: এ অসবোর্ন

ভেতর দিয়ে পাহাড় চূড়ায় চূড়ায় আর উপত্যকার কোলে। আবার মিশে যায় সে তার উৎসে—সেই সাগরের বুকে। সেখানেই ঘটে তার চরম বিরতি।

—বলাকার সারি আকাশে ডানা মেলে চলে যায় দূর দিগ্‌দিগন্তে-আবার তারা ফিরে আসে তাদের বিশ্রাম-নিলয়ে।

—যে সূক্ষ্ম আত্মা একদিন সৃষ্টির আদিকালে আবির্ভূত হয়েছিল তোমা থেকে, হে পবিত্র শৈল, আবার ফিরতে হবে তাকে তোমারই সেই মহাসত্তায়। হে পরম আনন্দ স্বরূপ! তোমাতেই সে নেবে তার শরণ, চিরবিশ্রাম—ডুবে যাবে তোমার গভীরে, গলে মিশে যাবে তোমার অমৃতধারায়—তোমার সঙ্গে হয়ে উঠবে সে অদ্বৈতস্বরূপ।[১]

সেই অদ্বৈতস্বরূপেই মহর্ষি সেদিন বিলীন হইয়া গেলেন।

১ সংদর্শন ভাষ্য—(রমণ-গীতাবলী), রমণাশ্রম।

শ্রী অরবিন্দ

মুক্তির পরম মন্ত্র যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষদের কণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়াছে। জীবনযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া মুমুক্ষু মানুষের জন্যে তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন অমৃতের সঞ্চয়। এই সর্বত্যাগী তাপসদেরই এক উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ।

এই মহাপুরুষের জীবনের স্তরে স্তরে বিধাতাপুরুষ অকৃপণ করে তাঁহার ঐশ্বর্য ঢালিয়া দেন; জীবনের শতদলটি ভরিয়া উঠে রঙে, রসে, সৌগন্ধে ও দিব্য লাবণ্যে। লোকোত্তর মেধা, মনীষা ও কবিত্বের সঙ্গে অরবিন্দের জীবনে দেখা দেয় অসামান্য দার্শনিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শক্তি। তারপর এই জীবন পরিধি অচিরে হইয়া উঠে আরো বিস্তৃত, আরো গভীর। বহিরঙ্গ জীবনের মুক্তিসংগ্রাম একদিন অধ্যাত্মমুক্তির দিব্য চেতনায় ভাস্বর হইয়া উঠে।

সর্বত্যাগী মহাসাধক এবার তাঁহার জ্যোতির্ময় জীবনের প্রাঙ্গণতলে আসিয়া দাঁড়ান। বিধাতার দেওয়া সমস্ত কিছু সমৃদ্ধিকে জ্বালাইয়া দেন সমিধরূপে। জীবনযজ্ঞ তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে। শুধু দিব্য জীবনের অমৃতবার্তাটি ঘোষণা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না, যে পরম উপলব্ধি তাঁহার সাধনসত্তায় উপজিত হয়, মানবকল্যাণে তাহাই অবলীলায় বিলাইয়া দিয়া যান।

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দই দেশমাতৃকার মধ্যে সর্বপ্রথম দেবীত্বের আরোপ করেন, ইহা সত্য। কিন্তু এই তত্ত্বকে জনচৈতন্যে তুলিয়া ধরেন অরবিন্দ। তাঁহার ধ্যানকল্পনা, তাঁহার সাধনা সেদিন স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেয়—জগন্মাতা আর দেশমাতা ভেদ নাই। আর তাঁহার এই মাতৃপূজায় চরম ত্যাগ ও আত্মদানের আহ্বানও তিনি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার প্রতিভা ও সত্য দৃষ্টি এ আদর্শকে করিয়া তোলে ব্যাপকতর। রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিসর ধূলিধূসর ক্ষেত্রে অধ্যাত্মশক্তিকে তিনি উৎসারিত করিয়া দেন। এদেশের রাজনীতিতে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের দিক দিয়া অরবিন্দ অবতীর্ণ হন এক নব পথিকৃৎরূপে।

অরবিন্দ বিশ্বাস করিতেন, ভারতের অধ্যাত্ম-জাগরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে জগতের প্রকৃত কল্যাণ। আর এই জাগরণ, রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। তাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ব্রত সম্বন্ধে এমনতর নিষ্ঠা তাঁহার ছিল। শিক্ষাব্রত ত্যাগ করিয়া সেইজন্য তিনি একদিন রাজনীতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। কিন্তু দৃষ্টি তাঁহার কোনোদিনই চরম লক্ষ্য হইতে সরিয়া যায় নাই, মুক্তিসংগ্রামের মহত্তর অধ্যায়টি উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি হইতে নিজেকে তিনি সরাইয়া নেন, আত্মিক শক্তি আহরণের জন্য করেন সর্বস্ব পণ।

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম অরবিন্দের দৃষ্টিতে ছিল এক ধর্মযুদ্ধ, ইহার সম্ভাবনাও ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে অপরিসীম। তাই পুরুষোত্তম বাসুদেবকে জাতির পুরোভাগে তিনি স্থাপন করেন পরম পুরুষরূপে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম চেতনার তরঙ্গ বহাইয়া দেন।

উত্তরজীবনে তাঁহার নিজের অধ্যাত্ম-সংগ্রামের পুরোভাগেও এই বাসুদেবকেই আমরা দণ্ডায়মান দেখি। আলিপুরের কারাকক্ষে একদিন যে অলৌকিক চেতনার উন্মেষ হয়,

পরবর্তীকালে ঘটিতে দেখা যায় তাহারই এক মহত্তর এবং জ্যোতির্ময় প্রকাশ। দিব
জীবনের বার্তা তাঁহার মহাজীবনে ধ্বনিত হয়।

অরবিন্দের জীবন-শতদল থরে থরে তাহার দল মেলিয়া দেয়—অমৃতলোকে ঘ
তাঁহার মহাউত্তরণ।

আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার হুগলী জেলার অবদান প্রায় অতুলনীয়
রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও অরবিন্দ—ভারতের এই তিন বিশিষ্ট ধর্মনেতাকে হুগলী এব
শতাব্দীর মধ্যে উপহার দিয়াছে। কোন্নগর এই জেলারই এক ক্ষুদ্র জনপদ। এখানকা
প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে, ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের গৃহে, অরবিন্দ আবির্ভূত হন।

মনীষী ও মহাপ্রাণ সমাজনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতাকে ডাঃ ঘোষ বিবাহ
করেন। আর এই ঘোষ দম্পতিরই তৃতীয় সন্তানরূপে, ১৮৭২ সালের ১১ই আগস্ট
অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন।

মাতৃ ও পিতৃকুলের যে দুইটি বেগবতী সাংস্কৃতিক ধারা অরবিন্দের মধ্যে আসিয়া
মিলিত হয় তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। একদিকে তাহার দেখি—
ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রাজনারায়ণের প্রভাব, অপরদিকে পাশ্চাত
সংস্কৃতি ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাঃ কৃষ্ণধনের ব্যক্তিত্ব ও গতিবেগ।

এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. উপাধি নিয়া ডাঃ কৃষ্ণধন যেদিন দেশে ফিরিয়া
আসেন, কোন্নগরের রক্ষণশীল সমাজে সেদিন এক মহা আলোড়ন পড়িয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত
না করিলে কোনোমতেই তাঁহাকে সমাজে স্থান দেওয়া হইবে না। কৃষ্ণধনের তেমনি দৃঢ়
পণ, কিছুতেই তিনি মাথা নোয়াইবেন না। অবশেষে ক্রোধভরে পৈতৃক ভদ্রাসন এক
দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে নাম মাত্র মূল্যে তিনি বিক্রয় করিয়া দিলেন। কোন্নগরের বাস
চিরতরে উঠিয়া গেল।

উৎকট সাহেবিয়ানা ছিল কৃষ্ণধনের, আবার তেমনি ছিল একগুঁয়ে স্বভাব। অথচ
ইহারই আড়ালে সংগোপিত ছিল এক মহানুভব, দরিদ্র-বান্ধব ব্যক্তির স্পর্শচেতন মন।

ডাঃ ঘোষ তখন উত্তরবঙ্গে সরকারী কাজে রত। ম্যালেরিয়ার জন্য তাঁহার অঞ্চলটি
কুখ্যাত। একটি হাজামজা খালের সংস্কার করা অবিলম্বে দরকার, জলনিকাশের ব্যবস্থা
না হইলে লোকের দুর্ভোগ বাড়িবে। সরকারী বিলি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কোনো
লাভ নাই, উহা বড় মন্থর গতিতে চলে। অথচ এদিকে রোগের আক্রমণে বহু লোকের
মৃত্যু ঘটিতেছে। এই দুর্দশা দেখিয়া ডাক্তার ঘোষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ঐ খাল
সংস্কারের জন্য বহু সহস্র টাকা তিনি দান করিয়া ফেলিলেন। এজন্য তাঁহাকে ঋণভার
ও অর্থকষ্ট কম সহ্য করিতে হয় নাই।

মানবকল্যাণের জন্য নিঃস্ব হওয়ার এই শক্তি কৃষ্ণধনের পুত্র অরবিন্দের জীবনে
তীব্রভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণধন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী। অরবিন্দকে তাই পাঁচ বৎসর বয়সেই
দার্জিলিং-এর ইংরেজ-স্কুলে তিনি পড়িতে দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনধারার প্রতি
পিতার উৎকট মোহ এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই, ১৮৭৯ সালে অপর দুই ভ্রাতার সহিত
অরবিন্দকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই এবার হইতে তিনি
পড়াশুনা করিবেন। এ-সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর।

অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা এই বালকের। বাল্যকালেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন হন। পরে ইটালীয়ান ও জার্মান ভাষাতেও তাঁহার দক্ষতা জন্মে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করার পর অরবিন্দ কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঐ বৎসরই, আঠার বৎসর বয়সে, তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেধাবী তরুণ এই পরীক্ষায় গ্রীক ও ল্যাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কিন্তু সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে এ মহাজীবনকে বন্দী করিয়া রাখিবে কে? দুই বৎসর বেশ দক্ষতার সহিত তিনি শিক্ষানবিশী করিলেন। তারপর দেখা গেল, অশ্বারোহণ পরীক্ষার দিন তিনি উপস্থিত নাই। অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন, এসময়ে তিনি পরমোৎসাহে তাস খেলিতেছিলেন।

সিভিল সার্ভিসের কর্মবন্ধন অরবিন্দ সেদিন যেন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া যান। ভবিষ্যতের মহামানব ও লোকগুরুর জীবনধারা মুক্ত ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

যে জীবনে একাগ্রতা ও দুঃসাহসের অবধি নাই, এই ঘোড়ায় চড়ার দিনে হঠাৎ তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল মনে করিলে প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে। বাস্তব জীবনের নানা দুরূহ ক্ষেত্রে অরবিন্দের পারদর্শিতা কোনো দিনই কম ছিল না। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত তাঁহার 'পুরোনো কথার উপসংহার'-এ এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিভিল সার্ভিসে কাজ করেন। অরবিন্দ সেদিন তাঁহার বাংলোতে আসিয়াছেন। বারান্দায় বসিয়া বন্দুক নিয়া হৈ-হল্লা চলিতেছে। অরবিন্দকে আহ্বান করা হইল, তাঁহাকে আজ লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। বন্দুক চালনার অভ্যাস নাই বলিয়া প্রথমে কিছুটা ওজর আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে রাজী করানো গেল।

শ্রীযুক্ত দত্ত লিখিয়াছেন, "শেষে বন্দুক ধরলেন। সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হল, কি ক'রে নিশানা করতে হয়। তারপরে বার বার লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্য কি পাঠককে বলে দিই, দেশলাইর কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে?"

এমনি একাগ্রতা ও কর্মতৎপরতা যাঁহার, অশ্বচালনা নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে কঠিন কিছু না।

বরোদা স্টেটের কাজ নিয়া অরবিন্দ ভারতে ফিরিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার জ্ঞান তখন নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু নিজের দেশ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ তাঁহার অপরিসীম। এই আগ্রহ নিয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপে লালিত ও শিক্ষিত তরুণের আননে দৃঢ়সংকল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে—ভারতাত্মার মর্ম তিনি উদ্ঘাটন করিবেন, দেশাত্মবোধের মধ্য দিয়া জাগাইয়া তুলিবেন আত্মোপলব্ধির পরম সাধনা।

স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাকে তিনি আত্মপরিচয়ের কাজে নিয়োজিত করিলেন। তের বৎসরের জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়া মনীষী অরবিন্দের সাথে প্রাচীন ভারতের কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইল। ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল ভবিষ্যৎ দেশনেতা ও লোকগুরুর আত্মপ্রস্তুতির সাধনা।

রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ অরবিন্দ এ সময়ে অনুবাদ করিতে থাকেন। একদিন রমেশ দত্ত মহাশয়ের সহিত বরোদায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দত্তমহাশয় অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী—বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠা দায়। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ তিনিও করিতেছেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোচকদের প্রশংসাও তাহা অর্জন করিয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র অরবিন্দের অনুবাদগুলি দেখিতে চাহিলেন। অরবিন্দ স্বভাবত লাজুক মানুষ, তাই মনীষী রমেশচন্দ্রকে নিজের রচনা দেখাইতে বড় কুণ্ঠা বোধ করিতে-ছিলেন।

অবশেষে ঐ অনুবাদ তাঁহাকে পাঠ করিতে হইল। শোনার পর রমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন, "আজ কেবলি মনে হচ্ছে, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে কেন আমি পণ্ডশ্রম করেছি। আমার দুঃখই হচ্ছে। তোমার এই কবিতাগুলো আগে দেখলে আমার লেখা কখনো ছাপাতাম না। এখন মনে হচ্ছে, সত্যি ছেলেখেলা করেছি।"

গোড়ার দিকে অরবিন্দ বরোদা স্টেট সার্ভিসে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিতেন। পরে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া স্টেট কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা শুরু করেন। ক্রমে তিনি এখানকার ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত হন।

একদিকে বরোদার মারাঠী ছাত্রদের সহিত যেমন তাঁহার প্রাণের যোগাযোগ গড়িয়া উঠে, তেমনি অপর দিকে মারাঠাকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের সহিতও এ-সময়ে তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। তিলকের সহিত তাঁহার এই সখ্য উত্তরকালে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

বরোদায় থাকাকালে অরবিন্দ বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারধর্মে তিনি চির উদাসীন। ত্যাগ-তিতিক্ষাময় এই জ্ঞানতপস্বীর জীবনে পত্নী মৃণালিনী দেবীর আবির্ভাব তাই কোনো পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। মহীয়সী পত্নীও স্বামীর দেশসেবা ও মুক্তিসাধনার ধারাকে নিজস্ব খাতে বহিয়া যাইতে দিয়াছেন। অরবিন্দর ব্রত উদ্‌যাপনের পথে মৃণালিনী এক-দিনের তরেও অন্তরায় ঘটান নাই। আত্মবিলুপ্তির এক অপূর্ব নিদর্শনই তাঁহার জীবনে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ মানসের এক স্পষ্ট বিবর্তন আমরা দেখি বরোদা-জীবনের শেষ পর্যায়ে। দেশমাতৃকার ধ্যানরূপ তখন তাঁহার অন্তর্লোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক মুক্তির বহু ঊর্ধ্বে ভারতীয় আত্মিক সাধনার বেদীতে উহা তিনি স্থাপিত করিতে চান। রাজনীতির এ অধ্যাত্মরূপান্তরকে অরবিন্দ তখন মণ-প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ ও তাঁহার পরিকল্পিত জাতীয় মুক্তির পার্থক্য এবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

মনীষী শিক্ষাব্রতী অরবিন্দের জীবনমঞ্চে এবার আসিয়া দাঁড়ান মুক্তিসংগ্রামের নেতা ও রাজনৈতিক চিন্তানায়ক অরবিন্দ। আড়ালে বসিয়া জীবন-দেবতা বোধহয় হাসিয়া বলেন —ইহা বাহ্য। বিবর্তনের ধারা আরো অগ্রসর হয়। সর্বশেষে দেশনেতা অরবিন্দের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে—মহাসাধক অরবিন্দ।

অরবিন্দের এ সময়ে দৃঢ় প্রত্যয় আসিয়া গিয়াছে—অধ্যাত্ম ভারতের জাগরণের আর দেরি নাই। এ মহতী জাগরণের প্রস্তুতিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এই অভ্যুদয়ের দূর বিস্তারী প্রভাব মনীষী ও সাধক অরবিন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তাই ঠাকুর সম্পর্কে তিনি লিখেন—

"আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য মতবাদে আস্থাবান কোনো ব্যক্তি হয়তো বলিয়া বসিবেন, 'এই লোকটি জ্ঞানহীন। কি সে জানে? আমি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, আমাকে সে কি-ই বা শেখাবে?' কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, তিনি কি আজ ঘটাইয়া তুলিতেছেন। তিনিই এই ব্যক্তিকে বাঙলাদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ইঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরতলে বসাইয়া দিয়াছেন, আর আজ ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম হইতে শিক্ষিত জনগণ—যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের সমস্ত শিক্ষা যাঁহাদের অধিগত—তাঁহারা এই তাপসের পদপ্রান্তে আসিয়া নিপতিত হইতেছেন। আমি তাই বিশ্বাস করি, মুক্তির কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"

১৯০৩ সালে অরবিন্দ তাঁহার ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করেন। পুস্তিকাকারে এসময়ে ইহা প্রকাশিতও হয়। স্থির হয় যে, দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হইবে, আর এগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম। এই আশ্রমের কর্মীরা চারিদিকের জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং গঠনমূলক কাজে ব্রতী হইবে। সেই সঙ্গে চলিবে তাহাদের সামরিক সংগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনকারী যোগাভ্যাস।

স্বাধীনতা সমরের তরুণ যোদ্ধা ও মা-ভবানীর সেবকদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় অরবিন্দ ব্রতী হইয়া পড়েন। প্রথমটায় নর্মদা তীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর কলিকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

সে সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমের গুরু ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। উচ্চকোটির যোগী বলিয়া এই মহাত্মার খ্যাতি ছিল। ইঁহাকে অরবিন্দ মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করিতেন এবং যোগীবরের কৃপাদৃষ্টিও তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল।

প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়া অরবিন্দ সে-বার ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। শিবকল্প মহাপুরুষের কাছে দিগ্বিদিক হইতে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সমবেত হইতেছে। তিনি কিন্তু প্রায় সময়েই থাকেন ধ্যানাবিষ্ট। সহসা কাহারো দিকে তাঁহাকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করিতে দেখা যায় না। অরবিন্দ যাওয়ার পরই কিন্তু এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যোগীবরকে প্রণাম করিয়া উঠামাত্র তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন। তাঁহার কৃপালাভ করিয়া অরবিন্দ সানন্দে ফিরিয়া আসেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য কেশবানন্দজীর সহিতও অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা হয়, এক প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। এই সম্পর্ক দীর্ঘদিন বর্তমান ছিল।

বরোদায় থাকার সময়ে দেশপাণ্ডে ছিলেন অরবিন্দের এক ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্‌ ও সহকর্মী। এই দেশপাণ্ডে এবং কেশবানন্দের সহযোগিতায় তাঁহার ভবানী মন্দির পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতে থাকে। একদল কিশোর ছাত্রকে এই সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমে রাখিয়া গড়িয়া পিটিয়া তোলার চেষ্টা করা হয়।

পুণ্যতোয়া নর্মদার অপর পারে রাজপিপ্‌লা রাজ্যের ছারোডী শহর। এখানকার এক আশ্রমে প্রসিদ্ধ যোগী মাধরিয়া বাবার বাস। সিদ্ধ সাধক হিসাবে সে অঞ্চলে তাঁহার

তখন খুব প্রসিদ্ধ। যোগীবর সিপাহী যুদ্ধের এক প্রাক্তন যোদ্ধা ছিলেন বলিয়াও অনেকে বলিত। সাধরিয়া বাবা শ্রঅরবিন্দকে বরাবরই ভালবাসিতেন। দেশোদ্ধারের পরিকল্পন এ মহাপুরুষের আশিস্‌ও অরবিন্দ প্রাপ্ত হন। ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধরিয়া বাবা সেখানে বাস করিবেন—এ প্রতিশ্রুতিও অরবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে আদায় করেন দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছায়োতীর এই মহাত্মার লোকান্তর ঘটে।

বরোদায় শিক্ষাব্রতী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অরবিন্দকে প্রায়ই ছুটি নিতে দেখা যায়। ভবানী মন্দিরের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনায়ও এ সময়ে তিনি অগ্রসর হইতেছেন।

মন যত অন্তর্মুখীন হইতে থাকে, সাধন পথের নিগূঢ় নির্দেশলাভ করার জন্য অরবিন্দ ততই ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

এইবার মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের প্রভাব কিছুটা পড়ে অরবিন্দের সাধন-জীবনে। যোগসাধনা সম্পর্কে লেলের কাছ হইতে নানা মূল্যবান নির্দেশ তিনি প্রাপ্ত হন।

চিত্তের সহজাত একাগ্রতা নিয়া অরবিন্দ জন্মিয়াছেন। এই একাগ্রতার বলে অতি সহজে ধ্যানের গভীরে তিনি ডুবিয়া যাইতেন, বাহ্য জগতের চেতনাও প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

এবার অরবিন্দের জীবনে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে তাঁহার লোকগুরু মূর্তি। বরোদা জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্মী দেশপাণ্ডে ও মাধবরাও যাদবকে তিনি 'ওঙ্কার জপ' শিক্ষা দেন। একাগ্রভাবে তাঁহাদিগকে এই জপ অভ্যাস করিতে দেখা যাইত।

শ্রীযুক্ত চারু দত্ত অরবিন্দের এক অনুরাগী বন্ধু ও ভক্ত। অরবিন্দের সাধনজীবনে এ সময়ে যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার কিছুটা দত্তমহাশয়ের জানা ছিল। তাই একদিন তিনি কিছু সাধননির্দেশ চাহিয়া বসিলেন।

শ্রীযুক্ত দত্ত লিখিয়াছেন, "একদিন কথায় কথায় তাঁকে (অরবিন্দ) বললাম, একটা ভাল জিনিস কিছু দাও না ভাই, যার উপর একাগ্র হবার চেষ্টা করতে পারি। এবার আর 'নট ইয়েট' বলে কথাটা উড়িয়ে দিলেন না। তবে আশ্বাসও দিলেন না। দুই একদিনে বরোদায় ফিরে গেলেন। এদিকে আমি একদিন খেয়ালবশে সন্ধ্যা-বেলায় চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে আড় হয়ে বসতেই একটু তন্দ্রার মতো এল—অকস্মাৎ আমার নজর চলে গেল বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে, সেখানে এক অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, জ্যোতির্ময় পদ্মাসনে ধ্যানস্থ। মুখখানি কোনো চেনা লোকের নয় কিন্তু অতি মধুর। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কতবার, যখনই চেয়েছি তখনই, সেই মূর্তি দেখেছি। ইদানীং অনেকবার দেখেছি যে, তাঁর মুখ যেন শ্রীঅরবিন্দের মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল।"

এ তথ্যটি হইতে বুঝা যায়, শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান্ লোকের আধারে এ ধরনের অধ্যাত্ম-অনুভূতি জাগাইয়া তোলার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই অরবিন্দ লাভ করিয়াছেন।

অনুগামী সাধকদের অনেক কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই কিন্তু সেদিনের নূতন

যোগী অরবিন্দের চক্ষু এড়াইত না, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। ১৯০৬ সালে এই চারুবাবুকেই তিনি বরোদা হইতে লিখিতেছেন, "আচ্ছা, তুমি যখন আনমনা হয়ে চুপটি ক'রে ব'স তখন কোনো রঙ দেখতে পাও? একই রঙ না, নানা রকমের রঙ?"

চারুবাবু উত্তরে তাঁহাকে জানাইয়া দেন, সব সময়েই একটি গোলাপী রঙ দৃষ্টিগোচর হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করিয়া দেয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠে সমগ্র দেশের সুপ্ত শক্তি। জাতীয় জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষাই অরবিন্দ করিতেছিলেন। এবার বরোদা ত্যাগ করিয়া বিক্ষোভ-চঞ্চল বাংলার কর্মক্ষেত্রে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গোড়ার দিকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থাপিত, জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদ তিনি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জীবনবিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ঘটনাচক্রে অচিরে তাঁহাকে শিক্ষাব্রতীর জীবন হইতে সরাইয়া আনে, স্থাপন করে জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে। মুক্তিযজ্ঞের পুরোধারূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকরূপে এ সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে যে বাণী নিঃসৃত হয় তাহা শুধু দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধই করে নাই, মুক্তিসংগ্রামের চিন্তাধারায়ও আনিয়া দেয় বিপ্লব। প্রকাশ্যে, সুস্পষ্ট ভাষায়, সকলের আগে তিনি ঘোষণা করেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ।

স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ জাগাইয়া তোলেন দেশের অধ্যাত্মচেতনা। যুগে যুগে যে আত্মিক রসধারা ভারতের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, সে সম্বন্ধেও তিনি দেশবাসীকে সজাগ করিয়া তুলিতে থাকেন।

ভারতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে রহিয়াছে অরবিন্দের সহজাত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বাণীই অপরূপ ভাবে ও ভঙ্গীতে তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে দিগ্বিদিকে ছড়াইতে থাকে। নবীন ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক নেতারূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

সুরাট কংগ্রেসের সংঘর্ষে তিলক ও অরবিন্দের জয় ঘোষিত হয় এবং ইহার পর হইতেই জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটে। আত্মপ্রতিষ্ঠ সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুরু হয় উহার পদক্ষেপ।

সুরাট-সংঘর্ষ অরবিন্দের জীবনের এক নূতন পর্বের সূচনা করে। মনীষী চিন্তানায়ক এবার দেশের প্রকাশ্য রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়ান—পাদপ্রদীপের আলোকে গ্রহণ করেন জননেতার এক নূতন ভূমিকা।

কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনের এ কর্মচাঞ্চল্য তাঁহার অন্তরের শান্তিকে ব্যাহত করে নাই। নিষ্কাম কর্মযোগী ইতিমধ্যেই সব কিছু হইতে নিজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছেন। বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দের এ অন্তর্লীন রূপটি সুরাট কংগ্রেসের মঞ্চে ফুটিয়া উঠিতে দেখেন। তিনি লিখিয়াছেন,—সুরাট অধিবেশনে চারিদিকে তখন মার্ মার্ শব্দে ইঁটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। গরম ও নরম দলে সংঘর্ষ চলিতেছে। অরবিন্দ তখন মঞ্চের উপর নির্বিকারভাবে, প্রশান্তবদনে বসিয়া আছেন। পুলিশ আসিয়া সভাস্থল জনশূন্য করিবার পর সকলের শেষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে

স্থান ত্যাগ করিলেন। এত বড় একটা আলোড়নের মধ্যেও চরিত্রের যে প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি তিনি দেখান, সহকর্মীদের মনে তাহা বিস্ময় জাগাইয়া তোলে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই, এত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মধ্যে, যোগী বিষ্ণু-ভাস্কর লেলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য আমরা দেখিতে পাই। এই সময়ে লেলের নির্দেশে অরবিন্দ বরোদার এক নির্জন কক্ষে ক্রমাগত তিন দিন ধ্যানস্থ থাকেন। ধ্যান-তন্ময়তার ফলে সারা দেহে ও মনে জাগে এক দিব্য অনুভূতি, সর্বসত্তায় ছড়াইয়া পড়ে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি।

এই সময়ে বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল ইউনিয়নের এক বিরাট সভায় অরবিন্দকে ভাষণ দিতে হয়। তার আগে লেলে তাঁহাকে অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বোধনের এক যৌগিক কৌশল শিখাইয়া দেন। বলিয়া দেন, শ্রোতাদের নমস্কার করিয়া শান্ত চিত্তে তিনি যেন কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তবেই তাঁহার মনের গভীরতম প্রদেশ হইতে অনর্গল ধারায় বাণী উৎসারিত হইবে। হইলও ঠিক তাহাই। জাতীয়তার আদর্শ ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে উদ্দীপনাময়ী বাণী সেদিন অরবিন্দের কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় তাহা সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

অরবিন্দের এ সময়কার ভাষণগুলি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনচিত্তে আলোড়ন তুলিয়া দেয়। জাতীয়তাবাদের এক নূতনতর ভাষ্য তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। তিনি বলেন, "আমাদের এই জাতীয়তার আন্দোলন স্বার্থমূলক নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিতও নয়। রাজনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন এতে জড়িত নেই এ হচ্ছে একটি ধর্ম, যাকে আশ্রয় ক'রে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করবো। এ একটা ধৃতি, যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। ভারতের এই ত্রিশ কোটি জনগণের মধ্যে আমরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করছি।"

নব জাতীয়তার এ এক অভূতপূর্ব ব্যাখ্যা। ঘুমন্ত দেশবাসীর কানে তো বার্ক, মিলের উক্তি শোনানো হইতেছে না! ফরাসী, মার্কিন মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসও তো আওড়ানো হইতেছে না! তিনি করিতেছেন দেশমাতৃকার মধ্যে ভগবৎসত্তার আরোপ। মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক দেশকে দিতেছেন নূতন মন্ত্র, আর নূতন মন্ত্রচৈতন্য।

বলা বাহুল্য, বৃটিশ রাজশক্তি নীরব দর্শক হইয়া থাকে নাই, জাতীয়তাবাদের এই শক্তিধর নেতাকে চূর্ণ করিতে উহা অগ্রসর হয়।

১৯০৭ সালে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশময় সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়া লিখেন,—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

কবির সত্যদৃষ্টি সেদিন নবজাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ অরবিন্দকে আবিষ্কার করে, ভারতাত্মার বাণীমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাঁহার মধ্যে!

অতঃপর আইনের ফাঁক দিয়া অরবিন্দ ঐ মামলার অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

এই সময়ে তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী, রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সদ্যমুক্ত মহান্ নেতাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথও সেদিন সেখানে আসিয়াছেন। আলিঙ্গন ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর কবি রসিকতা

করিয়া কহিলেন, "মশাই, আপনি কিন্তু আমায় ফাঁকিই দিলেন।" অর্থাৎ অরবিন্দের জেল এড়ানোর ফলে কবির প্রশস্তিভরা কবিতাটি মাঠে মারা গেল।

অরবিন্দও সকৌতুকে উত্তর দিলেন, "বেশিদিনের জন্য নয়!" অর্থাৎ রাজরোষ আবার আসন্ন,—কবির কবিতা বৃথা যাইবে না।

কথাটি শীঘ্রই ফলিয়া যায়। তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে, তাঁহাদের নায়ক হিসাবে, অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। এই মামলা অরবিন্দ জীবনের মহত্তর অধ্যায়টিকে উদ্‌ঘাটিত করে, তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের রূপান্তরকেও করে ত্বরান্বিত, সাধনজীবনের অন্তস্তলে যে জ্যোতির ঝলক মাঝে মাঝে দেখা দিত, এবার তাহা জ্যোতির্ময় রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

অরবিন্দ জীবনের সর্বস্তরেই দেখি এক নিষ্কাম কর্মযোগীর মহিমময় রূপ। তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের মধ্যেও দেখা যায় এক অদ্ভুত সংযম ও নির্লিপ্তি। যে দিব্য চেতনায় তিনি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন, যে মহান্ ব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সাহায্য করার জন্য তিনি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে আহ্বান জানান।

স্ত্রীকে এ সময়ে এক চিঠিতে লিখেন, "আমার বিশ্বাস—ভগবান্ আমায় যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের; যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার। যাহা বাকী রহিল তাহা ভগবান্‌কে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি তাহা হইলে আমি চোর। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত। আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে। অধিকাংশই কষ্টে দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোনোমতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের হিত করিতে হয়। কি বল এই বিষয়ে আমার সহধর্মিণী হইবে?"

দেশোদ্ধার ও জনকল্যাণের আদর্শে সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রাণের গূঢ়তম ইচ্ছাটির উল্লেখ করিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। অধ্যাত্ম মুক্তির প্রসঙ্গে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "যে কোনো মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার কোনো না কোনো পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ়সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম বলে, নিজের শরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে। সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দু-ধর্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে নিয়া যাই। "

দেখা যাইতেছে যে, নিজস্ব প্রেরণা ও চেষ্টা বলে বরোদা-জীবনেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার বহুতর সাধন অনুভূতি হইতে থাকে। তাই পত্নীর নিকট নিজের অন্তর্জীবনের মর্মকথা এসময়ে যেমন খুলিয়া বলিতেছেন, তেমনি তাঁহাকে এই নূতন জীবনের অংশ গ্রহণের জন্যও জানাইতেছেন সস্নেহ আহ্বান।

পতি ও পত্নীর মধ্যে একটি চমৎকার বুঝাপড়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। উভয়ের

এ সময়কার এক মিলন কাহিনীতে ইহার কিছুটা নিদর্শন মেলে। রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহেই অরবিন্দ তখন বাস করিতেছেন। কলিকাতার রাজনৈতিক জীবন তখন বিক্ষোভময়। মুক্তিসংগ্রামের নূতনতর আদর্শ ও প্রেরণা নিয়া অরবিন্দ জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চারিদিকে আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনা। এমনি এক কর্মচঞ্চল দিনে অরবিন্দের শ্বশুর ভূপালবাবু আসিয়া উপস্থিত। অরবিন্দকে তিনি সে রাত্রে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। একথাও জানাইয়া দিলেন, তাঁহার কন্যা মৃণালিনী দেবী অরবিন্দের সহিত দেখা করার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাই অরবিন্দ যেন তাঁহাদের ওখানেই সে রাত্রিটা কাটাইয়া আসেন।

সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। পতি-পত্নীর আসন্ন মিলনের সংবাদে সকলেই মহাখুশী। মেয়েরা অরবিন্দের সাজসজ্জার যোগাড় শুরু করিলেন। ধব্‌ধবে গিলেকরা পাঞ্জাবি ও কোঁচানো ধুতি আনানো হইল। সংগৃহীত হইল সুগন্ধি বেলফুলের গোড়েমালা। অরবিন্দ নীরবে দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন। উৎসাহিত হইয়া সকলে তাঁহাকে সাজাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত এদিনের এক মনোরম চিত্র দিয়াছেন—

"যখন কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন সাজগোজ করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল ওঁকে—সবচেয়ে সুন্দর, ঠোঁটের কোণে একটি সলজ্জ হাসি। আমরা তো সব দোরগোড়াতে অপেক্ষা করছিলাম, ওঁকে জামাই বেশে দেখবার জন্য।

"লীলাবতী (চারুবাবুর স্ত্রী) এগিয়ে এসে মালা দুটি হাতে দিলে, বললে—একটি আপনি পরাবেন দিদির গলায়, অন্যটি দিদি পরাবেন আপনার গলায়। ভুলবেন না যেন!"

"অরবিন্দ মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দিলেন, "তুমি যেমন বলছো, তেমনই আমি করবো, লীলাবতী।"

সুবোধ মল্লিক মহাশয়ও অরবিন্দকে বার বার অনুরোধ জানাইলেন রাত্রিটা যেন অবশ্য তিনি ওখানেই কাটাইয়া আসেন। তখন বাড়ির দারোয়ানকে বলিয়া দিলেন,—ফটক যেন বন্ধ থাকে, ঘোষ সাহেব রাত্রে আর ফিরিবেন না।

পরদিন ভোরে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, অরবিন্দ রোজকার মতই মল্লিক বাড়ির চায়ের টেবিলে উপস্থিত। আগের রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরিয়াছেন এবং বাহিরের দ্বার বন্ধ থাকায় দেওয়াল টপ্‌কাইয়াই তাঁহাকে ভিতরে ঢুকিতে হইয়াছে।

উৎসাহী বন্ধু বান্ধবীদের প্রশ্ন বর্ষণ শেষ হইলে অরবিন্দ বলিলেন, "এবার তবে শোন। চর্ব্য-চোষ্য ভোজনের পর রাত্তির এগারোটার সময় আমি ফিরে এসেছি। লীলা-বতী, মালা দুটি সম্বন্ধে তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।"

সকলে ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তা আপনি মাঝরাত্তিরে পালিয়ে এলেন কেন? তেমন তো কথা ছিল না!"

অরবিন্দের চোখে মুখে কৌতুকের হাসি। উত্তরে বলিলেন, "আমি তাকে সব বুঝিয়ে বলেছি; সে আমায় আসতে অনুমতি দিলে, তবে আমি এসেছি।"

স্বামীর জন্য ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন যাপন করিলেও মৃণালিনী দেবী তাঁহার উত্তর-জীবনের সাধনার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই। অকালেই তাঁহার জীবনদীপ নিভিয়া যায়। অরবিন্দের বাংলা ত্যাগের প্রায় নয় বৎসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর আশ্রয় ও আশীর্বাদ মৃণালিনী লাভ করেন। চারুচন্দ্র দত্তের নিকট লিখিত এক পত্রে এ বিষয়ে অরবিন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য ও আন্তরিকতা নিয়া লিখেন, "আমি জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী সাধনজীবনে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে অরবিন্দের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। 'ধর্ম' পত্রিকায় এ সময়ে তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে লিখেন, "যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টি-স্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবের দান।

"তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই যে বীর রে ?" তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্দীপ্ত ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বে-পরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎ-বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে, 'তুই বীর রে' !"

'ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে অরবিন্দ এসময়ে 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই।"

আলিপুর বোমার মামলার প্রাক্কালে অরবিন্দের বাসস্থানে জোর খানাতল্লাসি হয়। এ সময়ে এক মজার ঘটনা ঘটে। রামকৃষ্ণদেবের উপর অরবিন্দ সে সময়ে বড়ই শ্রদ্ধাশীল। তাঁহার নানা লেখায় এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রশস্তি দেখা যাইত। এ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের কিছুটা পবিত্র মাটিও তিনি শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। পুলিশ কিন্তু উহাকে বোমার মশলা ভাবিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল।

অরবিন্দ লিখিয়াছেন, "ক্ষুদ্র কার্ড বোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব (পুলিশ অফিসার) তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। তাঁহার সন্দেহ হয়, এটা কোনো ভয়ংকর বিস্ফোরণশীল পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ যে ভিত্তিহীন তা বলা যায় না। শেষকালে অবশ্য এই সিদ্ধান্তই করা হয় যে ইহা মাটি ভিন্ন আর কিছু নয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠানো নিতান্ত অনাবশ্যক।"

দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিকায় যে এ যুগের এক বিস্ফোরক শক্তি আত্মগোপন করিয়া আছে, ইহার অধ্যাত্ম-প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হইবে—এ বিশ্বাস অরবিন্দের ছিল। অবশ্য সেদিন ভারতবর্ষের খুব কম লোকই ইহার তাৎপর্য বা গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়।

আলিপুর বোমার মামলা শুরু হইয়াছে। নিষ্কাম কর্মযোগের সাধক অরবিন্দ কিন্তু বাহিরের সব কিছু আলোড়ন ও হৈ চৈ হইতে নিজেকে একবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছেন। ভিতরে তাঁহার রহিয়াছে পরম প্রশান্তি ও নির্বিকার ভাব।

এ সময়ে কারাকক্ষে থাকাকালে এক অলৌকিক অনুভূতি তাঁহার জীবনে আত্মপ্রকাশ করে অরবিন্দ নিজে ইহার বর্ণনায় লিখিতেছেন: "এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি হইতেছে আমার সঙ্গী, নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া ইহা আমাকে আলিঙ্গন করিতে উ'্যত।···উদ্যানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক সবুজ লাবণ্যে প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিগ্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে সান্ত্রী ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার মুখ ও পদশব্দ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখ ও ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে যায়, এই গরু ও গোয়াল নিত্যকার প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জন কারাবাসে আমি অপূর্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম।"

ইহার পর তাঁহার অধ্যাত্মসত্তার আসে এক বিরাট পরিবর্তন। কারাগারের চারিদিকের পরিবেশ এবং ভিতরকার সমস্ত কিছু যেন জীবন্ত ও চৈতন্যময় হইয়া উঠে।

প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া-অভিভাষণে তাঁহার কারাকক্ষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনা অরবিন্দ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় নি, পরন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন ··।

"যখন আমি পাদচারণা করতাম সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে-জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে, সেইদিকে আমি তাকালাম। কিন্তু দেখলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেয়ালগুলোর মধ্যে বন্দী নেই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।"

কংসের কারাগারে ভগবান্ বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হন। আর সেদিন ইংরেজের বন্দীশালায় অরবিন্দের জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সেই বাসুদেবেরই চৈতন্যময় সত্তা। সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহার সেদিন খুলিয়া গিয়াছে। চারিদিকের সব কিছু দেখিতেছেন পরমচৈতন্যে পরিপূর্ণ। ইটপাথর, কারাগারের লৌহদ্বার, সবই সজীব এবং প্রাণবন্ত। এক অলৌকিক জ্যোতির স্ফুরণ সর্বদিকে। জেলের কয়েদী হইতে আরম্ভ করিয়া মামলার উকিল, বিচারক অবধি সবই যেন সচ্চিদানন্দময় হইয়া উঠিয়াছে, সব কিছুতেই ওতপ্রোত রহিয়াছে বিশ্বাত্মার প্রাণস্পন্দন।

এই সময়কার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন, "এক একবার এমন বোধ হইত, যেন ভগবান্ সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাঁশীটি বাজাইতেছেন, দাঁড়াইয়া আছেন, সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে থাকে, কে যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে যেন আমাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাবের বিকাশ আমার সমস্ত মন প্রাণ অধিকার করিয়া নিল। কি এক নির্মল মহান্ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণটি আমার খুলিয়া গেল।"

নব-উৎসারিত এই অধ্যাত্মস্রোতেই অরবিন্দের তীব্র দেশপ্রেমকে মানবতার এক সর্বজনীন বোধে রূপান্তরিত করে, মহাপ্রেমের দিকে তাঁহাকে টানিয়া নেয়।

প্রতিভাবান্ কৌসুলী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের দৃষ্টিতে অরবিন্দের জীবনের এই নূতন রূপটি সেদিন ধরা পড়ে। সওয়াল করার সময় ওজস্বিনী ভাষায় এই সাধক রাজবন্দীর জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সেদিন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা যেন দৈববাণীরই ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছিল।

বিচারক মিঃ বীচক্রফটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছে, "এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে, এঁর অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানবসমাজ এঁকে স্বদেশপ্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সাগরপারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাকবে।"

উত্তরকালে চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি সত্য হইয়া উঠে।

এই সময়ে, কারাগারের মধ্যে অরবিন্দ দুইটি বাণী প্রাপ্ত হন। এই বাণীরই প্রত্যাশায় তিনি যেন উন্মুখ হইয়া ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "যোগসিদ্ধির জন্য আমি বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি তা কতকটা আয়ত্ত করতেও পেরেছিলাম, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী চাইতাম তা পাই নি, সন্তুষ্ট হতেও পারি নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জন সেলের মধ্যে আবার তা পেলাম। আমি বললাম—প্রভু, দাও আমাকে তোমার আদেশ; আমি জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন ক'রে করতে হবে। আমাকে তুমি একটি বাণী দাও!"

এই প্রার্থনার উত্তরে দুইটি বাণী অরবিন্দ এ সময়ে লাভ করেন। একটি দেয় জাতির পুনরুত্থানে সাহায্য করার নির্দেশ, অপরটিতে নিহিত থাকে অধ্যাত্মভারতের ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভূমিকার কথা। অরবিন্দ এই বাণীর বর্ণনায় বলিয়াছেন,—'এই এক বৎসর নির্জনবাসে তোমাকে দেখানো হয়েছে এমন কিছু যার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের মৌলিক সত্যতা। এই ধর্মটিকে আমি জগতের সামনে তুলে ধরছি, ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভেতর দিয়ে এই ধর্মটিকে আমি সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে গড়ে তুলেছি; আর এখন এ ধর্ম যাচ্ছে সর্বজাতির মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি এইটিই সনাতন ধর্ম, তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে প্রকাশ করছি।...যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়—সমস্ত জগতের জন্যই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে।'

এই দিব্য বাণীর প্রেরণা অরবিন্দের উত্তরজীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে।

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' এই দুইটি সাপ্তাহিকের মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। মুক্তিসংগ্রাম আর ইংরেজ সরকারের দমননীতি, উভয়ই তখন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। তেমনি অপর দিকে অরবিন্দের অন্তর্জীবনেও সাধিত হইয়াছে বৈপ্লবিক রূপান্তর। আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের

নূতনতর ভূমিকার দিকে এবার তিনি অগ্রসর হন। রাজনৈতিক জীবন হইতে নিজেকে সংহরণ করিয়া নেন, তারপর নিমজ্জিত হইতে থাকেন অধ্যাত্মজীবনের অমৃতসত্তায়।

ইহার পর তাঁহার জীবনে আসে এক নূতনতর পটপরিবর্তন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কলিকাতার কর্মমুখর জীবন ত্যাগ করিয়া কিছুদিন তিনি চন্দননগরে গিয়া আত্মগোপন করেন। তারপর উপস্থিত হন পণ্ডিচেরীতে। অরবিন্দের অন্যতম সহকর্মী রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমি জনৈক সি আই-ডির নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে এবং খুব সম্ভব শামসুল আমলের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ি ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম। তিনি ধীর চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া 'কর্মযোগিন্' অফিসে আসিলেন।

"প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।' আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' উপহার দেন। অরবিন্দবাবু বলিতেন যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দুদর্শন পড়িবার আগ্রহ হয়। ভগিনী নিবেদিতা 'কর্মযোগিন্'-এ প্রবন্ধ লিখিতেন। যে-সময়ে শ্রীঅরবিন্দবাবু চন্দননগরে লুকাইয়া ছিলেন, সে-সময়ে নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন।…যাহা হউক ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম।

"তিনি শুনিয়া বলিলেন,—তোমাদের নেতাকে আত্মগোপন করতে বল, এই আত্মগোপনের পরে তিনি তাঁর মধ্যবর্তীদের ভেতর দিয়ে অনেক কিছু কাজ করতে পারবেন।

"একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছেন,—'মা কালী সেদিন আমাকে সিস্টার নিবেদিতার মাধ্যমে আত্মগোপনের আদেশ দেন'…ঐ সংবাদ লইয়া আমি অফিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন,—বেশ, তবে সব ব্যবস্থা করো।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেছিলেন।… বোধ হয় নিবেদিতার সঙ্গে তিনি 'কর্মযোগিন্' পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্তার সময় আমরা কেহ উপস্থিত ছিলাম না।"

অরবিন্দ চন্দননগরে কিছুকাল আত্মগোগন করেন। তারপর তিনি সমুদ্রপথে পণ্ডিচেরীতে চলিয়া যান।

চন্দননগরে অবস্থান করার সময়েই দেখা যায়, ইতিমধ্যে তাঁহার মানসলোকে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বহির্জগতের সমস্ত চাঞ্চল্য ও ধূলিঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে এক অপূর্ব ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্তি নিয়া তিনি বিরাজমান। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় জগতের রুদ্ধদ্বার কি করিয়া যেন উন্মোচিত হইয়া যায়, ফুটিয়া উঠে জ্যোতির্ময় নানা অক্ষরের মালা, অবাক্ বিস্ময়ে তিনি চাহিয়া থাকেন।

এ সময়ে মতিলাল রায়ের গৃহে তিনি লুকাইয়া আছেন। সেদিন মতিলালবাবুর কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কতগুলি আলোর লিপি কেবলই আমার চোখের সামনে ভেসে ভেসে আসে, এদের অর্থ বার করার চেষ্টা করি।"

আবার একদিন তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, "অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে যে সব দেবতা রয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই আকার সামনে ফুটে ওঠে। অক্ষরের মতো এই সব মূর্তি'ও অর্থব্যঞ্জক—কি এরা জানাতে চায়, তাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।"

অলৌকিক জগতের, অধ্যাত্মলোকের কপাট বুঝি এবার খুলিয়া গিয়াছে। সেখানকার নানা ইঙ্গিত, নানা নিদর্শন সাধক অরবিন্দ মাঝে মাঝে প্রাপ্ত হইতেছেন।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়া উপস্থিত হন। রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার উন্মাদনা, সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-বন্ধুদের আকর্ষণ, সমস্ত কিছু নির্বিচারে পরিত্যাগ করিয়া আপন সাধনায় তিনি নিমগ্ন হইয়া যান। শুরু হয় প্রেরিত পুরুষদের প্রস্তুতি পর্ব। পণ্ডিচেরীর সাগর তীরে তাঁহার অভিনব যোগাশ্রম গড়িয়া উঠিতে থাকে।

নিজের যোগলব্ধ শক্তির প্রভাবে দেশের মুক্তি আনয়ন করিবেন, মানবের আত্মিক বিকাশের সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিবেন সার্থক—ইহাই ছিল তাঁহার সংকল্প।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে তিনি এ সময়ে এক পত্রে লিখেন, "একটা জিনিস উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও,—যে কাজ আমরা করিতে চাহিতেছি ইহার ফল সে পর্যন্ত বৈষয়িক জগতে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না আমার অষ্টসিদ্ধি ততখানি প্রবল হয়—যতখানি হইলে এই বস্তুতন্ত্রবাদী মর্ত্যের উপর উহা সমগ্রভাবে কলের মতো কাজ করিতে পারে।"

সাধনার আরও গভীরে প্রবিষ্ট হইবার পর অরবিন্দের জীবনে অধ্যাত্মরূপান্তর যেমন ঘটে, তেমনই স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করে তাঁহার দার্শনিক জীবনবাদ। মানবসমাজকে দিব্যজীবনে আদর্শ গ্রহণে তিনি আহ্বান জানান।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী হইতে 'আর্য্য' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, আর প্রধানত ইহারই মাধ্যমে অরবিন্দ তাঁহার নবতম আদর্শ জনচৈতন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন।

মহাসাধকের তপস্যার প্রভাব এবার ক্রমে দূরবিস্তারী হইতে থাকে। পণ্ডিচেরীর সহায় সম্পদহীন পরিবেশে ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম গড়িয়া উঠে, বিশ্বের দিগ্বিদিকে তাঁহার দার্শনিক আদর্শ এবং সাধনার পথনির্দেশ ছড়াইয়া পড়ে।

নিজের দর্শনতত্ত্ব অরবিন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহার অবিস্মরণীয় অবদান, লাইফ্-ডিভাইন গ্রন্থে। দিব্যজীবনের অভিনব তত্ত্ব তিনি ইহার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন।

এই 'দিব্য জীবন' হইতেছে তাঁহার আদর্শ ও তত্ত্বের দিক, আর তাঁহার 'পূর্ণযোগ' সেই তত্ত্বেরই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক। লাইফ-ডিভাইন' গ্রন্থে তিনি দিব্যজীবনের বার্তা ও তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন। আর তাঁহার 'সিন্থেসিস্ অব্ যোগ' গ্রন্থে স্থাপন করিয়াছেন, 'পূর্ণাঙ্গ' বা সমন্বয়ধর্মী যোগের পদ্ধতি।

অরবিন্দ-দর্শনের ভিত্তি হইতেছে বিবর্তন-ক্রিয়া। প্রকৃতির চরম ও পরম পরিণতির কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "মন ও প্রাণ যেমন জড় হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তেমনি যথাসময়ে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সুগোপন ভগবৎ-সত্তার মহত্তর শক্তিগুলি আবরণভেদ করিয়া

ফুটিয়া উঠিবে এবং উপর হইতে তাহাদের পরম জ্যোতি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে।" তাঁহার মতে, পৃথিবীতে এমনভাবে সম্ভাবিত হইয়া উঠিবে অতিমানসের মহাপ্রকাশ!

নূতন মানবজাতির কথা, নূতন মানস উপাদান সমন্বিত নূতন মানবের কথা ইতিপূর্বে অন্য মনীষী ও দার্শনিকেরাও বলিয়াছেন। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষণা করিলেন, প্রকৃতির মধ্যেই এ সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, ইহা শুধু অন্তর্নিহিত নয়, ক্রিয়াশীলও বটে। আশ্বাস দিয়া তিনি আরো কহিলেন, মানুষের চেষ্টায় ও সাধনায় অতিমানসের অবতরণ অথবা শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা যায়।

যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অনলস কর্মসাধনার মধ্য দিয়া অরবিন্দের সাধনজীবন সফল হইয়া উঠে তাহা অনেকেরই জানা নাই। সাধন-জীবনের এ সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি তাঁহার এক পত্রে অন্তরঙ্গ শিষ্য দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছেন—

"এটা নিতান্তই অদ্ভুত কথা যে—আমি অতিমানস সিদ্ধির উপযুক্ত মানসিক ধৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম এবং আমাকে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হ'তেই হয় নি। কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমার সারা জীবনেই চলেছে নিষ্করুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। ইংলণ্ড জীবনের নানা দুঃখ কষ্ট ও অনশন থেকে শুরু ক'রে পণ্ডিচেরী জীবনের নানা ঘোরতর অসুবিধা ও বিপদের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি—বহির্জীবন ও অন্তর্লোক উভয় ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে বহুতর অন্তরায়।

"আমার জীবন বরাবরই হয়েছে একটা যুদ্ধবিশেষ আর আজ যে আমি এখানকার দোতলায় বসে আমার অধ্যাত্মশক্তি ও অপরাপর বহিরঙ্গ শক্তি-বলে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছি, তাতে আমার এই যুদ্ধের স্বরূপ বদ্‌লায় নি। তবে এটা ঠিক, এসব কথা উচ্চ স্বরে চীৎকার ক'রে আমি কখনো বলি নি। তাই বাইরে থেকে স্বভাবতই একজন সমালোচকের মনে হবে যে, আমি বাস করছি একটা জাঁকজমকপূর্ণ কল্পনাবিলাসী ভাবরাজ্যে, সেখানে বাস্তব জীবনের কঠোরতা কোনো দিন দেখা দেয় নি। কিন্তু এটা কি একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়?"

সাধনা ও সিদ্ধির ইঙ্গিতটি দিয়া আর এক চিঠিতে লিখিতেছেন, "কিন্তু প্রতিদিন, দীর্ঘ বৎসরব্যাপী পাঁচ ছয় ঘণ্টার একাগ্র চিন্তার ফলেই আমার ভেতরে ঐশী শক্তির অবতরণ ঘটতে পেরেছিল—এসব গল্প তোমাদের কে বলেছে, বলতো? যদি একাগ্র চিন্তাকে কঠোর ও প্রয়াসশীল ধ্যান বল, তাহলে এটা কিন্তু আমার জীবনে কখনো ঘটে নি। যা আমি নিয়মিত করেছি তা হচ্ছে চার পাঁচ ঘণ্টা প্রাণায়াম—সে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যাপার।

"আর কোন্ ঊর্ধ্বলোকের ধারার কথা তুমি বলছো? কবিতার স্রোত তো এসেছিল, যখন আমি প্রাণায়াম করি তখন,—তার কয়েক বৎসর পরে মোটেই নয়। যদি অনুভূতির প্রবাহের কথা বল, তা এসেছিল দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাণায়াম বন্ধ করার পরে—যখন আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলাম—কি করবো, এবং সর্ব প্রচেষ্টা বিফল হবার পরে কোন্ দিকে আবার প্রয়াস শুরু করবো, তারও যখন কিছু ঠিক ছিল না।

"তাছাড়া, এটা দীর্ঘ বৎসরের প্রাণায়ামের ফলে উৎসারিত হয় নি, বরং সে সময়ে প্রাপ্ত এক গুরুর কৃপায় নিতান্ত অদ্ভুতভাবে এবং সহজরূপে হয়েছিল। শুধু সেই গুরুর কথা বললেও হয়তো ঠিক হবে না—কারণ সেই গুরু নিজেও এর আবির্ভাব দেখে নিতান্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো বা এটা পরমব্রহ্ম বা মহাকালী অথবা কৃষ্ণের কৃপায়ই সম্ভব হয়েছিল।"

অরবিন্দ অপূর্ব প্রশস্তিটি ১৯০৮ সালে উদ্‌গীত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে—১৯২৮ সালের দর্শনে, কবি তাঁহার সেই প্রশস্তিকেই রূপায়িত হইতে দেখেন। সেদিনকার এই দর্শনের কথা কবিবর তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলাম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এ'র অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন, আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার, আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।

"আমি তাঁকে বলে এলুম, 'আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে,—শৃণ্বন্তু বিশ্বে। প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে, প্রাণের চাঞ্চল্য। আর দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ·। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শক্তিধর মহাপুরুষের মহাসমাধির লগ্ন। মরদেহ ত্যাগ করিয়া সার্থক সাধক অরবিন্দ দিব্যলোকে অন্তর্হিত হন। মুক্তির যে অত্যুগ্র সাধনা প্রথম জীবনে তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, মানবাত্মার পরম মুক্তির পথে সে সাধনারই সেদিন ঘটে মহা-উত্তরণ।

শৈবাচার্য অপ্পর

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা ও ধর্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক-দল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উভয় যুগেই দলে দলে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের আলোক-সঙ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা। এই মহাত্মাদেরই অন্যতম শৈবাচার্য অপ্পর। কৃচ্ছ্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনন্য ইষ্টসেবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বর্য সমন্বিত হয় তাঁহার সাধনজীবনে। বহুজনের আলোক-দিশারী রূপে সর্বত্র তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

অপ্পর আবির্ভূত হন আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। তামিল দেশের, বর্তমান তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম। শিব-সাধনার ঐতিহ্যের ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত ছিল তাঁহাদের বংশে। অপ্পরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক ধারক ও বাহক। নৈষ্ঠিক শিবভক্ত বলিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল।

শৈশবেই অপ্পরের জীবনে নামিয়া আসে এক দৈবের নির্মম আঘাত। অল্প দিনের ব্যবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। অপ্পরের বাল্যবিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই সংসারেই বাস করিতেন; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার লালনপালনের ভার।

বালক কালেই অপ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদি অতিশয় যত্নে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন, তেমনি করেন তাহার লেখা-পড়ার সুব্যবস্থা। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অপ্পরকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই উচ্চতর পাঠসমূহ অনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা যায়। শিক্ষক ও পড়ুয়ারা সবাই চমৎকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়া দিদিরও আনন্দের অবধি নাই। দিনের পর দিন তাহাকে তিনি উৎসাহিত করিতে থাকেন।

নিত্যকার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অপ্পর স্নেহময়ী দিদির কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া বসেন, তাঁহার মুখ হইতে শোনেন প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু মহাত্মাদের দিব্য জীবনের কত অলৌকিক কাহিনী।

ভক্তিসিদ্ধ শৈবগুরুর কাছে দিদি দীক্ষা নিয়াছেন। সংসারের কাজকর্ম আর অপ্পরের দেখাশুনার সময় ছাড়া দিন রাতের বাকী সময়টা তাঁহার কাটে শিবের আরাধনা ও জপ ধ্যানে। সকল কিছু অনুষ্ঠানের শেষে, শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে বসিয়া এই বর্ষীয়সী পূজারিণী প্রতিদিন ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন সিদ্ধাচার্য মাণিক্যবাচক-এর অপূর্ব স্তোত্রমালা। শিব প্রশস্তির গম্ভীর ধ্বনিতে সারা মন্দির গম্‌গম্ করিয়া উঠে। মন্দির চত্বরে ক্রীড়ারত অপ্পর উচ্চকিত হইয়া উঠে, কি এক অজানা আকর্ষণে ছুটিয়া আসে পূজাবেদীর কাছে, দিদির ভাব-প্রদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকে নির্নিমেষে, শিব-

ভক্তির রসে রসায়িত দিদির সাধনজীবন এমনি করিয়া দিনের পর দিন প্রভাবিত করিতে থাকে বালক অপ্পরকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হইয়া যায়। এবার কোনো উচ্চতর শাস্ত্র পাঠের কেন্দ্রে অপ্পরকে যাইতে হইবে। সারা দক্ষিণদেশে তখন কাঞ্চীর খুব সুখ্যাতি। এ নগরী শুধু পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রের রাজধানীই নয়, ইহা তখন সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্র ধর্মের দিক দিয়া জৈনমতাবলম্বী, তাঁহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বড় বড় জৈন পণ্ডিতেরা রাজধানীতে জড়ো হইয়াছেন। এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে জৈন শাস্ত্রবিদ্ ও তর্কশূরদের এক প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয়। রাজ-সভায় প্রায়ই শাস্ত্রবিচার ও তর্কদ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব ধর্মের পণ্ডিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তাই কাঞ্চী তখন পরিগণিত হইয়াছে সর্বশাস্ত্রেরই পীঠস্থানরূপে।

চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও পড়ুয়াদের কাছে অপ্পর কাঞ্চীনগরের বিদ্যাবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিদ্যার্থী, তাছাড়া, সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চা-কাঙ্ক্ষা সম্প্রতি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁহার কিশোর মন চঞ্চল হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থ কাঞ্চীতে বসবাস করার জন্য। সেখানে গিয়া সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার অভিলাষ।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে একদিন কহিলেন, "দিদি, কাঞ্চীতে শিক্ষা লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার ক'রে দাও। বিদ্যার্থী হিসাবে এজন্য যা কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়, আমি তাতে একটুও পশ্চাদ্‌পদ হবো না। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, সেখান থেকে, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে, আমি দেশে ফিরবো।"

দিদি কহিলেন, "ওরে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবি তাই যে আমি চাই। আর সেই ভরসায়ই যে আমি এতকাল দিন গুনছি। কিন্তু ভাই, কাঞ্চীর বিদ্যাপীঠে তোর পড়াটা আমার যেন ভাল ঠেকছে না।"

"কেন বলতো ?"—ক্ষুন্ন মনে প্রশ্ন করেন অপ্পর।

"শুনেছি, কাঞ্চীতে রাজা মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অর্থাৎ, জৈনেরাই বেশী প্রতিপত্তিশালী। জৈন শাস্ত্রবিদ্‌দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যায়-শাস্ত্রের কূটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের কচ্‌কচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব সেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে।"

"এ তুমি কি বলছো দিদি। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার নিজের ধ্যানধারণা যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া, এযুগে প্রকৃত শাস্ত্রবিদ্ হতে হলে ঈশ্বরমুখী আর ঈশ্বরবিমুখী উভয় শাস্ত্রই পাঠ করতে হবে। কাঞ্চী ছাড়া কোথাও যে তার সুবিধে নেই।"

"আমি বলি কি, তুই বরং চিদম্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব-মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা আর রয়েছেন সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষেরা।"

"কিন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তো আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের একপেশে বিদ্যাচর্চা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ দিকের দশটি জানালা তো খুলবে না।

দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত্ত্ব তো আমি আয়ত্ত করতে পারবো না। না—না, আমি কাঞ্চীতেই যাবো। তুমি এতে আপত্তি ক'রো না।"

ভ্রাতার সংকল্পে দিদি আর বাধা দিলেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই অপ্পর রওনা হইয়া গেলেন কাঞ্চীনগরে।

এখানকার প্রধান বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য। উত্তরভারত হইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। আর তাঁহাদের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে চলিতেছে শত শত বিদ্যার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন। তরুণ ছাত্র অপ্পর এই বিদ্যাপীঠেই ভর্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়া শুরু হইল তাঁহার অধ্যয়ন-তপস্যা।

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ তাঁহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অপ্পর নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া জৈনশাস্ত্রে জন্মিল তাঁহার অসামান্য অধিকার। বিচারসভা ও তর্কদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই তরুণ পণ্ডিত অল্পকাল মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বে পারঙ্গমতার জন্যই শুধু নয়, অসামান্য কাব্য প্রতিভার অধিকারী রূপেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেন। প্রবীণ জৈন ধর্মনেতা ও সাধকেরা তাই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক বিরাট প্রতিশ্রুতি।

রাজা মহেন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিভাবান্ স্নাতকের উপর। অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্মে দীক্ষা নিলেন অপ্পর।

রাজসভার পণ্ডিতেরা বুঝিয়া নিলেন, এই প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিতই সেই চিহ্নিত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অপ্পর কাঞ্চী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, দিদির স্নেহসান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া যান। কিন্তু আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন মজিয়া আছেন বিদ্যাচর্চায়, ন্যায়ের কূটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈনধর্মের তত্ত্বানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর। বিদ্যার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে অপ্পরের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রভাবে পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও প্রায় তিরোহিত।

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, কাঞ্চীতে গিয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে বাধা জন্মায়, তার মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস ?"

"ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো ? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি ?"

"আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতরে বিদ্যার অভিমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন শুষ্ক তার্কিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী হয়েছিস। সব চাইতে দুঃখের কথা ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েছিস তুই। আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব

সাধক। তাঁদের পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস। এর ফল কি কখনো ভালো হতে পারে ?"

কয়েক দিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন মারাত্মক শূলব্যথায় অপ্পর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূর্ষু অপ্পরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ এসময়ে অপ্পরের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গুরুদেব তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধ শৈবসাধক বলিয়া এ অঞ্চলের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাঁহার প্রচুর। তাই তাঁহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল।

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, "তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট অচিরেই কেটে যাবে, অপ্পর বেঁচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশানুক্রমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইষ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তো যতো বিপদের সৃষ্টি। তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ। অপ্পর আজ তাঁর কাছেই করুক আত্মসমর্পণ।"

আশীর্বাদ জানাইয়া মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপ্পরের জন্য দিদির এবার আর দুশ্চিন্তা নাই। বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হইবার নয়, প্রভু শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে।

অপ্পরকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুই ইষ্টদেবকে ভুলে গিয়েছিস। ইষ্টদেবের চরণে অপরাধ ক'রেই তো তোর এত কষ্ট, এত বিড়ম্বনা। সবাই আমরা তোকে ধরাধরি ক'রে শিবমন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, স্তবস্তুতি জানিয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর্। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাজ তো আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যে হবার নয়।"

প্রচণ্ড শূলবেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই দৈব কৃপার উপর নির্ভর করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না।

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থমথমে ঘন অন্ধকার। মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত অপ্পর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, "বৎস অপ্পর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছো তুমি, লাভ করেছো নবজন্ম। আশীর্বাদ জানাই, নূতনতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধনসত্তায়, আর তোমার মাধ্যমে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অপ্পর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র শূলবেদনা দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নূতন চেতনার জোয়ার। সুষুপ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁহার নবজাগরণ।

দিব্য আনন্দের রসে অপ্পর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন শিব-মহিমার অপরূপ স্তবগাথা।

আবার শোনা যায় দিব্যপুরুষের বাণী, "বৎস অপ্পর, তোমার স্তবমালা আমায় প্রসন্ন করেছে। আজ থেকে শিবভক্তেরা জানবে তোমায় 'তিরুণাবক্করসু' নামে ঈশ্বরের আশিসপূত বাক-পতি ব'লে পরিচিত থাকবে তুমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে।"

যুক্তপাণি অপ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, "প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহিত করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য উৎসর্গীত। তোমার মহিমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত।

মন্দিরের স্বর্গীয় জ্যোতির ধারা অন্তর্হিত হইয়া গেল। দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপিত অপ্পর কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের পাশে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুই নয়ন তাঁহার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন, স্বধর্মের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, প্রভুর আশীর্বাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। চিত্ত তাঁহার তাই ইষ্টদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অপ্পরের মুখ হইতে আনুপূর্বিক শুনিলেন। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আর কিন্তু দেরী করা নয়, ভাই। আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্যের কাছ থেকে তুই দীক্ষা গ্রহণ কর্। যে কৃপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক। শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক্, তা-ই যে আমি চাই।"

গুরুর কাছে দীক্ষা নিবার পর অপ্পর শুরু করেন তাঁহার কঠোর সাধনা। ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরন্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোনো হুঁশ নাই। গুরুর নির্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগূঢ় সাধনার এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

গুরু একদিন কৃপাভরে কহেন, "বৎস অপ্পর, সাধনার এই দুরূহ ক্রমসমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ত করছো, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে রেখো, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তোমার সাধনসত্তার মিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবভক্তি ও দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্ব হইতে প্রভু তোমায় চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সিদ্ধ মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শিবভক্তি প্রচারের পথ তুমি অনুসরণ করো। তাঁর স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার সাধনজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠবে।"

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাঁহার সাধনপন্থা আর স্তবগাথা দক্ষিণদেশের হাজার হাজার শৈব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে। দিব্য

জীবনের দুয়ার তাঁহাদের সম্মুখে করিয়াছে উন্মোচিত। গুরুর আদেশে অপ্পর তাই শুরু করিলেন মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অনুধ্যান।

মাদুরার সন্নিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত হন মাণিক্যবাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় তাঁহার জীবনে। সর্ব শাস্ত্রবিদ্ ও পরমধার্মিক পণ্ডিত রূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাণ্ড্যরাজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ। দূত পাঠাইয়া বাদাবুর হইতে তরুণ পণ্ডিতকে তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক ; অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন ; শুধু তাহাই নয়, কহিলেন, "পণ্ডিত, বয়সে তরুণ হলেও, প্রভু শিবজীর কৃপায় অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান তুমি অর্জন করেছো। বাদাবুর গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্য তো তোমার জন্ম হয় নি। তোমার যোগ্য স্থান রাজধানীতে। এবার এখানে তুমি চলে এসো, তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো দেশের ও দশের কল্যাণে। আমার রাজকার্যে তুমি সহায়তা করো। তোমায় আমি নিযুক্ত করছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে।"

"মহারাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, সত্যের সন্ধানই আমার জীবনের ব্রত। রাজধানীতে থেকে, রাজকর্মের ভিড়ে, আমার সে ব্রত উদ্‌যাপনে যে বাধার সৃষ্টি হবে।" সবিনয়ে উত্তর দেন মাণিক্যবাচক।

"না পণ্ডিত, ও কাজ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা হবে না। আমার রাজধানীতে দিনের পর দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্, কত সিদ্ধ সাধক। তাঁদের সান্নিধ্য পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোমার মতো কর্মক্ষম, শুদ্ধাচারী ও জ্ঞানী সচিবের সাহায্য পেয়ে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুমি এ কার্যভার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর হিতসাধন করো।"

পাণ্ড্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরম ধার্মিক। প্রজাদের সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদা তৎপর। সর্বোপরি তরুণ পণ্ডিত মাণিক্যবাচককে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এই ভালবাসাটার টান এড়ানো সম্ভব হইল না, মন্ত্রিত্বের পদ মাণিক্যবাচক গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শাস্ত্রচর্চা, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে।

তত্ত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ্ণা চিরদিনই জাগিয়া রহিয়াছে তাঁহার অন্তর্জীবনে। এক এক সময়ে এই তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠে, ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বহু জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ্ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ত্ব আলোচনার পরম সুযোগও আসিতেছে। কিন্তু তৎ-এর সাক্ষাৎ তো জীবনে ঘটিতেছে না। শাস্ত্রানুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য—সেই 'তৎ', সেই পরমপুরুষ। তাঁহার দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো আজিও হয় নাই। এ জীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, 'বন্ধ্যা'। প্রকৃত সমর্থ সদ্‌গুরুর কৃপা না পাইলে ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু কে তাঁহার এই সদ্‌গুরু? কোথায় কখন ঘটিবে তাঁহার কৃপাঘন আবির্ভাব? আজকাল এই চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্যবাচককে ব্যাকুল করিয়া রাখে।

এ সময়ে পাণ্ড্যরাজ একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, "দ্যাখো মন্ত্রী, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপত্তা

ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নূতন ক'রে সংগঠিত করা দরকার। এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ। কোষাগাব থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে চলে যাও। উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে নিয়ে এসো।"

অর্থ ও লোকলস্কর নিয়া মাণিক্যবাচক চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্যরূপ। তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে পৌছানোর পর তাঁহার জীবনে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা। যে সদ্‌গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে এখানে হঠাৎ তিনি হন আবির্ভূত।

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাঁহার কৃপায় তরুণ সাধক মাণিক্যবাচক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইষ্ট সাক্ষাতের ফলে তাঁহার সাধনজীবন হয় কৃতকৃতার্থ।

মাণিক্যবাচককে কয়েকদিন নিজ সান্নিধ্যে রাখার পর গুরু মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে কহিলেন, "বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিষ্ট কাজ শেষ হয়েছে। আমি এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মতো তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তোমার প্রতি আমার দুটি নির্দেশ রইলো। এই স্থানটি বড় জাগ্রত, বড় পবিত্র। এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করো। বহু শিবভক্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা হবে তাঁদের প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে। আর একটি কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচনায়। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমালা যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষকে প্রেরণা দেবে, মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে থাকবে।"

গুরুর নির্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাচকের বিলম্ব হয় নাই। রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহাই তিনি নিয়োজিত করিলেন মন্দির নির্মাণের কাজে। তারপর মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্ড্যরাজ্যের সকাশে। অকপটে নিবেদন করিলেন তাঁহার অপরাধের কথা। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে আমি ব্যয় করেছি, আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন।"

পাণ্ড্যরাজ তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিক্যবাচককে তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে কারাগারে। কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি এই অপরাধের বিচার করবো।"

নির্ধারিত দিনে, বিচারসভায় বন্দী মাণিক্যবাচককে নিয়ে আসা হইল। পাণ্ড্যরাজের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। ঘটনার আনুপূর্বিক ইতিহাস শুনিয়া প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর কিছুটা সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, "মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি করেছো, তা অত্যন্ত গুরুতর। এজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড। কিন্তু সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদন্তের ফলে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল, রাজকোষের অর্থ দিয়ে শিবমন্দির তৈরি করেছিলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এ অর্থ তুমি নাও নি। আরও একটা কথা। তুমি মন্ত্রী পদে আসীন থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কল্যাণে অনেক কিছু করেছো।

তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মর্যাদা দিয়ে আসছি। এসব কথা স্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছিনে। তুমি পদচ্যুত হয়েছো, কারাগারে এতদিন যাপন করেছো, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুটা হয়েছে। তবে রাজ-অর্থের অপব্যবহারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অর্জিত ধন সম্পত্তি আমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম। এবার তুমি মুক্ত। অতঃপর যেখানে তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পাবো।"

পাণ্ড্যরাজের আদেশ শুনিয়া মাণিক্যবাচক-এর আনন্দ আর ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই যে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামনা ক'রে এসেছি। আমার ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন —এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ হবে দীনবেশে ইষ্টদেব শিবজীর স্তুতিগান করা আর এদেশের সাধনপীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন করা।"

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্ম্য প্রচারের এই ব্রতই মাণিক্যবাচক জীবনের শেষ দিন অবধি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও ঐশ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অপরূপ স্তবমালা দিনের পর দিন তিনি রচনা করিয়াছেন, দেশের ভক্তজন ও অধ্যাত্মরসের রসিকদের কাছে তাহা গণ্য হয় মণিমাণিক্যের মতো মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাঁহাকে আখ্যা দেয়—মাণিক্যবাচক, অর্থাৎ বাক্য তাঁহার মাণিক্যের মতো দ্যুতিমান, মূল্যবান।

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক তাঁহার জীবনলীলায় ছেদ টানিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য ভাবাবেশে শিবের স্তুতিগান করিতে করিতে এই মহাত্মা চিদম্বরমের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাজের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যান।

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শিব-চৈতন্যময়। তাঁহার অমর স্তবগাথার গ্রন্থ 'তিরুবাচকম' উত্তরকালে কীর্তিত হয় ভক্তি প্রবাহের উৎসরূপে, উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এই স্তবমালায়। সাধক জীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য-চেতনার মধ্য দিয়া সাধক চরম পর্যায়ে ঈশ্বরে সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন, তিরুবাচকম-এ রহিয়াছে তাহাদেরই অপরূপ ব্যঞ্জনা। আজো তামিলদেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথা হইতে লাভ করে পরম পথের পাথেয়।[1]

সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপূত আদর্শ এখন হইতে হইয়া উঠে অপ্পরের সাধনজীবনের ধ্রুবতারা। তিরুবাচকম-এর স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন, নিগূঢ় চৈতন্যময় জীবনের স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাঁহার সম্মুখে। শুধু তাহাই নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অপ্পরের কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্তোত্রমালা। অচিরে এই স্তোত্রসমূহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অপ্পরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। গুরু মহারাজের নিকট নূতনতর সাধন নির্দেশ নিবার জন্য তিনি ছুটিয়া যান।

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগূঢ় ক্রম গুরু এবার তাঁহাকে শিক্ষা দেন। প্রসন্ন কণ্ঠে

১ কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া ভল্যু. ২,—দ্য শৈব সেইণ্টস্ : এস. এস, পিল্লেই

আশ্বাস দিয়া বলেন, "বৎস, সাধনার এই ক্রমগুলো সমাপ্ত করো, আর এইসঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে করো উৎপাটিত। ইষ্টদেব শিবজীর ভৃত্যরূপে নিজেকে সদাই গণ্য ক'রে চলবে। আশীর্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইষ্টদর্শন। ইষ্টকৃপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে।"

এখন হইতে সাধনার গভীরে অপ্পর নিমজ্জিত হইয়া যান। নিত্যকার সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে স্বরচিত শিবস্তব তিনি গাহিয়া বেড়ান। সর্বত্যাগী সাধকের পরনে একটি জীর্ণ বহির্বাস, হস্তে এক খুরপি—গ্রামে গ্রামান্তরে যেখানে যে শিবমন্দির আছে এই খুরপি দিয়া তাহার পরগাছা উৎপাটন আর ময়লা নিষ্কাশন করাই হয় তাঁহার নিত্যকার কর্ম। প্রভু শিবের একান্ত দাস ও সেবকরূপে তামিলদেশের সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

শিব শরণাগতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত অপ্পরের জীবনে এবার সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন।

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস অপ্পর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, যেমন তোমার অভিরুচি—বর মেগে নাও।"

ত্যাগব্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, "প্রভু, দাসরূপে সেবা ক'রে তোমার দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই যেন চিরদিন আমি থেকে যাই। এই কৃপাই তুমি আমায় করো।"

ইষ্টদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তথাস্তু।"

সিদ্ধ সাধক অপ্পরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নূতন অধ্যায়। দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী। গৃহপ্রাঙ্গণ শিবভক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে। কাঞ্চী, মাদুরা, চিদম্বরম প্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অপ্পরের খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কাঞ্চীর জৈন সাধক ও শাস্ত্রবিদেরা এবার চঞ্চল হইয়া উঠেন। অপ্পর যে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত। তাঁহার উপর অনেকে আশা-ভরসা করিয়া আছেন। রাজধর্মের বিশিষ্ট ধারক বাহকেরা। জৈনধর্মের প্রচারে অপ্পর প্রাণমন ঢালিয়া দিবেন, এই ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহা নয়, একেবারে বিপরীত বুদ্ধি নিয়া শৈবধর্মের নব অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে বসিয়াছেন।

রাজপণ্ডিতেরা পাণ্ডারাজের কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন, "মহারাজ, জৈনমণ্ডলীর সংস্রব অপ্পর ত্যাগ করেছে, শুধু ওই নয়, সরকারী বিদ্যাপীঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যে উপকার সে পেয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে হয়েছে বিস্মৃত। জৈনধর্ম ত্যাগ ক'রে শুরু করেছে শৈবধর্মের প্রচার। অবিলম্বে তার দণ্ডবিধান না করলে রাজকীয় ধর্ম শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, আদেশ দেন, 'জৈনধর্মত্যাগী এই নবীন আচার্যকে সত্বর রাজসভায় উপস্থিত করো। বিচারে তার সমুচিত দণ্ড বিধান করা হবে।"

অপ্পরকে রাজার সন্নিধানে নিয়া আসা হইল। রাজপণ্ডিতদের অভিযোগের উত্তরে শান্তস্বরে তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আমি চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে রত রয়েছি।

এজন্য বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ কোনো পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ বাদ দিই নি। জৈন মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর পরে প্রভু শিবজীর অপার করুণায় পরমতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন আমার হয়েছে কৃতকৃতার্থ। এতে আমার কোনো অপরাধ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

পাণ্ড্যরাজ রোষে গর্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুমি কি জানো না, জৈনধর্ম এখানকার রাজধর্ম? সেই ধর্ম একবার গ্রহণ ক'রে তুমি তা ত্যাগ করেছো। এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। তাছাড়া, অপ্পর, তুমি রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেছো, রাজকোষের বহু অর্থ রাজপণ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার জন্য।"

"মহারাজ যা বলেছেন তা সত্যি। কিন্তু আমার দিক দিয়ে অধর্মাচরণ আমি কিছু করি নি। ধর্মের মূল লক্ষ্য—পরম সত্য আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা। শৈবধর্মের ছায়াতলে এসে, পরমপুরুষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকেই লাভ করেছি। জীবন আমার ধন্য হয়েছে।"

"তবে কি তুমি বলতে চাও, রাজকীয় জৈনধর্মে সত্যবস্তু নেই? তা রয়েছে শুধু শৈবধর্মেই।"—রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মতো হইয়াছে।

সভায় উপস্থিত জৈন পণ্ডিতেরা উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুরু করিলেন, "মহারাজ, রাজধর্মের অবমাননাকারী এই দুর্বৃত্তকে আপনি চরম দণ্ড দিন। নইলে এ রাজ্যের মহা অকল্যাণ হবে।"

পাণ্ড্যরাজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য অপ্পর। তুমি রাজধর্ম ত্যাগ ক'রে তার বিরুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য ব'লে ঘোরতর অপরাধ করেছো। সুপণ্ডিত হয়েও একাজ তুমি করেছো, তাতে অপরাধের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের,—প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।"

ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অপ্পরকে বধ করা হইবে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে নিচে নিক্ষেপ করিয়া। এই দণ্ডদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলী জনতার ভিড় জমিয়া উঠে।

রাজার নির্দেশ অনুয়ায়ী কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সাধক অপ্পর বিস্ময়করভাবে প্রাণে বাঁচিয়া যান। দেখা যায় পর্বত শীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত তাঁহার দেহটি সানুদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়া কোনোমতে রক্ষা পাইয়াছে।

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। উচ্চ কণ্ঠে অপ্পরের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। অনেকে বলাবলি করিতে থাকে—'শিবের একান্ত ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অপ্পর। স্বয়ং শিবই কৃপা ক'রে রক্ষা করেছেন ওর জীবন।'

রাজপুরুষেরা ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার কথা নিবেদন করিলেন। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি অপ্পরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইবে?

পাণ্ড্যরাজ কহিলেন, "না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টা ক'রো না। হাজার হাজার উত্তেজিত লোকের সামনে একাজ করারও প্রয়োজন নেই। বরং অপ্পরকে তোমরা গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। গলদেশে ভারী পাথর বেঁধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসো।"

আদেশ মতো কাজ সমাধা করিয়া রাজপুরুষেরা কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল—এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমুদ্রগর্ভে তলাইয়া গিয়াও অপ্পর প্রাণ

হারান নাই, ইষ্টদেব শিবের কৃপায় গলার বন্ধনী হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটি কখন খসিয়া গিয়াছে। তারপর তাঁহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে [১] সেখান হইতে ধীবরেরা তাঁহাকে উঠাইয়া নেয় এবং শুশ্রূষার ফলে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে।

সুস্থ হইয়া উঠিয়া অপ্পর ধীবরদের সব কথা খুলিয়া বলেন, তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়াইয়া পড়িতে দেরি হয় নাই তাই তাঁহার পিছনে সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা।

জনতার বিশ্বাস, সাধক অপ্পর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের কৃপাতেই দুই-দুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাহাদের কয়েকজন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, অপ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ পুরুষ—এ যুগের প্রহ্লাদ। আপনি এবার তাঁকে মুক্তি দিন, সমবেত জনগণের সন্তুষ্টি বিধান করুন।"

দুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপ্পর অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন। পাণ্ড্যরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া আসিয়াছে। অপ্পরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "অপ্পর, আমি বুঝতে পারছি, কোনো বিরাট শক্তি দ্বারা তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটা কি তুমি আমায় খুলে বলো।"

উদ্ধারকর্তা ইষ্টদেব শিবের কথা স্মরণ করিতেই সাধক অপ্পর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। নয়ন দুটি তাঁহার নিমীলিত, আননে দিব্য জ্যোতির আভা, কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতেছে পুলকাশ্রু, যুক্তকরে গাহিয়া উঠেন স্বরচিত শিবমহিমার স্তবগাথা :

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালা
গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদিদেব,
সৃষ্টি আর প্রলয়ের লহরী লীলায়—
কখনো মঙ্গলময় শিবরূপে, কখনো রুদ্ররূপে
নিজেকে করছেন তিনি বিলসিত।
এই আদি অন্তহীন বিভুকে
কি ক'রে করবো ধারণ
ক্ষুদ্র মানুষের এই অন্তর পটে ?
কি ক'রেই বা পাবো উদ্ধার
ভয়াল মৃত্যু আর বিনষ্টির হাত থেকে ?
মূর্খ আমরা, তাই অভিমানের প্রাচীর গ'ড়ে
ঠেকিয়ে রেখেছি শিবের ত্রিনয়নের জ্যোতি,
সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সরিয়ে।

১ তামিলদেশের তীরভূমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের কৃপা অপ্পরের গলার প্রস্তরকে হালকা ভাসমান কাষ্ঠে পরিণত করে এবং তাঁহাকে বেলাভূমিতে ভাসাইয়া নিয়া আসে। অপ্পরের ভাসমান দেহটি সমুদ্রতটের যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আজিও বহু শৈবসাধক ও ভক্ত সে স্থানটিকে পুণ্যপীঠ বলিয়া গণ্য করেন।

আত্ম অভিমানের সে প্রাচীর গুঁড়িয়ে দাও
এগিয়ে চলো দৈন্য আর একান্ত শরণের সাধনায়,
প্রভুর কিঙ্কর আর সেবক রূপে
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে।
তবেই তো প্রভুর করুণা সম্পাত,
তবেই তো প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ।
কল্যাণ আর অমৃতের ধারা
তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে। (তেবরম্)

এই দিব্য ভাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানো ইষ্টস্তুতির মধু ঝঙ্কার পাণ্ড্যরাজকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অপ্পরের পদতলে তিনি লুটাইয়া পড়েন, ব্যাকুল কণ্ঠে মাগেন তাঁহার কৃপা ও আশ্রয়।

শৈবসাধক অপ্পরের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ইহার ফলে সারা তামিলদেশে দেখা দেয় শৈবসাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। মাদুরা, কাঞ্চী ও চিদম্বরমের মন্দির ও ধর্মসভাগুলিতে শিবভক্ত সন্ন্যাসী ও আচার্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাজগুরু অপ্পরকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয় নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। কিন্তু এ আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তকরে কহেন, "আমি শিবের দাস, শিব-কৃপার দীন ভিখারী। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত স্বহস্তে ইষ্ট বিগ্রহের সেবা পূজা করা আর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া তাঁর মাহাত্ম্যের কথা। শিবের দাসত্ব ক'রে শিবের কৃপা যেন মর্ত্যধামে নামিয়ে আনতে পারি, এই আশীর্বাদই আপনারা আমায় করুন।"

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যিনি, রাজগুরুরূপে লোকগুরুরূপে সর্বত্র যিনি পূজ্য, এ কি অদ্ভুত দৈন্যময় আচরণ তাঁহার। একফালি জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড তাঁহার কোমরে জড়নো হাতে একটি ঝুড়ি আর খুরপি। এই বেশে অপ্পর দেশের নানা শৈব তীর্থ ও জনপদে ঘুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মার্জনী হস্তে শত শত ভক্ত। শিব মন্দিরের আগাছা ও ময়লা সযত্নে তাহারা পরিষ্কার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণালীর যত কিছু পূতিগন্ধময় জঞ্জাল। এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙ্গনে গীত হইতে থাকে অপ্পরের ভক্তিরসাত্মক শিব-ভজন ও শিবস্তুতি। ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ মহাপুরুষ অপ্পর যে মন্দিরে যে সাধনপীঠে উপস্থিত হন, সহস্র লোকের ভিড় জমিয়া উঠে। তাঁহার প্রচারিত দাসমার্গীয় শৈব সাধনার উঠে জয় জয়কার।

এমনি এক পদযাত্রার কালে, চিদম্বরমের শৈবপীঠে অপ্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি সিদ্ধ কিশোর সাধক 'জ্ঞানসম্বন্ধর'-এর। সম্বন্ধর নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাধক পরিচিত; উভয়ের এই সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশের শৈব আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভক্তসমাজ উদ্বুদ্ধ হয় নূতনতর চেতনায়।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া অপ্পর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছা ও ময়লা নিষ্কাশন করিতেছেন, শত শত অনুগামীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হইতেছে শিবমহিমার স্তুতিগান। এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সম্বন্ধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। শিব-চেতনায় সদা আবিষ্ট,

সিদ্ধ মহাত্মা অপ্পরকে দর্শন করা মাত্র ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়া গিয়া লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে। আকুল কণ্ঠ হইতে বার বার উচ্চারিত হইতে থাকে, অপ্পর—অপ্পর।[১]

ভূমিতল হইতে সম্বন্ধরকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া অপ্পর তাঁহাকে আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে। দুই প্রসিদ্ধ শিবভক্তের মিলনে মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যায়।

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ সাধক। তিনি ছিলেন কৃপাসিদ্ধ। কথিত আছে, হরপার্বতীর কৃপার ধারা বালক বয়সেই তাঁহার উপর বর্ষিত হয় এবং বালক বয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ-বিভূতি। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

সম্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক। পিতার সঙ্গে গ্রামের উপান্তে শিবমন্দিরে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছিলেন। স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া পূজায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুত্র রহিয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দুই চোখ রক্তবর্ণ, দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, গদ্‌গদ স্বরে বার বার সে বলিতেছে, "ঐ যে বাবা, আর ঐ যে আমার মা। বাবা—মা, বাবা—মা।" বার বার ব্যগ্রভাবে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে শিবমন্দিরের চূড়ার দিকে!

পিতা তো মহা সন্ত্রস্ত। তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। পুত্র কি কোনো কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে? অথবা বিষাক্ত কিছু খাইয়া আবোল তাবোল বকিতেছে?

লক্ষ্য করিলেন, তাহার গালের দুই কস্ বাহিয়া দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িতেছে। "কোথায় কি খেয়েছিস ঠিক ক'রে বল্। ওরে শিগ্‌গীর বল্"—পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন।

পুত্র এবার কিছুটা স্থির হয়, বাহ্যজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। ধীর কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কুণ্ডের তীরে সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে—মন্দিরশীর্ষে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে হরপার্বতী হইয়াছেন আবির্ভূত। কৃপাময়ী মা পার্বতী দুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাঁড় হাতে নিয়া নিচে নামিয়া আসেন, স্নেহভরে বালককে উহা পান করান। সেই দুগ্ধেরই চিহ্ন এখনো রহিয়াছে তাহার মুখে।

হরপার্বতীর দিব্য মূর্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়া যায়। কিন্তু যে অহেতুক কৃপার ধারা এই বালকের প্রতি বর্ষিত হয় তাহার ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতির।

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু স্নানার্থী ও ভক্তের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হরপার্বতীর আশিস্-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি

১ তামিল শব্দ অপ্পর-এর অর্থ—পিতা। প্রথম জীবনে সাধক অপ্পর ভক্তসমাজে পরিচিত ছিলেন তিরুণাবুক্করসু নামে, জনশ্রুতি আছে চিদম্বরমে সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সম্বন্ধর ভাবাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে অপ্পর বলিয়া ডাকিয়া উঠেন। উত্তরকালে ভক্তসমাজে এই অপ্পর নামই প্রচলিত হয়।

করিতে থাকে তাহার স্বরচিত অপরূপ শিবস্তুতি। চারিদিকে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়ে এই কৃপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহিনী। বালককালেই শিবের কৃপায় দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভক্তসমাজ এই বালকের নামকরণ করেন—'জ্ঞানসম্বন্ধর' অর্থাৎ, দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি রহিয়াছেন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত।

সম্বন্ধর যেমন অপ্পরকে পিতারূপে গ্রহণ করেন, তেমনি অপ্পরও তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই ভক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগূঢ় আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধর্মের উজ্জীবনে একযোগে প্রচার কর্ম শুরু করেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যুক্তভাবে এই দুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত ভক্ত নরনারী করিত তাঁদের অনুসরণ।

ইষ্টদেব শিবকে সাধক অপ্পর আরাধনা করিতেন কিঙ্করররূপে, আর সম্বন্ধর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে। পৃথক দৃষ্টি-কোণ হইতে ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও শরণাগতির দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন একই সাধনপথের সহযাত্রী। সিদ্ধ শৈবাচার্য হিসাবে অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ-বিভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে দেশের অগণিত শিবভক্ত নরনারীকে। অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর রচিত শিব-মহিমার শত শত স্তবগাথা আজও তামিলদেশের সাধকেরা পথে প্রান্তরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, ভক্তহৃদয়ে শিব-ভক্তির প্লাবন বহিয়া যায়।[১]

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্ঞানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্যত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন। মহাত্মা অপ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগূঢ় সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত। পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিরুপ্পগালুর-এর প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অপ্পরের নব ধর্মপ্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা একদল বিরোধী লোকের সহ্য হয় নাই। তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দুষ্টেরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। তিরুপ্পগালুর-এ অপ্পর যখন নিভৃতে বাস করিতেছেন, তখন তাহাদের দুরভিসন্ধি-চরিতার্থ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

রাত্রিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্টা নারীকে তাহারা পাঠাইয়া দেয় অপ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্নের প্রলোভনও তাঁহাকে দেখানো হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক অপ্পরকে প্রলুব্ধ ও বশীভূত করা দূরের কথা, এই নারীরাই তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ে, চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা।

চক্রান্তকারীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে অপ্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে তাহারা পরিচিত হইয়া উঠে।[২]

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচার্যদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। ভক্তদের

---

১ তেবরম্ গ্রন্থে অপ্পর-এর রচিত বহু দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাথা সংকলিত হইয়াছে। এই স্তবসমূহের সংখ্যা তিন শতাধিক।

২ কালচারাল্ হেরিটেজ—শৈব সেইণ্টস্ : এস. এস. পিল্লেই

মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ঋষি ছিলেন শৈব সাধনার প্রধান ধারক বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শিব ও মুরুগ-এর (সুব্রহ্মণ্য বা কার্তিকেয়) সিদ্ধসাধক অগস্ত্য সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিক যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্ড্য রাজসভার আচার্য শৈব সাধক নক্কির-এর প্রভাব প্রতিপত্তির নানা তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজা কন্নপ এক সিদ্ধ শিব-ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, কন্নপ এক সময়ে ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্ঘ্য প্রদান করেন তাঁহার নিজের একটি চক্ষু। অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে যাইবেন এমন সময়ে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হন তাঁহার সম্মুখে। প্রভুর বরে ভক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যালোক দর্শনের শক্তি।

পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবির্ভূত হন প্রখ্যাত শৈবযোগী তিরুমূল'র। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবিভূতির নানা কাহিনী দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। জনশ্রুতি আছে, পরকায় প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর। এক শুদ্ধসত্ত্ব রাখাল বালকের মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব-গাথা। তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ত্ব ও শৈব ধ্যানধারণাকে দেশের দিগ্‌বিদিকে বিস্তারিত করে।

পরবর্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধনা ও ধর্ম-আন্দোলন সুসম্বদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচার্যের মাধ্যমে। মাণিক্যবাচক, অপ্পর (তিরুণাবুক্করসু), জ্ঞানসম্বন্ধর, এবং সুন্দরমূর্তি যথাক্রমে, প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পৃথক পৃথক পন্থা —জ্ঞান, চর্যা, ক্রিয়া ও যোগ। এই পন্থাগুলি সন্মার্গ, দাসমার্গ, সৎপুত্র মার্গ ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছে।

সিদ্ধ শৈব সাধক আচার্যপ্রবর অপ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। তাঁহার মতে, 'দেবাদিদেব শিব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু, জীব তাঁহার নিত্যদাস। আত্মঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাসরূপে তাঁহার সেবা করো, একান্ত শরণ নিয়া তাঁহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, তবেই লাভ করবে বহু প্রার্থিত পরমা মুক্তি।'

অপ্পরের এই দাসমার্গীয় শৈবধর্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাভ করে। পাণ্ড্যরাজ মহেন্দ্র ছিলেন তাঁহার অনুগত শিষ্য। কাঞ্চী মাদুরা চিদম্বরম প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাও মহাত্ম অপ্পরের শিব ভক্তির আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শহরে জনপদে যেখানেই যাওয়া যাইত, শত শত ভক্ত গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনা যাইত এই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপালীলার নানা অলৌকিক কাহিনী। মন্দিরে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাঁহার রসমধুর শিবগাথা।

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিব্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার শেষ অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে, মহাত্মা অপ্পর এবার উৎসুক হন ইষ্টদেব শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য। প্রবীণ সিদ্ধপুরুষের স্তবগাথায় বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে "প্রভু, এবার তোমার কিঙ্করকে

কৃপা ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোতির্লোকে, পরমা মুক্তির মহাসাগরে করো তাকে নিমজ্জিত।"

ইষ্টদেব মহেশ্বর সেদিন আবির্ভূত হন। অপ্পরের নয়নসমক্ষে, আর্তি ও প্রার্থনার উত্তরে বলেন,—'তথাস্তু'।

৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে একাশী বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ সর্বজনশ্রদ্ধেয় শৈবাচার্যের মরলীলায় ছেদ পড়িয়া যায়, চির ইপ্সিত শিবধামে ঘটে তাঁহার মহা উত্তরণ।

অদ্বৈত আচার্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাক্কাল পূর্ব-নবদ্বীপ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিদ্যাগর্বী পণ্ডিতেরা আপন অহমিকা নিয়া মত্ত, ন্যায়ের কচ্‌কচি আর কূটতর্কের ভিড়ে ভক্ত বৈষ্ণবের দল কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে। প্রেমভক্তির কথা উত্থাপন করিলে, নৃত্য কীর্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন আচার্য শ্রীঅদ্বৈত।

অসাধারণ শাস্ত্রবেত্তা এই আচার্য। পাণ্ডিত্যের সাথে তাঁহার জীবনপাত্রে আসিয়া মিশিয়াছে প্রেমভক্তির অপরূপ সুধা—বহু বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাঁহার জীবনে উপজাত হইয়াছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সেদিনকার দিনে ভক্তসাধক অদ্বৈত আচার্য হইয়া উঠিয়াছেন বৈষ্ণবদের প্রবীণতম নেতা, তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ও ভরসাস্থল।

কখনো শান্তিপুরে কখনো বা নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে আচার্যের ধর্মসভা বসে। গৌরকান্তি, শ্মশ্রুগুম্ফ-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র ভক্তসভাটিতে বসিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতা ও ভাগবতের শ্লোক। দুই নয়ন তাঁহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়া ওঠে, ভক্ত শ্রোতাদের অন্তরে জাগে দিব্য শিহরণ।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সাধ্যমতো প্রদান করেন। সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির শুচিশুভ্র কুসুম ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সারা দেশ যে এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি করেন, এসময়ে তাঁহার এই ক্ষীণকায়া ভক্তিস্রোতের ধারায় তো ঈশ্বরবিমুখ মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমভক্তির বেগবতী ভক্তিগঙ্গা-ধারা—আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার মতো এক নব ভগীরথ।

হৃদয়ে দিনের পর দিন আর্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর যুগপ্রবর্তক পুরুষ। কবে ঘটিবে তাঁহার মহা আবির্ভাব? তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়া বৃদ্ধ আচার্য ভক্তিভরে দিনের পর দিন এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সারা ভুবনের মঙ্গলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিক্ত করেন বিষ্ণুঘরের মৃত্তিকা।

জনকয়েক বৈষ্ণব ভক্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য সেদিন বসিয়া আছেন। পবিত্র ভাগবতের মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা চলিতেছে, এমন সময় এক ভক্ত সুসংবাদ জানাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বড় আশ্চর্যর কথা—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে এসেছে এক পরম বৈষ্ণবরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ। পাণ্ডিত্যের অহমিকা কোথায় ভেসে গিয়েছে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। প্রভু! এ দিব্য উন্মত্ততার ছোঁয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার দেখছে, তার আকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূত ও ভাববিহ্বল। তরুণ অধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকাবার শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে নবদ্বীপে।"

আচার্য বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, চোখ দুইটি উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "ভাই, তোমাদের কথা সত্য হোক, আশা ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি।"

কিছুক্ষণ মৌনী থাকার পর আবার তিনি স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তা হলে একটি গোপন কথা তোমাদের ভেঙে বলছি,—কাল শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ শ্লোকের নিহিতার্থ বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই উপবাসী থেকে এই শ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম। রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখলাম, আমাদের ঐ নিমাই আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। ডেকে বলছে—'আচার্য, তুমি আর মনে দুঃখ ক'রো না, ওঠো।' কি অদ্ভুত ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোকের অর্থাটও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।

"মুহূর্ত মধ্যে আমার সর্বশরীরে সঞ্চারিত হলো এক অপূর্ব পুলকস্রোত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি মাঝে মাঝে দেখেছি—তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো আমার গৃহে। সে অনেক দিন আগের কথা। যাক্ তোমাদের সংবাদ, বড়ই শুভ। দেখা যাক্ শ্রীভগবান্ এই মহাবৈষ্ণবের ভেতর দিয়ে তাঁর কোন লীলানাট্যের সূত্রপাত করতে চাচ্ছেন।"

এ নাট্যলীলা অনুষ্ঠিত হইতে দেরি হয় নাই। অচিরে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় বিগ্রহরূপে ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনামের ধারায় সারা দেশ তিনি প্লাবিত করেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান পার্ষদরূপে, লীলানাট্যের অন্যতম সূত্রধাররূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে অদ্বৈত প্রভুর যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবর্তী। চৈতন্য ভাগবত নিতাই ও অদ্বৈতকে অভিহিত করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের দুই বাহুরূপে। অদ্বৈতের প্রতি ভক্ত মানবের ঋণের কথা জানাইতে গিয়া ভক্তকবি বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন, "যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার।"

চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের মহাপ্রভু—আর প্রভু হইতেছেন দুইটি—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। আর কোনো চৈতন্যপার্ষদ এই প্রভুত্বের মর্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য।

চৈতন্য-পার্ষদ অদ্বৈত ভক্তদের 'প্রভু', মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণভক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একটা বিশেষ মর্যাদা তাঁহার আছে। অদ্বৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তরঙ্গ শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্য প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপান্তর। তাই মাধবেন্দ্র-শিষ্য এই আচার্যকে শ্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুরুর মতো। সুযোগ পাইলেই অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবাইর সম্মুখে দিতেন তাঁহাকে অসীম মর্যাদা। চৈতন্য চরণাশ্রিত

বৃদ্ধ বৈষ্ণব চৈতন্যের এই ভক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। কোনো বাদপ্রতিবাদে ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু কোনো সময়েই ধর্ম ও শাস্ত্র ও লৌকিক আচার-আচরণের মর্যাদা রক্ষণে ত্রুটি করিতেন না, তাই অদ্বৈতের প্রতি ভক্তি নিবেদনের বেলায়ও তাঁহাকে কখনো নিরস্ত করা যায় নাই।

শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতের পারস্পরিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় অন্তরঙ্গ। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের স্বরূপটি মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য গোসাঞিকে প্রভু গুরু করি মানে।
লৌকিক লীলাতে ধর্ম মর্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন।
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য করে প্রভু জ্ঞান
আপনাকে করেন তাঁর দান অভিমান।

সমকালীন বৈষ্ণবসমাজের এই প্রবীণ প্রতিভাধর নেতা, মহাপ্রভুর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, অদ্বৈত আচার্যের জন্ম হয় শ্রীহট্টে। বর্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অঞ্চল তৎকালে ছিল লাউড় পরগনা নামে পরিচিত। এই পরগনা অন্তর্ভুক্ত নবগ্রামে আনুমানিক ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন।[১]

পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মপরায়ণ আচার্যরূপে তাঁহার তখন যথেষ্ট খ্যাতি। বংশের গৌরব ও ঐতিহ্যও কম নয়। স্বনামধন্য নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাঁহারই পূর্বপুরুষ। পাঠান যুগের গৌড়ীয় হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়া নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল।

কুবের আচার্য ও তাঁহার পত্নী লাভা দেবীর বড় দুঃখ, পর পর তাঁহাদের কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু একটিও জীবিত রহে নাই। আর যে কোনো পুত্রসন্তান জন্মিবে সে আশাও নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানের পিণ্ডও পাওয়া যাইবে না? এই সব ভাবিয়া স্বামী স্ত্রী কাহারো মনে শান্তি নাই, সংসার কর্মেও দিন দিন বড় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন তাঁহারা লাউড় ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন।

পতি-পত্নী উভয়ে এবার স্থির করিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে কিছুদিন নির্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে পূজা, ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিবেন।

নূতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাভা দেবী সন্তানসম্ভবা হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে রাজসভার আহ্বানও আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত আনন্দিত মনে সস্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

১ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্য জন্মকালে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বাহান্ন বৎসর বয়স্ক। চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই। নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ।

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব ভক্তিপরায়ণতা। সহজাত ধর্ম-সংস্কার নিয়াই সে জন্ম নিয়েছে। নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোনো কিছুই তাহাকে আহার করানো যায় না।

দেব পূজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন নারায়ণ শিলা অর্চনা করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়া সেখানে সে বসিয়া থাকে, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু।

কুবের তর্কপঞ্চানন লক্ষ্য করেন ছেলে তাঁহার শ্রুতিধর। এই সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। বুঝিলেন, বালক উত্তর কালে শাস্ত্রপারঙ্গম হইবে, বংশগত ঐতিহ্যের ধারাটিও সে বজায় রাখিতে পারিবে।

কমলাক্ষের বয়স যখন বারো বৎসর। অধ্যয়নের জন্য পিতা তাঁহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর এই কিশোর শিক্ষার্থী। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং ষড়্দর্শনের পাঠ সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া আসেন। এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। নব্বই বৎসর বয়সে পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মরদেহ ত্যাগ করিয়া যান এবং কিছুদিন পরে মাতা লাভা দেবীরও লোকান্তর ঘটে।

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগ্যের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। স্থির করিলেন, অবিলম্বে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণতি জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্যটনে।

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে তাঁহার তরুণ জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিমার্গীয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তি তাঁহার ঘটিবে, এ সংকল্পই এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য নিষ্ঠাভরে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন-ভজনে রত থাকিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন।

গয়ার কার্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক রহিল জীবনতরীর কাণ্ডারী সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি একদল মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্মসভায় আসিয়া উপস্থিত। নারদীয় সূত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে। এই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্ত্বিক ভাববিকার।

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্ন্যাসী, ভক্তিরসের পরম রসিক, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত। নবাগত ভক্ত কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া পুরী মহারাজ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অপার করুণা ঝরিয়া পড়িল এই তরুণ ভক্তের উপর। অদ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।

মূর্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী
কহে ইঁহো ভক্তিধর্মে উত্তমাধিকারী।
সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধা প্রেমভক্তি।
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার স্থিতি।
শুদ্ধ প্রেমাসব ইঁহা করিয়াছে পান।
অন্তর্নিত্যানন্দ ইঁহার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ইঁহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ।
জগতে তারিতে বুঝি হৈলা প্রকটন।

ভক্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি বারংবার শ্রবণের পর কমলাক্ষ আচার্য সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন। শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ; দুই নয়নে তাঁহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন।

কমলাক্ষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনতি করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন পেলাম। সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিকল্পবৃক্ষ। আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিন।"

পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্যের জীবনে দেখা দিল এবার সদ্‌গুরু কৃপার অরুণোদয়, জীবন তাঁহার নবরাগের বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্ত্বের উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাঁহার নব রূপান্তর।

মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদায় গ্রহণের পালা। কমলাক্ষ স্বভাবতই মানবপ্রেমিক, লোকমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সহজাত। করুণ কণ্ঠে সদ্‌গুরুর কাছে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে আদর্শহীন, ধর্মহীন। সর্ব দিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট। ভুবনমঙ্গল হরিনাম, কৃষ্ণনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক'রে তারা উদ্ধার পাবে।"

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কণ্ঠে কহেন, "কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর আবির্ভাব চাই। তা নইলে তো চলবে না। তুমি মহাভক্ত। জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে ঐশী শক্তির প্রকাশ। শ্রীভগবানকে ডাকবার, তাঁকে জাগ্রত করবার ভার তুমিই আজ থেকে নাও বৎস।"

সদ্‌গুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ আচার্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থদর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন করেন আর হৃদয়ে তাঁহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভক্তবর কখনো ভাবাবেশে শুরু করে উদ্দণ্ড নর্তন কীর্তন, কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায় কোনো হুঁশ নাই।

সেদিন তিনি গিরিগোবর্ধনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তরে বহিয়া চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ। পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন।

সারাদিন পাগলের মতো যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; এবার রাত্রি সমাগত। চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহে আচার্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অল্পকাল মধ্যে দুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা।

এই সময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন।—শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাঁহার ভুবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কহিতেছেন, "আচার্য, জীবের মঙ্গলসাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ. এ বড় আনন্দের কথা। যথাসাধ্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করো। আর এই সঙ্গে করো লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর শোন, তোমায় আমি একটা নিগূঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমার এক দিব্যমূর্তি দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে। আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে—মদনমোহন। দ্বাপরে কুব্জা আমার এই মূর্তির সেবা করেছে। আজো বিগ্রহ যমুনা তটে ভূগভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্তন করো।'

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্যের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরি হয় নাই। কোদাল শাবল নিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে দ্বাদশ আদিত্য তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল।

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় এক পরম মনোহর কৃষ্ণমূর্তি। ললিত ত্রিভঙ্গঠামে উহা দাঁড়াইয়া আছে। স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্তি হাতে পাইয়া আচার্য আনন্দে বিহ্বল হন। অতঃপর একটি ভক্তিমান্ সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের সেবার ভার দিয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান।

প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই। অদ্বৈত আচার্যকে এবার তিনি এক নতুন খেলা দেখাইতে শুরু করিলেন।

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্যয় ও ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাণ্ডব। স্বপ্নলব্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আচার্য বৃন্দাবনে আসিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যায়।

ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোলা হইয়াছে; তাই এটির দর্শনের জন্য সর্বদাই জনতার ভিড় লাগিয়াই থাকে। একদল দুষ্টস্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন দল বাঁধিয়া তাহারা মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে। এটির মর্যাদা-হানি করা ও ভাঙিয়া ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর।

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করেন। পাঠানেরা কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাই। কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

নূতন পূজারী এতক্ষণ যমুনায় দাঁড়াইয়া স্নান-তর্পণে রত ছিলেন। পাঠানদের হামলার কথা শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এটি অপবিত্র করিয়াছে এবং জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। খেদের তাঁহার আর সীমা রহিল না, হায়-হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সংবাদ শুনিয়া আচার্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অন্যান্য অভুক্ত অবস্থায় চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু হারানো বিগ্রহের কোনো সন্ধানই মিলিল না।

রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। স্বপ্নযোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে আচার্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, আর এমন ক'রে ভেবে মরছো? আমায় তো পাঠানেরা ভেঙে ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই দুষ্ট ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল বাগান আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় তুলে নিয়ে এসো। আর শোন, এখন থেকে আমার এই দুষ্টু গোপাল-লীলার স্মৃতিই এখানে জাগরূক থাক, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদ্‌লে দাও তুমি।"

আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনই পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদনগোপালরূপে ইহার সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। আবার একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্নাদেশ হইল, "আচার্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানটা তেমন সুরক্ষিত নয়। ম্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি এক কাজ করো। মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী দু'একদিন মধ্যে এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো। তাহলে আমার সেবাপূজার কোনো বিঘ্ন আর হবে না।'

আচার্যকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর আরো কহিলেন, "বৎস, তুমি খেদ ক'রো না। এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মতো মহাভক্তের মধ্য দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুষ্টি। আরও শোন। আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে সংগোপিত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও।"

পরদিন মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদনগোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়েও পৌঁছিয়া গিয়াছে।

আচার্যের কাছে আসিয়া দৈন্যভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। সাশ্রুনয়নে আচার্য প্রাণ প্রিয় শ্রীবিগ্রহ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। অর্চনার জন্য সঙ্গে আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট।

মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইয়া কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না।

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্রপুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাঁহার দিব্য ভাবাবেশ। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর প্রিয় শিষ্য কমলাক্ষকে ডাকিয়া সেদিন এই নিগূঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন :

পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্মাণ।
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। (অদ্বৈত প্রকাশ)

বলা বাহুল্য, অদ্বৈত আচার্য তাঁহার গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন। প্রাক্ চৈতন্য যুগের তাঁহার অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি রাধার এই যুগল উপাসনা অত্যল্পকাল পরে প্রভু চৈতন্যের মণ্ডলীতে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই আচার্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আরো একটি কথা বলিয়া গেলেন। কহিলেন, "বৎস, এবার তুমি বিবাহ ক'রে সংসারাশ্রমী হও। সংসারে থেকে কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করো, জীবের কল্যাণ সাধন করো।"

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরী মহারাজ শান্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচার্য জীবন। নিজ গৃহে শান্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর বিদ্যার্থীর দল এই সাধক ও শাস্ত্রবেত্তার কাছে আসিয়া শরণ নেয়। তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি বাহিয়া চলিতে থাকে। তাই পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের নায়কেরা এই পূর্বসূরীর কাছে কম ঋণী নন।

কমলাক্ষ আচার্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্যামদাস। আচার্যের সহিত তর্কবিচারে পরাস্ত হইয়া নতশিরে তিনি তাঁহার ভক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্যামদাস এ সময়ে আচার্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য। এখন হইতে কমলাক্ষ পণ্ডিত এই নূতন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

অদ্বৈতের অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ। বৈষ্ণব দীক্ষা প্রাপ্তির পর ইঁহার নূতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণদাস অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য যবন হরিদাস আচার্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমভক্তির ঢল নামিয়াছে। হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় শান্তিপুরে অদ্বৈতের ধর্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া

উপস্থিত। আচার্য প্রভুর নাম এবং সাধন-ঐশ্বর্যের কথা তিনি শুনিয়াছেন, মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের পথপ্রদর্শকরূপে।

কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাঁহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে থাকেন।

আচার্যের হৃদয় গলিয়া যায়। কে এই গৌরতনু চারু দর্শন তরুণ ভক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাড়িয়া নেয়? সিদ্ধ সাধকের অপূর্ব লক্ষণসমূহ তাঁহার চোখে মুখে। সারা দেহে ভক্তি-রসের লাবণ্য টলমল করিতেছে।

আগ্রহাকুল কণ্ঠে আচার্য প্রশ্ন করেন, "বৎস, কি নাম তোমার? কোথা থেকে তুমি আসছো?"

পদতলে পতিত তরুণ ভক্ত উত্তর দেন, "প্রভু, আমি ম্লেচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে এসেছি। কৃষ্ণভক্তি কি ক'রে পাবো, কৃপা ক'রে সেই উপদেশ আমায় দিন।"

পরম স্নেহভরে আচার্য-প্রভু নবাগত ভক্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া শুরু হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন। আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য ভক্তি-তত্ত্ব তিনি আহরণ করেন, কীর্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

ভক্ত হরিদাস আর্তি আর দৈন্যের মূর্তবিগ্রহ। তাই একদিন আচার্যের কাছে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় শাস্ত্রপাঠ, সাধনা, এসব তো করলাম। কিন্তু আমার মতো জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কৃপা শক্তি ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবে না! সেই কৃপাশক্তিই আজ প্রয়োগ করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোনো উপায় নেই।"

অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন—

কহে, শুন বৎস ধর্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী।
কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি।
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাধিক হয়।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই হয় সর্বোত্তম।
কৃষ্ণ বহির্মুখ যেই সেই নরাধম। (অদ্বৈত প্রকাশ)

জীবোদ্ধারের যে উদার সর্বজনীন আহ্বান পরবর্তীকালে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে গৌরসুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অদ্বৈতের মুখে শোনা গেল তাহারই পূর্বাভাস।

অদ্বৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শান্তিপুর ত্যাগ করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

আচার্য তাঁহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "হরিদাস, তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একান্তভাবে গ্রহণ করো, দিগ্‌বিদিকে পরমপ্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়েছিলেন। তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নির্দিষ্ট করছি—

ধর্ম প্রবর্তন হেতু লও হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ।

যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়।
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয়।
নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খণ্ডয়।
নাম-চিন্তামণি-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
ব্রহ্মাণ্ডে সবস্তু নাঞি নামের সমান।
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন।"

বৈষ্ণব সাধক হরিদাসকে আচার্য প্রভু সন্ন্যাস দিলেন। মস্তক মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়া দেওয়া হইল কৌপীন-ডোর, গলায় তুলসীর মালা। শক্তি-সঞ্চারিত নামের বীজ আচার্য এই মহাভক্তের কর্ণে দিলেন।

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা। টলিতে টলিতে গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়া পড়িলেন। এখন হইতে তাঁহার নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ। অদ্বৈত আচার্যের অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যেন দেখা দিলেন নামব্রহ্মের চারণ যবন হরিদাস। আচার্য তাঁহার নাম দিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ভক্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন দিগ্‌বিদিকে।

গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়া গেল।

নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ী এক ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহার দুইটি যমজ কন্যা—সীতা ও শ্রীরূপা। এই দুই কন্যাকে তিনি অদ্বৈত আচার্যের কাছে সম্প্রদান করিলেন।

শান্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অদ্বৈতের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা। বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী, বিশেষ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার। শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ভিড় করিতেছে। উচ্চস্তরের বিষ্ণুভক্ত সাধক বলিয়াও তঁাহার খ্যাতি প্রচুর। ভক্তিমার্গের সাধন যাঁহারা লাভ করিতে চান তাঁহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্যের গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের খ্যাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে।

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষাগুরু অদ্বৈতের সঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই, হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া উঠে নূতন ভাবাবেগ, নূতন উদ্দীপনা।

শান্তিপুরের ব্রাহ্মণেরা যবন-ভক্ত হরিদাসের আগমনের কথা জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথা তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই প্রতিষ্ঠা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকিল। ম্লেচ্ছ সাধককে নিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতে তাঁহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক অদ্বৈতকে বলিয়া দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে তাঁহাকে একঘরে করা হইবে।

ইতিমধ্যে শান্তিপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। স্থানীয় একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়িতে সেদিন পূজা-উৎসব চলিতেছে। গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক ব্যক্তি আসিয়া সেখানে জুটিয়াছেন, আহারাদির যোগাড় হইতেছে। এমন সময় নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। অপূর্ব তাঁহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে সিদ্ধ সাধকের দিব্য দ্যুতি। সন্ন্যাসী শুধু বাক্‌সিদ্ধই নয়, পরম কৃপালুও বটে। কাঁদিয়া কাটিয়া যে যাহা ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাই মিলিতেছে। পদধূলি মাথিয়াই কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়া গেল। বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভিড়।

উৎসব গৃহের কর্মকর্তারা ছুটিয়া আসিলেন। গলবস্ত্র হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থা হয়েছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে আপনিও দয়া ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন।"

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "কিন্তু বাবা, আমি তো অ-নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিনে। বিষ্ণুর প্রসাদ যদি থাকে তবেই আহারে বসতে পারি।"

"বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ শিলা রয়েছেন। তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে আপনাকে ভোজ্যদ্রব্য এনে দিচ্ছি। পাতা দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে এসে বসুন।"

সন্ন্যাসী তখনও ভাবাবেশে মত্ত। ধীরে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া বসিলেন। সর্বাগ্রে তাঁহাকে আহার্য পরিবেশন করা হইল।

কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, "একি হরিদাস, তুমি এখানে! আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেখছি, তোমায় নিয়ে পঙক্তি ভোজনে বসে গেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড। এ আবার তোমার কোন্ ঐশ্বর্য প্রকাশ?"

অদ্বৈতের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া হরিদাস কহিলেন, "প্রভু, আমার দোষ নেবেন না। কৃষ্ণকৃপায় এই সজ্জনেরা আমায় আজ কি এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন জানিনে। আগ্রহ ক'রে এঁদের পঙ্‌ক্তি ভোজনের ভেতর এনে বসিয়েছেন।"

আচার্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। দুই চোখ বাহিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্যের স্তবগান। এক অপূর্ব ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা সবাই নির্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়া মহাভাগবত হরিদাসের ব্যক্তিত্বের এই ইন্দ্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। এইসঙ্গে অদ্বৈতের মহিমাও তাঁহারা কিছুটা উপলব্ধি করিলেন। যবন হরিদাসের অলৌকিক কাহিনী তাঁহারা শুনিয়াছেন, আজ তাহার কিছুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচার্য অদ্বৈত হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্ণবেরই এক প্রধান পথপ্রদর্শক। এই আচার্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করার জন্য যাঁহারা চেষ্টিত ছিলেন তাঁহারা এবার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া নিলেন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মহিমা সাধারণ মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? এ মহিমা বুঝিয়া-

ছিলেন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিজের গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজ্য-পাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভক্তিসিক্ত এই যবন ভক্তকেই।

আচার্যের এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমকিয়া উঠেন। যুক্তকরে নিবেদন করেন, "সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এ আপনি আমার মতো অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন কেন?"

প্রেমাশ্রু-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দিলেন, "হরিদাস, আমার দৃষ্টিতে তুমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব। জানতো? প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা বিহার করেন গোলোকপতি। তোমার মতো মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়া যে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমান। আমি তো এতে অন্যায় কিছু করিনি।"

যবন সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন এক বৈপ্লবিক সৎসাহস প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্ম্যের দিকে চাহিয়াই তাঁহার এই কার্যকে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়।

অদ্বৈত আচার্যের এই ঔদার্য সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাঁকিয়া উঠে। গীতা, ভাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, আর নিশাযোগে পরমভক্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাবেশে করেন নামকীর্তন।

সুপণ্ডিত বিষ্ণুভক্ত, অদ্বৈত আচার্যকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা আচার্যের ধর্মসভায় প্রায়ই উপস্থিত হয়, কৃষ্ণকথায় আনন্দে কাল কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

দেশের চারিদিকে তখন ধর্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্মের তাণ্ডব চলিয়াছে। পাষণ্ডীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জরিত। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদেরই প্রতি যেন তাহাদের আক্রোশ সর্বাপেক্ষা বেশী।

এ অবস্থা আর যেন সহ্য করা যায় না। ভক্ত হরিদাস এক একদিন সাশ্রুনয়নে আচার্যকে কহেন, "প্রভু, ধরণীর ভার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবান্‌কে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি—তিনি কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের উদ্ধার সাধন?"

আচার্য সান্ত্বনা দেন, "হরিদাস, তুমি উতলা হ'য়ো না, তোমার মতো আমিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গাজলে কৃষ্ণের আরাধনা করছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। ভেবো না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন।"

শ্রীবাস, শুক্লাম্বর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার সভায় বসেন, পাষণ্ডীদের অনাচারের কথা বর্ণনা করেন। পরমাশ্রয়, সর্বজীবের উদ্ধারকর্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া ভক্তেরা খেদ জানান।

শুদ্ধাচারী মহাতেজস্বী আচার্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন। ভক্তদের সম্মুখে নিজের আশা ও সংকল্পের কথা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—

মোর প্রভু-আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।

তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।

বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখহ হেথাঞি। (চৈতন্য ভাগবত)

'অদ্বৈত সিংহে'র হুঙ্কার আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্তন ও আর্তি'র ফল অচিরেই ফলিল। নিজ গৃহের ধর্মসভায় বসিয়া আচার্য সেদিন আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর, তার্কিক বিদ্যাগর্বী বিশ্বম্ভর, গয়াধাম হইতে এক মহাবৈষ্ণবে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাবপ্রবাহ উচ্ছলিত তাঁহার সর্বসত্তায়, দুর্লভ সাত্ত্বিক প্রেমবিকার স্ফুরিত তাঁহার সর্বদেহে। সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন ঐশী লীলার মহাপ্রকাশ ঘটিতে যাইতেছে?

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাঁহার তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন দুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল। প্রাণে জাগিয়া উঠিল পরম আশ্বাস—তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন? নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য দিয়াই কি তাঁহার আত্মপ্রকাশ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্ আধারে কেমন করিয়া প্রকটিত হইতে চলিয়াছে।

যাই হোক, আচার্য ধৈর্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। পরমতমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে তবে তাঁহাকে যে আচার্যের কাছে আসিতেই হইবে। তাঁহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাঁহার তুলসীগঙ্গাজলসহ আর্তি তো বিফল হইবার নয়। আবির্ভূত পুরুষকে আপনা হইতেই যে অদ্বৈতের আঙিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে।

সেদিন প্রভাতে আচার্য আঙিনার তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। কখনো গোলোকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র নতি কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া ছাড়িতেছেন প্রবল হুঙ্কার।

এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়া বিশ্বম্ভর সেখানে উপস্থিত। আচার্যকে দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ। মুহূর্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সংবিতের চিহ্নমাত্র রহিল না।

অদ্বৈত নির্নিমেষে এই মূর্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। এ কি অপরূপ দিব্য লাবণ্যময় দেহ! এ কি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে! এই অদ্ভুত ভক্তি-আবেশ তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মহান্ মূর্তি নয়ন হইতে ফিরাইতে পারেন না!

ভক্তিসিদ্ধ আচার্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল এক পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবস্তু যাহার জন্য আজীবন তিনি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন—ইনিই যে তাঁহার প্রাণনাথ।

ভাববিমুগ্ধ আচার্য বিষ্ণু পূজার উপকরণাদি নিয়া বিশ্বম্ভরের মূর্ছিত দেহের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসেন। পরম ভক্তিভরে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া, বিষ্ণু-স্তোত্র গাহিয়া করেন তাঁহার বন্দনা।

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্য প্রভুর নয়নাশ্রু অবিরাম ঝরিতেছে, আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বম্ভরের চরণ দুটি হইতেছে সিক্ত।

গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত। সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ আচার্য অদ্বৈতের এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও তাঁহার হইল। আচার্যকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিলেন, "প্রভু, বিশ্বম্ভর আপনার কাছে বালকমাত্র। তাকে এভাবে পূজা অর্চনা আপনি যেন আর করবেন না।"

ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা আচার্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গদাধর, এ বালক যে কে, তা অচিরেই বুঝবে আর একটু অপেক্ষা তোমরা করো।"

ইতিমধ্যে বিশ্বম্ভরের বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

বিশ্বম্ভর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন। অদ্বৈতের পদধূলি মাথায় নিয়া দৈন্যভরে কহেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥

নির্নিমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, হে কপটী, এ আবার তোমার কোন ছল? কিন্তু আর তো আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। যে পরম আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে। আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে আমার সম্মুখে।

ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "না বিশ্বম্ভর আর তুমি আমায় এড়াতে চেয়ো না। আমার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে—তুমিই হচ্ছো আমার শ্রেয় বস্তু। আর শোন, বৈষ্ণব জীবনের ধারা সারা দেশে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভক্তেরা সবাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরাশ্যে, মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্তনে মাতোয়ারা হবার জন্য তারা ব্যাকুল। তুমি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।"

চিহ্নিত নেতা আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহার নিজগণ চিনিয়া নিন, সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই যে অদ্বৈত চাহিতেছেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য, কিছুকাল নবদ্বীপের বাহিরে থাকিয়া বিশ্বম্ভরকে পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অদ্বৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া থাকেন, এই লীলা পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভক্তসমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন লীলা। শ্রীবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবেরা প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া জড়ো হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

মাধবেন্দ্রপুরীর পরম স্নেহভাজন নিত্যানন্দ। ভক্তি প্রেমরসের তিনি এক উৎসস্বরূপ। মাধবেন্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিরসের অন্যতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচার্য। তাই নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোৎসব তেমন যেন জমিতেছে না।

সেদিন প্রভু শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে ডাকিয়া কহিলেন—

চলহ রমাই! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনি আসিয়া ঝাট কর বিবর্তন। (চৈঃ ভাঃ)

প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রভু গৌরসুন্দর এবার আর যেন রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবির্ভাবের পরম তত্ত্বটি নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছেন— এসময়ে চিহ্নিত পার্ষদ অদ্বৈত আচার্যকে যে তাঁহার অবিলম্বে চাই।

রামাই পণ্ডিতকে প্রভু আদেশ কহিলেন, "দ্যাখো, তুমি গোপনে আচার্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্তা। এখানে এত দিন ধরে যা কিছু দেখেছো ও শুনেছো, আচার্যকে সব বলবে। আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য যেন পুজোর সব উপচার সংগ্রহ ক'রে আনে, সস্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজো করে।"

রামাইকে দেখিয়াই আচার্য বলিয়া উঠিলেন, "কি হে রামাই, হঠাৎ তুমি এসময় শান্তিপুরে এলে কি মনে ক'রে, বলতো। আমায় ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি।"

রামাই বুঝিলেন কোনো কথাই এই শক্তিমান্ বৈষ্ণবের অগোচর নাই। মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে সব কিছুই তো আপনার জানা। আদেশ হয়েছে, এবার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর সকাশে চলুন।"

বৃদ্ধ আচার্য বড় চতুর—মনোভাব তাঁহার বড় দুরবগাহ। প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, "আচ্ছা রামাই, তোমরা সবাই এত হৈ-চৈ করছো, কিন্তু আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান্ মানবদেহে আবির্ভূত হবেন। কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি—তোমার অগ্রজ শ্রীবাস পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে। কিন্তু রামাই, তোমাদের এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা তো বুঝতে পারিনে।"

রামাই জানেন, আচার্য অদ্বৈত গৌরসুন্দরের নব আন্দোলনের এক বড় স্তম্ভ। প্রভু তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন—তাঁহার জন্য তিনি আজ প্রতীক্ষমাণ। তাছাড়া, গদাধরের কাছে তাঁহারা সবাই শুনিয়াছেন, আচার্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার প্রাণপ্রভুরূপে। স্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাঁহাকে পূজা করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আজিকার এ কথা তো তাঁহার প্রাণের কথা নয়।

যাই হোক, ভক্ত রামাই ভাবিলেন—তিনি দূতমাত্র। প্রবীণ, মহাজ্ঞানী আচার্যের সহিত আঁটিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবহু আচার্যের সম্মুখে এসময়ে আওড়াইয়া গেলেন।

যুক্তকরে কহিলেন, "আচার্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন।

আপনি পুজোর সজ্জা ও উপচার নিয়ে শিগ্‌গীর আসুন। আর আমরা সবাই প্রভু আর তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরের মিলনমধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি।"

মুহূর্ত মধ্যে দেখা গেল আচার্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রেমভক্তির প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার দেহখানি থরথর কাঁপিতেছে। মহাপণ্ডিত আচার্য বালকের মতো ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—"এসেছেন, এসেছেন! প্রভু আমার ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ধুলায় তিনি নেমে এসেছেন!"

কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলেন। রামাই এই সুযোগে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "আচার্যবর, প্রভু কিন্তু আপনাকে অবিলম্বেই তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।"

অদ্বৈত পণ্ডিত এবার তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "দ্যাখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, যখন তিনি আমায় তাঁর আপন ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য দেখাবেন, আর আমার এই পক্ককেশাবৃত মস্তকের ওপর তাঁর চরণদুটি তুলে ধরবেন।"

সস্ত্রীক নবদ্বীপে পৌঁছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখো দ্যাখো, নাড়া এখনো আমার পরীক্ষা করতে চায়। আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচার্যের ঘরে সস্ত্রীক সে লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।"

অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্নীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল।

প্রভু আজ ঐশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য রূপৈশ্বর্য চতুর্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভাববিহ্বল অদ্বৈত নির্নিমেষ নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া আছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র। গদাধর পণ্ডিত তাঁহার তাম্বূলকরঙ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন করিতেছেন, আর শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মুখে বিস্তারিত গৌরসুন্দরের সৌন্দর্য-সুধার সমুদ্র। অদ্বৈত হতবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ময় কনক সুন্দর কলেবর।
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।

শুধু তাহাই নয়, অদ্বৈত আচার্যের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা পর্দা অপসারিত করিয়া নিয়াছেন। অনাবৃত করিয়াছেন তাঁহার জ্যোতির্ময় দিব্যরূপ। এ রূপের জ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর।

এ অলৌকিক-দর্শনের ফলে পতিপত্নী উভয়ে আনন্দে আত্মহারা। পরম ভক্তিভরে ষোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পূজা তাঁহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোদ্বেল আচার্যের মুখে বার বার উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষ্ণুধ্যানের স্তবগাথা।

পূজা ও স্তবগানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ সর্বজনমান্য মহান্ আচার্যের শিরে তিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণদ্বয়। ভক্ত-গোষ্ঠীর হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্বৈতের সংকল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে তিনি স্বীকার করিবেন, জীবন-প্রভুরূপে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে অদ্বৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। সে সংকল্প আজ তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে। আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। প্রভু ও তাঁহার স্বজনদের জ্যোতির্ময় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন। অদ্বৈতের শিরে পদ স্থাপন করিয়া প্রভু আদেশ দিলেন, "অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে ব'সো, পঞ্চ উপচারে সস্ত্রীক আমার চরণ পূজা করো।"

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভু এমনি করিয়া তাঁহার সর্বস্ব কাড়িয়া নিবে, তাঁহার জীবন-বেদীতে নিজেকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই তো তিনি চান।

এবার সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভুকে সাজাইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ষোড়শোপচারে প্রভুর পূজা সম্পন্ন করিলেন। আচার্যের দুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর ধারা।

প্রভু বিশ্বম্ভর আজ অপূর্ব দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গভীর ভাবে অদ্বৈতের পূজা আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ষীয়ান মহাভক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মালা।

এবার শোনা গেল আচার্যের প্রতি প্রভুর আর এক নূতন আদেশ, "ওরে নাড়া, পুজো আমার শেষ হয়েছে। এবার কীর্তন হবে তাতে তুই নৃত্য কর।"

ভক্তগণ সোল্লাসে কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভুত দৃশ্য। মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব বৃদ্ধ আচার্য পরমানন্দে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজি বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু। অদ্ভুত প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপনা বিস্মৃত হইয়াছেন। ভক্তগণ তাহার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, অদ্বৈত আচার্য—বহু ভক্তজন যাহার আশ্রিত, বহুজনের অধ্যাত্ম-জীবনের যিনি পথপ্রদর্শক? পরশমণি প্রভুর জাদুস্পর্শে এই ভাবগম্ভীর জ্ঞানীপুরুষ আজ নৃত্যকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম।

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থনা। তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও, যা চাইবে তা ই আজ আমি তোমায় দেব।"

আচার্য যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, কোনো কথাই বলিতেছেন না। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে দুলিয়া দুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, "না আচার্য, তুমি বর প্রার্থনা করো। কি তোমার অন্তরের অভিলাষ, তা জানাও।"

অদ্বৈত আচার্য তবুও নিরুত্তর।

প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, "তবে শোন আচার্য, ঘরে ঘরে নামকীর্তনের প্রচার এবার আমি শুরু করবো। অপূর্ব ভক্তিসম্পদ চারদিকে বিলিয়ে দেবো।"

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। করুণার্দ্র নয়নে কহিলেন, "প্রভু, যদি কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যদি তোমার দেবদুর্লভ ভক্তি বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে তাদেরই দাও যারা রয়েছে সবার পশ্চাতে—চিরবঞ্চিত হয়ে। শূদ্র আর স্ত্রীজাতির মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও।"

ভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহার এই প্রার্থনা পূরণে স্বীকৃত হইলেন, সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন হুঙ্কার।

প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে, আচার্যের দিন বড় আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু অন্তরে তাঁহার একটা কাঁটার খোঁচা থাকিয়াই যাইতেছে। বয়ঃবৃদ্ধ বৈষ্ণব নেতা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ভক্তি করেন, সম্ভ্রম দেখান। এক একদিন আচার্যকে সবলে ভূতলে ফেলিয়া তাঁহার চরণতলে নিজের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের সারা অন্তর তখন এক অব্যক্ত কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চায়। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন করিয়া শুধু শুধু তাঁহাকে বিড়ম্বিত করেন? প্রভু তাঁহার প্রভুত্ব দেখাইতে থাকুন, আচার্যকে কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাঁহার অন্তরঙ্গতা।

আচার্য ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত চাতুর্যপূর্ণ খেলাই তিনি খেলিবেন। অল্প কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন।

আচার্যের পূর্বেকার সে ভক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষ্ণধী বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ্‌রূপে। আর তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের দিগ্‌দর্শন—

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া।
"জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সর্বশক্তি।
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন।
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম?
আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র।" (চৈঃ ভাঃ)

অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবেরা তো অবাক্‌! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির অন্যতম ধারক ও বাহক অদ্বৈতের মুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের কথা। আচার্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়া ফেলিলেন?

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের চোখে আচার্য ধুলা দিতে পারেন নাই। হরিদাস বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরসুন্দরের সহিত চতুরতার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে

অবিলম্বে শান্তিপুরে টানিয়া না আনিয়া তিনি ছাড়িবেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্বব্যাখ্যা শুনেন, আর নীরবে মুচ্‌কি হাসি হাসেন।

অচিরেই অদ্বৈত আচার্যের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ গৌরসুন্দর শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত।

আচার্য ও তাঁহার গৃহের সকলে ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িল।

অদ্বৈত যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে নাড়া, আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল্— ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়।"

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ইহাই যে তিনি চাহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবেন, দণ্ড দিবেন, আর তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। এইজন্যই তো চতুর অভিনয় তাঁহাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে হইয়াছে।

সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, সর্বকালে সর্ব সমাজে জ্ঞানই তো বড়। জ্ঞানহীন ভক্তি দিয়ে কোন্ কার্য সাধিত হবে?"

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? ওরে নাড়া, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই এ কথা উচ্চারণ করছিস!"

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচার্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। তারপর প্রবল বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল অজস্র কিল চড়।

প্রহার জর্জরিত আচার্যের মুখ দিয়া কিন্তু একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না। মৃতপ্রায় হইয়া তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। আচার্য গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিল না। আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দোহাই তোমার! বুড়ো বামুনকে একেবারে প্রাণে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও।"

ভক্তপ্রবর হরিদাস এক পাশে দণ্ডায়মান। প্রভুর এই বিচিত্র কোপ-লীলা দর্শনে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীতি ও বিস্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতেছেন।

হৈ চৈ শুনিয়া আচার্যের আঙিনায় বহু লোকজন জড়ো হইয়াছে। সবাই মহা সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ আচার্যের এ কি দুর্গতি।

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছেন।

অদ্বৈত আচার্যকে প্রভু এবার মুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি সংবরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপনা আজিকার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়া দিয়া গেল প্রভুর আত্মপরিচয়। 'মুঁই সেই, মুঁই সেই,' বলিয়া বার বার তিনি তাঁহার ভগবত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কৃপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা নাই। বৃদ্ধ বৈষ্ণবনেতা আঙিনায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন।

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, "প্রভু নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তো দেখিয়েছ। তোমার এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতেই যে আমি চেয়েছিলাম। এবার আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো।"

প্রভু গৌরসুন্দর পরম প্রেমভরে অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। উভয়ের কপোল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। আচার্যের আঙিনায় কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল।

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া শ্রদ্ধের বৃদ্ধ আচার্যকে যে প্রহার লাঞ্ছনা করিয়াছেন সেজন্য খুব লজ্জিত। প্রসন্নমধুর কণ্ঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, "আচার্য, সবাই আজ শুনে রাখুক, তিলার্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, তার শত অপরাধ আমি মার্জনা করবো।"

প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর নয়নজলে তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে।

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীলা ও ইষ্টগোঠী। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার রঙ্গ ও হাস্য পরিহাস চলিতে থাকে। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবীর আজ আনন্দের সীমা নাই। সোৎসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন করিতে বসেন।

গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অপূর্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। সুগৌর সুঠাম দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যশ্রী। রসনায় উচ্চারিত হইতেছে ইষ্টনাম। ভক্ত ও পার্ষদেরা এ অপূর্ব প্রেমঘন মূর্তির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছেন।

ভাবাবিষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অদ্বৈত এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। সবেগে তিনি গৌরসুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। পরমভক্ত হরিদাসও এ মহা সুযোগ হারাইবার পাত্র নহেন। অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাঁহার জীবনে মিলিয়াছে—আজ দুই সংগ্রাতাই তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়া আছেন। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈতের চরণতলে পতিত হইলেন।

আচার্যের আঙিনায় সর্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়া উঠিল এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। শায়িত ত্রিমূর্তির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক। তাঁহার শিরে চরণ স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সর্বোপরি রহিয়াছেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'ধর্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে'।

ইহার পর আসিল ভোজন পর্ব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই বাল্যভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া অন্ন ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ত্ব ভালোরূপেই জানেন। তাই তাঁহার সহিত বিক্রম কোন্দল করিতে, তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে. তাঁহার বড় আনন্দ।

আচার্য কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহা বিপদে পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে। সকলের জাতধর্ম নাশ না ক'রে এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলো তা কে জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী ব'লে। জাতি কি, কোন্ ঘরে জন্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে

যায়-তার হাঁড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা অনাছিষ্টি। হরিদাস তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও।”

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ ও হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। এ বালসুলভ কোন্দল দেখিয়া প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়া অস্থির হন।

কিছুক্ষণ বাদে লড়াই থামিয়া গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পরম আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

এইভাবে আচার্যের ভবনে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের এবারকার আগমন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করিল এক নূতনতর শক্তি।

বিশেষত অদ্বৈত আচার্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই আচার্য ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রভুর নব আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তম্ভরূপে। নবদ্বীপের লীলাক্ষেত্রে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভুর প্রধান সহায়করূপে। এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত আচার্যের মর্যাদা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বশক্তি। তাই চৈতন্য-ভাগবত এই দুই প্রধান পার্ষদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—‘প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুইজনে।’

বৎসরখানেক পরের কথা। প্রভু গৌরসুন্দর ইতিমধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার লীলানাট্যের এক নূতনতর অঙ্ক।

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচার্যের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। শুধু প্রভুর এই নবরূপ ও জীবোদ্ধার লীলা দর্শনের আশাতেই যে তিনি বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ ভক্তদের কাছে বিদায় নিতে চান। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া নিজে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুকে দর্শনের জন্য সহস্র সহস্র দর্শনার্থী সেদিন আচার্য ভবনে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, নৃত্যকীর্তনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। শান্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে।

গৌরসুন্দরের সর্বত্যাগী বৈরাগ্য মূর্তি দর্শনে অদ্বৈত আচার্য আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না। ভাবোদ্বেল হইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মূর্ছিত।

বহুক্ষণ পরে আচার্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। প্রভু এবার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈতের শিশুপুত্র অচ্যুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া আপন মনে এতক্ষণ খেলা করিতেছিল। এবার এই জনসংঘট্ট ও দেবদুর্লভ মূর্তি প্রভুকে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধূলিধূসরিত শিশুকে গৌরসুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সস্নেহে কহিলেন, “অচ্যুত, বলতে পারো তুমি আমার কে? জানতো, আচার্য আমার পিতা, কাজেই তুমি আর আমি হচ্ছি দুই ভাই।”

সবাইকে বিস্মিত করিয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াছিল, “না-গো তা নয়। দেবের

যিখানে তুমি এসেছ জীবনসখারূপে—তোমার জনক তো কখনো কেউ থাকতে পারে না—তুমি যে স্বপ্রকাশ।"

ভক্তদল ও দর্শনার্থীরা হতবাক্‌! অদ্বৈত আচার্যের এ অবোধ শিশু একি অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা বলিতেছে। অপূর্ব সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ!

নবদ্বীপে প্রভুর যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে ঐশ্বর্য ভক্তগণ দেখিয়াছিলেন, অদ্বৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মতো সকলে দেখিলেন। দিব্য উদ্দীপনাভরে বিষ্ণুখট্টার উপর প্রভু উঠিয়া বসিলেন। স্বমুখে বার বার 'মুঁই সেই, মুঁই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতত্ত্ব।

বিদায়ের পূর্বে অদ্বৈত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে প্রভু তাঁহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই।
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্ত বশ স্বভাব আমার।
তোমার সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব অবতার।
তিলার্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জানাইয়া।

প্রতি বৎসরই ভক্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচলে যান, আর তাঁহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত আচার্য। এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষ্ণবেরাই নয়, তাঁহাদের সহধর্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের আগ্রহের অন্ত নাই। যা কিছু আহার্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, যা কিছু এখনো ভালোবাসেন, সযত্নে তাহাই ভারে ভারে শুষ্ক করিয়া নিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন।

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিল বড়ই বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পথ পর্যটন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোষ্ঠী নীলাচলে পৌঁছিতেন, প্রভুর দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাঁহাদের পথ পর্যটনের সমস্ত কিছু শ্রান্তি এক মুহূর্তে দূর হইয়া যাইত।

প্রাণপ্রিয় বৈষ্ণবেরা তাঁহার দর্শনে আসিতেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রভুও ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যান। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন। প্রভুর গোষ্ঠী আর অদ্বৈতের গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া যায়। আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

প্রভুর পূজার্চনার জন্য আচার্য নানা উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহারের উপায় কই? মুহূর্তের মধ্যে ঘটিয়া যায় আত্মবিস্মৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস দুকূল ছাপাইয়া উঠে, বৃদ্ধ আচার্য আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার দিতে থাকেন, 'এনেছি এনেছি, প্রভুকে আমি এনেছি।"

আচার্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন—এ বিশ্বাস রহিয়াছে সকল ভক্তেরই অন্তরে। তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভু ও আচার্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠে।

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্নাথদেবের আজ্ঞামালা নিয়া সেবকেরা ছুটিয়া আসে। এই মালা ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়া দেন আচার্যবরের কণ্ঠে, তারপর অপর বৈষ্ণবেরা মালা প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন।

সেবার নীলাচলে পৌঁছিয়া অদ্বৈত আচার্যের অভিলাষ হইল প্রভুকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সব কিছু তিনি রাঁধিবেন।

নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীচৈতন্য মহা উল্লসিত—

প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায়
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বথায়!
আচার্য। তোমার অন্ন আমার জীবন
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন।
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়া খাইতে আমার তথি হয় মন।

ভক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথা শুনিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? আচার্য আনন্দে আপনহারা হইয়া গেলেন।

আজ প্রভুর নিমন্ত্রণ। আচার্য ও আচার্যপত্নী প্রত্যুষ হইতেই কর্ম-ব্যস্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য রন্ধনের অধিকারটি পত্নী সীতাদেবীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন করিতেছেন, আর পত্নী সীতাদেবী নিকটে বসিয়া সব কিছু জুগাইয়া দিতেছেন।

আচার্যের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা স্ফুরিত হইতেছে। প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাঁহার সহিত আসিয়া উপস্থিত হয় একদল সেবক ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত। বড় আশা করিয়া বহু কষ্টে আচার্য আজ এত সব প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়ানো যাইবে না।

পত্নীকে ডাকিয়া আচার্য মনের কথাটি খুলিয়া বলিলেন, তারপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আহা, এমন কোনো দৈব দুর্যোগ কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভু একলাটিই আমার কুটিরে এসে উপস্থিত হন। তা'হলে পরম পরিতোষ সহকারে ওঁকে ভোজন করানোর সুযোগ পাই!"

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। আচার্য সবে মাত্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, হঠাৎ আচম্বিতে আকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা। অল্প সময়ের মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

আচার্য প্রমাদ গণিলেন। একি ঘোর বিপদে আজ পড়া গেল। প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই মধ্যে একি দৈব দুর্যোগ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের তাণ্ডব শুরু হইবে তাহা কে জানে!

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। ঝড় জলে ভিজিয়া 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া আচার্য তাঁহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। কিছুটা বিশ্রামের পর প্রভু আহারে বসিলেন।

বহু বিচিত্র আহার্য সম্ভার। আচার্য প্রাণপণে অজস্র খাবারের যোগাড় করিয়াছেন। পীড়াপীড়ি করিয়া প্রভুকে আকণ্ঠ ভোজন করানোর পর ভক্তের প্রাণে শান্তি আসিল।

এবার ভক্তিভরে আকাশের দিকে চাহিয়া অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার স্তুতি শুরু করিয়া দিলেন।

প্রভু মহা বিস্মিত। কহিলেন, "আচার্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর তোমার এত ভক্তি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন বলতো?"

উত্তর হইল, "প্রভু, আজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো।"

প্রভু একথা মানিতে রাজী নন। ঝড় শিলাবৃষ্টির সময় তো এ নয়। এ যে আচার্যেরই কাজ। তাঁহারই বৈষ্ণবীয় ভক্তির বলে এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইয়াছে। অদ্বৈতের প্রশস্তি গাহিয়া কহিলেন—

কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্বথা।
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ?

আবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত তৎক্ষণে প্রভুর চরণ তলে পতিত হইয়াছেন। বার বার কাঁদিয়া কহিতেছেন, "প্রভু, তুমি সেবকবৎসল, সেবকের মনোবাঞ্ছা তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্ছা পূরণও তুমি করো। আমার যা কিছু শক্তি তা যে এই প্রত্যয়েরই উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে—অদ্বৈত সিংহ। কিন্তু তারা তো জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল।"

ভক্তগোষ্ঠী নিয়া প্রভু বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃষ্ণকথা ও কীর্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে।

বহুজন পরিবৃত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

প্রভু সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "এই যে আচার্য! কোথা হতে তুমি আসছো। কোন্ কাজেই বা ব্যাপৃত ছিলে, বলতো?"

"প্রভু শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম। জগন্নাথ দর্শন সেরে এইমাত্র আসছি।"

"খুব ভাল কথা, আচার্য। কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর আর কি তুমি করেছো।"

"প্রভু, শ্রীমূর্তি দর্শনের পর তাঁকে রোজ প্রদক্ষিণ করি। আজও সেই কাজই ক'রে এলাম।"

উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিয়া প্রভু কহিলেন, "আচার্য, এবার তুমি সত্যই হেরে গেলে!"

অদ্বৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাঁহার পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, তাহা তো বুঝা যাইতেছে না। কহিলেন, "প্রভু, আগে বল, হারজিতের বিষয়টি কি। তবে তো আমি তা মেনে নেব।"

প্রভু ও ভক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে। এবার সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল—

প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হরিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার।
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা।
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে।

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব যে ইহাই। আর এই দর্শনেই চৈতন্যদেব প্রতিদিন করিয়া থাকেন—জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাঁহার নয়নে থাকে চিরস্থির।

ভক্তজনেরা সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া আছেন। কাহারো মুখে কথা সরিতেছে না।

অদ্বৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, তোমার কাছে পরাজিত হয়েই যে রয়েছি—এ পরাজয় তো নূতন কিছু নয়। তবে এটা বুঝতে পারি জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।"

বৃদ্ধ আচার্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, যে চৈতন্যতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত তাহারই আলোর ধারা দিকে দিকে তিনি ছড়াইয়া দিতে চান। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুব অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "এসো আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নামগানে, স্তুতিগানে, বাধা কোথায় ?"

ভক্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, 'মুঁই কৃষ্ণদাস' ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন। তাঁর নামকীর্তনের উৎসাহ কাহারো কম নাই। কিন্তু প্রভু তাঁর নিজের স্তুতিগান শুনিয়া যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তবেই বিপদ।

অদ্বৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই ভয় কাটিয়া গেল। শুরু হইল উদ্দণ্ড কীর্তন।

কীর্তনিয়াদের গানে নিজের এই আত্মস্তুতি শুনিতে প্রভু রাজী নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

কীর্তন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোনা গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে একেবারে চুপচাপ পড়িয়া আছেন।

অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়া ভক্তেরা কুটিরে ঢুকিলেন।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা শ্রীবাস, তোমরা সব সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান্ ভক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো ? কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ছেড়ে তোমরা আমার অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছো কেন ?"

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "প্রভু আমাদের স্বাতন্ত্র্যই বা কি, শক্তিই বা কোথায় ? ঈশ্বর যা বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করেছি।"

প্রভু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমরা সবাই শাস্ত্রবিদ্‌, স্থিরবুদ্ধি। আচ্ছা বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে বার ক'রে দিতে হয় ? তা কি সঙ্গত ?"

শ্রীবাস স্মিতহাস্যে সূর্যের দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করার ভঙ্গী দেখাইলেন।

প্রভু কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে, সবটা প্রকাশ ক'রে বল।"

উত্তর হইল, "প্রভু, হাত দিয়ে আমি সূর্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যই কি ও বস্তু ঢাকা যায় ? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি, কোনো কিছু দিয়ে ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা যায় না।"

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্বারে হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, 'প্রভু'কে দর্শনের জন্য। অচল জগন্নাথের পরে সচল জগন্নাথ দেখিয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে। এই দর্শনার্থী জনতা সেদিন জানাইয়া দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ—কোনো গোপনতার আড়ালই তাঁহাকে জনচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিতে পারে না।

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়া সেদিন জয়যুক্ত হইয়া উঠে, উদ্‌ঘাটিত করে প্রভুর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ।

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের স্মরণ নিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দুই বৈরাগ্যবান্‌ বৈষ্ণব ভক্তকে সম্মুখে রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকটা গুণগান করিলেন। তারপর কহিলেন, "দ্যাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যিই পেতে চাও তবে তোমরা অদ্বৈতের শরণ নাও। তাঁর কৃপা না হলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি উপার্জিত হবে না।"

নবাগত ভক্তদ্বয় তখনি সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য, এ দুজনকে তুমি কৃপা করো। তুমি হচ্ছো ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্বাদ না পেলে তো এদের অভীষ্ট লাভ হবে না।"

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্যের সুবিদিত। বুঝিলেন, প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি এই দুই মহাপ্রতিভাধর ভক্তের হৃদয়ে স্ফুরিত হোক, আর তাঁহার সূচনা হোক প্রবীণতম বৈষ্ণবনেতা, ভক্তিশাস্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতের আশীর্বাণী নিয়া।

আচার্য কহিলেন, "প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ভাণ্ডারের অধিকারী হচ্ছো তুমি। আমি সে ধনের ভাণ্ডারী কিনা জানি না। যদি হয়েই থাকি, তবে ভাণ্ডারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই আশীর্বাদই করছি—এদের দু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেমভক্তির উদয় হয়।"

সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন,—'আর তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। শক্তিধর আচার্যের কৃপা আজ তোমরা পেয়েছো—

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ॥ (চৈঃ ভাঃ)

আর একদিনের কথা। অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বসিয়া আছেন। ভাবাবেশে দেহ তাঁহার কম্পিত হইতেছে, আয়ত নয়ন দুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিত, আমায় বল দেখি. অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর বৈষ্ণব বলে মনে করো ?"

বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন। কি ইহার উত্তর দেওয়া যায় ? ক্ষণকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপূত হইল না। অর্ধবাহ্য অবস্থায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস করিয়া তখনি এক চড় বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর ভাবাবেশ কাটিয়ে গেল। শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রভু শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে অদ্বৈতের স্বরূপ মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত তত্ত্বটি চিরতরে সেদিন অঙ্কিত হইয়া গেল।

প্রতি বৎসরই আচার্য অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত হন। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্মক্ষেত্র গৌড়দেশে। সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে।

সেবার আচার্যের এক ভক্ত তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। এই ভক্তটির নাম বাউলিয়া বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য প্রভুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ দেনার জন্য তাঁহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

বাউলিয়া বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাবে তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো. এত সব ঐশ্বর্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে আচার্যের এমন দুর্গতি চলিতে থাকিবে ? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়।

বাউলিয়া বিশ্বাস তাহাই করিলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচার্যের অর্থকৃচ্ছ্রের কথা জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়া বসিলেন।

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, "দ্যাখো, বিশ্বাস যেন কখনো আমার কাছে না আসে আমি তার মুখ দর্শন করতে চাইনে। শুদ্ধসত্ত্ব অদ্বৈত আচার্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! জানবে, আমার কাছে কোনোদিন তার ক্ষমা নেই।"

প্রভুর এই দণ্ডাজ্ঞা নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তুলিল। ভক্ত সমাজের সম্মুখে ইহা দেখা দিল এক সতর্ক-সঙ্কেত রূপে। সকলেই বুঝিলেন—প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ করা চলিবে না।

বাউলিয়া বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতের প্রাণে বড় বাজিল। প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য সে কোনো সাহায্য চাহে নাই. চাহিয়াছে আচার্যেরই শুভার্থী হইয়া।

কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্যের সাক্ষাৎ।

আচার্য সকৌতুকে কহিলেন, "প্রভু, বাউলিয়া বিশ্বাসের ওপর তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও তাকাও না।"

প্রভু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আচার্য, তুমি সর্ব বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল, তুমি তো নিশ্চিত-

রূপে আমাদের মতবাদ জানো। প্রকৃত বৈষ্ণব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর-প্রেমে সদা-উন্মত্ত। বিষয়কূপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার ঋণ শোধের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে বসে আছেন। তবুও বাউলিয়া বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা করলো? তাই তো আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো, এ দণ্ড তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে করেই, সে তোমার ভক্ত ব'লে। বুঝেছি, ভক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত করেছে। আচ্ছা এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জনা করলাম। আর যেন কখনো তার এমন কুমতি না হয়।"

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়াছেন। তাঁহার মাধ্যমে বৃদ্ধ অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজা পাঠাইলেন।

প্রভুকে কহিও আমার
কোটি নমস্কার
এই নিবেদন তাঁর
চরণে আমার।
—'বাউলকে কহিও লোকে
হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে
না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কাজে
নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা
কহিয়াছে বাউল।'

নীলাচলে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় জগদানন্দ এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন। বড় প্রহেলিকাময় আচার্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়া বসিয়া আছেন। প্রভু স্মিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "বেশ, তাঁহার যে আজ্ঞা।"

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই ছিলেন। মনে তাঁহার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আমরা কেউ এ হেঁয়ালির মানে বুঝে উঠতে পারলুম না। আপনার কথাও বড় দুর্বোধ্য ঠেকছে। কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন।"

উত্তর হইল, "স্বরূপ, জানতো অদ্বৈত আচার্য আগমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসর্জন, দুই অনুষ্ঠানই তাঁর জানা আছে। আচার্য বোধহয় একটা কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমাদের মতো আমিও সবটা বুঝতে পারি নি।"

প্রভু আসল কথাটা চাপিয়া গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচার্য তাঁহার দেবতার বিসর্জনের ইঙ্গিতই এই হেঁয়ালির মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা হয় নাই,

অদ্বৈতের এই তরজা শ্রবণের পর হইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরো অন্তর্মুখীন। গম্ভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়া নেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিল তুলসী আর অশ্রুজলে যে লীলা আচার্য স্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কার্যশেষে তাহারই উপর যবনিকা ক্ষেপণের কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়া যান।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা সংবরণের পরও দীর্ঘদিন অদ্বৈত আচার্য মরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের অন্যতম স্তম্ভরূপে এই বৃদ্ধ আচার্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়।

ভক্তজনচিত্তে আচার্যের সেই দিব্য রূপটিই এসময়ে ভাস্বর হইয়া উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রিয় সখা মুরারি গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্বে প্রকাশ করেন—

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য।
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।
তাঁর দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।

(চৈঃ মঙ্গল—লোচন)

শঙ্করদেব

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় নূতনতর ভক্তিধর্মের অভ্যুদয়। এই ধর্মের মূল তত্ত্ব—আরাধ্য পরম বস্তু শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য তাঁহার কাছে নাই। ভক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একান্ত শরণাগতি নিয়া, যে কোনো শ্রেণীর সাধক তাঁহার আরাধনা করিতে পারে, পৌঁছিতে পারে তাঁহার দিব্যধামে। এই উদার সর্বজনীন ভক্তি-ধর্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব স্তরে; আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নূতনতর মানবতা-বোধ।

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তৎশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলুগু দেশে বল্লভাচার্য, গৌড় ও উড়িষ্যায় চৈতন্য-মহাপ্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন উদার ভক্তিধর্মের এক একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবও ছিলেন ইঁহাদের মতো ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদেবের উপাস্য। এই উপাস্যকে জনমানসের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে। শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধর্মের মহিমা প্রচারিত হয় তাঁহার সাধনপূত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে। তৎকালীন আসামের অনগ্রসর এবং বহুবিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন ভক্তি-প্রেমের বিপুল জোয়ার। সর্ব ভারতের ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজ্য আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়া উঠে শঙ্করদেবের সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাহিত্যের মধ্য দিয়া।

শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি। বর্তমান আসামের নওগাঁ শহর হইতে ষোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতার নাম কুসুমবর, মাতা—সত্যসন্ধা। পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্ম-প্রাণ, সেবাপূজার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাঁহারা পোষণ করিতেন।

---

১ অনেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আসামের ঐতিহাসিক স্যার এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহার ধারণা আরো ৩০-৪০ বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন।

অনিরুদ্ধ ছাড়া কোন অসমীয়া জীবনীকারই শঙ্করের জন্ম-সাল লিপিবদ্ধ করেন নাই। অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ, ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, শঙ্করের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছিল, অহোম রাজা চুহু-মুঙ্গ (১৪৯৭-১৫৩৯) এবং কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৫৪০-১৫৮৪): সেই জন্য মনে হয় হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দের পরিবর্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দকে শঙ্করদেবের জন্ম-সাল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।—উজ্জীবন,

সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধ্যার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শঙ্করের নামজপ করিতে করিতে তিনি তনু ত্যাগ করেন। তাই তাঁহার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় শঙ্কর। গৌরকান্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের ভার সযত্নে গ্রহণ করেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী।

শঙ্করের পূর্বপুরুষ ছিলেন ধনী সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। তাঁহাদের বলা হইত শিরোমণি ভূঁইয়া, অর্থাৎ ভূঁইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও কীর্তিকলাপে তাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌড়দেশে নিয়া আসেন। এই কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তম পুরুষ পরবর্তীকালে আসামে আসিয়া বসবাস করেন। আসামের অন্যতম রাজা দুর্লভনারায়ণ গৌড়ের অধিপতি ধর্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কয়েকটি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তদনুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন। নবাগত ঐ কায়স্থদের মধ্যে কেহ কেহ নওগাঁ জেলার মৈরাবাড়ি অঞ্চলে নিজেদের বাসভূমি গড়িয়া তোলেন। আসামের রাজারা ইঁহাদের কর্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া কোনো কোনো মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভূঁইয়া উপাধিতে ভূষিত করেন।

শঙ্করের পূর্বপুরুষ চণ্ডী ভূঁইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। তাঁহার পরবর্তী বংশধর রাজধর প্রভৃতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া শঙ্কর পয়ার ছন্দে তাঁহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন :

বরদয়া নামে গ্রাম শস্যে মৎস্যে অনুপাম
লোহিত্যর অতি অনুকূল।
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর
কায়স্থ কুল পদ্মফুল ॥
তানে পুত্রসূর্যবর মহা বড় দেশধর
দানী মানী পরম বিশিষ্ট।
যার যশ এভো জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ
দুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ ॥
তানে পুত্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার
প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার।
তানে সুত শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি
বিরচিল শঙ্করে পয়াব ॥

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠাবান ভূম্যধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে, তাঁহারা ছিলেন প্রতাপশালী বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের পিতা কুসুমবরের সময়ে পরিবারের পূর্ব ধন-মানের গৌরব হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধার্মিক বলিয়া নিজ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন।

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্নে যেমন লালিত হইতে থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থাও গোড়া হইতে করা হয়। নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও কথাবার্তায় ফুটিয়া উঠে নানা বৈশিষ্ট্য। পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার নিয়া সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান্য মেধা ও প্রতিভা। এক একদিন বালকের প্রশ্ন ও কথাবার্তায় ঝলকিয়া উঠে তাহার প্রতিভার দীপ্তি, বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত লোকেরাও ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুরিত হইতে দেখা যায় এই কচি বয়সেই। যুক্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিন্তু এই সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা—'করতল কমল কমলদল নয়ন।' সকলেই সোৎসাহে বলাবলি করিতে থাকেন,—'এ বালক বাক্‌দেবীর অনুগৃহীত, আশিসপ্রাপ্ত, উত্তরকালে অবশ্যই এ প্রসিদ্ধি লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে।'

বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভর্তি করা হয় পণ্ডিতবর মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই আচার্য পারঙ্গম। কিশোর ছাত্রও তেমনি বিস্ময়কর ধীশক্তির অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠে। আচার্য মহেন্দ্র কন্দলী নিজে ভক্তিমান্ তাই ভক্তিশাস্ত্রের চর্চায় তাঁহার উৎসাহ বেশী। তাঁহার এই ভক্তিপ্রবণতার প্রভাব কিশোর ছাত্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়া পড়ে। নবীন ছাত্রের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচার্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু করেন হিন্দুধর্মের উচ্চতর দর্শনের তত্ত্বালোচনা।

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। শিক্ষক মহেন্দ্র কন্দলীর সান্নিধ্য ও প্রভাবে তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তরুণ পণ্ডিত শঙ্করের জিজ্ঞাসু মন জীবনের দিগ্‌দর্শন সম্পর্কে, পরমতত্ত্ব সম্পর্কে, এখনো স্থিরভূমি প্রাপ্ত হয় নাই, প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তার ভিত্তি তাঁহার জীবনে গড়িয়া উঠে নাই।

মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। পরম সত্যের পথসন্ধান ও আত্মিক উপলব্ধির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। দিনের পর দিন উঠে চিন্তার তরঙ্গরাশি—জীব কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত সৃষ্টিকর্তা ভগবানের কি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগসূত্র? জীব ও ভগবানের মিলন কি সম্ভব? যদি সম্ভবই হয়, তবে তাহার পন্থা কি? কাহার সাধনপ্রণালী তিনি অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই পরম কারুণিক দিগ্‌দিশারী?

এই সময়ে কিছুদিনের জন্য এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচর্য তিনি লাভ করেন। ইঁহার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া নিয়া শুরু করেন যোগসাধনা।

শঙ্করদেবের প্রামাণিক জীবনচরিত-লেখক দৈত্যারি ঠাকুর এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

প্রাণ অপান সমান উদান
আদি করি বায়ুচয়।
বশ্য করিলন্ত, চলাইবে পাবন্ত
যি বায়ু বৈত লাগয় ॥

বায়ুক ক্ষেপিয়া, উপাসে ধরিয়া
আসন ভিরি হরিষি।
থাকন্ত সদায়, সুনিশ্চয় কায়
দিন দুই চারি বসি ॥

কিন্তু এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অনুসরণ করেন নাই। নিজ অন্তরের গভীরে অবগাহন করিয়া অচিরে বুঝিতে পারেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। ভক্তিপ্রেমের সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, এবং এই সংস্কারই অনিবার্যরূপে এবার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাঁহার সাধনজীবনে। অতঃপর কয়েকটি বৎসর শঙ্কর গভীরভাবে ভারতের পুরাণ-শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় নিবিষ্ট হন, ভক্তিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে হন যত্নবান।

শঙ্করের তখন বাইশ বৎসর বয়স। মনে সংকল্প স্থির করিলেন, এবার কিছুদিনের জন্য সারা ভারতের তীর্থ পরিব্রাজনে তিনি বহির্গত হইবেন। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুর পাদপীঠ গয়াধাম ও কৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সংকল্প সাধনের পথে সেদিন বাধা পড়িয়া গেল। পিতা হঠাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থভ্রমণে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো।"

"আজ্ঞে হাঁ, মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে"—সবিনয়ে শঙ্কর নিবেদন করেন।

"বাবা, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু তার সময় তো এখন নয়, অনেক পরে। তীর্থ পরিব্রাজনের বয়স হয়েছে বরং আমার। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তুমি বয়সে নবীন, এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে অনেক কিছু কর্তব্য। আগে সেসব সমাপন করো, তারপর তীর্থে বেরুবে।"

"কিন্তু বাবা, আমি যে—"

"না, আর কিন্তু-টিন্তু নয়। এ বয়সে তোমার তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে বেড়ানো চলবে না। হাঁ, আমি স্থির করেছি, এবার তোমার বিবাহ দেবো। সুপাত্রীও পেয়েছি। বিবাহের পর তুমি সংসারী হও, প্রয়োজনীয় বিষয়-কর্ম দ্যাখো, পিতা ও পিতৃপুরুষের বাঞ্ছিত পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করো। তারপর কর্তব্যকর্ম সব সমাধা ক'রে প্রবীণ বয়সে তীর্থ-ভ্রমণ করবে। এই আমি চাই।"

পিতার নির্দেশ অমান্য করা চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে বিবাহ করিতে হইল। পত্নী সূর্যবতী যেমনি রূপবতী তেমনি সর্বগুণসম্পন্না, পতির উচ্চাদর্শ ও ধর্মজীবনের সহায়িকারূপেই তিনি তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু শঙ্করের এই গার্হস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, বিবাহের চার বৎসর পরে সূর্যবতী এক শিশুকন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুসুমবরও প্রস্থান করেন পরলোকে।

পর পর এই দুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্য ও নির্বেদ।

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দেশটিও স্মরণে আসিয়া যায়। 'সংসারের প্রধান কর্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিব্রাজন বা তীর্থ দর্শন করবে, এই কথাটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তাই শঙ্করকে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। অতঃপর কন্যা মনুর জন্য হরি নামক এক সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পাত্ররূপে তিনি নির্বাচন করিলেন এবং তাঁহার বিবাহ দিলেন। এবার আসে শঙ্করের বিদায়ের পালা। বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় জয়ন্ত ও মাধব দলইকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি। সারা ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। পথে বিপদের অন্ত নেই, আর কোনো দিন ফিরে আসবো কিনা তাও জানিনে। আমার কন্যা আর আত্মীয়স্বজনেরা রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের দেখাশুনা করবে। আমার জমিদারী ও বিত্তবিষয় রক্ষণের ভারও রইলো তোমাদের ওপর। তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন; প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্তব্য কাজ তোমরা চালিয়ে যাবে। শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বহু অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর প্রায় বারো বৎসর তিনি আসামের বাহিরে নানা তীর্থে ও সাধনপীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার অনুচরদ্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব।

শঙ্কর তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল। আচার্য মহেন্দ্র কন্দলী তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন, 'বৎস আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলো পরিক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের। তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।'

শিক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন। আরো পনের ষোল-জন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুরু হইল তাঁহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থযাত্রা। শঙ্করের এই তীর্থদর্শনের বিস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাঁহার বিভিন্ন চরিতকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন।[১] যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি।

সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারো বৎসর ব্যাপিয়া। এই দীর্ঘ বৎসরগুলি তিনি শুধু বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে যে দেবমন্দির বা সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শাস্ত্রবিদদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম-ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে তিনি বাস করিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বান্বেষী মন তৃপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানে।

১ শঙ্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামচরণ ঠাকুর ও তৎপুত্র দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ, দ্বিজ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি।

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত গুরুর আবির্ভাব। দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গুরু তাঁহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির সাধন পথ। বিদায়কালে নির্দেশ দেন, আমি আশীর্বাদ করি, শুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তুমি ইষ্টলাভ করো। ভক্তির যে শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে, অচিরে তা সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক।"

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, "বৎস, বিধি-নির্দিষ্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে। সংসারজীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পরিণত করার কাজে তুমি আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্বদা স্মরণ রাখবে, পরম কারুণিক বিষ্ণু বা তাঁর অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, মানবের ইষ্ট। এই পরমপ্রভুর একান্ত শরণ নিয়ে, সর্বত্র নামধর্মের প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্‌যাপন করো। নামী আর নাম অভেদ, এই পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজ্যের সর্বত্র। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁর জীবন ও বাণীর ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন।"

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ও উদীয়মান্ ধর্মনেতা। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন এবং সিদ্ধ সাধুসন্ত ও তাত্ত্বিকদের সাহচর্য ও কৃপা তাঁহাকে পরিণত করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে। বৈষ্ণবীয় সাধনার দৃঢ়ভূমি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের অমৃতলোকের সিংহদ্বার।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আদিষ্ট কর্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরি করেন নাই। সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্মে উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়বার তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস উঠাইয়া দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নূতন ভবন ও প্রচারকেন্দ্র। শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষিত শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি সত্র বা মঠ নির্মিত হইল এবং প্রবর্তিত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গ্রাম সন্নিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্তনে ও নাম-ধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ।

আচার্য জীবনের এই প্রথম পর্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাঁহার প্রচারিত ভক্তিধর্ম অভিহিত হয় 'একশরণ ধর্ম' নামে।[১]

তাঁহার নব প্রচারিত ধর্মের মূল কথা.—এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হইতেছেন বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই অদ্বিতীয় পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে হইবে মানবজীবন। শঙ্করের একশরণ ধর্মে অপর উপাস্য বা ইষ্টের স্থান নাই। নিজের শুদ্ধাভক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, এককেন্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়া ভক্তেরা কখনো অপর ইষ্ট বিগ্রহ বা দেবীর উপাসনা করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও চলিবে না। অন্যথায় ভক্তিসাধনা তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, পথচ্যুত।

১ শঙ্করদেব : বৈষ্ণব সেইণ্ট্ অব্ আসাম— বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

"একশরণ ধর্মে ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের মধ্যে কোনো চাওয়া-পাওয়ার স্থান নাই, সুখ-সুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্য পুরস্কার বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্মের মূল লক্ষ্য—ভক্ত সাধক ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়া দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম-উজ্জীবনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, নূতনতর অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সঁপিয়া দিবেন পরম প্রভুর শ্রীচরণে[১]।"

নামকীর্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বরদোয়ার সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভিড়ের অন্ত নাই। চারিদিকে তখন শঙ্করদেবের নূতন ভক্তিধর্ম নিয়া চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু শঙ্করদেবের মনে উৎকণ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ ঐশ্বরীয় কর্ম তিনি উদ্‌যাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাবালুতা কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে। তাছাড়া, তাঁহার নূতন ধর্মের বিরোধী শক্তিগুলিও কম সক্রিয় নয়। শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণকে তাঁহার ভক্তি আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রাধান্য খর্ব করিতেছেন। ইহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত। এ সম্পর্কে অবহিত না হইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বিপদ অনিবার্য।

এজন্য দরকার তাঁহার এই নূতন ভক্তিধর্মের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই তাঁহার প্রচারিত উদার ও সর্বজনীন ভক্তি আন্দোলন স্থায়িভাবে গড়িয়া উঠিবে। এজন্য ভাগবত পুরাণের সাহায্য তাঁহাকে নিতে হইবে। ভাগবতের আলোকে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা ও অমৃতময় বাণীর নূতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিস্তারিত করিতে হইবে তাঁহার এই নবধর্ম। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি ছড়াইয়া দিবেন সমাজের সর্বস্তরে, একশরণীয়া ভক্তিধর্মকে জনমানসে করিবেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাছাড়া, এই মহান্ কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চাই একটা দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ সংগঠন। স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হইবে একটি করিয়া সত্র বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে নামঘর—যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নিধন, শুদ্ধাচারী সাধক ও পাপাচারী পাষণ্ডীরা, সবাই মিলিতভাবে করিবে নামকীর্তন, প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিবে পরম প্রভুর পুণ্যময় লীলাকথা।

প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহুতর বিপদ ও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে। ধর্ম দেশ ও জাতির উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের ঐশ নির্দিষ্ট ব্রত।

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চলিয়াছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ। সমগ্র আসাম বহুতর স্বাধীন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। দূর পূর্বাঞ্চল চুটিয়দের শাসনাধীন, দক্ষিণ-পূর্বে রহিয়াছে কচরীদের অধিকার। ইহাদের আশেপাশের স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঁইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা রাজ্যের শাসন। সে সময়ে উহা কোচবিহার নামে পরিচিত। কোচ রাজারা সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ

১ শঙ্করদেব (চৈতন্য ' বিবেকানন্দ: অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)—বাণীকান্ত কাকতি

করিয়া আছেন, আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজ্যের অধিকারে। আসামের জনজীবন এইরূপ বহু প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বারা বহু-বিচ্ছিন্ন।

এসময়কার ধর্মীয় জীবনে, সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব—তান্ত্রিক ধর্মের। কিন্তু এই ধর্ম প্রধানত সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ এই ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। শূণ্ডজাতীয় লোকেরা হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত-প্রেত ও বৃক্ষপূজায়ই তাহারা বেশী বিশ্বাসী।

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই তন্ত্রধর্ম এবং সাধনার মধ্যেও এসময়ে দেখা দিয়াছে নানা অনাচার। তন্ত্রের উচ্চতর নিগূঢ় সাধন সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত ধর্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকর্ম, ভোগলিপ্সা ও ব্যভিচারে।

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রপীঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু দেখিয়া নেওয়া দরকার। পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ রাজ্য, রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে—বর্তমানে যাহা গৌহাটি নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল হইতেই এখানে তন্ত্রধর্মের প্রচলন ছিল। রাজারা ও উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক বাহক। নীলাচল বা কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধন ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বুদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচার্যদের। মহাভারত এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিকা পুরাণে, কামরূপের তান্ত্রিকতার নানা কাহিনী পাওয়া যায়।[১]

প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএনথ্‌ সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা সমকালীন আসামের ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই। কুমার ভাস্করবর্মণ তখন কামরূপের রাজা। রাজা ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়া গিয়াছে ধর্মীয় গণ্ডীর বাহিরে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় দূর-প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে রণকুশল অহোমরা বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে; কামরূপের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় ছেদ পড়িয়া যায়।

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি। ইহারা জাতিতে শান্, উত্তর বর্মা হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়া ইহারা অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে। শান্ জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তর্যা দ্য লাকুপ্রি বলেন, এই জাতি মোঙ্গল নেগ্রিটো ও চীনদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুশল, দৃঢ়চেতা ও পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু সুজলা সুফলা উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহারা শক্তিহীন ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠে। অহোম রাজারা এবং সাধারণ অহোমরা প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়।

অহোম রাজারা খুব ইতিহাস-সচেতন, তাহাদের সময়কার লেখা বুরুনজী-তে রাজশক্তির

---

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ এথিক্স্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন (২-১৩৩)

উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে। অহোম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন। আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে ইঁহাদের অবদান যথেষ্ট।

ষোড়শ শতকে, বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের অভ্যুদয় কালে পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচরাজ নরনারায়ণ (১৫২৮-১৫৮৪) আর পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল অহোম রাজা চুহুমুঙ্গ-এর (হিন্দুনাম—স্বর্গনারায়ণ) অধিকারে।

নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি চিলা রায়ের অসামান্য শৌর্য ও দক্ষতায় রাজ্যের প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তন্ত্রধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণকারীরা কামাখ্যা মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজা নরনারায়ণ এটি নূতন করিয়া নির্মাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইষ্টদেবী বিগ্রহের করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আসামের তান্ত্রিকদের আচার আচরণে একসময়ে নানা দুর্নীতি অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধনা ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখা দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন ওই অবক্ষয়ের চিত্রটি ঐতিহাসিক গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট : "এই তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম প্রথা ছিল জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মানুষ-বলিও বাদ দেওয়া হইত না। কালিকা পুরাণে বলা হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে উৎসর্গ করা যায়, যার দেহে কোনো খুঁত নাই। এ ছাড়া ঐ বলিযোগ্য মানুষটিকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়া শিরচ্ছেদ করা হইবে, কিভাবে রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথ্যও ঐ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

"কামাখ্যা দেবীর নূতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে অন্যূন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়্গাঘাতে ছেদন করা হয় এবং এই রক্তাপ্লুত মস্তকগুলি তাম্রপাত্রে সজ্জিত করিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয় দেবীর চরণে। হাফ্‌ৎইক্লিম-এর বর্ণনা অনুসারে এই সময়ে কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহারা স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরূপে নিজেদের নিবেদন করিত—ইহারা অভিহিত হইত 'ভোগী' নামে। যেদিন তাহারা ঘোষণা করিত, দেবী তাহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন এবং বলিরূপে উৎসর্গীত হইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত, সেই দিন হইতে তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোনো বাধা দেওয়া হইত না। সে অঞ্চলের যে কোনো রূপসী নারীর দেহ তাহারা নির্বিবাদে সম্ভোগ করিতে পারিত। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায় ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ। এই সময়কার একদল তান্ত্রিকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোনো কোনো ভবিষ্যৎবক্তা ও তান্ত্রিক অভিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহচ্ছেদন করিয়া ভ্রূণ বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিত। এইসব তান্ত্রিকেরা চক্রে বসিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো যেসব জঘন্য কুক্রিয়া করিত তাহা প্রকাশযোগ্য নয়।[১]

অতঃপণ্ডিত ও তান্ত্রিকদের মণ্ডলীগুলি পর পর বহু অসমীয়া রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয়। এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হৃতগৌরব ও

১ হিস্টরী অব আসাম : স্যর এডওয়ার্ড গেইট

পতনশীল, এবং এই রাজবংশগুলি, উদ্ভূত হইয়াছিল অর্ধসভ্য পার্বত্য সমাজ হইতে। ইহাদের ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকেরা সমকালীন আসামের জনজীবনে সৃষ্টি করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিকা ও নৈরাশ্যের।[১]

শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার বৈষ্ণবধর্ম এবং সুস্থ নীতিধর্মভিত্তিক সামাজিক জীবন গঠনের আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার আশীর্বাদ রূপে। নিপীড়িত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে একশরণ ধর্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্ত্র।

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধর্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিতে হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহার তত্ত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, এজন্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহজবোধ্য ও সুললিত অসমীয়া অনুবাদ। শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিধর্মের আকর এবং প্রকরণ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডও ইতিপূর্বে তিনি পাঠ করিয়াছেন' তাই তাঁহার পক্ষে একটি অসমীয়া ভাগবত রচনা করা খুব কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত বৎসর পূর্বে, বিশেষত তন্ত্রধৃত আসাম রাজ্যে, ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। শঙ্করদেব বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাঁহার সকল কিছু সমস্যার চমৎকার সমাধান হইয়া গেল।

বরদোয়ার সত্রে সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া শঙ্করদেব বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া শঙ্করদেবের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যুক্তকরে সবিনয়ে কহিলেন, "আমার নাম জগদীশ মিশ্র, নিবাস মিথিলার ত্রিহুতে। আপনার দর্শনের জন্যই আমি এতটা দূরের পথ এসেছি।"

শঙ্করদেব সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। মধুর কণ্ঠে কহেন, "আপনার আগমনে আমরা সবাই পরম আনন্দিত। আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। কিন্তু কি কারণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, দয়া ক'রে তা প্রকাশ করুন।"

"তবে শুনুন। অন্তরে আমার সংকল্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, প্রভু জগন্নাথ-দেবের সম্মুখে ব'সে গোটা ভাগবত আমি পাঠ ক'রে শোনাবো। সে পবিত্র কাজ শুরুও করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ—'ওহে মিশ্র, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। কিন্তু আরো বেশী প্রসন্ন হবো একটি কাজ করলে। অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ করো'।' এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরি করিনি। গ্রন্থের পোঁটকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

একি অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের। অন্তর্যামী শঙ্করদেবের অন্তরের কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব করেন নাই।

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব ভক্ত মিশ্রজীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। পরদিন হইতে শুরু হইল প্রভুর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ।

১ ই-আর ই: আসাম—অ্যাণ্ডারসন।

কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ মিশ্র বৎসর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই। মনে হয় যেন প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। সে কাজ সমাপ্ত হইবার অল্পকাল পরেই নরলীলায় ছেদ পড়িয়া গেল।[১]

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড এবার তিনি ভাষ্যসহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেন। তারপর শুরু করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং সুললিত কাব্যছন্দে তাঁহার মহান্ গ্রন্থের রচনা। তাঁহার এই অসমীয়া ভাগবত একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া ভক্তের প্রাণে কৃষ্ণরস সিঞ্চন করিয়াছে, তাহাদের জীবনে ভক্তিধর্মের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি ইহা গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে। রাজ্যের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

অসমীয়া বৈষ্ণব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রতিবেশী, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রায় সমকালীনও বটে। উত্তরজীবনে শঙ্করদেব একবার তাঁহার বহু ভক্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের কালে প্রভু চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় মতবাদ দ্বারা তেমন বেশী প্রভাবিত হয় নাই।

নিজের ধর্মমত প্রচারে এবং অসমীয়া ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তি ও একান্ত শরণাগতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী; দাস্য-ভক্তিভাবের দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো তিনি মাধুর্য-রসের তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেন নাই।

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে—রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি করিতে করিতে হঠাৎ কোনো এক গোপীকে নিয়া অন্তর্ধান হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই গোপীকে চিহ্নিত করিয়াছেন রাধা বলিয়া। শঙ্করদেব কিন্তু ইঁহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণের আরাধিকা কোনো গোপীর কথাই তিনি বলিয়াছেন।

কৃষ্ণকে গোপীরা বনাঞ্চলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সেস্থলে কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথা বাহির করেন নাই, বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শুদ্ধাভক্তি ও দাস্য ভাব। গোপীরা বলিতেছেন।

আকে পাইলে পাতকিয়ো সংসার নিস্তার।
শুদ্ধ হঞ্ঃ বুলি ব্রহ্মা হরো শিরে ধরে॥
আইস ঘসো এহি ধূলি আমস্নো মাথাত।
হুয়া শুদ্ধ মাধবক দেখিবো সাক্ষাত॥
জগত দুর্লভ কৃষ্ণ পদরেণু মাখি।
হেনোবা পবিত্র হুয়া কৃষ্ণমুখ দেখি॥

—এসো আমরা কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাখি, যার মহিমায় সংসারের পাতকীরা সংসার থেকে পায় নিস্তার যা মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হন ব্রহ্মা আর হর, এ ধূলি মাথায় নিলে আমরা হবো পরিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ মাধবের পাবো দর্শন।

১ শঙ্করদেব: বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীরা চিহ্নিত হইয়াছেন দাস্যভক্তির সংবাহিকা রূপে, মধুর রসের দ্যোতনা তাদের মধ্যে নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিবাদের আরো পার্থক্য আছে। গৌড়ীয়েরা জপ ও কীর্তন করেন 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া বৈষ্ণবেরা স্মরণ ও মনন করেন চারি নাম।

"সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে। বাংলার বৈষ্ণবধর্মে রূপের ও রসের উপাসনা। ইহাতে নিরাকার ব্রহ্মের স্থান নাই। কিন্তু শঙ্করদেব তাঁহার ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

প্রণত তার নারায়ণ নিরাকার
কৃষ্ণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

রাসলীলা শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ কথামৃত কর্ণ ভরিয়া পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ হইবে—

"মোক্ষজেবে পাইবা পাপ করিয়া নির্ঘাল
কৃষ্ণকথামৃত কর কর্ণভরি পান[১]।"

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই মতবাদ সদাই অতিশয় সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলেন।

শুদ্ধাভক্তির ব্যাখ্যাতা শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের স্থানে স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অতি মনোরম ভাষায় এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সুষমা ও প্রেমরসের অপূর্ব সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে। শঙ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের সংগীত অতি মনোরম :

পরম মোহন বংশী যাও চুম্বি তোলৈ-নাদ
বঢ়াবয় সমাকে সুরতি।
মহা মহা সার্বভৌম রাজারো সুখক লাগি
যাক দেখি না যাই আউর মতি।
লোক সমস্ত শোক দুঃখ-ভয় বিনাশয়
দরশন মাত্র কতে যাক।
জগতের মনোনিত হেনয় অধরামৃত
দিয়া আমি জীয়ায়ো আমাক। (ভাগবত—১১৯-২৮)

শঙ্করদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তিনি কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভক্তিধর্মের যে নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার ধর্ম-সাহিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

"জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ—ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। তাই স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ ; কিন্তু জীবাংশে মায়া বর্তমান এবং ঈশ্বর মায়াতীত। এই

১ অসমীয়া ভাগবত ও শঙ্করদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩,—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্তমান। এ বিষয়ে তিনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়া শ্রীশঙ্করদেবের মতকে 'ভেদাভেদ' বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রী.শঙ্করদেবের আদর্শ স্পষ্টতর' গীতোক্ত 'পুরুষোত্তম'। ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অনন্ত নামরূপী ভাগবান্। নামধর্মের ইহাই এক বিশেষত্ব[১]।"

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেব বরদোয়ার বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাঁহার দুর্ধর্ষ প্রজারা বার বার এ অঞ্চলে হামলা করিতে থাকে। উপদ্রব ও অশান্তি এড়ানোর জন্য শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করেন। তারপর স্থায়িভাবে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বসবাস করিতে থাকেন ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মজুলি দ্বীপের এই স্থানটি যেমনি শান্তিপূর্ণ ও মনোরম, তেমনি শস্য-শ্যামল। এই স্থানে বসিয়া আপন উদার ভক্তিধর্ম তিনি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন।

ভাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বলিয়াছেন—

'পুরাণ সূর্য মহা ভাগবত
বেদান্তরো ইতো পরমতত্ত্ব'

এই পরমতত্ত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগতি ও শ্রদ্ধা ভক্তির সহায়ে। বৈষ্ণব সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তির সহায়ক এই শ্রদ্ধাভক্তির গুণ-কীর্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে ভজন করে
ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে,
একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন।
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্তি,
দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত,
হৃদয়ে তাঁর-স্ফুরিত হয়ে ওঠে
প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের মাধুর্য মূর্তি।
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে,
ক্ষুধার্ত অভাগার কাছে
এক-এক মুষ্টি অন্ন, হয়ে উঠে পরমান্ন।
প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা,
জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি।

(নিমি নব সিদ্ধ সম্বাদ)

শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্ত্বের ব্যাখ্যান, কবিত্ব ও পদ-মাধুর্যের লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে

সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়া পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

শংকরের জীবনীকার ভূষণ দ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন। আশ্রয় নিয়াছেন তিনি ব্রহ্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদান্তীর চতুষ্পাঠীতে। একদিন শাস্ত্রতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই শ্লোকটির মর্মার্থ বুঝিতে পারিতেছে না, চুপ করিয়া তাহারা বসিয়া আছে। এমন সময়ে অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কণ্ঠভূষণ, উঠিয়া দাঁড়ান, শ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন।

ব্রহ্মানন্দজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, ভাগবত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছো তা প্রশংসনীয়। বলতো কোথায় তুমি এসব শিখলে ?"

কণ্ঠভূষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, বৈষ্ণব আচার্য শংকরদেবের রচিত অসমীয়া ভাগবত আমরা পাঠ করতে অভ্যস্ত। তাই এই শ্লোক কয়টির তত্ত্ব আমার অজানা নয়।"

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণশাস্ত্র হইতে তত্ত্ব আখ্যান ও উপকথা নিয়া শংকরদেব অসমীয়া ভক্তদের জন্য ছোট বড় বহুতর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আসামের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এগুলি পরম সম্পদরূপে গণ্য।

শংকরদেবের কীর্তন তাঁহার ভক্তিসিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমন পরিচয় দেয় অসামান্য কাব্য প্রতিভার। এই সুললিত কীর্তনে প্রেমভক্তি লীলার নানা অনুভূতি —মিলন বিরহ, আনন্দ দুঃখ, রোষ ও ক্ষমা প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, শংকরদেবের কীর্তন সকল বয়সের শ্রোতাদের আনন্দ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। শিশুরা কীর্তনে বর্ণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকৃষ্ট হয়, যুবজনেরা মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণেরা তৃপ্তি লাভ করেন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যানে।

একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তুচ্ছতা ও আনন্দের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে শংকরদেব বলিতেছেন—

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ,
রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী—
রাজ অট্টালিকা আর রাজকোষের রত্ন,
কিন্তু এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি
নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ?
গয় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষা
হয় কি কখনো নিবারিত ?
সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়,
কিন্তু বাসনা জয়ে তারা হয়েছেন ব্যর্থ।
ইন্দ্রিয়কে যে করে বশীভূত
হৃদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আর্তি,
দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী।

লোভ আর আসক্তি যদি না হয় সংযত
তিন ভুবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তুষ্টি।
(বালী ভজন—শঙ্করদেব)

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা ভজন-সংগীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অনুভূতি পরমার্থ তত্ত্ব ও ভক্তহৃদয়ের আর্তি।

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেবের মর্মস্পর্শী চিত্র আমরা পাই। এই ভজনগীতটি তিনি রচনা করেন হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে বসিয়া। তিনি গাহিয়াছেন—

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে,
দেখছো না কি—অন্ত আসছে এগিয়ে?
আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ
জীবনদীপ অচিরে হবে নির্বাণ,
কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে ঐ প্রতিদিন,
— মৃত্যু নিয়ে আসে সর্ববিনাশ।
এই ভঙ্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত
তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল,
শরণ নাও শ্রীরাম-চরণে
হে দুর্ভাগা মন. তুমি যে অন্ধ,
বিষয় ধাঁধায় মরছো তুমি ঘুরে ঘুরে।
জেগে ওঠো তামসিক সুপ্তি থেকে,
জেগে ওঠো, ভজ এবার শ্রীগোবিন্দ।
হে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢ়স্বরে,
রাম চরণ বিনা নাই কো তোমার গতি।

আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রভুর কাছে ভক্ত শঙ্করদেব জানাইয়েছেন তাঁহার হৃদয়ের আকুতি, মাগিয়েছেন পরমাশ্রয়:

হে প্রভু নারায়ণ,
চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর,
বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্তি।
নাসিকা মোর সুগন্ধের জন্য লুব্ধ,
শ্রবণ মাগে সুমধুর নারীকণ্ঠ,
নয়নদ্বয় হয়েছে অধীর
দেহের রূপ আর স্পর্শসুখের লাগি,
তবে কি করে করবে তোমার ভজন?
কাম, ক্রোধ. মোহ, অভিমান—
এই সব মহাশত্রু করেছে আমায় বেষ্টন।
শঙ্কর কহে আকুল স্বরে
হে প্রভু, হে আমার গোপাল,
তোমার এই দীন দাসকে
কে বাঁচাবে এই শত্রুদলের হাত থেকে?

অংকিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধর্ম সংস্কৃতিময় জীবনে শঙ্করদেবের আর দুইটি বড় অবদান। সংগীতময় নাট্য অভিনয়, ধর্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ ও সংগীতের ব্যঞ্জনায় এই অভিনয় জনচিত্ত জয় করিয়াছে এবং শত শত বৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবাহিত করিয়াছে ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরান্তের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় নাট আর ভাওনা কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণকাহিনীর অমৃত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে,—শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মকে করিয়াছে সর্বজনবোধ্য, সর্বজনপ্রিয়।

শঙ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "ইতিপূর্বে প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতো শুধু স্বর্গের সীমানার ভেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন সেই তটিনীর তটভূমি, তাইতো তার অমিয় ধারা আজ মর্তের দিকে দিকে হচ্ছে বিস্তারিত।"

ধুয়াহাটাতে শঙ্করদেব তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসমীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ স্মরণীয় হইয়া আছে।

লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ বয়সেই শাস্ত্রশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, তান্ত্রিক আচার্যদের আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও অর্জন করেন দক্ষতা।

মাধবদেবের জননী এক সময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, চিকিৎসা নানা রূপই করা হয়, কিন্তু রোগিনীর অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যায় না। মাধবদেব অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়া উঠিলেন, দেবীবিগ্রহের প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন।

জননী কিছুক্ষণের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে। মাধবদেবের ভগ্নীপতির নাম গয়াপানি, তিনি শঙ্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। পারিবারিক অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নীপতির উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহাকে কহিলেন, "ভাই, তুমি খোঁজখবর ক'রে বলিদানের উপযোগী নিখুঁত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও। দেবীর কাছে যে মানৎ করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষা করতে হবে।"

গয়াপানি শ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, "তুমি দেখছি মহাশক্তি জগজ্জননীকে ছাগশিশুর কচি মুণ্ডু খাইয়েই সন্তুষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছো, বলতো ?"

মাধবদেব তো মহা ক্রুদ্ধ। কহিলেন, শাক্তধর্ম আমাদের সনাতন ধর্ম। এর মর্ম তুমি বুঝবে কি ? তোমার গুরু শঙ্করদেবই যে তোমার মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছে। দ্যাখো, আমাদের দেবী যেমন জাগ্রত, তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানও তেমন সদ্য ফলপ্রদ। তোমাদের বৈষ্ণবেরা যত লাফালাফি করুক আর যত নেচে গেয়ে বেড়াক, দেবতার আসন তাতে টলে না।"

গয়াপানি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ধর্মের প্রাণবস্তু কি তা জানলে না। ভগবান্‌ জীবের প্রেম চান—না ছাগলের রক্ত চান, তা বুঝতে চাইলে

না। অনেকবার তো বলেছি চলো আমাদের গুরু শঙ্করদেবের কাছে, ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি তা জানতে পারবে।"

অনেকদিনই মাধবদেব ভগ্নীপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। আজ তাঁহার জেদ চাপিয়া গেল। কহিলেন, "বেশ, চলো তোমার গুরুর কাছে। শাক্তধর্ম বড় না বৈষ্ণব-ধর্ম বড় তার বিচার আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে এসেছি। আজ আমি তাঁকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো তর্কবিচারে।"

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে মাধবদেব কহেন, "আচার্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা আমি শুনেছি। নূতন ভক্তিধর্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন এবং জাতিভেদ ও অধিকারীভেদ না মেনে নির্বিচারে দিয়ে চলেছেন নামমন্ত্র। কিন্তু এতো শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র ও পার্বত্য জাতি সবাইকে এক ক'রে দিলে তো এই সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মকে বাঁচানো যাবে না। সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে। আপনি আমার সঙ্গে বিচারসভায় বসুন। যদি আমি পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো। আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে।"

"ধর্ম রসাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হচ্ছে বলেই তো আমার এই উদার সর্বজনীন ভক্তিধর্মের প্রচার আমি প্রাণপণ প্রয়াসে করছি।" সহাস্যে উত্তর দেন শঙ্করদেব।

"যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বানমণ্ডলীকে ডাকুন। তাঁদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ। দেখা যাক, কার মতবাদ জয়ী হয়।"

শঙ্করদেব এই দ্বন্দ্বের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন সমাগত শাস্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুরু হইল তত্ত্ব বিচার।

শঙ্করদেব সর্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নূতন ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্তশাস্ত্র তিনি অভিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। সর্বোপরি ভারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ত্ব তাঁহার অধিগত।

বিচারসভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি-তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজস্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

সুগৌর কান্তি, সমুন্নত বপু, পরম প্রশান্ত, ভক্তি-আন্দোলনের এই বর্ষীয়ান্ নেতার ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে তাহা কে জানে। বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাণ্ডিত্যে চির-আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি করিলেন, ভাগবতের সেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার মর্মকথা :—

তরুর মূলে সিঞ্চন ক'রো স্নিগ্ধ সলিল,
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি
তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব।

জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্তু—
সারা শরীর ও ইন্দ্রিয় তো তার হবে প্রাণবন্ত।
তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালো ভক্তিরস,
সর্ব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট।

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব কহিলেন, "আচার্য, আপনার মাহাত্ম্য আপনার ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাধনোজ্জ্বল তত্ত্ব ব্যাখ্যানে। আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম। এখন থেকে সারা আসাম রাজ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে আমার জীবনের প্রধান ব্রত।"

প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন প্রতিভাধর পণ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাঁহার 'একশরণ' মণ্ডলীতে।

শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কন্যার সঙ্গে। গুরুর আশ্রয় লাভের পর মাধবদেব সংকল্প গ্রহণ করিলেন, গার্হস্থ্য আশ্রমে তিনি আর প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্ণবীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, একান্তভাবে গুরুর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ।

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্য শঙ্করদেব ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মাধবদেবকে রাজী করানো যায় নাই। ত্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জন্য চির তরে বাছিয়া নেন।

উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপূত, ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন। এই বৈরাগী সাধকেরা সত্রসমূহের পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কেওয়ালিয়া (চিরকুমার) বৈষ্ণব সাধকরূপে ইহারা পরিচিত হইয়া উঠেন।

মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম অনেক বেশী শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাঁহার প্রধান শিষ্যরূপে। উত্তরকালে অসমীয়া বৈষ্ণবদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়া মাধবদেব কীর্তিত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব তাঁহার অসামান্য সংগঠন শক্তি নিয়া বৈষ্ণবধর্মের উজ্জীবন সাধন করেন, নিজস্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভক্তি আন্দোলনের স্রোতকে আরও বেগবতী করিয়া তোলেন।

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে হয়। অহোমরাজ চুহুমুঙ-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন।

রাজা কহিলেন, "শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস করছেন ভালো কথা। কিন্তু আপনি নাকি নূতন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অছিলায় নানা অনাচার ক'রে চলেছেন। হিন্দু ধর্মবিরোধী ও বেদ-বিরোধী পাপকার্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজসভার পণ্ডিতেরা আর তান্ত্রিক মোহান্তেরা এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে।"

শঙ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আমি হিন্দুধর্মের ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। বরং হিন্দুধর্মকে বাঁচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্মের দীপ জ্বালানোর জন্যই আমি উৎসর্গ করেছি আমার জীবন।"

"বেশ তো তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত অভিযোক্তাদের সঙ্গে বিচারে বসুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নূতন ভক্তিধর্মের যৌক্তিক কথা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করুন।

অহোমরাজ সনাতন পন্থী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সব সময়ে পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে নিজেকে তিনি জাহির করিতে চান। তাছাড়া রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এসময়ে কেবলি তাঁহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে. কারণ শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য মানিয়া চলে না। শূদ্র ও অন্ত্যজদের দেয় সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার।

শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে না। তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন ধর্মে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্মবিচার সভা।

সর্ব দর্শন ও সর্ব ধর্মের তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার অজানা নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট কর্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন করিতেও তিনি দৃঢ়সংকল্প। সাধনার উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্যসাধারণ। তাই তাঁহার সহিত কূপমণ্ডূক ও রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল মধ্যেই শঙ্করদেব তাঁহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পর্যুদস্ত করিলেন।

শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে. কিন্তু কুচক্রী ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাঁহার উপর পূর্ববৎ রহিলেন বিদ্বিষ্ট।

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া যায়। অহোমরাজ তখন ধুয়াহাটা অঞ্চলে হাতি ধরার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী হাতি খেদা বা অবরোধ-বেষ্টনী নির্মাণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের সহিত গ্রামের লোকদের সহযোগিতা করতে হয়। গ্রামবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড দিয়া খেদার অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে। হাতির দল যখন উগ্রমূর্তি হইয়া খেদার বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতি পলায়ন করে রাজসরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।

সেবারকার খেদা অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আসিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার লোকজনদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি দিয়াই বুনো হাতির দল কঠোর বেষ্টনী ভাঙিয়া ফেলে এবং পলাইয়া যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী দুষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়া উঠে এবং চরম দণ্ড বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে।

অহোমরাজ এবং তাঁহার কর্মচারী ও পুরোহিতরা এ যাবৎ নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগামী বৈষ্ণবদের উপর করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। কিন্তু এবারকার পরিস্থিতি তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাজার এই বিরোধিতার মুখে তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। বরং রাজার অত্যাচারের ফলে তাঁহার এই নূতন গড়িয়া উঠা ভক্তি আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট।

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন অবিলম্বে সদলবলে তাঁহারা

এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ জেলায়। ঐ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা চিলা রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃংখলার অবস্থা সেখানে উন্নততর, এখানকার মতো দুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়।

একদল অনুগামীসহ শংকরদেব গোপনে ধুয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাতা শ্রীমান্ হরি। উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন। মাধবদেব সন্ন্যাসী বলিয়া অহোমরাজ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে দেওয়া হইল মৃত্যুদণ্ড। এই ঘটনায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

কামরূপ জেলায় বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শংকরদেব এবার তাঁহার নূতন নিবাস স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্য একটি সত্র এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে এই স্থানটি হয় শংকরদেবের প্রধান সাধনপীঠ ও প্রচারকেন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শংকরদেবের খ্যাতি কামরূপের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহার চিহ্নিত অনুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং অনন্ত কণ্ডলী ইঁহাদের অন্যতম। এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে ব্রাহ্মণ। শংকরদেবের সাধন ঐশ্বর্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম ইঁহাদের উদ্বুদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে। উত্তরকালে ইঁহারা অসমীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তম্ভ রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন।

বরপেটা অঞ্চলে থাকাকালে প্রবীণ আচার্য শংকরদেব আর একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন শতাধিক শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমণকালে শংকরদেব পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১] ভারতের অন্যান্য তীর্থ ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত তিনি মিলিত হন। ইহার ফলে, একদিক দিয়া অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম যেমন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানসলোকের সহিত, আসামের নবীন বৈষ্ণবধর্মের যোগসূত্র রচিত হয়, নূতন ঐক্যবন্ধন গড়িয়া উঠে।

আসামে ফিরিয়া আসার পর শঙ্করদেব তাঁহার ভক্তি-আন্দোলনে সঞ্চারিত করেন নূতন উৎসাহ নূতন প্রেরণা। সর্ব জাতি ও বর্ণের মধ্যে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। নূতন বৈষ্ণবধর্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামরূপের শাক্ত আচার্য ও পুরোহিতদের চঞ্চল করিয়া তোলে। কোচরাজ নরনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়া উপস্থিত হন।

করজোড়ে তাঁহারা কহেন, "মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, ধর্ম ও সমাজ রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে এসব কি হচ্ছে, বলুন তো। দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, ধর্ম যাচ্ছে রসাতলে।"

"কি ব্যাপার, আপনারা সব খুলে বলুন।"

১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎ ঘটে স্বল্পকালের জন্য, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা বা মতবিরোধের কোন সুযোগ তিনি পান নাই।

"মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কায়স্থ হয়েও সে আচার্য হয়ে বসেছে। জাতিবর্ণের পার্থক্য সে মানে না. প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। ম্লেচ্ছের মতো তার আচার-আচরণ। উদার বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করার অছিলায় বেদ-বহির্ভূত এক নূতন ধর্ম সে প্রচার করছে। নিম্নবর্ণের মানুষ, অর্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে! এর প্রতিবিধান আপনকে করতেই হবে।"

নরনারায়ণ ধর্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, "বেশ, আমি শঙ্কর-দেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যও আমি শুনবো। আপনারা সভায় উপস্থিত থেকে যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে তাঁর মতবাদ করবেন খণ্ডন।"

শঙ্করদেব তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া রাজা নরনারায়ণের সভায় উপনীত হন। শাক্ত আচার্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত।

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, "মহারাজ, আমার বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। বেদে বিষ্ণু উপাসনার কথা রয়েছে। স্মৃতি ও পুরাণে আছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য। তাছাড়া বিশেষ ক'রে ভাগবত পুরাণের ভিত্তিতে আমার বৈষ্ণবীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণদাস্য আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। একে বেদ বহির্ভূত বলা হচ্ছে সত্যের অপলাপ।"

শাক্ত আচার্যদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতেরা রহিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ত্ব তাঁহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন।

শঙ্করদেব তখন ঐশ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ অজস্র ধারায় নির্গত হইতেছে তাঁহার কণ্ঠ হইতে, ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাঁহার বদনমণ্ডল। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া নির্নিমেষে তাকাইয়া আছে।

শাক্ত পণ্ডিতেরা এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন। নিঃশব্দে নত শিরে গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন।

রাজা নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্মব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আচার্য, আপনি কৃপা ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার নব বৈষ্ণবধর্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে। আপনার এই ধর্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। নূতনতর ধর্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা দিক্—তা ই আমি কাম্য বলে মনে করি।"

রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি চিলা রায় শঙ্করদেবের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়ে তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে বুঝাইয়া বলেন, "মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজসিকতা। দিনচর্যা অন্যরূপ। যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই আপনি আপাতত অনুসরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্মে নিবৃত্তি মার্গই বড় কথা, সে মানসিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা আর নীতিনিষ্ঠা আমি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, একথা জানবেন, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোনো সমস্যায় আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো।"

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ববৎ রত রহিলেন ভক্তি-উপাসনা ও নাম ধর্মের প্রচারে।

রাজা নরনারায়ণ ও চিলা রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজধানী কোচবিহারে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন।

ভক্তিমান্ চিলা রায় কোচবিহার নগরের অনতিদূরে ভোলাডাঙায় শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার আশা ছিল, এই সত্রকে উপলক্ষ করিয়া কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের যোগাযোগ আরো নিবিড় হইয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও কৃপালাভে তাহারা ধন্য হইবেন—এ আশা তাঁহার অনেকাংশে সফল হইয়াছিল।

শঙ্করদেবের ভক্তি আন্দোলনের পুণ্যধারা ক্রমে বিস্তারিত হয় সারা আসামের দিগ্‌বিদিকে। মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্ধ, অপরদিকে তেমন ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল। আসামের জনজীবনে ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের সর্বত্র সত্র আর নাম-ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত হইয়াছে সহস্র সহস্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিত্র গ্রন্থ। অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁহার কীর্তন, বরগীত, অংকিয়া-নাট আর ভাওয়ানার রসমাধুর্যে হইতেছে অভিসিঞ্চিত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু নয়, অন্ত্যজ শূদ্র ও অর্ধসভ্য পার্বত্য নরনারীও শঙ্করদেবের প্রসাদে মত্ত হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে। নামধর্মের জয়গানে আজ তাহারা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের পালা এবার সমাপ্তির পথে। শঙ্করদেব কিছুদিনের জন্য ভোলাডাঙার সত্রে বাস করিতেছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক চিহ্নিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি সমাগত হয়। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিষ্য, চির-ব্রহ্মচারী মহাবৈষ্ণব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠী নেতৃত্বের আসন[১]। তারপর কৃষ্ণরসে রসায়িত সিদ্ধ মহাপুরুষ নরদেহ ত্যাগ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে।

---

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা, তাই মণ্ডলীর নেতার আসন অনেকে তাঁহাকেই দিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব এ দাবি অগ্রাহ্য করিয়া মনোনীত করেন ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবদেবকে।

গোস্বামী রঘুনাথ দাস

নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পরিকর ও লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথ-দাস। দৈন্যময় বৈষ্ণবীয় ভজন আর ব্রজরসের নিগূঢ় সাধনায় অপূর্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার জীবনে। মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে বিরাট ভক্তিসাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন তাঁহার অন্যতম ধারক ও বাহক।

সংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীর একমাত্র পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের অফুরন্ত স্নেহ, প্রাসাদের রাজসিক বিত্ত ও বিভব ও ভোগৈশ্বর্য, রূপসী তরুণী ভার্যার প্রেম, কোনো কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া উন্মাদের মতো তিনি বাহির হইয়াছেন সর্বময়ের সন্ধানে। পরম সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়া হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ।

শ্রীচৈতন্যের কৃপা আর তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বরূপ' স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া উঠে ও ব্রজরসের পরমতত্ত্বের সন্ধান তিনি অবগত হন। উত্তরকালে তাঁহারই মাধ্যমে বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধকমহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ত্ব ও ব্রজরসের মহিমা প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতের ভিতর দিয়া এই রসের মাহাত্ম্যই বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে।

কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিস্ফুট :

চৈতন্যের লীলা রত্ন সার　　　স্বরূপের ভাণ্ডার
　　তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল　　　তাহা ইহা বিবরিল
　　ভক্তগণ দিল ইহা ভেটে॥
ছোট বড় ভক্তগণ　　　বন্দো সবার শ্রীচরণ
　　সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত　　　রঘুনাথ জানে যত
　　তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥　　(চৈ, চ, মধ্য ২)

অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস। তিনি শুধু সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার রাজসিক কর্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জীবনে তাঁহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপান্তর।

আনুমানিক ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবর্ধনদাস মজুমদার। জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের কোনো সন্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নির্বিশেষে অপার স্নেহে তাঁরা পালন করিতে থাকেন। সপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা চাঁদপুরে ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস।

সপ্তগ্রামের এই সুবিখ্যাত জমিদার বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থাগম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গঙ্গা তাঁহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনর্বিযুক্ত হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই "মুক্ত" ত্রিবেণীর সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সপ্তপুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই তপঃক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজত্ব কালে এই-স্থানে সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্বদিকে ভাগীরথী উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্রমে একটি বাণিজ্যবহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবি কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে—

সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥

"মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা তখন পার্শ্ববর্তী স্থান লইয়া একটি মুলুক বা খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। পাঠানেরা যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে তাঁহাদের অন্তত দুই শতাব্দ লাগিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যেও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলিব্যবস্থা লইয়া সর্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে "বুলবাদখানা" বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নির্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক মোক্তা রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপন্ন লোককে ইজারা দিতেন। যাহারা এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়া এক একটি সরকার গঠিত হয়, মজুমদারেরা জমিদার হন। এখন একটা পরগনার আংশিক অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা ততোধিক পরগনা অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বার্ষিক বারলক্ষ টাকা মোক্তা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা লইয়াছিলেন দুই জন মৌলিক কায়স্থ—দুই ভ্রাতা, হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস। পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ ঔপনিবেশিক, স্বজাতি-রক্ষক সাহসী বীর, এবং প্রবল পরাক্রান্ত শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উঁহারাই গুরু পুরোহিতরূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। হিরণ্য গোবর্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাঁহাদের পিতৃপুরুষের কোনো বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোনো বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজানুগৃহীত পাঠান আমীরের কবল হইতে তাঁহারা কোনো মুলুকের বন্দোবস্ত লইতে পারিতেন না। বন্দোবস্ত লইলেও তাঁহাদের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদ্বয় "বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ" অর্থাৎ তাঁহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশলক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বারলক্ষ রাজস্ব দিয়া আট লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। ইহা ত শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় শুল্ক হইতে

তাহাদের উক্ত আয় ছাড়া আরও ৩-৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। সুতরাং তাহাদের মোট বার্ষিক আয় ১০-১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়া কত জনের নেত্রপীড়া জন্মিত। বর্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্ধনের রাজ-প্রাসাদতুল্য বসতবাটী ছিল।

"ধনৈশ্বর্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সৎকার্যের গৌরবও তাহাদের কম ছিল না। "গৌড়ে গোবর্ধনো দাতা" বলিয়া প্রবাদবাক্য এই যশ কীর্তন করিত। কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন।—

"মহৈশ্বর্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্মিক অগ্রগণ্য ॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ (চৈ, চ মধ্য, ১৬শ)

নদীয়া অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি অথবা মাসিক বৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বিপুল তাঁহাদের বিভব, ধর্মে তাঁহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভরা তাঁহাদের যশ, রাম-লক্ষ্মণের মতো তাঁহারা অভিন্ন হৃদয়—অভাব তাঁহাদের কিছুরই ছিল না। কেবলমাত্র বহুকাল পর্যন্ত উভয়ে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্ধনের ছিল একটি মাত্র সন্তান—রঘুনাথ[১]।" এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ দুই ভ্রাতার নয়নের মণি।

অতুল ঐশ্বর্য আর স্নেহমমতার পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন। পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধারা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ভূম্যধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জন করিবেন দানশীলতা ও পুণ্যকর্মে। কিন্তু এ অভিলাষ তাঁহাদের পূর্ণ হয় নাই। জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা যায় তাঁর জীবনে।

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পড়ুয়ারা এখানে পড়িতে আসিত, নব্যন্যায় ও অন্যান্য দর্শন আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রেও বর্তমান ছিল শাস্ত্রপাঠের আদর্শপীঠ।

হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। তাই দুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। গৃহে বাসয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ করা তাঁহাদের মতো ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস তাহা করেন নাই। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথামত ছাত্রেরা অধ্যাপকের আবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাঁহার সাহচর্য ও তত্ত্বাবধানে জীবন গড়িয়া তোলে। এই প্রথাই

১ সপ্ত গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

তিনি অনুসরণ করিলেন; বালক রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কুলপুরোহিত বলরাম আচার্যের গৃহে। এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্রের মধ্যেই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছেদে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্য শুধু শাস্ত্রবিদ্‌ই ছিলেন না, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। গ্রামে কোনো সাধুসন্ত উপস্থিত হইলে তাঁহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা। এই পরিবেশে থাকিয়াই বালক রঘুনাথ সাধুসেবা ও সদাচারের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

বলরাম আচার্য যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক বিদ্যার্থী রঘুনাথও তেমন অসাধারণ মেধা প্রতিভার অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমালা রচনা করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষায় এই উৎকর্ষ এবং সাফল্য।

নামমূর্তি হরিদাস ঠাকুর সে বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। বলরাম আচার্য সাদরে তাঁহাকে জানান অভ্যর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরি করা হয় এই ভক্ত অতিথির জন্য। সেই কুটিরে বাস করিয়া হরিদাস তাঁহার নিত্যকার জপ ও নামকীর্তন সমাধা করিতেন আর বলরাম আচার্যের গৃহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্বাহ।

বালক রঘুনাথের কৌতূহলের অন্ত নাই। সুযোগ ও অবসর পাইলেই তিনি ঘুরঘুর করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে। হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান, ধন্য হন তাঁহার আশীর্বাদ ও স্নেহস্পর্শে। দিনের পর দিন এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের ভজননিষ্ঠা ও দৈন্যময় সাধনা দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হন, দিব্য ভাবাবেশের ছবিটি কোমল হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

শুধু বলরাম আচার্যই নন, হিরণ্য ও গোবর্ধনও ছিলেন ভক্তসিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের অতি অনুগত। ফলে বালক রঘুনাথও এই মহাপুরুষের দ্বারা এসময়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়েন।

হরিদাস ঠাকুরের কৃপাকরসম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে ভক্তি-সাধনার দুয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতেই তাঁহার বালক কালের এই মানস বিবর্তনের ইতিহাস কৃষ্ণদাস শ্রবণ করেন এবং চরিতামৃতে তাহা লিখিয়া যান :

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥

অতঃপর হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া যান, এবং ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন।

প্রভু কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার দিব্য-জীবনের নবতম অধ্যায়। সপ্তগ্রামের বহু লোকই তাঁহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদ

রাখেন। বিশেষ করিয়া জমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্যদাস ও তাঁহার ভ্রাতা গোবর্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপলীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ অবগত আছেন।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহাদের সভা ছিল রাজসভার মতো এবং এই সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আসিতেন।

হিরণ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর। এই সংবাদে প্রভু হিরণ্য ও গোবর্ধনদাসকে 'আজ্ঞা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাজেই প্রভুর ভক্তি-ধর্মের প্রচার ও সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

প্রভু কাটোয়া হইতে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে আসিলেন। ভক্তি প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, দেবদুর্লভ মূর্তি, এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য শান্তিপুরে ভিড় জমিয়া যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে। সপ্তগ্রাম হইতেও বহু লোক শান্তিপুরের দিকে রওনা হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়া রঘুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন।

অদ্বৈত আচার্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন।[১] প্রেমঘন দিব্যমধুর মূর্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া নেওয়া যায় না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভু টলমল করিতেছেন। কখনো হইতেছেন সংজ্ঞাহীন। সারা দেহে তাঁহার ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রুকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার।

প্রভুকে ঘিরিয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও কীর্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত। মর্তলোকে যেন এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধনদাসের সহিত অদ্বৈত আচার্যের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাই বালক রঘুনাথের প্রতি স্নেহসমাদরের ত্রুটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণধূলি ও পবিত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন।

রঘুনাথ শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন প্রভু শ্রীচৈতন্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রভুর অলোক-সামান্য রূপ, প্রেমার্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর ভক্তদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সবকিছু মিলাইয়া যে অপরূপ ভাবমূর্তিটি তাঁহার মানস-পটে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে। প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাঁধা পড়িয়া যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বন্ধনে।

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; রঘুনাথ পদার্পণ করিয়াছেন সতের বৎসরে। এই তরুণ বয়সে লোকে সাধারণত আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পার্থিব ভোগ সুখের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রঘুনাথের বেলাই দেখা যায় তাহার বিপরীত। হৃদয়ে তাঁহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়া—সংসারে মন এক দণ্ডও টিকিয়া থাকিতে চায় না।

---

১ বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীই সর্বপ্রথম প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্ত হন।

লোকমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়া যে লীলা তিনি করিতেছেন, প্রেমভক্তিধর্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাথ পাইতেছেন। এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে। দুর্নিবার। এ সময়ে বার বারই চেষ্টা করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্তু বার বারই তাঁহার অভিসন্ধি ফাঁস হইয়া যায়, ধরা পড়িয়া যান।

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তোমরা ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোনো ফাঁকে যেন না পালায়।"

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেরি হইল না; কয়েকজন সঙ্গী ও পাইক নিযুক্ত হইল এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দেশ রহিল, রঘুনাথ সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

পিতা ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ সাত্ত্বিক প্রকৃতির যুবক, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা। এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন বড় প্রশ্ন, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখা যায়? পিতা ভাবিলেন, কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়া সাধনভজন শুরু করিলে, পূজা-পার্বণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কার্যে রত হইলে হয়তো গৃহত্যাগের ঝোঁক কমিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে সংসারজীবনে সে আকৃষ্ট হইবে।

যদুনন্দন আচার্য গোবর্ধনদাসের কুলগুরু। ইনি অদ্বৈত আচার্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সুপণ্ডিত ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া সুনামও যথেষ্ট। তাঁহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া হইল।

গুরুর নির্দেশমতো বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধনভজন করিয়া চলিলেন, কিন্তু মন তাঁহার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে।

অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাক। রূপসী তরুণী পত্নীর আকর্ষণে যদিবা সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া আসে।

সুলক্ষণা পরমা সুন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরি হয় নাই। এক শুভলগ্নে জাঁকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও রঘুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে।

এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের বিস্তারিত সংবাদ পৌছে সপ্তগ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড় রামকেলীতে আসিয়া রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপা করেন। তারপর বৃন্দাবনে গমনের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছেন সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্তন-নর্তনের আনন্দস্রোত।

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও পিতাকে খুলিয়া

বলিলেন তাঁহার মনের কথা। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না।

হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এবার বহু সলাপরামর্শ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। এবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় কয়েকদিন কাটাইয়া আসিয়া যদি সে কিছুটা শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবে সপ্তগ্রামে।

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রভুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদলবলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে।

কিন্তু এই দর্শন ও সান্নিধ্য তো ভক্ত রঘুনাথকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। প্রভুর দিব্যমূর্তি, আর তাঁহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই নবীন সাধককে আরো যেন উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। চরণতলে লুটাইয়া সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, "প্রভু, মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছি, আপনি ছাড়া এ-জগতে আর আমার কোনো আশ্রয় নেই। বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন আমি যাপন করছি। কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।"

অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনো কিছুই অজানা নয়। রঘুনাথ যে তাঁহার চিহ্নিত পরিকর, তাঁহার দিব্যলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কিন্তু সব কিছুরই একটা ক্রম আছে, নির্ধারিত লগ্ন আছে। রঘুনাথকে এখানে যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে নিজের প্রস্তুতি।

তাঁহাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া প্রভু প্রশান্ত স্বরে কহিলেন :

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ (চৈ, চ, মধ্য, ১৬৭)

নিভৃতে বসিয়া প্রভু আরো কহিলেন, "বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে দুঃখ ক'রো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের কাছে ফিরে আসবো। তখন তুমি কোনো ছলে আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোন ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে কৃষ্ণ তোমাকে তা বলে দেবেন। কৃষ্ণ কৃপা রয়েছে যার উপর তাকে কে ঠেকাবে?"

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হৃদয় কন্দর তাঁহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরি হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করিতে হইবে, বিষয়কর্ম পরিচালনা করিতে হইবে। আর এই সঙ্গে অটুট রাখিতে হইবে প্রেমভক্তির নিষ্ঠা। তবেই জীবনে তাঁহার নামিয়া আসিবে কৃষ্ণ কৃপার অমৃতধারা। প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়া রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন?

অন্তরের আর্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল। স্থির করিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে রত থাকিবেন, আর অপেক্ষা করিবেন

সেই পরম লগ্নের জন্য যখন প্রভু তাঁহাকে করিবেন বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার, ঠাঁই দিবেন তাঁহার চরণকমলে।

শান্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, প্রভুর সস্নেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। হিরণ্য ও গোবর্ধন এই সুযোগে তাঁহাকে বিষয়কর্ম পরিচালনায় নিয়োজিত করিলেন। সুবিস্তৃত মুলুকের রাজস্ব সংগ্রহ, সুলতানের প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক; শিক্ষা দীক্ষা, মেধা, প্রতিভা তাহার যথেষ্ট। এবার বিষয়কর্মে দক্ষতা অর্জন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ব সে বুঝিয়া নিক্ ইহাই পিতা ও পিতৃব্যের পরমকাম্য।

রঘুনাথের এই কার্যভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল এক কঠিন সঙ্কট। এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত না থাকিলে হিরণ্য ও গোবর্ধনের রাজস্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্যস্ত হইত, সমূলে তাঁহারা ধ্বংস হইতেন।

গৌড়-অধিপতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া নেন। তাঁহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিষ্পেষণের চাপে প্রজাদের অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজস্ব আদায় পুরো-পুরিভাবে হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়া নিয়া সুলতানের খাতে রাজস্ব আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়া বৎসরের পর বৎসর এই ধরনের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হইতেন। শেষটায় সুলতান বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনকে নিযুক্ত করেন তাঁহার স্থানে।

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজস্ব আদায়ের কাজ করিতেন। তাঁহার আমলে প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমতো হইত। সুলতানকে তাঁহার পাওনা বারো লক্ষ টাকা মিটাইয়া দিয়াও আটলক্ষ টাকা মজুমদারেরা নিজের ঘরে তুলিতে পারিতেন। পূর্বতন মোক্তাদার, আমীর, ইহা লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ষার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন, হিরণ্যদাস কয়েক লক্ষ টাকা বেশী আদায় করিতেছে, কিন্তু অন্যায়ভাবে সরকারী কোষাগারকে করিতেছে বঞ্চিত। এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল।

সুলতান হুসেন শাহ তখন রাজস্বের আদায় বন্ধ করিয়া রাজ-সিংহাসনকে সুদৃঢ় করিতে ব্যগ্র। আমীরের উস্কানিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে পাঠাইলেন হিরণ্য ও গোবর্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৌড়ে নিবার জন্য।

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। সেনাদল আসিতেছে খবর পাইয়া ভ্রাতাসহ তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়া থাকা যাক, তারপর সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে।

এদিকে মজুমদার ভ্রাতাদের দেখা না পাইয়া উজীর তাঁহাদের প্রতিনিধি রঘুনাথকেই গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌড়ে নিয়া গিয়া নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে।

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে রঘুনাথকে হাজির করা হয়। আর ভর্ৎসনা ও ভীতি প্রদর্শন চলিতে থাকে দিনের পর দিন।

রঘুনাথকে সুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন না দুটি কারণে। প্রথমত, মজুমদারেরা দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বারা রাজস্ব বাড়ানো যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারা জাতিতে কায়স্থ. চাতুর্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা অপর কোনো কূট চাল চালিয়া রাজস্বের আদায় ব্যবস্থা ইহারা বিপর্যস্ত করিতে পারে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে।

রঘুনাথ বুঝিলেন কৌশল অবলম্বন না করিলে এই নির্যাতনের হাত এড়ানো যাইবে না। স্থির করিলেন, মিষ্ট কথায় সুলতানের হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একটা আপোস মীমাংসার জন্য।

করজোড়ে, সবিনয়ে সেদিন সুলতানকে নিবেদন করিলেন, "আমার বাবা ও জেঠা আপনার ভাই। আর আমি হচ্ছি আপনার পুত্রের মতো। আমাদের ভেতর বিরোধ বা মনোমালিন্য থাকবে কেন? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক। জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব সব কিছু আপনার আয়ত্তে। আপনার মতো মহান্ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে কার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াবো?"

এই বিনয়নম্র বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মূর্তি, হুসেন শাহের মন গলাইয়া দিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "দ্যাখো বেটা, তোমার জেঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। আট লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর রাজস্ব থেকে একলা ভোগ করে। তা থেকে আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ি ফিরে যাও। তাকে একথা বুঝিয়ে বলো। আমি তোমাদের সবাইকে মার্জনা করলাম।"

রঘুনাথ সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, পিতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তিনি রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপ্তগ্রামে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় এবং সুলতানের মনান্তর অতঃপর অতি সহজে মিটিয়া যায়।

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রীচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ কর্ম রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়া করিয়াছেন। আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়া। শুধু তাহাই নয়, জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাকিলে সুলতানের সহিত আপোস-মীমাংসা সম্ভব হইত না। ফলে হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারকে হইতে হইত সর্বস্বান্ত।

কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন সবাইকে নির্বিচারে বিলাইতেছেন প্রেমধন। তাঁহার উদ্দণ্ড কীর্তন-নর্তনে আর আনন্দ-রঙ্গে ভক্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়াছে। রাঘব পণ্ডিতের ভবন হইয়াছে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র।

পানিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, খুব বেশী দূরেও নয়। রঘুনাথ স্থির করিলেন, একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আসিবেন।

"কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয়া ভাবাবেশে আকুল করিতে হয়, 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দ তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ। তাহার মূর্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল, মুখের কথায় কি মধু ছিল, কীর্তনে কি মদিরা ছিল, হাস্যরসে কি চটুলতা ছিল

যে, যখনই কেহ তাঁহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়া উঠিত, সব ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ছুটিত, আর দেশময় লোকারণ্য হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়া সে অঞ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মতো এই অপরূপ অবধূতের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলা অতি সুন্দর-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে লীলার বৈদ্যুতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মৃতির মতো ছিলেন।"[১]

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেশেতে॥
তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম তিলার্ধেক কাহারো স্ফুরে॥ (চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫ম)

রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে কীর্তন-নর্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পরিবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ। আয়ত নয়ন দুটি দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে ভক্তেরা নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। এই সময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তেরা রঘুনাথকে চিনতেন। তাহারা তাঁহার পরিচয় জানাইয়া দিলেন, "প্রভু, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবর্ধনদাসের পুত্র।"

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের কথা, তাঁহার প্রেমার্তির কথা শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন, নিজের চরণ দুটি স্থাপন করেন তাঁহার মস্তকে। কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, "ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম। ভালই হল, এবার তুমি আমার ভক্তদের দধি চিড়া খাইয়ে তৃপ্ত করো।"

কৌতুকী নিত্যানন্দের 'চোরা' কথার নিহিতার্থ, রঘুনাথ তার প্রকৃত স্বরূপটি চমৎকার-রূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি-প্রেমের সাধনা ও আর্তির ফলে অন্তর তাঁহার রহিয়াছে কৃষ্ণময়, কিন্তু বাহ্যজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফেরা করিতেছেন।

এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে জানাইলেন তাঁহার সোৎসাহ সাধুবাদ। শুধু তাহাই নয়, সহস্র সহস্র ভক্ত বৈষ্ণবকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল সুযোগও এসময়ে তাঁহাকে তিনি দান করিলেন।

অর্থের এমনতর সদ্ব্যবহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে। লোকজন ও অর্থের তাঁহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্বত প্রমাণ চিড়ার স্তূপ আর শত শত ভাণ্ডের দধি ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আসিয়া জুটিল সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সারা গৌড়দেশের দিকে দিকে।

---

১ সপ্তগোস্বামী, বাতুল রঘুনাথ

কথিত আছে, সেদিনকার মহোৎসবে, নিত্যানন্দের আকর্ষণে ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্য সূক্ষ্মদেহে পুলিন-ভোজনে আবির্ভূত হন, পঙ্‌ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্তপ্রদত্ত চিড়া দধি সানন্দে গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবেরা অনেকেই বলিতে থাকেন, রঘুনাথ মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তাহাকে কৃতার্থ করবার জন্যই ঘটিয়াছে কৃপালু প্রভুর আবির্ভাব।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহেরও সেদিন রাত্রিতে বৈষ্ণব সেবার সময়ে ঘটে এমনি এক অলৌকিক কাণ্ড। নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আসন। এই আসনে সশরীরে প্রভু আবির্ভূত হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই লীলাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

রাঘব দুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্নে আনিয়া দিলেন। স্নেহভরে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এসে ভোজন ক'রে গেলেন আজ এখানে। এই নাও তাঁর পবিত্র প্রসাদ, জীবন তোমার ধন্য হোক্, সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি।"

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সজল নয়নে, যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আমি বিষয়ী—জীবাধম। বামন হয়ে চাঁদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কিন্তু ভব-বন্ধন আমার যে এখনো টুটছে না। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়।"

নিত্যানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে।"

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদের এই আশীর্বাণী রঘুনাথের সাধন-জীবনে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোৎসবে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গ লাভের পর রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। প্রভু চৈতন্যের সান্নিধানে কবে যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই হয় তাঁহার ধ্যান জ্ঞান।

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না। বহির্বাটীতে, দুর্গামণ্ডপের এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাড়ির লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত্নীর আর্তি, আর অভিভাবকদের তিরস্কার কোনো কিছুতেই ফল হইল না।

পিতা ও পিতৃব্য এবার তাঁহার পাহারার ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করিলেন। যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা বা প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কভাবে ঘিরিয়া থাকে। এই ব্যূহ ভেদ করিয়া নীলাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন।

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল—কৃষ্ণ তাঁহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অচিরে সুযোগ একটা উপস্থিত হইবেই। খিন্ন হৃদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন গুণিতে থাকেন।

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়া ২য় তাঁহার পলায়নের সুযোগ। কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি আপনার সেবক। কি আমায় করতে হবে, আদেশ দিন। আমি যথাসাধ্য তা করবো।" ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ।

"আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, তা জানো। যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি এই বিগ্রহের পুজো করে সে আজ ক'দিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি নিজে অশক্ত। কি ক'রে ঠাকুরের সেবাপূজা নির্বাহ হবে ভেবে পাচ্ছিনে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিজে বলে দাও, তাহলে তোমার কথা ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই একবার চল, আমায় মুক্ত করো এ বিপদ থেকে।"

রঘুনাথ তখনই রওনা হইলেন তাঁহার সঙ্গে। কুলগুরুর সঙ্গে যাইতেছেন তাঁহারই জরুরী কাজে। তাই রক্ষীরা কেউ আর তাঁহাকে বাধা দিল না।

প্রাসাদের বাহিরে কিছুটা রাস্তা গিয়া রঘুনাথ আচার্যকে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি সোজা আপনার বাড়িতে চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি।"

আচার্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা। রঘুনাথের জন্য তিনি নিজ গৃহেই অপেক্ষা করিবেন।

পলায়নের এই পরম সুযোগ রঘুনাথ ছাড়িলেন না। পূজারী ব্রাহ্মণকে যদুনন্দন আচার্যের কাছে পাঠাইয়া দিয়া ধাবিত হইলেন নীলাচলের দিকে। রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীরা তাঁহার পশ্চাদ্‌ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়া ফেলিবে। দ্রুতপদে চলা শুরু করিলেন বনপথ দিয়া।

উষার আলোক তখনো ফুটিয়া উঠে নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাঁটা ও কাঁকরের আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত। কোনোদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মাদের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়া চলিয়াছেন। মুখে নিরন্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ-পঙ্কজে।

পদব্রজে নীলাচল যাত্রা তখনকার দিনে ছিল অতি দুরূহ। পথে সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্যুদের উপদ্রব। এসব কোনো কিছু গ্রাহ্য না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারো দিনে। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, আর বাকী নয়দিন কাটিয়াছে অনাহারে। এই অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। তারপর সরাসরি পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। চরণে পতিত, অস্থিচর্মসার, অচেতন প্রায় নবাগত ভক্তকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ—বিষয়-বিরাগী ভক্ত রঘুনাথ।

প্রভু তখন ভাবাবেশে রহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূতলে শায়িত রঘুনাথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, ব্যস্তভাবে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অধরে ফুটিয়া উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুমুক্ষু রঘুনাথকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ বিভোর হন স্বর্গীয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, মাগেন পরমাশ্রয়।

আশ্বাস ও অভয় দিয়া প্রভু রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। সকলকে নির্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য।

প্রেমপূর্ণ স্বরে প্রভু এবার কহেন, "রঘুনাথ, দ্যাখো, কৃষ্ণের কি অপার কৃপা। এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কূপ থেকে। প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা শুরু হ'লো।"

সজল নয়নে, বাষ্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, "প্রভু, আমি কৃষ্ণ জানিনে, কৃষ্ণ-কৃপা কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কৃপাই আমায় আজ উদ্ধার করলো।"

কৃপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন,

"এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥

"স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ; যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই, গুরুগম্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত। প্রভু নিজেই বলিতেন নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ও ব্রজের লীলারস রহস্য তাঁহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনার দৃঢ়তার বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। ঐরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গূঢ়তত্ত্ব অনুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। এজন্য প্রভু তাঁহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়া সেই মর্মী ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন। বিশেষত তিনি জানিতেন, প্রিয় ভক্তটিকে যথোচিত আদর যত্ন বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ তাঁহার নাই; এজন্য রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাঁহাকে পুত্রবৎ ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুত্রকে ধনীর গৃহে পোষ্যপুত্র করিয়া দিবার মতো রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তিনি 'স্বরূপের রঘুনাথ' নামে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন[১]।"

গৌড় হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রম, অর্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। তদুপরি কয়েক দিন তাঁহাকে জ্বরে ভুগিতে হইয়াছে এবং এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে।

লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্তু ভোজনের জন্য স্বাভাবিক একটা ইচ্ছা জন্মে।

১ রঘুনাথদাস গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

রঘুনাথের বেলায়ও তাহা দেখা দিল। সুস্বাদু ভোজ্য বস্তুর জন্য তিনি উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিয়াছেন, কয়েকদিন রঘুনাথকে যেন তাঁহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য সে প্রসাদ বৈরাগী সন্ন্যাসীদেরই উপযোগী। অথচ সদ্য রোগমুক্ত রঘুনাথের জিহ্বার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা সেদিন তিনি মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচিকর চব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপর মনে মনেই তাহা গ্রহণ করিয়া হন পরিতৃপ্ত।

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়া প্রভু স্বরূপকে কহিলেন, "স্বরূপ, আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ হয়েছে। রঘুনাথ আমায় কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে[১]।"

দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রভুকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করানোর সামর্থ্য তাঁহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ ভোজন তো কাহারো চক্ষে পড়ে নাই? স্বরূপ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বুঝিলেন, ইহা প্রভুর মানস ভোজন, আর ইহা সম্ভব হইয়াছে ভক্ত রঘুনাথের মানস নিবেদনের ফলেই।

রঘুনাথও উপলব্ধি করিলেন, অন্তর্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভক্তদের ভাবনা চিন্তার ক্ষীণতম বুদ্‌বুদ্‌টিও ধরা পড়িয়া যায়। তাই তাঁহার বৈরাগ্য সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাভরে, আর সারা দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায়।

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে সাধন নির্দেশ নিবার জন্য। তাঁহার সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে স্বরূপ দামোদরের উপর। তাই স্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো আমায় সাধনভজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার হয়ে আপনি তাঁকে একটু বলুন।"

স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাথের ব্যাকুলতার কথা উঠাইলেন। তখনি সর্ব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাঁহার নির্দেশ :

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তাহা জানে ॥
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ ॥ (চৈ, চ, অন্ত্য-৬)

সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অন্তর্যামী প্রভুর এই মনোরম আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

তাঁহার নিগূঢ় ব্রজরস তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার ভার রহিল স্বরূপ দামোদরের উপর। সেইজন্যই তো তিনি স্বরূপের হাতে রঘুনাথকে একান্তভাবে সঁপিয়া দিয়াছেন।

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার। রঘুনাথের তরুণী পত্নী অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন। জননী হইয়াছেন উন্মাদিনীর মতো, তাঁহার বুক ফাটা হাহাকার শুনিয়া অশ্রুজল রোধ করা যায় না। হিরণ্য ও গোবর্ধন একমাত্র পুত্রের অদর্শনে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়া নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণে। আর তাঁহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে ফিরাইয়া আনা যাইবে না।

কিন্তু রঘুনাথের মাতাকে শান্ত করা যায় কই? কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, "যেমন ক'রে হোক্ তোমরা আমার নয়নের মণি রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো। দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো। এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী আছে কী করতে?"

গোবর্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানাভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা ক'রেও রঘুনাথকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে বিধিলিপি। আরো কহিলেন :

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন ॥
দড়ীর বাঁধনে তারে রাখিব কি মতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে ॥ (চৈ, চ, অন্ত্য-৬)

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রতি বৎসর গৌড় হইতে যাঁহারা নীলাচলে প্রভুর দর্শনে যাইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই শিবানন্দ। যাত্রিদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁহার উপর।

গোবর্ধন মজুমদার রঘুনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের কাছে। জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়া কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে যাপন করিতেছে। সে বৈরাগ্য সে দৈন্যদশা দেখিলে অশ্রুরোধ করা কঠিন হয়।

গোবর্ধনের অন্তর বেদনার্ত হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের মতো বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া সে সহ্য করিবে। অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত মুদ্রা ও বহুতর সুস্বাদু খাদ্য।

পাচক ও ভৃত্য নীলাচলে পৌঁছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু মুদ্রাগুলি কি করিবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে। এই অর্থ দিয়া প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো যাইবে।

ভক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি মাসে দুই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নানা সুস্বাদু ভোজ্য

তৈরি হয়, প্রভু ও তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবেরা তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন। ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকৃতার্থ।

প্রায় দুই বৎসর এভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর হঠাৎ রঘুনাথের মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আর এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। কিন্তু এই সঙ্গে কি তাঁহার অহমিকা কিছুটা মিশ্রিত নাই? 'প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তদের মধ্যে আমি বিশেষ একটা মর্যাদা এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছি' এই ধরনের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তো রহিয়াছে। তাছাড়া, প্রভু কি সত্যই এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন?

ভাবিলেন, 'প্রভু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের আদর্শই তিনি তাঁহার অনুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে ধরছেন। চরম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোনো সাধকই পরম প্রেমরস বা ব্রজরস সহজে ধারণ করতে পারে না। অনুগামী বৈরাগী সন্ন্যাসীদের প্রতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সেই বৈরাগ্যমূর্তি প্রভুকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। আমার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়ী, ধনী জমিদার। তাঁদের প্রেরিত অর্থে যে আহার্য প্রস্তুত হয়, তা ভোজনে প্রভুর তো সত্যকার আনন্দ হবার কথা নয়। তাই তো! ভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে আমি এ কি করছি?'

অতঃপর রঘুনাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রভু প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ডাকছে না। ব্যাপার কি?"

স্বরূপ নিবেদন করেন, "প্রভু, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে, বিষয়ীর অন্ন আপনাকে নিবেদন করাটা ঠিক নয়। আপনি ভক্তাধীন, ভক্তের ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু রঘুনাথের মন আজকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে না।"

একথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত। কহিলেন, "রঘুনাথ ঠিকই বুঝেছে। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধা পড়ে। রঘুনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভুল করে নি।"

আহার বিহার সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন, এই দিকে রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে নিজে এই পন্থার অনুরাগী। তাছাড়া রঘুনাথ আরও ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বহুল জীবনে বহুতর অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে—ভোগেচ্ছার সূক্ষ্ম অঙ্কুর হয়তো এখনো রহিয়াছে উদগ্র। এ অঙ্কুরকে নির্মমভাবে বিনাশ না করিলে শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গড়িয়া উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সংকল্প করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়া নিবেন, ভোগলিপ্সা ও আত্ম-অভিমানের কাঁটাকে সমূলে করিবেন উৎপাটিত।

শ্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দেশ ছিল, ভক্ত রঘুনাথ তাঁহার ভজনপূজন ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে আসিলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কিছুদিন ইহা, ভোজন করিয়াই রঘুনাথের দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ শুরু হইল তাঁহার আত্মসমীক্ষণ, 'তাই তো, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আমি পা বাড়িয়েছি। কিন্তু আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর মতো যত্রতত্র ভিক্ষা ক'রে তো উদরপূর্তি করছিনে। বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছি। চিন্তা নেই,

ভাবনা নেই, আহার ঠিকমতো জুটছে, নিরুদ্বেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। এ তো ঠিক নয় বৈরাগী জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক'রে নিতে হবে।'

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেন। তারপর আসিয়া দাঁড়াইতেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে। কাঙাল বৈষ্ণব বলিয়া দর্শনার্থীরা দয়া করিয়া কেহ যদি কোনো খাদ্য ভিক্ষাস্বরূপ দিত, তাহা দিয়া কোনোমতে করিতেন ক্ষুন্নিবৃত্তি।

এই অযাচক-বৃত্তিই তো নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সাধুর আচরণীয় ধর্ম। এখন হইতে এভাবেই শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য গভীর রাত্রে রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন। তারপর সারারাত কাটাইতেন জপ ধ্যান ও ভজনে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের মনঃপূত হইল না। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের সূক্ষ্ম ইচ্ছা। মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তুক দাতা সম্পর্কে কত কিছুই না ভাবিতে থাকে! কখনো ভাবে—এই যে আমার পরিচিত ভিক্ষাদাতা এগিয়ে আসছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, আজো হয়তো দিয়ে যাবেন। কখনো বা কাহারো সম্পর্কে হয় বিপরীত মনোভাব—এই দাতাটি তেমন সুবিধের লোক নন, বোধহয় এর কাছে আজো কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কহিলেন, 'না—এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের মতো মেগে খাবো।'

প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাভাবে। কখনো ইষ্টগোষ্ঠী করেন কখনো বা ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে থাকেন ব্যতিব্যস্ত। কয়েক দিন রঘুনাথের সংবাদ রাখেন না। সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, "রঘুনাথ কেমন আছে? আর কি ক'রেই বা আজকাল তার ভিক্ষা নির্বাহ হচ্ছে, বলতো?'

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচকভাবে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। এখন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন।

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "তা বেশ করেছে। সত্রে মেগে খাওয়াই তো ভালো। মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্যাবৃত্তিরই মতো। দাতার চোখে পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দাঁড়িয়ে থাকা—এ বড় জঘন্য।"

ভাববিলাসী বৈষ্ণবেরা প্রভুর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন? গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র রঘুনাথ—তাঁহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনে টানিয়া নামাইলেন।

অতঃপর সর্বত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘুনাথ আসিয়া দাঁড়ান কৃচ্ছ্রসাধনের শেষ ধাপে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করার কালে প্রভু কতদিন বলিয়াছেন—

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

সত্রে কাঙালীর সারিতে বসিয়া খাইতে হয় বটে, কিন্তু ভোজন মিলে প্রচুর এবং

নিশ্চিতভাবে। উদরপূর্তি করার পর সারাদিন রঘুনাথ ভজনানন্দে কাটাইয়া দেন। কিন্তু সর্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্যের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে, একমাত্র কৃষ্ণকৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তো সমীচীন নয়। সত্রে গিয়া চাহিয়া খাওয়া—আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি অবলম্বন করিবেন। এমন বস্তু সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো কাছে চাহিতে হয় না; যাহার জন্য কাহারো কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। শুধু তাহাই নয়, যে বস্তু খাইলে অপর কোনো জীবকে বঞ্চিত করা হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন।

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত ভক্তকবি কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতিতিক্ষা ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য :

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায় ॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী ॥
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
লুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়। (চৈ, চ, অন্ত্য-৬)

এ যেন বৈরাগ্যের এক অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপস্বী রঘুনাথ নিজেকে নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে চান, কৃষ্ণকৃপার মহারস ধারণের সামর্থ্য অর্জন করিতে চান।

মন্দিরের কাছে পসারীরা মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে। প্রতিদিন সবটা বিক্রীত হয় না। ঐ বাসি প্রসাদ দুর্গন্ধ হইলে সিংহদ্বারের পাশে দাঁড়ানো গাভীদের সম্মুখে তাহা ঢালিয়া দেওয়া হয়। গাভীরা কতকটা খায়, কতকটা দুর্গন্ধের জন্য ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। রঘুনাথ এই বাসি পচা অন্নকণা কুড়াইয়া আনেন। বার বার জলে ধৌত করার ফলে কোনো কোনো অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। এগুলি সংগ্রহ করিয়া নুন সহযোগে রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন।

যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কৃপালু ও কল্যাণকামী তাঁহার সাধন পথের দিগ্‌দিশারী স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পর্যায়টি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "রঘুনাথ, এমন অমৃতময় প্রসাদান্ন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না। একি অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার!" তারপর ঐ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে। রঘুনাথের কৃচ্ছ্রব্রতের সাফল্যে জানাইলেন অন্তরের অজস্র সাধুবাদ।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চর্যার কোনো কিছুই অজানা নাই। তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, "স্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার বল। দিনচর্যা তার কিভাবে চলছে?"

স্বরূপ করজোড়ে রঘুনাথের কৃচ্ছ্রের কথা সবিস্তার বিবৃত করেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল। স্বরূপকে নিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘুনাথের কুটিরে।

রঘুনাথ তখন ভোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদান্ন জলে মাজিয়া নিয়া, নুন মাখাইয়া পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্বার্থবুদ্ধি ? এমন মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ করছো, আর আমাদের ডাকছো না !"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদানা প্রভু মুখে পুরিয়া দিলেন। আবার হাত বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাঁহার হাতটি খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, "না—না প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্রা আর তুমি বাড়ায়ো না প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও।"

ভক্তেরা তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ।

ভক্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়া বার বার প্রভু তাঁহার এই দৈন্যময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে সেদিন স্বরূপের রঘুনাথ, স্বরূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন প্রতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মূর্ত বিগ্রহরূপে।

রঘুনাথের কঠোর তপস্যা দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্যের আনন্দের সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রভু তাঁহার দুইটি পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক ভক্ত সন্ন্যাসী বৃন্দাবনে গিয়া একটি গোবর্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্যকে এই দুইটি পবিত্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই দুইটি প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্ধনশিলাটির দিকে দৃষ্টি পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনলীলা স্ফুরিত হইয়া উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামালা গলায় পরিয়া শিলাখণ্ডটিকে সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ।

এই পবিত্র বস্তুদু'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ। সাত্ত্বিকভাবে, নিষ্ঠাভরে, তুমি জল ও তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এঁর সেবা পূজা করো, অচিরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবে তুমি।"

তরুণ সাধক রঘুনাথের প্রতি প্রভুর এই কৃপা দেখিয়া নীলাচলের ভক্তেরা বিস্মিত হইয়া যান, ভজননিষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানাইতে থাকেন সাধুবাদ।

পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পাওয়া গেল, কিন্তু ইঁহার পূজার জন্য সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই। আসন, বস্ত্রখণ্ড ও দু'এক পয়সার খাজা সন্দেশও তো যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু কাঙাল রঘুনাথের কাছে তো একটি কানাকড়িও নাই। তবে উপায় ?

এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন স্বরূপ দামোদর। প্রভুর সেবক গোবিন্দকে বলিয়া এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, "রঘুনাথ, গোবর্ধন-শিলা আর গুঞ্জামালা দান ক'রে প্রভু তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন তা কি বুঝতে পেরেছো ?

রঘুনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষাগুরুর দিকে চাহিয়া আছেন। স্বরূপ দামোদর উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে গোবর্ধন-শৈলে। আর গুঞ্জামালা অর্পণের মূল কথা হ'লো এখন হতে তোমার স্থান হ'লো রাধারাণীর চরণে।"

রঘুনাথের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেন, "প্রভু কেন আমার ওপর এত নির্দয়? কেন আমায় বৃন্দাবনে গিরি গোবর্ধনে পাঠাচ্ছেন? আমি যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ধ্রুবতারা। বৃন্দাবনের ঘনীভূত রূপ যে আমি প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি. রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখেছি, আর তাঁর এই তত্ত্বই যে এতদিন অনুধ্যান ক'রে আসছি।"

"না—রঘুনাথ, তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে যেতে বলছেন না। যাবে তুমি পরবর্তীকালে, তোমার তপস্যার শেষ পর্যায়ে। এখন পরমানন্দে প্রভুর সাহচর্য তুমি করো. ব্রজরস সাধনার যে সব অত্যাশ্চর্য লীলা প্রভুকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর দিন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তোল।"

বিস্ময়কর ত্যাগ-তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল অসামান্য ভজননিষ্ঠা। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি অতিবাহিত করিতেন ভজন পূজন রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা, আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষীভূত লীলা দর্শনে। প্রেমভক্তির মহাসমুদ্র প্রভু শ্রীচৈতন্য। সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দিন নৃত্য করিতেছে অগণিত ভাবতরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়া তুলিতেছে। কখনো মিলনের আনন্দে হাসিতেছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো বা বিরহের শোকে হইতেছেন মুহ্যমান। এই ভাবতরঙ্গের মোহন লীলা যেমন অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভৃতির হৃদয়কে নাচাইতেছে,—তেমনি উদ্বুদ্ধ করিতেছে রঘুনাথ প্রভৃতি ভজননিষ্ঠ নবীন ভক্তদের।

প্রভুর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা রঘুনাথ। স্বরূপ ছিলেন প্রভুর সব সময়ের সঙ্গী ও তাঁহার মহাভাবের সূত্রকার, আর এই পরম নিগূঢ় সূত্রের বৃত্তিকার হইলেন রঘুনাথ।

দিনের বেলায় প্রভুর সান্নিধ্যে থাকিয়া রঘুনাথ তাঁহার অপার অনন্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর রাত্রিতে প্রভু গম্ভীরা গর্ভে বসিয়া মহাভাবের যে লীলানাট্য উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মর্মকথা রঘুনাথ দিনের পর দিন শুনিতেন তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বরূপ দামোদরের মুখে। ভজননিষ্ঠা আর ইষ্টকৃপার ফলে ভক্ত রঘুনাথের অন্তর্জীবন প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা মাধুর্যের রসে রসায়িত হইয়া উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের পরমোদয় দেখা দেয় তাঁহার সাধন সত্তায়।

ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ নীলাচলে প্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন, প্রভুর কৃপা আর স্বরূপ দামোদরের শিক্ষা, এসময়ে তাঁহার জীবন-তপস্যা সফল হইয়া উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের পালা। নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া প্রভু হন অন্তর্ধান। প্রভু-সর্বস্ব স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্ত্যধাম।

পর পর দুটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ উন্মত্তের মতো হইয়া উঠেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত গোবর্ধনশিলা ও গুঞ্জামালাটি ঝুলিতে পুরিয়া রওনা হন তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে। মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ দুই প্রবীণ পার্ষদ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডবৎ করিবেন. তারপর এই নরদেহ ত্যাগ করিবেন ভৃগুপাত করিয়া। পুণ্যগিরি গোবর্ধনের শিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এবার তিনি ছেদ টানিয়া দিবেন বিরহখিন্ন আকাঙ্ক্ষংকর জীবনে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় অন্ত্যলীলা দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাই সেখানকার গোস্বামীরা ও ভক্তেরা অধীর হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

সনাতন ও রূপ তাঁহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, "রঘুনাথ, আমরা দুই ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। তুমি হচ্ছো আমাদের আর এক ভাই। এসো তিন ভাইয়ে মিলে বৃন্দাবনে প্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করি। তাছাড়া. তুমি ভৃগুপাত ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীলা গম্ভীরালীলার কথা আমরা কার মুখ থেকে শুনবো? প্রভুর অন্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই পরম লীলাতত্ত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রচুর লীলাতত্ত্ব বুঝিয়েছেন। তুমি নিজেও সেই লীলা দর্শন করেছো, তার মাধুর্যে অবগাহন করেছো। সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্ত্বই তো তোমার মুখে আমরা শুনতে চাই।"

সনাতন ও রূপের স্নেহের বন্ধনে রঘুনাথ বাঁধা পড়িয়া গেলেন। বৃন্দাবনে থাকিয়া ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভু শ্রীচৈতন্য বহু পূর্বে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ তাই এবার কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শুরু করেন প্রভু-নির্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইতে থাকে তাঁহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা।

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর নিগূঢ় প্রেমলীলার কথা আলোচনা করিতেন, তাঁহার মুখে এই লীলার মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন। এবার বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি লাভ করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক রূপগোস্বামীর স্নেহময় সান্নিধ্য। প্রভুর মাধুর্যরস উদ্‌ঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' মাধুর্যময় সাধনা ও নিগূঢ় প্রেমরহস্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সমুজ্জ্বল। শ্রীরূপ যেমন তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা করিতেন মহাভাবময় জীবনের বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্য। তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্বন্ধ। প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোস্বামীর মধুর রসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শী। এখন হইতে রঘুনাথের সাধনজীবনে তিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা কাহিনী শোনার জন্য, স্বরূপ ও রামানন্দের প্রেমতত্ত্ব শোনার জন্য, বৃন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর ভক্তেরাই রঘুনাথের কুটিরে আসিতেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি। শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও তাহার মর্যাদা ছিল অপরিসীম। ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস

কবিরাজ তাই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, মাধুর্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কৃষ্ণদাস প্রায় সময়েই রঘুনাথের সান্নিধ্যে থাকিতেন, সুযোগ পাইলেই তাঁহার সেবা যত্নে নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

রঘুনাথের সংকল্প, গোবর্ধনে গিয়া কঠোর তপস্যায় তিনি ব্রতী হইবেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে কাটাইয়া দিবেন অবশিষ্ট জীবন। রূপ গোস্বামী এবার আব তাঁহাকে বাধা দিলেন না। শুধু কহিলেন, "গোবর্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকে ভাবোন্মত্ত, বাহ্য-জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তো দেহ থাকবে না। কৃষ্ণদাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে।"

রূপ গোস্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কৃষ্ণদাসকে তাই সঙ্গে নিতে হইল। অতঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে উপনীত হইলেন গোবর্ধনে। এই গোবর্ধনেই রঘুনাথের সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের মহামূল্যবান তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভূতির বলে রচনা করেন অমর গ্রন্থ—চৈতন্যচরিতামৃত।

গোবর্ধনের পাদদেশে রহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার উপবেশন ঘাট। এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রভুর উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়া রঘুনাথ আশ্রয় নেন এক বৃক্ষতলে। এখানেই শুরু তাঁহার নূতনতর তপস্যা।

সনাতন গোস্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধনভজন করিতেছেন। তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না থাকিলে চলাফেরা বড় একটা করেন না। পরম স্নেহভাজন রঘুনাথের আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুটিয়া আসিলেন। দুই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল।

সনাতন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ, এস্থানে তপস্যা করবে বলে এসেছো, তা ভালোই। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর আশিসপূত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তাঁরই মাধুর্যলীলার স্তবগান, লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে।"

"আমি কাঙাল বৈষ্ণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো যথেষ্ট, প্রভু।" করজোড়ে নিবেদন করেন রঘুনাথ।

"না রঘুনাথ, তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি ভজনময় জীবন যাপন করো। এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই।

---

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকৃত দীক্ষাগুরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত প্রমাণ নাই। কেহ বলেন তাঁহার গুরু ভট্ট গোস্বামী কেহ বলেন রূপ গোস্বামী। তবে কৃষ্ণদাসের লেখা অনুযায়ী এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে, রঘুনাথই তাঁহার গুরু: শ্রীমৎ গোস্বামী—রসিকমোহন।

দীক্ষাগুরু না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগুরু বা সারগুরু যে রঘুনাথ তাহাতে বিতর্কের অবকাশ নাই: চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—রাধাগোবিন্দ নাথ।

বৃক্ষতলে রাত্রিকালে বাস করা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, তোমার এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় নেওয়াই দরকার।"

সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া ভক্ত গ্রামবাসীরা দলে দলে সেখানে সমবেত হইতে থাকে। সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়া পর্ণকুটির বাঁধিয়া ফেলে, রঘুনাথ ও তাঁহার সেবক কৃষ্ণদাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সনাতনের কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকে।

যেস্থানে ভজনকুটিরটি তৈরি করা হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম। জনশ্রুতি আছে, অরিষ্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়া ব্রজমণ্ডলে দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পর্ব তো শেষ হইল, কিন্তু এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকে তিনি কহিলেন, "বৃষরূপী অসুর তুমি বধ করেছো, এর ফলে হয়েছো মহাপাপের ভাগী। সর্বতীর্থের জলে স্নান না করলে তো তোমার এ পাপ মোচন হবে না।"

চাতুর্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহাস্যে তিনি পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্বতীর্থের পুণ্যময় সলিলধারা। তাহার ফলেই সৃষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড।

গিরি গোবর্ধনের পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য তাঁহার গোবর্ধন পরিক্রমার কালে, ভাবাবেশে মত্ত থাকা অবস্থায়, এই কুণ্ড দুইটি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে মজিয়া গিয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছে নীচু ধানের ক্ষেত রূপে। প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রঘুনাথ তাঁহার ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন। কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো কাজ হইবে না, গভীর করিয়া এ দুটিকে খনন করা দরকার। সারা ভারতের ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করা দরকার।

রঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈষ্ণব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় পাইবেন? তাই খেদের তাঁহার পরিসীমা রহিল না।

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, "হে প্রভু, করুণাসিন্ধু, পরম পবিত্র কুণ্ড দুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব ক'রে তোল। লক্ষ লক্ষ ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আর্তি বিফলে যায় নাই। ভক্তবৎসল প্রভু অচিরে ইহার ব্যবস্থা করিলেন।

সেদিন গোবর্ধন পরিক্রমণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে বিশ্রাম করিতেছেন, অন্তরে বার বার উঠিতেছে চিন্তার তরঙ্গ—'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা আজো সম্ভব হয়ে উঠে নি। এ যে তাঁর বড় সাধের কাজ।'

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষ্ণবভক্ত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানায়। করজোড়ে নিবেদন করে, "বাবাজী, আপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস?"

"হ্যাঁ বৎস, আমিই গোস্বামীদের দাস—রঘুনাথ। কোথা থেকে তুমি আসছো। কি

প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমতো আমি তা করতে চেষ্টা করবো।" শান্ত স্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ।

"প্রভু, আপনার কাছে একটা জরুরী কাজে আমি এসেছি। এখন সোজা আসছি বদরিনারায়ণ থেকে। প্রভু নারায়ণজীর কাছে পূজার মানৎ ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তাঁর পুজো দেবো ব'লে বদরিনাথে পৌঁছলাম। সেই রাতেই প্রভুজী স্বপ্নে দিলেন প্রত্যাদেশ—এখানকার পুজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পুজো সম্পন্ন করো, তারপর সোজা চলে যাও ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে। সেখানে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথদাস চিন্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের খনন কাজের জন্য। ব্যয়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করো। এই জন্যেই আপনার কাছে আমি এসেছি।"

রঘুনাথের নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন অন্তর্যামী প্রভু তাঁহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন। নিজের সব কিছুর ব্যবস্থা তাই করিয়াছেন।

অচিরে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে খনন করিয়া পরিণত করা হয় স্নিগ্ধ সরোবরে। এই জলপূর্ণ পবিত্র কুণ্ডদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ব্রজমণ্ডলের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যস্নান সম্পন্ন করিতে থাকে। এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন রাধাকুণ্ডের দাস গোস্বামী নামে।

রঘুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে। অতঃপর তাঁহার তপঃপ্রভাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে নির্মিত হয় বহুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন-কুটির। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া আরো বহু বৈষ্ণব সাধক এখানে ভজনকুটির স্থাপন করেন এবং রাধাকুণ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে।

নীলাচলের মতো রাধাকুণ্ডে থাকিতেও রঘুনাথ তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত ও ভজননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসিতে দেন নাই। পাষাণের রেখার মতো স্থির অবিচল ছিল তাঁহার এই দৈন্য-বৈরাগ্যময় সাধনার ক্রম। কখনো কোনো কারণে ইহার ব্যত্যয় হওয়ার উপায় ছিল না। সদাসঙ্গী ও ভক্তশিষ্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার এই দিনচর্যার বর্ণনা দিয়াছেন :

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম ॥
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপাতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান ॥
সার্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে ॥

(চৈ, চ, আদি, ১০ম)

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও যুগল লীলার মানসপূজা ছিল রঘুনাথের প্রেমসাধনার মূল উপজীব্য। রসরাজ কৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি, মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জ্বল থাকিতেন তাঁহার সাধনসত্তায়। রাধাকৃষ্ণের এই মিলিত মাধুর্যমূর্তি তিনি দর্শন করিতেন ইষ্টদেব প্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে।

'অন্তরঙ্গ সেবা বা সখী বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের মানসসেবায় রঘুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে দুরবগাহ ভাবময়তা ও প্রেমোন্মাদনা তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিত, ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে তাহা ছিল পরম বিস্ময়কর।

"রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ বা বিরহদশায় তাঁহাব সখীগণ যেভাবে তাঁহার প্রতি সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথও অন্তর্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সেই সময়ে কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, তাঁহার আত্মবিস্মৃত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝা যাইত। এই অবস্থার কথা ভক্তমালে আছে—

আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥

"রূপগোস্বামী ললিতমাধব নাটক রচনা করিয়া রঘুনাথকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ভ লীলা অতি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মতো হইয়া গেলেন। এই জন্য তাহার সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে "দানকেলি-কৌমুদী" নামক ভাণিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার করে অর্পণ করেন। প্রতিষেধক ঔষধের মতো উহাতে পূর্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়া রঘুনাথ সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারম্ভ ও উপসংহারের আশীর্বচনে এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন।

"একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলে, তাঁহার তপঃ-প্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং শ্রীভগবানের কৃপামাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাঁহারা যেন স্থির হতে পারেন না। একজনের জন্য সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য হয়, পুণ্যময় হয়। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও ভূগর্ভ গোস্বামী তাঁহার নিকটেই ভজনকুটিরে থাকিতেন। শ্রীবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন।"[১]

রঘুনাথের অকৃত্রিম ভজননিষ্ঠা ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাঁহাকে সারা ব্রজমণ্ডলে বরণীয় করিয়া তোলে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলার এক মরমী ব্যাখ্যাতা রূপেও তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্যতম অবদান তাঁহার রসমধুর স্তবাবলী উল্লেখ করিতে

১ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র।

হয়।[১] অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য দিয়া যখন তাঁহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, অন্তর-পুরুষ তখন দুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেন। সুললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত হইত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে। এই স্তবাবলী প্রমাণিত করে যে তিনি দিব্যলীলা দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শাস্ত্রবিদ্ সাধক। আজো ইহা অগণিত ভক্তের সাধনপথের পরম পাথেয় হইয়া আছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহা বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্র সমাদৃত।[২]

ভজন-সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেম-সিদ্ধি রঘুনাথ লাভ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ সেবার কালে ব্রজের মাধুর্য-লীলা দর্শনে হইতেছেন আপ্তকাম। কিন্তু তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তাঁহার সতর্কতার বিরাম নাই। অশন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগ্য সাধনার সেই পাষাণের রেখা ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল।

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। রঘুনাথের কল্যাণ কামনা নিয়া এই মাতৃস্বরূপা সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এসময়ে তাঁহার কাছে নৈষ্ঠিক বৈরাগী রঘুনাথকে নিজের সম্পর্কে যে আর্তি প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল। বহু বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, পরম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ণব সজল নয়নে বলিতেছেন :

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসো লাজ ভয়।
কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয় ॥
একদিন না করিনু চরণ সেবন।
তথাপি চরণ মাগো হেন দীনজন ॥
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি ॥

(প্রে, বি, ১৬শ বিলাস)

এই আর্তি ও দৈন্য এখনো কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের ? ব্রজরস সাধনার উত্তম অধিকারী মাত্রেই তাঁহার ঐ উক্তি হইতে বুঝিয়া নিবেন, বৈরাগ্যের নিষ্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের অহমিকাকে দিনের পর দিন অবলুপ্ত করিয়া দিতেছেন, আর কৃষ্ণ অনুরাগের ভাণ্ডটিকে করিতেছেন প্রশস্ততর।

নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কৃচ্ছ্র চরমে উঠে। সাধনজীবন তাঁহার অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া নামমাত্র আহার্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রকট হইবার পর অন্ন তিনি একেবারে ত্যাগ করেন। সামান্য ফল ও দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন।

১ শ্রীমৎ দাস গোস্বামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রঘুনাথের সংস্কৃত স্তবের সুললিত অনুবাদ দেওয়া আছে।

২ অপর গ্রন্থগুলির নাম—শ্রীনাম চরিত, মুক্তাচরিত এবং দানকেলি-চিন্তামণি। স্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কড়চার বৃত্তিকার রূপেও রঘুনাথ ভক্তসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাছাড়া, পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত তিনটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনে আগমনের পর আহার আরও হ্রাস পায়। দুই একটি ব্রজফল এসময়ে খাইতেন, আর দুধের পরিবর্তে গ্রহণ করিতেন অল্প পরিমাণ ঘোল।

রাধাকুণ্ডের তপস্যাময় জীবনে যে আহার্য সম্বন্ধে কোনো হুঁশই তাঁহার থাকিত না। সারা দিন ও রাত্রের বেশী সময়ই থাকিতেন ভজনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং অপর একটি ব্রজবাসী ভক্ত সুযোগ মত পাত্রের দোনা করিয়া তাঁহার মুখে কিছুটা ঘোল ঢালিয়া দিতেন। এই ধরনের কৃচ্ছ্র চলিতে থাকে প্রায় বিশ বৎসর ব্যাপিয়া।

অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামীদের মধ্যমণি সনাতন তনু ত্যাগ করেন। অগ্রজ-প্রতিম এই মহাবৈষ্ণবের তিরোধানে রঘুনাথ শোকে হন মুহ্যমান। তারপর আসে আর এক দুর্দৈব। রূপ গোস্বামীও ভক্ত বৈষ্ণবদের মায়া কাটাইয়া মরধাম হইতে অন্তর্হিত হন। গুরুস্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথা শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের জন্য অন্নজল ত্যাগ করেন। এসময়ে তাঁহার দেহটি বাঁচাইয়া রাখা হয় কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্যা।

বিস্ময়ের কথা এই শোকজর্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু, মহাসাধকের নিয়মিত ভজন পূজন ও অন্তরঙ্গ সেবার কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখা যায় নাই।

অতি ক্ষীণ শরীর দুর্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥
যদ্যপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাপয় ॥
নিয়ম-নির্বাহ বৈছে যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে ॥

(ভ, র, ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ)

প্রেমঘন মূর্তি রঘুনাথ গোস্বামীর চরণতলে এক সময়ে অনেক সাধকই আসিয়া উপবেশন করিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিনি সিদ্ধ মহাত্মা রঘুনাথের সাহচর্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে দিনের পর দিন শুনিয়াছেন গম্ভীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধারিত মহাপ্রভুর প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা।

আজিও কল্পনা করা যায়; ভজনকুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব রঘুনাথের যুগলভজনময় জীবনের স্নিগ্ধমধুর দীপশিখা—যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে বিছাইয়া দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জ্বল রসের স্নিগ্ধ প্রলেপ—মানুষকে উর্ধ্বায়িত করিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিকে, অপ্রাকৃত ব্রজধামের দিকে। আর সেই দীপশিখারই মৃদু আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। তাঁহার প্রাণপ্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন তিনি গোস্বামী রঘুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হইয়া।

আরও কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়। গোস্বামী রঘুনাথ এবার আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার মর্ত্যলীলায় শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। বয়স তখন তাঁহার প্রায় চুরাশি

বৎসর। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীর পরম লগ্নটি সেদিন আসিয়া যায়। ১৫১৪ শকের[1] চিহ্নিত ক্ষণটিতে আপ্তকাম মহাসাধক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়।

রাধাকুণ্ডের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখাটি সেদিন নিভিয়া যায়; আবার বুঝি নূতন করিয়া দিব্যরূপে জ্বলিয়া উঠে রাধামাধবের অপ্রাকৃত মহাধামে।
